ভারতে মুসলিম নির্যাতন

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

ভারতে মুসলিম নির্যাতন

মুহাম্মাদ সিদ্দিক

ঢাকা পাবলিকেশন্স

ভারতে মুসলিম নির্যাতন

লেখক ও সংকলক ঃ মুহাম্মাদ সিদ্দিক

প্রকাশক

ঢাকা পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশ

পরিবেশক

সুহৃদ প্রকাশন

৩৮/৩, বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইলঃ ০১৭১২১৫৩৩৬২

প্রাপ্তিস্থান

১. মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ও নয়াপল্টন, ঢাকা।

২. আহসান পাবলিকেশন্স, ওয়ারলেস গেট, বড় মগবাজার, ঢাকা এবং কাটাবন, ঢাকা।

প্রথম প্রকাশ

১৪১৭ বাংলা

১৪৩২ হিজরি

২০১১ ইংরেজি

মূল্য ঃ টাকা ৪০০.০০ (চারশত)

মার্কিন ডলার ঃ ২০ (বিশ)

Bangla language book

Bharate Muslim Nirjaton (Oppression on Indian Muslims), written and compiled by : Muhammad Siddique, Published by : Dhaka Publications, Dhaka, Bangladesh, year 2011.

US$: 20 (Twenty)

উৎসর্গ

ইন্ডিয়ার শহীদ মুসলমানদের রুহের মাগফিরাতে এই নজরানা।

সূচীপত্র

ভারতের মুসলিম নির্যাতন

–মুহাম্মাদ সিদ্দিক

ভারতে অহরহ সংখ্যালঘুদের উপরে জুলুম চলছে। অথচ একশ্রেণীর দেশী বিদেশী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক ভারতীয় অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশেই সংখ্যালঘুদের উপর কল্পিত নির্যাতনের কাহিনী ফাঁদেন। তাঁরা দেশে বিদেশে বাংলা-ইংরেজী ভাষাতে সে সব কাহিনী প্রচার করেন ও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নস্যাতে সচেষ্ট। এটা যে ভারতের সংখ্যালঘু-নিষ্পেষণকে আড়াল করতে, তা বোধগম্য। তবুও ভারতীয় ও তাদের বন্ধু ইহুদী-ইসরাইলী মিডিয়ার কল্যাণে এই মিথ্যাচারের প্রচার হচ্ছে বেশি। দেশে-বিদেশে মানুষ হচ্ছে বিভ্রান্ত। আর বাংলাদেশের সত্য মিডিয়া চক্রান্তে পাচ্ছে গৌণ প্রচার। এই যে ষড়যন্ত্র এটা ফাঁস হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কখনও কখনও খারাপ, তা প্রতিবেশী দেশ গুলোর চেয়ে বেশি খারাপ নয়। আর যে সব ঘটনা হয়ে থাকে তাতে ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোন সংযোগ নেই। এগুলো নিছকই রাজনৈতিক বা আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপার। এর শিকার যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হতে পারে, যেমন ডাকাতি, হাইজাকিং, মুক্তিপণ আদায়, নারী নির্যাতন, নারী-শিশু পাচার, হত্যা, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি। এসব ঘটনাতে তো সংগতকারণে মুসলমানরাই 'ভিকটিম' বেশি। কারণ তারা সংখ্যায় বেশি। যে দু'একটা ঘটনাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কেউ 'ভিকটিম' হয় তখন মতলবি প্রচারণা হয় এসব নিয়ে দেশে বিদেশে। এতে দেশের দেশ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহ যেমন জড়িত, তেমনি বিদেশের গোয়েন্দা ও তথ্য সংস্থাসমূহ। ইহুদী মিডিয়া এসবকে ফাঁপিয়ে প্রচারে ওস্তাদ। এদের মিডিয়াতে সমস্ত মুসলিম বিশ্বই যেন শয়তানের ঘাঁটি। অথচ শয়তান যে ইসরাইলে ঘাঁটি গেড়েছে, তার উল্লেখ নেই।

দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে কিছুকিছু গোষ্ঠী বাংলা-ইংরজীতে বই লিখে, প্রচার পত্র বিতরণ করে বাংলাদেশেও সংখ্যালঘু নির্যাতনের অলীক কাহিনী প্রচার করেছে। এসব মতলবি বই, প্রচারণা সামগ্রী পাশ্চাত্য, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে তারা ছড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ইত্যাদি দেশ বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের কৌশলিক এলাকা তৈল ও অন্যান্য সম্পদ দখলে তৎপর। কল্পিত সন্ত্রাসীর তালাসে তারা মুসলমানদের অশেষ দোষ আবিষ্কারে রত। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের শিকার, এটাও যুক্তরাষ্ট্রের ও ইউরোপের কোন কোন নেতা বিশ্বাস করে ক্ষুব্ধ। অথচ চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্যাতন যদি হয়েই থাকে তা হচ্ছে গুজরাটে, ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরে, পশ্চিমবাংলায় ইত্যাদি এলাকাতে।

চট্টগ্রামের একটি চিহ্নিত মুখচেনা মহল "নির্যাতিত সংখ্যালঘু বিপন্নজাতি" (ইংরেজী নাম "Persecuted Minorities Endangered Nation") শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করল। এতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর কথিত ভয়াবহ নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রায় সাড়ে তিনশ' পৃষ্ঠার এ বইয়ে রয়েছে বাংলাদেশ

বিরোধী প্রচারণা। বাংলা এবং ইংরেজীতে ছাপানো এই বইটির হাজার হাজার কপি দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে। চরম বাংলাদেশ বিদ্বেষী এ পুস্তকটি বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার কাছে পাঠানো হয়েছে।

অপসেট কাগজে চার রঙা ছবি সংবলিত এই বইটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক তোলপাড় হয়। আলোচ্য এই বইটিতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ২০০১ সালের ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ২ মাস ২৫ দিনে দেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের একটি ভূয়া পরিসংখ্যান দেওয়া হয়।

এতে দেখানো হয় উল্লেখিত সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় খুন হয়েছে ২৭ জন, ধর্ষিত হয়েছে ২৭০ জন নারী ও শিশু, দৈহিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছে ২ হাজার ৬১৯ জন পুরুষ, ১ হাজার ৪৩০ জন নারী, অপহৃত হয়েছে ১০০ জন, ৩৮ হাজার ৫০০ পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। গীর্জা, মন্দির ও মূর্তি ভাংচুর হয়েছে ১৫৫ টি, ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসগৃহে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে ৪ হাজার ৫৫১ টি। এসব পরিষংখ্যানের নেই কোন ভিত্তি, বানোয়াট সব কাহিনী।

বইটির প্রাক-কথনে সম্পাদনা পর্ষদের একটি বক্তব্যও দেয়া হয়। এতে বলা হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সারাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অবাধে, নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের লক্ষে নির্বাচন পূর্বকালে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিস্পৃহতা পরিলক্ষিত হয়। এ সুযোগে নাকি একতরফা সাম্প্রদায়িক নির্যাতন, নিপীড়ন শুরু হয়, নির্বাচন পরবর্তীতে তা একটানা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। প্রপাগাণ্ডা ধরণের বইটিতে লেখা হয়, নির্যাতনকারীরা অবাধে খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, চাঁদাবাজি কালে ধমীয় সংখ্যালঘুদের হয় দেশ ছাড়ার, নয়তো ধর্মান্তরের কিংবা দেশে থাকতে হলে তাদের ভাষায় মাইনরিটি ট্যাক্স দেয়ার হুমকি দেয়। এসবই যে মিথ্যা– ডাহা মিথ্যা তা স্পষ্ট। কবে কোন হিন্দুকে বাধ্যকরা হয়েছে মুসলমান হতে? নাম দিবে কি তারা?

এই মতলবি বইটিতে বাংলা ও ইংরেজীতে ১৯টি প্রবন্ধ, ১৪টি পত্রিকা সম্পাদকীয়, বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সংবাদ, ২টি তথাকথিত তদন্ত প্রতিবেদন, কথিত সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন এবং নির্যাতনের স্থিরচিত্র দশটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। ভূমিকায় বলা হয়, অবাঙালী ও বহির্বিশ্বের পাঠকদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় গুরুত্বসহ ইংরেজী মাধ্যমকে ব্যবহার করা হয়েছে। এ বইয়ের সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা হলেন রণজিৎ কুমার দে, রানাদাস গুপ্ত, স্বপন কুমার মহাজন, অঞ্জন কুমার সেন, সমরেশ বৈদ্য, অনুপ সাহা ও তুষার কান্তি বসাক। ৪২, দেয়ানজি পুকুর লেইন দেওয়ানবাজার, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত বইটির গায়ে দাম লেখা হয়েছে দু'শো টাকা। বইটির হাজার হাজার কপি বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

এই ধরণের আরো কিছু বই যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র ছাপা হয়ে বিতরণ করা হয়েছে। সে গুলো আবার মার্কিনী কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরদের ভিতরও বিতরণ করা হয়। কোন কোন

বিভ্রান্ত সিনেটর ও কংগ্রেসম্যান আবার মন্তব্য করেন যে পাওয়া গেছে এখন এমন তথ্য বাংলাদেশকে পাকড়াও করা যাবে। এইসব বইয়ে কমই সত্য রয়েছে। গুজরাটে দুই-চার হাজার মুসলমানকে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করা হল। বাংলাদেশে কি তা হয়েছে? গুজরাটের পথে পথে মুসলমান নারীদের নগ্ন করে গণধর্ষণ করে ভিডিও করা হয়েছিল। গর্ভবতী মা'র পেট চিরে ভ্রূণ হত্যা করা হল গুজরাটে। তবুও গুজরাটের ব্যাপারে সোচ্চার না হয়ে বাংলাদেশের প্রসংগ আসবে কেন? হ্যাঁ, তবে বাংলাদেশে যে সব সন্ত্রাসী কাণ্ডকারখানা হচ্ছে তার ৯৯ ভাগের ভিকটিমইতো মুসলমান নর-নারী। মুসলমানরা কাকে দোষ দেবে? খোদা নাখাস্তা এই নিরানব্বই ভাগ ভিকটিম যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হতো, তাহলে তো কি ইলাহী কাণ্ড কারখানাই না করত কেউ কেউ।

আমাদের বর্তমান বইটিতে ভারতীয় লেখক বুদ্ধিজীবীদের মন্তব্য রয়েছে ভারতে লোমহর্ষক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে। এগুলো এই বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সুচিন্তিত মন্তব্য। আমরা শুধু একসঙ্গে হাজির করলাম কোন প্রকার টিকা-টিপপনি ছাড়া। মানুষ যে কত নীচু স্তরে নেমে যেতে পারে তারই প্রমাণ পেশ করেছেন এই সব মানব-দরদী ব্যক্তিগণ। তারা ভারতের সেই মজাপুকুরে পদ্মফুলের মত। তারা যে সন্ত্রাসীদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে হক কথা বলেছেন এটা তাদের মানবতাবাদী চরিত্রেরই প্রকাশ। এঁদের লেখায় প্রকাশ পেয়েছে যে রুয়াণ্ডার মত গণহত্যা হয়েছে গুজরাটে। রুয়াণ্ডা ও গুজরাট একই চিত্র। মুসলমানরা হত্যাকে ঘৃণা করে। বিধর্মীকে রক্ষা করাই মুসলমানদের ধর্ম। হত্যাকারীর শাস্তি অনন্তকাল দোজখ।

নিরপরাধীকে হত্যা করা মহাপাপ

নরহত্যা সে যে কোন হত্যা হোক, মুসলমান হোক বা অমুসলমান হোক। জঘন্য অপরাধ ইসলামে। প্রখ্যাত পণ্ডিত আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারা একজন খ্যাতিসম্পন্ন অপরাধ বিশেষজ্ঞ আলেম। তাঁর "আল খাতায়া ফী নাযরিল ইসলাম" (ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ) গ্রন্থে লেখা রয়েছে :

"ইচ্ছাকৃত হত্যাই অতি ভয়ংকর পাপ যা শান্তি বিঘ্নিত করে। এটা এমন পাপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা যার হিসাব বা বিচার প্রথম করবেন। রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন :

"প্রথমতঃ বান্দাদের মধ্যে যে বিষয় ফয়সালা করা হবে তা হ'লো রক্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ হত্যা'। (বুখারী ও মুসলিম)।

ইসলাম মানুষের আত্মার অপসারণ অর্থাৎ মৃত্যু ঘটানকে গুরুত্বদান করেছে, তাই একজন মানুষ হত্যাকে সকল মনুষ্য হত্যার পর্যায়ে রেখেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ার ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো; এবং কেহ কাকে বাঁচালে তবে যেন সমস্ত লোককে রক্ষা করল।" (৫ সুরা মায়েদাহ : ৩২ আয়াত)।

"মানুষ সম্বন্ধে আল্লাহর নির্ধারিত এ দৃষ্টিভঙ্গি অপরাপর সকল প্রকার দৃষ্টিভংগী ও দর্শনকে ছাড়িয়ে গেছে। অতএব অন্যায়ভাবে কোন একটি প্রাণকে হত্যা করা তা যে ধর্মেই হউক না কেন বা যে রংগেরই হউক– সকল মনুষ্য গোষ্ঠিকে হত্যা করার সমতুল্য। আর কোন প্রাণকে ডুবে মরা, পুড়ে মরা, ভুকে ভরা এবং রোগে মরার বিপদ হতে বাঁচিয়ে তোলা পূর্ণ মানব গোষ্ঠিকে বাঁচিয়ে তোলার সমপর্যায়ভুক্ত।"

"মনুষ্য আত্মা বা প্রাণ সম্বন্ধে ইসলামের এ ধারণা বা ইংগিত তার অনুসারীদেরকে মানুষের প্রতি সম্মান দেখাতে প্রলুব্ধ করেছে, আর কোন ব্যক্তির জন্যই তা অবমাননা ও তার প্রতি অন্যায় আচরণ প্রদর্শনের কোন অবকাশ থাকল না।"

"ইসলাম বলে, কোন মানুষকে অন্যায় ভাবে হত্যাকরা কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ যার কর্তা কিয়ামতে অনন্ত শাস্তির উপযুক্ত হবে। আল্লাহতা'আলা এরশাদ করেন :

'এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তারা তাকে হত্যা করেনা, এবং ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলি করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বর্ধিত করা হবে। এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় চিরকাল থাকবে।' (আল ফুরকান : ৬৮-৬৯ আয়াত)।"

"রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তোমরা ধ্বংস সাধনকারী সব বস্তুকে পরিহার কর। আর তার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন :

"ঐ নির্দোষ প্রাণকে বধ করা যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন।'

"ইসলাম সে সব লোক হতে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে যারা নিরপরাধ নির্দোষ কোন লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয় যদিও তারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন। তাই রসূলুল্লাহ (স.) বলেন :

'যে ব্যক্তি সন্ধি স্থাপনকারী কোন লোককে হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহ্শতের সুগন্ধও পাবে না অথচ তার সুগন্ধ চল্লিশ বৎসর দূরের পথ হ'তে পাওয়া যাবে।' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)। সন্ধিস্থাপনকারীরা হলো ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক যারা মুসলমানদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার অংগীকারে আবদ্ধ হয়েছে।

যেসব ইহুদী এবং খৃষ্টান মুসলমানদের দেশে বসবাস করে তাদেরকে যিম্মি বলা হয়। কেননা তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহ রসূলের যিম্মাদারী রয়েছে। তাদের উপরও কোনরূপ আক্রমণ চলবেনা। যদি তারা যে শর্তে যিম্মি হয়েছে ঐ শর্ত রক্ষা করে এবং মুসলমানদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ না করে তবে আমরা তাদের প্রতি ঐ আন্তরিকতা প্রদর্শন করবো যে আন্তরিকতা আমরা নিজেদের এবং স্বীয় পরিবারের প্রতি প্রদর্শন করে থাকি। যারা তাদের প্রতি আক্রমণ করে তাদের পাপ বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ (স.) বলেন :

'যে ব্যক্তি যিম্মিদের মধ্যে কাউকে হত্যা করে সে ব্যক্তি বেহেশতের সুগন্ধপ্রাপ্ত হবেনা যার সুগন্ধ চল্লিশ বৎসর দূরবর্তী স্থান হতেও প্রাপ্ত হবে।' " (ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, বাংলা অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ২৬০-২৬২)।

ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি

জনাব তাব্বারা 'ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি' সম্পর্কে লেখেন, "ইসলাম ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি বর্ণনা করেছে। যেমন আল্লাহতা'আলা ইরশাদ করেছেন :

'আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা। কেহ অন্যায় ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দান করেছি কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। (সুরা আল-ইসরা : ৩৩ আয়াত)।

হত্যাকারীর শাস্তি বিধান সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা বলেন :

'হে বিশ্বাসীগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী; কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হ'তে কিছুটা ক্ষমাপ্রদর্শন করা হ'লে তার দেয় আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হ'তে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও যে সীমালংঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হ'তে পার।' (সুরা বাকারা : ১৭৮-১৭৯ আয়াত)।

"নিহত ব্যক্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুমিন সম্প্রদায়ের উপর যে কিসাস লওয়া অত্যাবশ্যকীয় করেছেন, তা হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে স্বভাবতঃ ওর পরিবর্তন। একেও হত্যা করা হ'বে। ইসলাম নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের জন্য এ অধিকার দিয়েছে। অতএব ইসলামী বিধান মতে হত্যাকারীকে প্রথমতঃ নিহত ব্যক্তির ওলী বা অভিভাবকদের সম্মুখে পেশ করা হবে, তারা তাদের নিহত ব্যক্তি কিসাস গ্রহণ করবে, কেননা এক্ষেত্রে তারা নিহত ব্যক্তির স্থলবর্তী, অতঃপর নিহত ব্যক্তির ওলীগণ শাসন কর্তার নিকট হত্যাকারীকে হত্যার আবেদন করবে অথবা তার নিকট হতে রক্ত পণ আদায় করে তার বিনিময়ে নিহত ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে; এ তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। পাত্র ও অবস্থাভেদে তারা সে ব্যবস্থা নেবে। যদি তারা হত্যার আদেশ করে, তবে তাদের এ সিদ্ধান্ত হত্যাকারীর জন্য হবে বিচার এবং উপযুক্ত। আর যদি তারা রক্তপণ দিয়ে ক্ষমা করে দেয় তবে তা হ'বে রহমত এবং এহ্‌সান।"

"কিসাসের এ বিধান হলো হত্যাকারীর জন্য পার্থিব শাস্তি এবং নিহত ব্যক্তির ওলীদের হক। শাসক ইহা জারি করলে অন্যের জন্যও ইহা দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হয়।"

"মূলতঃ ইসলামী শরীয়তে অন্যায় ও পাপের মূলোৎপাটন করতে চায়, তাই ইচ্ছাকৃত হত্যার হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির ওলীদের হাওয়ালা করে। নিহত ব্যক্তির ওলীদের ইচ্ছানুযায়ী হত্যাকারী হ'তে কিসাস প্রকৃত পক্ষে মানুষের জীবন। কেননা অন্য লোককে হত্যা করা হ'তে লোকদেরকে যে বস্তু প্রায়শঃ ফিরিয়ে রাখে তা হ'লো তাদের জীবিত থাকার প্রতি লালসা এবং যাকে হত্যা করবে তার পরিবর্তে তাকে হত্যা করা ভয়। অতএব কিসাসই তাদের জীবন রক্ষা করলো। আরও ঐসকল লোকের জীবন রক্ষা করলো যারা তাদের হত্যার কথা মনে মনে চিন্তা করছিল। এটাই আল্লাহ তা'আলার এ আয়াতের সারমর্ম।"

'হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন রয়েছে যাতে তোমরা সাবধান হ'তে পার।' (সূরা বাকারা : ১৭৯ আয়াত)।

"এসব কিছুই ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্বন্ধে বলা হয়েছে কিন্তু ভুলবশতঃ হত্যা হলে তার জন্য রক্তপণ এবং অন্য আহকাম রয়েছে।" (ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, পৃষ্ঠা, ২৬৫-২৬৭)।

যেখানে নিরীহ, শান্তিপ্রিয় কোন মানুষকেই হত্যা করা মহাপাপ, তেমনিভাবে অমুসলিমদেরও তাই। যদি কোন মুসলমান বেহেশ্‌তে যেতে চায়, সে কি করে এই জঘন্য কাজ করতে পারে? হত্যা মহা অপরাধ। তা যাকেই হত্যা করা হউক না কেন বিনা অপরাধে।

জুলুম করা ও জুলুমের সাহায্য করা ঈমানের পক্ষে মারাত্মক

কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন, "আল্লাহ্‌ নির্দেশ দেন ন্যায়, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনদের দান করতে এবং নিষেধ করেন তিনি পাপাচার, অন্যায় ও ধৃষ্টতা হতে, তিনি উপদেশ দানেন তোমাদের শিক্ষার জন্য।" (১৬ সুরা নাহল : ৯০ আয়াত)।

রসূলুল্লাহ্‌ (স.) বলেছেন, "আওস্‌ ইবনে শুরাহ্‌বীল (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম (স.)-কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি কোন জালেমের সংগে তার সাহায্য ও সহযোগীতা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্য চলল– এই অবস্থায় যে, সে জানে যে সেই ব্যক্তি জালেম, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল।" (বায়হাকী– শুয়ুবে ঈমান)।

এর ব্যাখ্যায় মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম লেখেন, "জুলুম করা ইসলামী আইনে পরিষ্কার হারাম। সব রকম জুলুম বন্ধ করার জন্য কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যেখানে মুসলমান থাকিবে, সেখানে কোন প্রকার জুলুম পোষণ ও নির্যাতন থাকিতে পারিবে না। ইহাই হইতেছে মুসলমানের পরিচয়। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি জুলুম বন্ধ করার পরিবর্তে জানিয়া শুনিয়াই জালেমের সাহায্য ও সহযোগিতা করে, জালেমের

হস্ত মজবুত করে, জালেমকে আরো শক্তি যোগাইয়া দেয় যেন সে আরো বেশি করিয়া জুলুম করিতে পারে, তবে সে ব্যক্তি কোনক্রমেই ইসলামের সীমার মধ্যে থাকিতে পারে না। জালেমের সাহায্যকারীর এই অবস্থান হইলে খোদ জালেমের কি অবস্থান হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। রসুলের এই সাবধানবাণীর উদ্দেশ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। মানুষ অনেক সময় না বুঝিয়াই ও বে-খেয়ালি অবস্থায় জালেমের সাহায্যে লিপ্ত হয়, তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও তাহার হুশ হয় না। ইহা তাহার পক্ষে খুবই মারাত্মক। অতএব এই ব্যাপারে সকলকেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।" (হাদীস শরীফ, ইসলামিক পাবলিকেশনস লি, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৯৮-১৯৯)।

জুলুম ও জুলুমের সাহায্য-উভয়ই ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন প্রকৃত মুসলমান এসবে জড়িত হতে পারে না। মুসলমান, অমুসলমান কারোর উপরই কোন প্রকার জুলুম ইসলাম গ্রহণ করে না। জালেম ও জালেমের সাহায্যকারীকে দমনই ইসলাম।

রসুল (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হইও না। আমি বলিনা যে, মানুষ তোমাদের উপকার করিলে তোমরা তাহাদের উপকার করিবে এবং তাহারা তোমাদের প্রতি জুলুম করিলে তোমরাও তাহাদের প্রতি জুলুম করিবে। এবং যে উপকার করে তাহাদের উপকার করিও, কিন্তু তাহারা তোমাদের উপর জুলুম করিলে, তোমরা জুলুম করিও না।" (তিরমিজী)।

রসুল (সা.) বলেন, "কিয়ামতে তিন বক্তিকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে- (১) যে ব্যক্তি কোন নবীকে হত্যা করিয়াছে; (২) যাহাকে কোন নবী হত্যা করিয়াছেন, (৩) অত্যাচরী নেতা বা বাদশাহ।" (তেবরানী)।

রসুল (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি নেতা হইয়া জনসাধারণের বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের প্রতি লক্ষ্য করে না, কিয়ামতের দিন আল্লাহতায়ালা তাহাকে কোন প্রকারেই ক্ষমা করিবেন না।" (আবু দাউদ)।

রসুল (সাঃ) বলেন, "মজলুমের (উৎপীড়িতদের) বদদোয়া হইতে সাবধান হও, কারন সে আল্লাহর নিকট তাহার ন্যায্য অধিকার করিবে এবং আল্লাহ কখনও কাহারও ন্যায্য অধিকারে বাধা প্রদান করেন না। (আহমদ)।

রসুল (সাঃ) বলেন, "হাদীস কুদসীতে আছে, আল্লাহতায়ালা বলেন- যদি কেহ এক ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে, যাহার সাহয্যকারী আমি ব্যতীত আর কেহই নাই, সে যেন আমার ক্রোধকে উত্তেজিত করিল"। (তেবরানী)।

রসূল (সা.) বলেন, "যদি কোন ব্যক্তি কোন অত্যাচারীকে কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে দেখিয়া তাহার হস্তদ্বয় না ধরে (বাধা না দেয়) তবে সত্বরেই আল্লাহ তাহার উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন।" (আবু দাউদ)।

রসুল (সা.) বলেন, "মজলুম ব্যক্তি জালিমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিলে উহাকে মেঘের উপরে উঠাইয়া লওয়া হয় এবং উহার জন্য আসমানের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর আল্লাহ মজলুমকে লক্ষ্য করিয়া বলেন– যদিও বিলম্বে হয় তবুও নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সাহায্য করিব।" (তিরমিজী, আহমাদ)।

রসুল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন জালিমকে সাহায্য করার জন্য রওনা হয়, সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়।" (তেবরানী)।

রসুল (সা.) বলেন, "জালিম কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভে বঞ্চিত হইবে।" (তেবরানী)।

রসুল (সা.) বলেন, "যে পর্যন্ত কোন বিচারক অবিচার বা জুলুম না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তাহার সঙ্গে থাকেন, কিন্তু যখন সে জুলুম বা অবিচার আরম্ভ করে, তখন আল্লাহ দূরে সরিয়া যান এবং শয়তান সে স্থান দখল করে।" (ইবনে মাজাহ, তেবরানী)।

রসুল (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেহ নেতা নির্বাচিত হয় এবং সে লোকের প্রতি জুলুম বা অবিচার করে, তবে আল্লাহ তাহাকে উলটামুখী করিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।" (তেবরানী, হাকেম)।

রসুল (সা.) বলেন, "জাহান্নামের মধ্যে হার্ হার্ নামক একটি অগিনময় জঙ্গল আছে, উহাতে আল্লাহ একমাত্র জালিমদিগকে শাস্তি প্রদান করিবেন।" (তেবরাণী)।

তাহলে আমরা কি দেখছি? অত্যাচারী যারা হবে, যে আদর্শেরই হবে, তার নেই নিস্তার। আর মুসলমানদের তো দায়িত্ব আরো বেশী। প্রকৃত মুসলমান কারও উপরই অত্যাচার করতে পারে না। যে তা করে সে মুসলমানই নয়। তার নাম আরবী-ফার্সীতে যাই হোক না কেন।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ "জালেমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফাআতকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে।" (সূরা আল-মুমিন ঃ ১৮ আয়াত)।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রসূল (সা.) বলেন তোমরা জুলুম করা থেকে দূরে থাক। কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে।" (মুসলিম)।

আইশ (রা) থেকে বর্ণিত; রসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে জুলুম করল (জবর দখল করল; কিয়ামতের দিন) সাত তবক জমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি (মহানবী) এ আয়াত পাঠ করলেন : 'আর তোমার রব যখন কোন জালেম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক।' (সূরা হুদঃ ১০২ আয়াত)। (বুখারী ও মুসলিম)।

মুআয (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল (সা.) আমাকে (ইয়ামনের শাসক করে) পাঠানোর সময় (অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে) বলেন : মজলুম বা নির্যাতিতের দোয়াকে (অভিশাপকে) ভয় কর। কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)।

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবাগণ বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেন : আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদত সহ আবির্ভূত হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। এদেরকে তার নেক আমল গুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমলও শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৭১২)।

এসব থেকে আমরা কি দেখছি? জুলুম করা হারাম। আর জুলুমের প্রতিরোধ করতে বলছে ইসলাম। নইলে নেকীর কাজ করেও তা হয়ে যাবে বাজেয়াপ্ত। মজলুমকে সে সব দিয়ে দেওয়া হবে শেষ বিচারে।

ধর্মে নেই জবরদস্তি

মতলবি প্রচারে একশ্রেণীর বিদেশি এজেন্ট প্রচার করছে যে বাংলাদেশে নাকি সংখ্যালঘুদের মুসলমান হওয়ার ধমকি দেওয়া হচ্ছে। এটা ডাহা মিথ্যা। বরঞ্চ ইউরোপীয় ও মার্কিনী খৃস্টানরা তাদের ডলারের লোভ দেখিয়ে বহু সংখ্যালগুকে খৃস্টান করে চলেছে যা। এখন পার্বত্য এলাকার জন্য হুমকি সদৃশ্য। ইসলামে ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। ইউরোপের খৃষ্টানরা আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও পলিনেশিয়ার আদিবাসীদের ভয় দেখিয়ে খৃষ্টান বানিয়েছে।

কুরআন বলে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই" (সুরা বাকারা)। বল প্রয়োগে ধর্ম প্রচার করতে আল্লাহ পাক মানুষকে যেমন নিষেধ করেছেন, তিনি নিজেও তা পছন্দ করেন না। তাই তিনি বলেছেন, "আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে নিশ্চয়ই তাদের উপর এমন ভয়ঙ্কর নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম, তদ্‌দৃষ্টে তাদের গর্দান (স্বভাবতঃই আমার দিকে) অবনত হয়ে পড়ত।" প্রভু জোর পূর্বক ধর্মান্তকরণে বিরোধী। তাই তিনি কুরআনে তাঁর প্রিয়নবীকে আদেশ করেন,

"তুমি লোককে তোমার প্রভুর পথে আহ্বান কর- বুদ্ধি প্রয়োগ করে ও সুন্দর উপদেশ বাক্য দ্বারা এবং তাদের সহিত সবচেয়ে সুন্দর ও কার্যকরী উদাহরণসহ তর্কে প্রবৃত্ত হও।"

গভীর জ্ঞান, মিষ্ট বাক্য এবং সর্বোপরি অনুপম চরিত্র বৈশিষ্ট্য, – ইহাই আল্লাহ্র বাণী প্রচারের ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

ইসলাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়

মিশরের মুহাম্মাদ কুতুব (শহীদ সাইয়েদ কুতুবের ভাই তাঁর "ইসলাম দি মিস আন্ডারস্টুড রিলিজিয়ন" (ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম) গ্রন্থে **"ইসলাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়"** নিবন্ধে লিখেন :

"ইসলামী শাসন সম্পর্কে অমুসলমানদের ধারণা বিরূপ ও সমালোচনামূলক বলে মনে হয় এবং এই কারণে এ প্রসঙ্গের আলোচনা করতে অনেকেই ইতস্তত করেন। মধ্য-প্রাচ্যের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসা করতে দোষ কিঃ 'আপনারা ইসলামী শাসনকে ভয় করেন কেন? ইসলামী আইন কানুন প্রয়োগে আপনাদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বা কি?' এ প্রসঙ্গে কোরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ "যারা তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না কিংবা তোমাদের ঘর বাড়ী থেকে উৎখাত করতে চেষ্টা করে না তাদের প্রতি সদ্ভাব রাখতে বা তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ্ নিষেধ করেন না; কারণ যারা সৎ ও সুবিচারের পক্ষপাতী তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন" (৬০ ঃ ৮)। "আহ্‌লে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য আর তোমাদের খাবার তাদের জন্য হালাল। সতী মোমেনা নারী ও সতী আহ্‌লে কিতাব নারীকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য জায়েয" (৬ ঃ ৬)। এছাড়া ইসলামের সাধারণ বিধানও রয়েছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমানদের ন্যায় অমুসলিম সম্প্রদায়ের সমান অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ও তাদের সাথে সদ্ভাব রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। একমাত্র ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ব্যতীত সামাজিক ও নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সাথে সমপর্যায়ভুক্ত থাকবে এটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানদের ও আহ্‌লে কিতাবদের সঙ্গে পানাহার ও বিবাহ বন্ধন ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী শাসন প্রয়োগ করা হয়েছিল সে সম্পর্কে একজন নিরপেক্ষ ইউরোপীয় খৃষ্টান লেখকের উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। The Preaching of Islam নামক গ্রন্থে Sir T.W. Arnold লিখেছেন ঃ মধ্য প্রাচ্যের খৃষ্টান ও মুসলিম আরবদের মধ্যে যে সদ্ভাব ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা থেকে বুঝা যায়, ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করা হয়নি। মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই কতিপয় খ্রীস্টান গোত্রের সংগে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাদেরকে স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মকর্ম সম্পাদনের নিশ্চয়তা বিধান করেছিলেন। তাদের যাজকশ্রেণীকেও পূর্বেকার ক্ষমতা ও অধিকারের নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিল।' (পৃঃ ৪৭-৪৮) অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ 'হিজরী প্রথম শতাব্দীতে বিজয়ী মুসলমানগণ কর্তৃক আরব ভূমির খৃষ্টানদের প্রতি প্রদর্শিত সহনশীলতার যে উদাহরণগুলোর উল্লেখ পূর্বে করা

হয়েছে এবং যে সহনশীলতা পরবর্তীকালেও প্রদর্শীত হয়েছিল তা থেকে আমরা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, যে সকল খৃস্টান সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল তা তারা স্বেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে করেছিল' (পৃঃ ৫১)। "যখন বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনী জর্ডন উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছিল এবং সেনাপতি আবু ওবায়দা ফিহলের নিকট তাবু স্থাপন করেছিলেন তখন সেই এলাকার খৃস্টান অধিবাসীগণ এই মর্মে পত্র প্রেরণ করেছিলেন ঃ 'হে মুসলিমগণ আমরা বাইযান্টাইন শাসকদের চেয়ে আপনাদেরকে বেশি পছন্দ করি, কারণ যদিও তারা ধর্ম বিশ্বাসে আমাদের সাথে এক তবু আপনারা বিশ্বস্ততা ও সততার দিক দিয়ে অনেক ভাল। আপনারা আমাদের প্রতি দয়াশীল এবং আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করে থাকেন। আপনাদের শাসন তাদের শাসনের চেয়ে অনেক ভাল। তারা আমাদের ঘরবাড়ী ও ধনসম্পদ লুন্ঠন করে নিয়েছে, আপনারা তা করেন নি" (পৃঃ ৫৫)। Arnold সাহেব আরও লিখেছেন ঃ ৬৩৩-৩৯ খৃস্টাব্দে আরবগণ যখন ক্রমে ক্রমে রোমীয় সেনাবাহিনীকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিলেন তখন সিরিয়ার জনসাধারণের মনোভাব ছিল এইরূপ আর যখন ৬৩৭ খৃস্টাব্দে দামাস্কাস নগর আরবদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা ও শান্তি লাভ করে, তখন সিরিয়ার অন্যান্য শহরও অবিলম্বে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। একে একে এমেসা, এরিখোসা, হিলিওপোলিস ও অন্যান্য শহর আরবদের সঙ্গে সন্ধি করে তাদের শাসন মেনে নেয়। এমন কি জেরুজালেমের প্রধান যাজক (Patriareh) একই রকম শর্তে শহরটি আরবদের হাতে সমর্পণ করেন। রোম সম্রাটের ধর্মীয় জবরদস্তির তুলনায় মুসলমানদের সহনশীলতা সেখানকার অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে দেখা দেয় এবং এ কারণেই তারা খৃস্টান রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থেকে মুসলিম শাসন বরণ করে নেয়। প্রথম অবস্থায় সামরিক অভিযান জনিত ভীতি কেটে যাওয়ার পর তারা বিজয়ী আরবদের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ে' (পৃঃ ৫৫)।

ইসলামের অনুকূলে একজন খৃস্টান লেখকের সাক্ষ্য এই। এর পর ইসলামী শাসন সম্পর্কে ভীতির আর কি কারণ থাকতে পারে? হয়ত, কোন কোন খৃস্টান মুসলমানদের তথাকথিত 'ধর্মীয় গোঁড়ামীর' প্রশ্ন তুলতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে এ সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা রয়েছে। গোঁড়ামী বলতে কি বুঝায় তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

স্পেনে যেসব Inquisition Court স্থাপিত হয়েছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে সে দেশ থেকে উৎখাত করা। ঐ সকল কোর্টের মাধ্যমে সেখানে মুসলমানদের উপর যে ধরনের অত্যাচার করা হয়েছিল, এর আগের ইতিহাসে তার নযীর মেলে না। তারা জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছিল, আংগুলের নখ টেনে তুলেছিল, চোখ খুঁচিয়ে তুলে ফেলেছিল এবং হাত পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেলেছিল। এ ধরনের নির্যাতনের দ্বারা তারা লোকদেরকে তাদের ধর্মত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। খ্রীস্টানদের প্রতি কি কোন মুসলিম রাষ্ট্রের এ ধরনের অত্যাচার করা হয়েছে? ইউরোপের অন্যান্য এলাকায়ও মুসলমানদেরকে অনুরূপে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া ও রুশ শাসনাধীন অন্যান্য দেশে মুসলিম নিধন যজ্ঞ

ঘটেছে। উত্তর আফ্রিকা, সোমালিয়া, কেনিয়া, জাঞ্জিবার প্রভৃতি ইউরোপীয় শাসনাধীন দেশেও অত্যাচার কম হয়নি। ভারত, মালয় প্রভৃতি দেশেও এ দিক দিয়ে বাদ পড়ে না। এ সকল এলাকায় নির্যাতন চালান হয়েছে শান্তি, শৃঙ্খলা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষার নামে।

মুসলিম নির্যাতনের আরেকটি উদাহরণ আবিসিনিয়া। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সূত্রে মিশরের সাথে আবিসিনিয়ার গভীর সম্পর্ক। আবিসিনিয়ার জনসংখ্যা ৩৫%-৪০% মুসলমান, বাকী খ্রীস্টান। তবুও সেখানকার খ্রীস্টান শাসনাধীনে এমন এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে ইসলাম ধর্ম বা আরবী ভাষা শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। মুসলমানেরা যদি নিজেদের অর্থ ব্যয়ে প্রাইভেট শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে তাহলে তার উপর অতি উচ্চ হারে কর ও অন্যান্য অসুবিধার বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। এর ফলে প্রায়ই এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কিছু দিন আগে ইটালি কর্তৃক আবিসিনিয়া অধিকার করে নেয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে সাধারণ দেনার দায়ে মুসলমানদেরকে খ্রীস্টানদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হত। মুসলমান ঋণী ব্যক্তিদেরকে ধরে নিয়ে নানা প্রকার দৈহিক নির্যাতন করা হত এবং তারপর বাজারে সাধারণ পণ্যের ন্যায় বিক্রি করা হত। এ সব করা হত সরকারের নাকের ডগায়ই। সেখানকার মন্ত্রীসভা বা উচ্চ পদে গোটা জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অর্থাৎ মুসলমানদের কোন প্রতিনিধি ছিল না। কোন মুসলমান শাসিত দেশে কি খ্রীস্টানদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে? এই ছিল 'ধর্মীয় গোড়ামীর' আসল চেহারা।

কমিউনিস্টরা বিশ্বাস করে যে, মানুষের অস্তিত্বের আসল দিকটা হল অর্থনৈতিক। একথা মেনে নিয়েও জিজ্ঞাসা করা চলে ঃ মুসলিম শাসনে কি খৃস্টানদের কোন অর্থনৈতিক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে? ধর্মীয় বিশ্বাসের অজুহাতে তাদের কি কখনো সম্পত্তি ভোগ দখল শিক্ষা-দীক্ষা, পদোন্নতি বা চাকরী প্রদান বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে?

আর যদি নৈতিক ও আত্মিক স্বত্তার প্রশ্ন তোলা হয় তাহলে একথা বিশেষ জোর দিয়ে বলা চলে যে, ইসলামী শাসনাধীন খৃস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হয়নি। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৃটিশ উপনিবেশদের প্ররোচনায় দু'একটি অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে। অমুসলিমদের উপর জিজিয়া আরোপের ব্যাপার নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রায়ই ধর্মীয় অসহনশীলতার অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে। এর উত্তর T. W. Arnold-এর কথায়ই পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ 'মিশরে যখন মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়কে সামরিক দায়িত্ব থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল তখন তাদের উপরও সামরিক-বাহিনীতে যোগদানের পরিবর্তে খৃস্টান জনসাধারণের উপর আরোপিত করের ন্যায় একটি বিশেষ কর ধার্য করা হয়েছিল' (The Preaching of Islam, p-63)। Arnold সাহেব আরো লিখেছেন ঃ "পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, জিজিয়া শুধু সামরিক দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে সক্ষম পুরুষের বেলায় ধার্য কর ছিল। এ ধরনের পুরুষ মুসলমান হলে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হত। এটা লক্ষণীয় যে, যখনই

কোন খৃষ্টান সেনাবাহিনীতে যোগ দিত তাকে জিজিয়া কর দিতে হত না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এন্টিয়ক নগরীর উপকণ্ঠে বসবাসকারী আল জুরাজিমা নামক খৃষ্টান গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে এ শর্তে সন্ধি করেছিল যে, তারা জিজিয়া কর দানের পরিবর্তে মুসলমানদের মিত্র হিসেবে তাদের যুদ্ধে যোগদান করবে এবং পরিবর্তে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের আনুপাতিক ভাবে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশ পাবে' (ঐ, পৃঃ ৬২)।

এর থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ধর্মীয় অসহনশীলতা জিজিয়া করের উৎস নয়। আসল কর হল মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যারা সামরিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইত তাদেরই উপর এ কর আরোপিত হত। এ প্রসঙ্গে কোরআন পাকে বলা হয়েছে ঃ "যারা আল্লাহ এবং শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করে না এবং আল্লাহ ও রসুল যা নিষেধ করেছেন তাকে নিষিদ্ধ মনে করে না কিংবা তারা সত্য ধর্মকে স্বীকার করে না, তারা যদি আহলে কিতাবও হয় তাহলে তারা নতি স্বীকার না করা পর্যন্ত কিংবা জিজিয়া কর না দেয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাও" (৯ঃ ২৯)। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, যে সকল অমুসলিম, ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তাদের কথাই এ আয়াতে বলা হয়েছে। মুসলিম শাসনাধীনে বসবাসকারী অমুসলিমদের বেলায় এ আয়াত প্রযোজ্য নয়।

উপসংহারে আমরা বলতে চাই যে, প্রধানত উপনিবেশিকতাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের চরেরাই মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করে থাকে। কমিউনিস্টদের একটা প্রচার-কৌশল এই যে, তারা যখন যেরূপ কথা বললে কাজ হবে সেখানে সে কথা বলে। মিলে মজুর ও শ্রমিকদের কাছে তারা বলে, 'তোমরা যদি কমিউনিজম গ্রহণ কর তাহলে মিলকারখানা তোমাদেরকে দিয়ে দেয়া হবে।' আর কৃষকদের মধ্যে প্রচারের সময় তারা বলে, 'তোমাদেরকে জমি-জমা দিয়ে দেয়া হবে।' বেকার শিক্ষিত সমাজকে লক্ষ্য করে তারা বলে, 'তোমরা কমিউনিষ্ট হলে তোমাদের সকলের যথাযথ চাকুরী মিলবে।' অন্যপক্ষে যৌন-উম্মাদনা-পীড়িত যুব সমাজের প্রতি তাদের প্রধান আবেদন, কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যদৃচ্ছ ভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে পারবে; রাষ্ট্র, আইন বা প্রচলিত নীতিজ্ঞান তাদের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপে মুসলিম দেশের খ্রীষ্টান অধিবাসীদেরও তারা বুঝাতে চেষ্টা করে ঃ 'তোমরা যদি কমিউনিজম গ্রহণ কর তাহলে ইসলামকে ধ্বংস করা যাবে, কারণ ইসলাম ধর্মীয় ভেদ নীতিতে বিশ্বাস করে।' এ সকল প্রচারণা কৌশলের মোকাবিলায় আমরা কোরআনের এ আয়াতটি উধৃত করতে চাই ঃ "তাদের মুখ থেকে যা বেরিয়ে আসে অত্যন্ত দুঃখজনক; কারণ তারা যা বলে তা মিথ্যা বই কিছু নয়" (১৮ ঃ ৫)।

ইসলাম সকল মানুষকে মানুষ হিসেবে সমান জ্ঞান করে এবং প্রত্যেকের সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে। ধর্মভীতির দরুন মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি ইসলামের শিক্ষা নয়। মুসলিম দেশে সকল খ্রীষ্টান অধিবাসীদের প্রতি আমাদের আরজ, তারা যেন ইসলামের সাথে তাদের ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি রেখে বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় কর্ণপাত না করেন।" (পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫০)। মুহাম্মাদ কুতুবের মন্তব্য শেষ হল।

ভুল ধারণা

আবদুল্লাহ্ মামুন আরিফ আল্ মান্নান তাঁর "ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা" গ্রন্থে "ইসলাম কি তলোয়ারের বলে প্রচারিত হয়েছে?" নিবন্ধে লেখেন, "জগতে ইসলাম ধর্ম প্রচার তলোয়ারের দ্বারাও হয়নি, অন্য কোন প্রকার ভয় প্রদর্শনেও হয়নি। অমানিশার ঘনান্ধকারে যেমন পতঙ্গরাজি কোন অজানিত টানে প্রজ্বলিত দীপালোকের দিকে ছুটে আসে, তেমনি সত্য-সনাতন ইসলামের জ্যোতিঃ ও উদারতা ধর্মান্বেষী মানব মাত্রেই প্রাণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল।

অবশ্য একথা সত্য যে, ঘটনাচক্রের আবর্তনে মুসলমানগণকে বহু যুদ্ধবিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ আক্রমণমূলক ছিল, কি আত্মরক্ষামূলক ছিল, সে কথার বিচার করা এখন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু এটা স্থিরনিশ্চিত যে, কাউকেও বলপূর্বক মুসলমান করা এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্য মোটেই ছিল না। মুসলমানগণ কার্যতঃ কোন স্থলে যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক, অথবা অন্য কোথাও হোক, এমন আচরণ প্রকাশ করেনি, যাতে ইসলাম প্রচারের বলপ্রয়োগের আভাষ মাত্রও পাওয়া যাবে।

আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে দাবী করছি যে, ইসলামের মূলনীতিসমূহের নিজস্ব সৌন্দর্যই ইসলাম প্রচারের প্রকৃত সহায়। ধর্ম প্রচার সম্বন্ধে ইসলামের নির্দেশ, ইসলামের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)-এর আচরণ ও প্রচার আদর্শ, মুসলমানদের চরিত্রমাধুর্য ও মহানুভবতা প্রভৃতি সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমাদের দাবীর বাস্তবতা দিবাকর সম-সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইসলামী শরীঅতে কাউকেও বলপ্রয়োগে মুসলমান করার প্রতি কঠিন নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান আছে। কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

"ধর্ম সম্পর্কে (ইসলাম গ্রহণে) বলপ্রয়োগের বিধান নেই; যেহেতু সুপথ কুপথ হতে পৃথক হইয়া আত্মপ্রকাশ করেছে।" (সুরা-বাকারা ঃ রুকু ৩৪) সুতরাং সকলেই নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা সহজে সুপথ চিনে নিতে পারবে। অতএব, বলপ্রয়োগের কি আবশ্যক?

"মুহাম্মদ (দঃ)! তুমি কি লোকদের নির্মিত ধার্মিক হওয়ার জন্য তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করিবে?" অর্থাৎ এরূপ করা কখনও বিধেয় নহে। সূরা-ইউনুসঃ রুকু ১০

একথা জ্বলন্ত সত্য যে, মুসলমানগণ কোরআনের এই আদেশ সর্বত্র অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। তারা আরবের বাইরে পদার্পণ পূর্বক পারস্য, সিরিয়া ও মিসরের ন্যায় বহু সহস্র বছরের পুরাতন ও শক্তিশালী রাজ্যগুলোকে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পদানত করত এই সমস্ত রাজ্যে ইসলামের বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন করেছিল; কিন্তু বিজয় গর্বে গর্বিত হয়ে কোন সময়েই কাউকেও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা তারা করেনি। এমন কি তারা কাউকেও কোন প্রকার লোভ-লালসায় বশীভূত করে ইসলামে দীক্ষিত হতে প্রলুব্ধ করেছে– এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্ম প্রচার ব্যাপারে মুসলমান বাদশাহগণ পর্যন্ত এমন উদারতার পরিচয় দিয়েছে, যদৃষ্টে সকলেই

একথা বুঝতে পারবেন যে, ইসলাম প্রচারের পশ্চাতে সামান্য প্রলোভনও বিদ্যমান ছিল না। খলীফা ও বাদশাহ্গণের রাজত্বকালে ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং নক্ষত্রোপাসকগণ নির্বিবাদে ও নির্ভয়ে নিজেদের ধর্মকর্ম সমাধা করত-এতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্নই ছিল ন। বিধর্মীদের জন্য ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার মুসলমানদের অনুরূপই ছিল। মুসলমানদের ধন-প্রাণের যে রকম মূল্য ছিল, বিধর্মী প্রজাদের ধন-প্রাণের মূল্যও তদপেক্ষা কম বিবেচিত হত না। বিধর্মী প্রজার প্রাণনাশের দণ্ডস্বরূপ মুসলমানের প্রাণদণ্ড হওয়া ইসলামী ধর্মগ্রন্থেরই আদেশ।

খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যে সমস্ত উপকরণ ও বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত এবং বর্তমান সময়েও হচ্ছে, এ রকম যদি ইসলাম প্রচার ব্যাপারে করা হত, তবে মুসলিম রাজ্যসমূহে কোন বিধর্মীর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। স্পেনের কথা ভেবে দেখুন, সেখানে কোটি কোটি মুসলমানের বাস ছিল এবং তথায় আট শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামী পতাকা উড্ডীয়মান ছিল; কিন্তু কখনও মুসলমানগণ বিধর্মীদের অস্তিত্ব বিলোপ করার সামান্য চেষ্টাও সেখানে করেনি। ইসলামী রাজত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই সুবিস্তৃত রাজ্য হতে মুসলমানের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। এক স্পেনের কথাই বা বলি কেন সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি রাজ্যেও যদি মুসলমানগণ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিত, তবে এই সমস্ত দেশে ভিন্ন ধর্মের নামগন্ধ পর্যন্ত বাকি থাকতো না। তদানীন্তন ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীও স্বীয় বক্ষে অষ্ট শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম রাজ-সিংহাসন ধারণ করে রেখেছিল, অথচ এখানে সর্বদাই অমুসলমানেরাই অধিক সংখ্যায় রয়েছে। একবার স্থির মস্তিষ্ক ও সুস্থ মনে চিন্তা করে বলুন, রাজধানী হতে বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের পূর্ব-সীমান্তে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী হয়েছিল। যদি রাজধানীর ভেতরে ধর্মান্তর করণের উদ্দেশ্যে সামান্য মাত্রও চাপ দেয়া হত এবং তৎসঙ্গে বিবিধ রকমের প্রলোভন দ্রব্যেরও সমাবেশ করা হত, তবে সেখানে কোনও অমুসলমানের অস্তিত্ব থাকতো কি?

অমুসলমানদের উপর কোন প্রকার চাপ দেয়াতো দূরের কথা, সাম্যবাদ এবং সর্বজাতীয় স্বাধীনতার মানদণ্ড মুসলমানগণ এমনভাবে ঠিক রেখেছিল যে, ইসলাম শক্তির পূর্ণ যৌবন কালেও খৃষ্টান, ইহুদী, অগ্নিপূজক এবং পুতুলপূজক সম্প্রদায় বড় বড় দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে মুসলমানদের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রতিযোগিতা করতে কুণ্ঠিত হত না।

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে– আব্বাসীয় খলীফাদের রাজত্বের সময় ইবরাহীম ইবনে হেলাল নামক নক্ষত্রপূজক এক ব্যক্তি আরবী সাহিত্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি একটি সাধারণ রাজকার্যে চাকুরী গ্রহণ করেন; পরে উন্নতি করে বাদশাহ ইয্যদ্দৌলার রাজত্বকালে মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ইয্যদ্দৌলা ও তাঁর ভাই আযদদ্দৌলার মধ্যে রাজ্যসংক্রান্ত বিবাদ চলছিল। ইয্যদ্দৌলার পক্ষ হতে যে সমস্ত চিঠিপত্র তদীয় ভ্রাতার নিকট প্রেরিত হত সেগুলি নিতান্ত আক্রমণমূলক হত এবং মন্ত্রী ইবরাহীমের হাতেই এই সমস্ত পত্র লিখিত হত। উত্তরকালে আযদদ্দৌলা সিংহাসন লাভ করলে ইবরাহীমের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় তাকে বন্দী করলেন। তখন বড় বড়

মুসলমান রাজ-কর্মচারীগ এই অনন্যসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করতে লাগলেন। বাদশাহ্ শুধু যে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হলেন এমন নয়, তাঁকে ইসলামী ইতিহাস লেখার মত দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করেও অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিলেন।

ইবরাহীম ইবনে হেলালের মৃত্যু হলে পর মুসলমান রাজ-কর্মচারী এবং আলেমগণ তাঁর প্রতি শোক প্রকাশ করে অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তৎকালীন স্বনামধন্য আলেম শরীফরাজি রচিত শোকোচ্ছ্বাসের একটি পদের অনুবাদ নিচে উদ্ধৃত হল–

"বলিতে পার-কাহাকে শবাধারের উপর বহন করিয়া লইয়া যাওয় হইয়াছে? সভার আলোক কোথায় লুকাইয়াছে?"

ইবরাহীম যে কেবল আরবী সাহিত্যেই দক্ষ ছিলেন তেমন নয়, ইসলামী ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি সম্পূর্ণ কোরআন শরীফের হাফেজ ছিলেন। তিনি মুসলমানদের সংস্রবে থেকে ইসলামী ধর্মশিক্ষা চর্চায় জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছিলেন। মুসলমানদের অনেক ধর্মানুষ্ঠানে তিনি যোগদান করতেন। এমন কি নিজেও অনেক ধর্মকর্ম পালন করতেন। কিন্তু এটা সত্ত্বেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি নিজের পুরাতন ধর্ম ত্যাগ করেননি। আযদদ্দৌলার আন্তরিক আগ্রহ ছিল, যাতে ইবরাহীমের মত বিদ্বান ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও তিনি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি করেননি, যাতে ইবরাহীমকে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হয়। এমন কিছুও করা হয়নি, যাতে স্বধর্মে থেকে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

এ রকম অনেক দৃষ্টান্তই ইসলামী রাজত্বের ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইবনুত্তিলমিয নামক এক খৃষ্টান আলেম খলীফার দরবারে আজীবন চাকুরী করেছিলেন। নিজ গুণে তিনি বাদশাহের মুসাহেব পদ (একটি অতি উচ্চপদ) পর্যন্ত প্রাপ্ত হয়েছিলেন; অথচ তাকে ইসলাম গ্রহণ না করার দরুন কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এ সমস্ত ঘটনাবলী কি একথার চাক্ষুষ প্রমাণ নয় যে, বলপ্রয়োগে মুসলমান করার প্রথা ইসলামের পূর্ণ শক্তির সময়েও মুসলমানদের মধ্যে ছিল না।

এক হাতে অস্ত্র ও অপর হাতে শাস্ত্রে'র তাৎপর্য

শান্তির ধর্ম ইসলাম কি করে বলতে পারে এক হাতে তরবারি অন্য হাতে কুরআন নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে? বিখ্যাত ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশ গুপ্ত 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' পুস্তকের ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "যে কারণেই হোক ভারতীয়দের মনে একটা ভুল ধারণা আছে, এক হাতে কোরান আর অন্য হাতে কৃপাণ নিয়ে এদেশে ইসলামের প্রচার করা হয়েছে, কিন্তু লক্ষণীয় মুসলিম কৃপাণ যেখানে সব চাইতে প্রচণ্ড ছিল সেই দিল্লি আগ্রা অঞ্চলের চাইতে ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে– যেমন, সিন্ধু, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, কেরলা, বাংলা প্রভৃতিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেশি।" ইসলাম ও মুসলমান সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে একটা কু-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যা বর্তমান অদূরদর্শী ঐতিহাসিক ও

লেখকদের পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের ফল। যদি ঐ শ্রম ভেদবুদ্ধির সৃষ্টিতে না লাগিয়ে মিলন মৈত্রীর পথে পরিচালিত হতো, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যায়, ভারতবর্ষ তিন ভাগে ভাগ হয়ে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হতো না। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে ভারতে হিন্দু ধর্ম ধ্বংসও হয়নি, হিন্দু জাতিও ধ্বংস হয়নি আর ধর্মীয় কারণে আর্য ও ইংরেজদের মত ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটেনি। অবশ্য বর্তমান ইতিহাসে যা ঘটানো হয়েছে তা ঘটনা নয় বরং রটনা। দীর্ঘকাল মুসলিম শাসনের অধীনে থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ অধিবাসী, এমনকি মুসলিম শক্তির প্রধান কেন্দ্রগুলির অধিবাসীও হিন্দু থেকে যায়, কিন্তু ইয়োরোপে পেগান ধর্মের বিরুদ্ধে এমন সর্বব্যাপী অভিযান চালানো হয় যে পেগান ধর্মাবলম্বী ইয়োরোপীয়দের চিহ্নমাত্র রাখা হয়নি। মুসলমানরা যদি সত্যিই একহাতে অস্ত্র নিয়ে ধর্মপ্রচারের অভিযানে নামতো তাহলে ইয়োরেপের মত ভারতবর্ষেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চিহ্নমাত্র থাকত না।' (শ্রী দাশ গুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম' পৃ-৯)

ইসলাম ধর্ম যখন ভারতে এল তখন সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের লাখ লাখ মানুষ আরবী ভাষা শিখে, পড়ে, বুঝে এবং ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে পুরাতনকে বাদ দিয়ে নতুন ধর্ম ইসলামকে হৈ হৈ করে গ্রহণ করল– একথা মোটেই সত্য নয়, আর যুক্তিসঙ্গতও নয়। কারণ তখনকার মানুষ ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত। দ্বিতীয় কথা ধর্ম মুস্টিমেয় ব্রাহ্মণ জাতির অধিকারে ছিল, ফলে অব্রাহ্মণরা ধর্ম সম্বন্ধে কিছু পড়বার বা মাথা ঘামাবার অধিকার পায়নি, তাই সক্ষমও হয়নি।

এটা হতে পারে, তখন হিন্দু ধর্ম এমন রক্ষণশীল ছিল যে অব্রাহ্মণ আর অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করে সমাজে লাঞ্ছিত হয়ে বাস করছিলেন। ঠিক ঐ সময়ে যাঁরাই তাঁদের শান্তি ও মৈত্রীর সন্ধান দিয়েছিলেন তাঁদের বরণ করে নেওয়া অত্যন্ত স্বভাবিক ছিল।

ঐতিহাসিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "আমরা দেখেছি যে মালবার উপকূলে ইসলাম ধর্মের উৎপত্তির আগে থেকেই আরব বণিকদের বসতি গড়ে উঠেছিল, বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জন্য শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা তারা বিশেষ জরুরী মনে করত এবং দেশের ভারতীয় শাসকদের এ ব্যাপারে সাহায্য করত। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আরব বণিকদের অসদ্ভাবের কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে নিতান্ত বাস্তব কারণেই উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। পরে এই আরবরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন থেকে তারা পরিচিত হয় মুসলমান বলে।" শ্রী গুপ্ত আরও লেখেন– "আরব বণিকরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং সেই ইসলামকে কেরালায় নিয়ে আসে, কেরালাস্থিত তাদের পরিবারবর্গের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে তখন এ বণিকদের স্থানীয় কর্মচারীরাও, যাদের একটা বড় অংশ বণিকদের জন্য কায়িক শ্রম করত, ইসলামের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে জানতে পারে। তারা জানতে পারে এমন এক শাস্ত্রের কথা, যাতে বলা হয়েছে– মানুষকে আলাদা আলাদা জাতিতে জন্ম দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু জন্ম দিয়ে নয়, মানুষের বিচার হয় তার স্বভাব-চরিত্র দিয়ে [৪৯, ১৩-১৫]। বর্ণভেদ প্রথায় জর্জরিত কেরালার জনসাধারণ ইসলাম ধর্মের মধ্যে মানুষ হিসাবে বাঁচার ডাক শুনতে পেল।"

শ্রীগুপ্ত পরে আরও লিখেছেন, "ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যবহারিক দিকগুলোর চাপে কেরালার জনসাধারণ যখন মানুষ হিসাবে নিজেদের পরিচয় ভুলতে বসেছে তখন ইসলাম ধর্মের আগমন ও আহ্বান। এই আহ্বানে তারা প্রচণ্ড উৎসাহে সাড়া দিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। 'তুহফাতুল মুজহিদিন' এর লেখক জৈনুদ্দিন লিখেছেন, 'যদি কোন হিন্দু মুসলমান হতো তাহলে অন্যেরা তাকে এই (নিম্নবর্ণে জন্মের) কারণে ঘৃণা করত না, অন্য মুসলিমদের সঙ্গে যে রকম বন্ধুত্ব নিয়ে মিশত, তার সঙ্গেও সেই ভাবে মিশত। মানুষের মূল্য পাবে, সমাজে মানুষের মত ব্যবহার পাবে– এটা ছিল ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রধান কারণ।" [দ্রঃ দাশ গুপ্তের 'ভারতবর্ষ ও ইসলাম', পৃষ্ঠা ১২৭-২৮)।

অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যোপলব্ধি করে এটা ধরা যায় যে, এক হাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে বলপ্রয়োগের কথাটি মুসলিম জাতির প্রতি অন্যায় প্রয়োগ মাত্র। শ্রী দাশ গুপ্ত লিখেছেন, "ইসলাম ধর্ম দু বাহু প্রসারিত করে ভারতীয়দের আপন বক্ষে আমন্ত্রণও জানিয়েছিল– ফলে হিন্দু সমাজে নবগঠিত সংকীর্ণ ও কঠোর আইন কানুনে জর্জরিত– বিশেষ করে নিম্নবর্ণের ও অস্পৃশ্য জাতিগুলি একই সঙ্গে মানবিক ব্যবহার লাভের ও শাসক শ্রেণীতে উন্নয়নের প্রত্যাশাতে ইসলামকে বরণ করে নিতে অগ্রসর হয়েছিল, কেননা স্বধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলিম সমাজ একান্তরূপে গণতান্ত্রিক ও সমদর্শী। আপন সমাজকে সুসংহত করার জন্য হিন্দু-নেতারা অনুশাসনাদিকে যতই সংকুচিত করতে থাকলেন ততই তাঁদের হাত থেকে পরিত্রানের জন্যে একদল, যাদেরকে বলা হয় নির্যাতিত হিন্দু তারা আরও বেশি করে ইসলামের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হলো।" [ঐ পুস্তকের পৃষ্ঠা ৫৪ দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ্যশক্তি ভারতের বৌদ্ধদের প্রতি এত বেশি অত্যাচার করত যা অতীব দুঃখের। বৌদ্ধরা মাথা মুণ্ডন ধর্ম গ্রহণ করতেন। অত্যাচার যখন সহ্যসীমা অতিক্রম করে তখন তাঁরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধদের বলা হতো, 'নেড়ে', তাই মুসলমানদেরকে অনেক অশিক্ষিত ও অজ্ঞ লোকেরা নেড়ে বলে থাকেন। এই নেড়ে কথাটি যতদিন থাকবে ততদিন ভারতীয় প্রাচীন হিন্দুদের বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচারের ইতিহাসকে জীবন্ত করে রাখার সামিল হবে। [এই 'নেড়েতথ্যে'র প্রমাণ ঐ পুস্তকের ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা।]

শুধু বৌদ্ধরা নন ভারতের আর একটা বিরাট জাতি জৈন। তাঁরাও অত্যাচারের বন্যায় ভেসে গেছেন এবং মুসলমান হয়েছেন অথবা মৃত্যু বরণ করেছেন।

শ্রী দাশগুপ্ত বলেন, "বাংলার বৌদ্ধের মত দক্ষিণ ভারতের জৈনরাও রক্ষণশীল শৈব হিন্দুদের হাতে নিপীড়িত হয় এবং একবার একদিনে আট হাজার জৈনকে শূলে হত্যা করার কথা তামিল পুরাণেই উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই এই সময়টাতে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্ম পরমসহিষ্ণুতার আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। এ জাতীয় অসহিষ্ণুতার সব চাইতে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত শ্রীরঙ্গমের পরম শৈবরাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ স্থাপন করে গেছেন– তাঁর প্রতাপে স্বয়ং রাসানুজ তাঁর শিষ্যবৃন্দ সহ ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের হয়সাল রাজা

বিষ্ণুবর্ধনের অশ্রয়ে পলায়ন করেন এবং তারপরে কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি আর শ্রীরঙ্গমমুখো হননি। শ্রীরঙ্গম ছেড়ে রামানুজের ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে পলায়ন ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কিন্তু সে তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা বিখ্যাত ঐতিহাসিকেরা অল্পই করেছেন।" [দ্রঃ ঐ পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠা]

পুরোহিতদের বা ব্রাহ্মণ্যবাদের কথা বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক দাশগুপ্ত লেখেন, 'শুদ্রকে স্পর্শ করলে সবস্ত্র স্নান ও উপবাসে শুদ্ধির প্রথাও প্রচলিত করা হয়। চণ্ডাল জাতিকে প্রাচীন স্মৃতিকারগণও অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, কিন্তু এ কালের সমাজপতিরাই আরও কয়েক পা এগিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে চণ্ডালকে দেখা বা তার সঙ্গে কথা বলা বা তার ছায়া মাড়ানো প্রভৃতিও প্রায়শ্চিত্তযোগ্য পাতক! বোধকরি এসবের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই টীকাকার [বৈজয়ন্তী-প্রণেতা] শুধু ওসবে সন্তুষ্ট হননি; বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়তিক বা বস্তুতান্ত্রিক ও নাস্তিককেও তিনি অস্পৃশ্যদের তালিকাভুক্ত করেন।" [দ্রঃ ঐ, ৫২ পৃষ্ঠা]

নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক ভ্রান্তি। ভারতের মুসলিম অঞ্চলগুলোর মধ্যে কেরালায় আজ এত মুসলমান কেন? সেখানে অস্ত্র দিয়ে বলপূর্বক ধর্মান্তর ঘটানো হয়েছে– এটা যে নিছক বাজে কথা তা আগের আলোচনায় দেখানো হয়েছে। তবুও কেরালা ও রাজস্থানের সামাজিক আলেখ্য ও আরও দু একটি নিয়ে আসছি।

"কেরালার নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমানুষিক ব্যবহার অকল্পনীয়। রাজস্থানে এই বর্ণভেদ প্রথা যে বাংলার চাইতে কত সহস্র গুণ ভয়াবহ তা আমার স্বচক্ষে দেখা-সাধারণত নিম্নবর্ণের লোকদের বর্ণ অনুসারে পৃথক পৃথক পোষাক ও গহণা আছে এবং নিম্নবর্ন লোকের পক্ষে এমন সাজপোষাক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যা উচ্চবর্ণের লোকের উপযুক্ত সাজপোষাক– ১৯৭৪ এর ডিসেম্বরে লক্ষ্য করেছি যে শহরাঞ্চলে কিংবা যোধপুর জেলার অন্তর্গত বোরুন্দার মত গ্রামে এসব বিধিবিচার শিথিল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ১৯৬৫ তে ঐসব নিয়ম অনেক কঠোর দেখেছিলাম। ১৯৭২ এর ২৭শে নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকাতে ব্রাহ্মণদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে উত্তর প্রদেশের এক হাজার হরিজনের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের খবর প্রকাশিত হয়, এর কিছুদিন পরে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উত্তর প্রদেশের বান্দাতে ধনবান ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র আক্রমণে গ্রামসুদ্ধ হরিজনরা ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরে এসে জেলা সমাহর্তার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে– সেই সময় দিল্লী যাওয়ার পথে এলাহাবাদ থেকে যাত্রীদের মুখে শুনি। রাঁচি-চক্রধরপুর রোডে অবস্থিত বাধগাঁওয়ের মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাইকেল ভেদ্রা আমায় বলেছিলেন, তাঁর বাবা একবার উচ্চবর্ণের লোকদের মত হাঁটুর নিচে ধুতি পরেছিলেন, এবং তাঁর ঐ স্পর্ধার জন্যে তাঁকে জমিদারবাড়ীতে ডেকে প্রচণ্ড প্রহার করা হয় এবং তারপরে তিনি খৃষ্টান হয়ে যান।" [শ্রী দাশগুপ্ত পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫]।

এসব অত্যাচারিত, উপেক্ষিত ও লাঞ্ছিত মানুষেরা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেন তখন তাঁদের আচার-ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ এবং নাম পর্যন্ত পাল্টে যেত, অর্থাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত।

"আগেই বলা হয়েছে যে নিম্নবর্ণের লোকদের উর্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখতে হতো। এককালে কেরালাতে অমুকের স্ত্রী বা মেয়ে ইসলাম নিয়েছে বলার দরকারই হতো না, তার বদলে শুধু 'কুপপায়ামিড়ুক' শব্দটি ব্যবহার করা হতো– কুপপায়ামিড়ুক শব্দটির অর্থ হলো 'গায়ে জামা চড়িয়েছে'। অপমান-সূচক বা হনিতা-দ্যোতক এ রকম বহু আচার প্রথা ইসলামের প্রভাবে কেরালায় সমাজ থেকে দূরীভূত হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম গ্রহণের ফলে দাস প্রথাও বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।" [দ্রঃ ঐ পুস্তকের ১৩০, ১৩১ পৃষ্ঠা।]

ভারতে মুসলিম আগমন ভারতের জন্য অভিশাপ নয়, আশীর্বাদ। শ্রী দাশগুপ্ত স্পষ্ট করে বলেছেন– "সামগ্রিক বিচারে মানতে হবে যে, ইসলাম স্বাতন্ত্রে গৌরবান্বিত বাংলার জনসাধারণকে অজ্ঞাতপূর্ব মুক্তির স্বাদ দিল। বৌদ্ধ ও নিম্নশ্রেণীর তথা শ্রমজীবী জনসাধারণকে দিল ব্রাহ্মণ্য নির্যাতন ও কঠোর অনুশাসনাদির থেকে মুক্তি, প্রতি পদে সামাজিক অপমানের থেকে মুক্তি, পূর্ব-দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্রস্পৃহ জনসাধারণকে দিল ভৌগোলিক বিধি-নিষেধের বন্দীদশা থেকে মুক্তি, বহু আয়াসসাধ্য সংস্কৃত ভাষার বন্ধন কেটে জনসাধঅরণকে দিল মাতৃভাষাতে আত্মপ্রকাশের অধিকার।" [ঐ, পৃষ্ঠা ১০৭]

ভারতের তথা সারাবিশ্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের বড় মাধ্যম ছিল মুসলিম সাধু সুফী, পীর আওলিয়াদের ভূমিকা, যা প্রত্যেক ঐতিহাসিক অল্প-বিস্তর স্বীকার করে গেছেন। তাঁরাও যে এক হাতে অস্ত্র এবং অন্য হাতে শাস্ত্র নিয়ে ধর্ম প্রচার করেছেন তা নয়।" ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা", পৃষ্ঠা ১০-১৫)।

অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা

আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান লিখেন, "ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি– মানুষ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে অথবা যেকান আকীদাভুক্ত হতে পারবে। অনুরূপভাবে সে কোন ধর্ম বা আকীদা গ্রহণ না করেও থাকতে পারবে। অর্থাৎ কোন ধর্ম বা আকীদা অবলম্বন করায় বা না করায় তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এতে তাকে কেউ জোর-জবরদস্তি করতে পারবে না। তবে তাকে বেহেশতের সওয়াবের আশা ও দোজখের ভয় দেখিয়ে এবং যুক্তি-তর্ক দ্বারা ইসলামের দিকে আহ্বান করা যাবে।

ইসলাম একদিকে যেমন মানুষকে কোন ধর্ম গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা দিয়েছে অপরদিকে তাকে যে কোন মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকারও অধিকার দিয়েছে। কিন্তু জোরপূর্বক কাউকেও ধর্মে প্রবেশ করানো হারাম করেছে। অনুরূপভাবে কারো ধর্ম ও আকীদা নিয়ে অন্যকে ঠাট্টা-তামাশা করা এমনকি এর ক্ষতি সাধন হতেও প্রতিরোধের

অধিকার দিয়েছে। কেননা ধর্ম ও আকীদা মানুষের নিকট তার জীবনের চেয়েও অধিক মূল্যবান। আর এর মধ্যেই তার ইহ-পরকালের সুখ-শান্তি নিহীত রয়েছে।

তাওহীদ হলো আল্লাহর ধর্ম। এতে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে বলা হয়েছে। আর বাতিল মাবুদদের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যা দুনিয়াতে আল্লাহ্র অবাধ্য মানব সন্তানরা প্রতিষ্ঠা করেছে। যদ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল এক নায়কত্ব প্রচার করা এবং মানব জাতির উপর প্রভূত্ব বিস্তার করা।

পক্ষান্তরে নাস্তিকতা ও মূর্তি পূজা অবাধ্য ও অত্যাচারীদের ধর্ম। যদ্বারা ঐ অত্যাচারীরা মানুষকে তাদের ও তাদের মূর্তিদের পূজা-অর্চনা করতে বাধ্য করে। ফলে সাধারণ মানুষ ঐ অত্যাচারীদের ভৃত্যরূপে পরিগণিত হয় এবং তাদের এক নায়কত্বের পথ সুগম হয়। এজন্য বলা হয় তাওহীদ বা একত্ববাদ হল স্বাধীনতা আর নাস্তিকতা হল পরাধীনতার ধর্ম। মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য ধর্ম ফরজ বা অবশ্য করনীয় করেছেন। এটা হচ্ছে তাদের জন্য রহমতস্বরূপ। এমতাবস্থায় পরকালের শাস্তির ভয় দেখিয়ে এবং সওয়াবের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে তাওহীদের দিকে মানুষকে ডাকা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিপন্থী নয়। কেননা এটাও তাদের মুক্তির দাওয়াত। এ সুফল তারাই ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন ঃ "যে নেক কাজ করল বস্তুতঃ সে তার আত্মার মঙ্গলার্থেই উহা করল। তার সুফলও তার আত্মার উপরই আপতিত হবে। আর যে মন্দ কাজ করল, তার কুফলও তার আত্মার উপরই নিপতিত হবে। "আরব পৌত্তলিকদের মহানবী (সঃ)-র প্রতি চরম অত্যাচার সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে জোর-জবরদস্তির কোন পন্থাই অবলম্বন করেন নি। কেননা তিনি তার নিজের ও অন্যান্যদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ নবীকে নির্দেশ করে বলেন "হে নবী আপনি পৌত্তলিকদেরকে বলুন, তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম।" উক্ত আয়াতের শান-ই-নজুল বা অবতীর্ণ হবার কারণ হলো ঃ একদা কোরেশ বংশীয় লোকেরা এসে মহানবী (সঃ)-কে বলল, আপনি এক বৎসরকাল আমাদের মাবুদদের উপাসনা করুন, তাহলে আমরাও এক বৎসরকাল আপনার মাবুদের পূজা করব। এতদশ্রবণে আল্লাহর নবী (রঃ) ওহীর বাণী অপেক্ষা'য় রইলেন। তৎপর উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ কুরআনে বহু আয়াত আছে। পাঠক সমীপে কয়েকিট আয়াৎ পেশ করা হল ঃ

প্রথম আয়াত

আল্লাহ বলেন, ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার বল প্রয়োগ করা চলবে না। কেননা অসৎ পথ হতে সৎ পথ দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।' (সূরাহ আল-বাকারাহ ঃ ২৫৬)।

উল্লিখিত আয়াতের শান-ই-নজুল দেখলেই এটা সহজে বোধগম্য হবে যে, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ করা চলবে না। এ আয়াত অবতীর্ণ হবার কারণ হলো ঃ মদীনার আনসারগণের মধ্যে এক ব্যক্তির দুই পুত্র মহানবী (সঃ)-র আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ

করে। অতঃপর পুত্রদ্বয় মদীনায় আগমন করলে তখন তাদের পিতা তাদেরকে জোরপূর্বক ইসলামে প্রবেশ করাতে চাইলে তারা রসূলের (সঃ) নিকট অভিযোগ করে। তখন উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় আয়াত

"আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে বলেন, হে নবী! আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে পৃথিবীর সকল লোকই ঈমান আনয়ন করত। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা নহে যে, সকলে ঈমান আনয়ন করুক (এর মধ্যে বিশেষ হিকমত ও গুড় রহস্য লুক্কায়িত আছে)। তবে কি হে মুহম্মদ (দঃ)! আপনি মানুষকে জোরপূর্বক ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করাবেন? প্রকৃতপক্ষ আপনি কাউকেও জোরপূর্বক মুমিন করতে পারবেন না"।

উক্ত আয়াতে শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে ঈমানে প্রবেশ করাতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি নেই।

তৃতীয় আয়াত

আল্লাহ তার নবীকে সম্বোধন করে বলেন, "হে নবী! আপনি বলুন, সৎপথ আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনয়ন করতে পারে, আবার যার ইচ্ছা সে কুফরী করতে পারে। আমি অত্যাচারীদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত রেখেছি।" (সূরা আল কাহাফ ঃ ২৯)।

উপরোক্ত আয়াতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈমান আনয়ন বা কুফরী করা মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য মানুষের এ ইচ্ছা আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। কেননা আল্লাহ সকল বিষয় বা বস্তু সৃষ্টিকারী। মানুষ তার কৃতকর্মের দরুনই পাপ পুণ্যের অধিকারী হবে। তার কাজ মংগলময় হলে সে পূণ্যের অধিকারী হবে আর পংকিলময় হলে শাস্তিভোগ করবে।

কেহ প্রশ্ন করবে যে দুনিয়াতে কাফির বা আল্লাহতে অবিশ্বাসী হলে যদি পরকালে আজাব বা শাস্তি ভোগ করতে হয় তবে এটা কোন ধরনের স্বাধীনতা? কেননা এতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহর উপর ঈমান আনয়নের জন্য মানুষদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে ধর্মাবলম্বনের ব্যাপারে স্বাধীনতা নেই বললেই চলে।

উত্তরে বলা যায় যে দুনিয়াতে কুফরী করলে পরকালে শাস্তি ভোগ করার ভীতি প্রদর্শন মানুষের অন্তরে দূরদৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনার রেখাপাত করে। এটা জোরজবরদস্তির মধ্যে শামিল নহে। আর এ দূরদৃষ্টি মানুষকে ফলাফলে পৌছালে সে ইচ্ছাকৃত ঈমান আনবে এবং আজাব হতে মুক্তি পাবে। আবার কখনও তার চিন্তাশক্তি তাকে সঠিক লক্ষ্যে পৌছাবে না। ফলতঃ সে কুফরীর উপর অটল থেকে যাবে এবং পরকালে পরিত্রাণ পাবে না।

ইসলাম অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসব ও পর্বসমূহ পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমনভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদি পালনের দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করেছে।

অবশ্য এটা রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের গণ্ডিসীমার মধ্যে হতে হবে। এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলমানদের সকল প্রকার লেনদেন ও কাজ কারবারের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের জিম্মাদারী ও দায়িত্বভার গ্রহণের সনদই তাদেরকে তাদের আকীদার উপর ছেড়ে দেয়ার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং তাদের কোন আকীদা পালনে বাঁধা দেয়া যাবে না।

মহানবী (সঃ) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে তাদের উপাসনালয়সমূহে তাদের সকল প্রকার ধর্মীয় অনষ্ঠান ও ক্রিয়াদি পালনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন।

অমুসলিমদের উপর ইসলামের বদান্যতার উদাহরণ এর চাইতে বড় আর কি হতে পারে যা, যদি কোন মুসলমানের স্ত্রী খৃষ্টান বা ইয়াহুদী হয়, তবে মুসলমান স্বামী ঐ স্ত্রীকে তাদের গীর্জায় যেতে নিষেধ করতে পারবে না। বরং বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে তার নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে স্বাধীনতা দিতে হবে।

এছাড়া মুসলমানদেরকে খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের শূকর বধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে ও তাদের মদের পাত্রও ঢেলে ফেলতে বারণ করা হয়েছে। কেননা তারা শূকর মাংশ ভক্ষণ ও মদ্যপানে অভ্যস্ত। অনুরূপভাবে ইসলাম অমুসলিমদেরকে তাদের ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ক্রিয়া-কর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। যেমন, তাদের বৈবাহিক বন্ধন, তালাক, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে অন্যান্য ধর্মে তাদের নিজস্ব ধর্ম ও মতবাদ অন্যান্যদেরকেও মেনে নিতে বাধ্য করা হচ্ছে।

ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনতার প্রতিফলন দেখা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে অমুসলিমরা সুন্দরভাবে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। মুসলিম বিশ্ব ছাড়া অন্য কোথাও অমুসলিমরা তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে এ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয়নি। এর প্রমাণ স্বরূপ বলা যায় যে, মুসলমানগণ যখনই কোন দেশ জয় করতেন, তখন অমুসলিমদের তাদের ধর্মে থাকবার সুবন্দোবস্ত করে দিতেন। মুসলমানগণ অমুসলিম বিজয়ীদের ন্যায় পরাজিতদের জোরপূর্বক তাদের ধর্মে আনবার চেষ্টা কখনো করেনি। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানে সর্বদাই অমুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। অবশ্য মুসলমানগণ আটশ' বছর হিন্দুস্থান শাসন করেছেন।

পক্ষান্তরে স্পেনে মুসলমানদের সংখ্যা (মধ্যযুগে) ছিল প্রায় ত্রিশ লাখ। কিন্তু অমুসলমানদের হাতে স্পেনের শাসনভার চলে যাওয়ার পর এখন সেখানে মুসলমান নেই বললেই চলে। তখনকার দিনে মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিনায়ক প্রথম সুলতান সলিম খৃষ্টানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চাইলেন। তখন মুসলিম পণ্ডিতরা এর ঘোর বিরোধীতা করলেন যে, ইসলামী শরীয়তে এটা অবৈধ। অতঃপর সুলতান সলিম তার অভিপ্রায় হতে পিছু হটলেন। মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত দেশসমূহের অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সন্ধির চুক্তিনামা পড়লেই সহজে মুসলমানদের বদান্যতা ও পর ধর্ম

সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের এ বদান্যতা ও সহনশীলতার দ্বারাই ইসলামের এত বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে।

মুরতাদের শাস্তি প্রসঙ্গে

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ধর্ম গ্রহণ বা না গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীনতা তাকলে মুরতাদের কঠিন শাস্তি হয় কেন? আর যদি মুরতাদের কঠিন শাস্তি ইসলামে বৈধ হয়ে থাকে তবে ইসলামে স্বাধীনতা রইলো কোথায়?

উত্তরে বলা যাবে, ইসলামে মানুষের কোন ধর্ম বা আকীদা গ্রহণ করা বা করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। জোরপূর্বক কোন মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করানো যাবে না। তবে মুসলমান ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডিসীমায় থাকতে হবে ও এর আইনকানুন মেনে চলতে হবে।

দুনিয়াতে দেখা যায় যে, মানুষের মনগড়া ও নব আবিষ্কৃত আইন বা ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিকে ঐ আইন বা ধর্মের আওতায় ও এর গণ্ডিসীমার মধ্যে থাকতে হয়। এবং তার রীতি-নীতির বশ্যতা স্বীকার করতে হয়।

পক্ষান্তরে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সুতরাং মুসলমান ব্যক্তিকে ইসলামের সকল প্রকার আইনকানুন মেনে নিতে হবেই। এর আকীদা ও মূল্য বিশ্বাস কোনটাই অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং মুরতাদের কঠিন শাস্তি হবে। কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরতাদ হওয়া ভয়াবহ পাপের সমতুল্য। আর এর শাস্তি হল কতল বা শিরোচ্ছেদ।

অবশ্য মুরতাদকে তওবার প্রস্তাব দেয়া হবে, তওবা না করলে শাস্তি প্রযোজ্য হবে।

অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক

দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আচার-আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও আদর্শকে সংক্ষেপে বলতে হল কুরআন মজীদের দুটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট। এ আয়াত দুটি এ পর্যায়ে ব্যাপক সংবিধান হওয়ার উপযুক্ত। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভাল ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ্ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুত্ব করবে না তাদের সাথে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা

করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করবে, তারাই জালিম।" (৬০ সূরা মুমতাহিনাহ ঃ ৮-৯ আয়াত)

যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বা কোনরূপ শত্রুতা নেই, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের প্রতি শুধু সুবিচার ও ন্যায়পরতা গ্রহণেরই উৎসাহ দেয়া হয়নি; বরং তাদের প্রতি ভাল ও শুভ আচরণকর ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ে কুরআনের কথা হলঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার ও ন্যায়পরায়নতাকারীদের ভালবাসেন।' আর ঈমানদার লোক মাত্রই সব সময় সে কাজ করতে অধিক ভালবাসে, তৎপর হয়, যা আল্লাহ পছন্দ করেন- ভালবাসেন এতো সর্বজনবিদিত।

'আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করছেন না' কথায় ভাল আচরণ গ্রহণ ইপ্সিত হওয়াটার বিপরীত কিছু বোঝায় না। কথা বলার এই ধরণটি গ্রহণ করা হয়েছে এজন্যে যে, মুসলমানরা হয়ত মনে করতে পারেন যে, দ্বীনের বিরুদ্ধপন্থীরা বুঝি ভাল আচরণ ও ন্যায়পরায়নতা পাওয়ার অধিকারী নয়। এই ভুল ধারণা দূর করার উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলা হল যে, আল্লাহ্ বিরোধীদের সাথে ভাল আচরণ গ্রহণ, বন্ধুতা ও সুবিচার করা থেকে বিরত রাখেন না-তা করতে নিষেধ করছেন না। তিনি শুধু সেসব লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন গ্রহণ করছে।

আহলি কিতাবের প্রতি বিশেষ সুবিধা দান

ইসলাম যখন দ্বীন-ইসলামের বিরোধীদের সাথেই সর্বোচ্চ মানের ভাল ব্যবহার ও ন্যায়পরায়নতা গ্রহণ থেকে নিষেধ করে না, মূর্তি পূজারী মূশরিক হলেও নয়-যেমন প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, যা আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল, তখন আহলি কিতাব-ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের প্রতি যে ইসলাম বিশেষ সুবিধাদি দান করবে-তারা ইসলামী দেশের অধিবাসী হোক কি তার বাইরে তা তো অতি স্বাভাবিক।

কুরআন মজীদে এই ইয়াহুদী খৃস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছে 'আহলি কিতাব'-সেই লোক যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে বলে। এ থেকে বোঝাতে চেয়েছে যে, আসলে এরা আল্লাহর নাযিল করা দ্বীনের ধারক লোক। অতএব মুসলমান ও তাদের মাঝে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যে মৌল দ্বীন ও বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আসলে তা এক ও অভিন্ন। একটি আয়াত উল্লেখ্য ঃ

তিনি তোমাদের জন্যে সেই দ্বীনই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করে পাঠিয়েছি, আর তার পথ-নির্দেশ করেছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা সকলে এই দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।" (সূরা শুরা)

মুসলমানদের তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাযিল করা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্যে। তাই সব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ মুসলমানের কর্তব্য। এছাড়া তাদের ঈমান সত্য ও যথার্থই হতে পারে না। বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা বলঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশধরদের প্রতি, আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতি, আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না, আমরা তো সেই এক আল্লাহরই অনুগত।" (২ সূরা বাকারা ঃ ১৩৬ আয়াত)। ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা", পৃষ্ঠা ৫৪-৬০)।

আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান লিখেন, "আধুনিক ব্যাখ্যায় এরা (যিম্মী) ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী-নাগরিক। প্রথম দিন থেকেই মুসলিম সমাজ এ সময় পর্যন্ত ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্যে যে অধিকার, অমুসলিমদের জন্যেও সেই অধিকার। তাদের যা দায়-দায়িত্ব এদেরও দায়-দায়িত্ব তা-ই। তবে শুধু আকিদা, বিশ্বাস ও দ্বীন-সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে কোন মিল বা সামঞ্জস্য নেই। কেননা ইসলাম তাদেরকে তাদের দ্বীন ধর্মের উপর বহাল থাকার পূর্ণ আযাদী দিয়েছেন।

যিম্মীদের সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) খুব কড়া ভাষায় মুসলমানদের নসীহত করেছেন এবং সেই নসীহতের বিরোধিতা যা লংঘন হতে আল্লাহ্‌র অসন্তোষ অবধারিত বলে জানিয়েছেন। হাদীসে নবী করীমের কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ

'যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল, সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল।'

'যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলা লড়ব।' (আবু দাউদ)

'যে লোক চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপর জুলুম করবে কিংবা তার হক নষ্ট করবে অথবা শক্তি-সামর্থ্যের অধিক বোঝা তার উপর চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া তার কোন জিনিস নিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা লড়ব।'

রাসূলে করীম (সঃ)-এর খলীফাগন এ সব অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষায় সব সময় সচেতন-সতর্ক থাকতেন। ইসলামের ফিকাহবিদগণ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ সব অধিকার ও মর্যাদার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মালিকী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদ শিহাবুদ্দীন অল-কিরাফী বলেছেন :

যিম্মীদের সাথে কৃত চুক্তি আমাদের উপর তাদের কতিপয় অধিকার ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে আমাদের সংরক্ষণ ও নিরপত্তার অধীন এসে গেছে। আল্লাহ্‌, রাসূল ও দ্বীন-ইসলাম তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। কাজেই যে লোক তাদের উপর কোন রকমের বাড়াবাড়ি করবে সামান্য মাত্রায় হলেও তা আল্লাহ তাঁর রাসূল

এবং দ্বীন-ইসলামের দেয়া নিরাপত্তা বিনষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের খারাপ কথা বলা, তাদের মধ্য থেকে কারো গীবত করা বা তাদের কোন রূপ কষ্ট জ্বালা দেয়া অথবা এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি সব এ নিরাপত্তা বিনষ্টের দিক।

যাহেরী মাযহাবের ফিকাহ্‌বিদ ইবনে হাজম বলেছেন ঃ

যেসব লোক যিম্মী, তাদের উপর যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদের পক্ষ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হওয়া ও তাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাহলেই আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিরাপত্তা দেয়া লোকদের সংরক্ষণ করতে পারব। কেননা এ রূপ অবস্থায় তাদের অসহায় ও সহজ শিকার হতে দেয়া নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব পালনের পক্ষে বড্ড ক্ষতিকারক হবে।

অমূসলমানের কাছে সাহায্য চাওয়া

মুসলিম অমুসলিমের কাছে দ্বীনী ব্যাপারাদি ছাড়া চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে সাহায্য চাইতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। শাসন কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই এ অনুমতি রয়েছে। তবে একথা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ যেমন এ সব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের স্বনির্ভরতা ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করা একান্তই কর্তব্য।

নবী করীম (সা) নিজে অমুসলিমের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে মজুরীর বিনিময়ে সাহায্য নিয়েছেন, কাজ করিয়েছেন। হিজরত করার সময় পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরীকতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আলেমগণ বলেন ঃ কেউ কাফির হলে যে কোন বিষয়েই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কথা জরুরী নয়। মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার মত কাজে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্যে একজন মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করায় এ পর্যায়ের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহজেই দূর হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানের নেতার পক্ষে অমুসলিমের কাছে সাহায্য চাওয়া-বিশেষ করে আহলি কিতাবের লোকদের কাছে-সম্পূর্ণ জায়েয বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধে এদের শরীক করা ও বিজয় লাভ হলে মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গণীমতের অংশ দেওয়ারও নাজায়েয কিছুই নেই। জুহরী বর্ণনা করেছেন, রাসূলে করীম (সা) যুদ্ধে ইয়াহুদীদের সাহায্য নিয়েছেন ও মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গণীমতের মাল দিয়েছেন। হুনাইন যুদ্ধে ছওয়ান ইবনে উমাইয়া মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন।

তবে শর্ত এই যে, যে-অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, মুসলমানদের ব্যাপারে তার ভাল মত ও দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে হবে। যদি তাদের বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে অবশ্য সাহায্য গ্রহন জায়েয হবে না। কেননা বিশ্বাস অযোগ্য মুসলমানের সাহায্য গ্রহণই যখন নিষিদ্ধ. তখন বিশ্বাস অযোগ্য কাফিরের সাহায্য গ্রহণের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মুসলিম অমুসলিমকে হাদিয়া তোহফা দিতে পারে, তাঁর দেয়া হাদিয়া তোহফা গ্রহণও করতে পারে। নবী করীম (সাঃ) অমুসলিম রাজা-বাদশাহের দেয়া হাদিয়া-তোহফা কবুল করেছেন। এ পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। নবী-বেগম হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন ঃ

'আমি নাজ্জাশী বাদশাকে রেশমী চাদর ইত্যাদি তোহফা পাঠিয়েছিলাম।'

বস্তুতঃ ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দেয়, সম্মান করে। তাহলে আহলি কিতাব, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কোন মানুষের সাথে অনুরূপ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বিত হবে না কেন?" ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা", পৃষ্ঠা ৬১-৬৩)।

উদারতা

আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান এ সম্পর্কে লেখেন :

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)র মা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর মা ছিলেন কাফির। তিনি আপন ছেলের সঙ্গেই মদীনায় বসবাস করতেন এবং আপন অজ্ঞতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে নানা ধরনের বিরূপ মন্তব্য করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) পিয়ারা নবী (সাঃ) এর খিদমতে এসে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আপন মাতার এই দুরাচারের কথা বর্ণনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা শুনে রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে বরং তার হিদায়াতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন।

এক কাফিরের আতিথেয়তা

অনুরূপ অপর এক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছিলেন, 'এক রাতে জনৈক কাফির রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করল। তিনি একটি বকরীর দুধ এনে তার সামনে হাযির করলেন। সে ওটা পান করে আরো দুধ চাইল। তিনি আরেকটি বকরীর দুধ দিয়ে এলেন। কিন্তু তাতেও সে তৃপ্ত হল না। আরো দুধ চাইল। এভাবে একে একে ঘরের সাতটি বকরীর সমুদয় দুধ সে সাবাড় করে তবে ক্ষান্ত হল।"

মূলতঃ সে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এরূপ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কুমতলব টের পাচ্ছিলেন। তবু তিনি আপন উদারতার কারণে তাকে কিছুই বলছিলেন না। এরর ফল হল এই যে, ইসলামের নবীর এই অনুপম উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করে ধন্য হল।

সাধারণ ক্ষমা

মক্কার কুরায়শরা সত্যের পথপ্রদর্শক মহানবী (সাঃ)-কে যেভাবে কষ্ট দিয়েছে তা কারো অজানা নেই। এই জালিমরা মহানবী (সাঃ)-এর উপর প্রস্তর বর্ষণ করেছে। নানাবিধ গালিগালাজ করেছে। চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে। পরিশেষে মহানবী

(সাঃ) এই জালিমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে স্বীয় জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মদীনা শরীফে এসে ইসলাম প্রচারের নূতন কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। সেখানেও মহানবী (সাঃ)-কে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়া হয়নি। তারা মদীনার উপরও বার বার আক্রমণ চালাল। এই সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)-এর বহু বন্ধু ও প্রিয়জন শহীদ হয়েছেন। মক্কায় যাঁরা ইসলাম প্রচারে সহযোগী ছিলেন তাঁদের উপরে নানাবিধ জুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে। যেদিন মহানবী (সাঃ) বিজয় বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন সেদিন মক্কার পাপিষ্ঠ কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে অপরাধীরূপে মহানবী (সাঃ)-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল। যারা মহানবী (সাঃ)-কে নানাবিধ গালিগালজ করেছিল এবং ইসলামকে দুনিয়া হতে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল, হযরত বিলাল (রাঃ)-এর গলায় রশি লাগিয়ে যারা রাস্তায় রাস্তায় টেনেছিল, যারা ইসলাম ও ইসলামের আহ্বায়ককে নানাবিধ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, যারা বক্তৃতার সময় মহানবী (সাঃ)-এর উপর পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পবিত্র জুতা রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছিল, তারা সকলেই অপরাধীর মধ্যে শামিল ছিল। সমস্ত অপরাধীই তখন ভয়ে ছিল কম্পমান। তারা নিজ নিজ অতীত কর্মের কথা স্মরণ করে লজ্জিত ছিল। মহানবী (সাঃ) না হয়ে অন্য কোন বিজয়ী সেনাপতি হলে ইসলামের ঘৃণিত এইসব শত্রুকে হত্যা করতে দ্বিধা করত না। তিনি হয়ত বা কাউকেও ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাতেন, কাউকেও হয়তো বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে মারতেন। পরাজিত শত্রুর উপর বিজয়ীদের নির্মম হত্যা ও ধ্বংসের কাহিনীর ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। কিন্তু মক্কা বিজয়ী মহানবী (সাঃ) প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলাবার কোন ফরমান জারি করেন নাই, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিবার কোন নির্দেশ দেন নাই। প্রতিশোধ গ্রহণ করবার জন্য হত্যা করেন নাই তাদের শিশুদের। বরং সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। দয়ালু নবীর পক্ষ হতে ফরমান জারি হল— 'তোমরা আজ সকলে নিরপরাধী। তোমরা সকলে মুক্ত। তোমরা নিজ নিজ গৃহে চলে যাও।'

সেনাবাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করলেন, সাবধান! যে লোক অস্ত্র ফেলে আত্মসমর্পণ করবে, তাকে হত্যা করবে না, যে লোক কা'বা ঘরের মধ্যে অথবা আবু সুফিয়ান ও হাকিম বিন হাযমের ঘরে প্রবেশ করবে, তাদেরকেও হত্যা করবে না, পলায়নপর ব্যক্তিদের পশ্চাদ্ধাবন করবে না, আহত ও বন্দীদেরকেও হত্যা করবে না।

পুনরায় আল্লাহ্‌র সত্যনবী সমস্ত অপরাধীর প্রতি ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সকলের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করে বললেন ঃ

'লা তাসরীবা আলাইকুমুল ইয়াওমা ইযহাবু ফাআনতুমুত্ তুলাইকট'— তোমরা আজ সকলে নিরপরাধী, তোমরা আজ মুক্ত, তোমরা নিজ নিজ ঘরে চলে যাও।

এক ইহুদীর জানাযা

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা' দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হল— ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ), এতো এক ইহুদীর লাশ!

তিনি বললেন ঃ কেন ইয়াহুদী কি মানুষ নয়? ইসলামে তো মানুষ মাত্রেরই একটা মান ও মর্যাদা আছে।

মসজিদে ইহুদীর পেশাব

হযরত নবীপাক (দঃ) এবং তাঁর খলিফাগণ তাঁদের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে সকল অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একবার এক ইহুদী মসজিদে ঢুকে পেশাব করতে শুরু করলো। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাকে বাঁধা দিতে উদ্যত হলেন। হুজুর (দঃ) তাঁদেরকে থামিয়ে দিয়ে বললেন-'ওকে বাঁধা দিও না, পেশাব করতে দাও। তা' না হলে যে ওর পেশাবের রোগ হয়ে যাবে।'

পেশাব করা শেষ হলে হুজুর (দঃ) ইহুদীকে আদর করে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বললেন– 'এটা আমাদের মসজিদ। এখানে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। এখানে পেশাব করতে নেই।' হুজুরেপাক (দঃ)-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল।

বিধর্মী মেহমানের পায়খানা পরিষ্কার

আরেকবার এক বিধর্মী হুজুর (দঃ)-এর মেহমান হল।

হুজুর (দঃ) খুব যত্ন সহকারে তার মেহমানদারী করলেন। রাতের বেলা লোকটি বিছানায় পায়খানা করে রেখে পালিয়ে গেল। পরদিন হুজুর (দঃ) নিজ হাতে সব কাপড়গুলো ধুলেন। একটুও বিরক্ত হলেন না।

'আল্লাহ' শব্দে দাসুর-এর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল

মহানবী (সাঃ) একদিন একটি গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এই সুযোগে দাসুর নামে একজন শত্রু তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। শোরগোল করে সে মহানবী (সাঃ)-কে ঘুম থেকে জাগাল।

মহানবীর (সাঃ) ঘুম ভাঙলে চোখ খুলে দেখলেন, একটা উন্মুক্ত তরবারি তাঁর উপর উদ্যত।

ভয়ানক শত্রু দাসুর চিৎকার করে উঠল, 'এখন আপনাকে কে রক্ষা করবে?'

মহানবী (সাঃ) ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ!'

শত্রু দাসুর মহানবীর (সাঃ) এই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠের 'আল্লাহ' শব্দে কেঁপে উঠল। তার কম্পমান হাত থেকে খসে পড়ল তরবারি।

মহানবী (সাঃ) তার তরবারি তুলে নিয়ে বললেন, 'এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, দাসুর?' সে উত্তর দিল, 'কেউ নেই রক্ষা করার।'

মহানবী (সাঃ) বললেন, 'না, তোমাকেও আল্লাহই রক্ষা করবেন।' এই বলে মহানবী (সাঃ) তাকে তার তরবারি ফেরত দিলেন এবং চলে যেতে বললেন।

বিস্মিত দাসুর তরবারি হাতে চলে যেতে গিয়েও পারল না। ফিরে এসে মহানবীর হাতে হাত রেখে পাঠ করল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর মহানবী শত্রুদেরই মঙ্গল চাইলেন

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং সৈনিকদের ব্যূহ সাজিয়েছেন। পাহাড়ের গলিপথে পাহারা বসিয়েছিলেন এবং যার যা দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রাথমিক বিজয় মুসলিম সৈনিকদের আত্মহারা করে দিয়েছিল, দায়িত্বের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। পাহাড়ের গলিপথ রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল, তারা সরে এসেছিল সেখান থেকে। ফলে পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ায় বিপর্যয় নেমে আসে মুসলিম বাহিনীতে।

অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। আহত হলেন আরও অনেক। স্বয়ং মহানবী (সাঃ) মারাত্মকভাবে আহত হলেন। পাথরের আঘাতে তাঁর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হলো। লৌহ শিরস্ত্রাণ তাঁর ঢুকে গিয়েছিল সেই ক্ষতে। দাঁতও তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

পাহাড়ের এক চূড়ায় সাহাবীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে চাইলেন। রক্ত মুছে ফেললেন মুখমণ্ডল থেকে। তারপর তিনি প্রথম যে কথা বললেন তা ছিল এই,

"হে আল্লাহ, আমার লোকদের সত্য পথে ফিরিয়ে আনুন। তারা জানে না তারা কি করছে।"

মযলুম চাইলেন যালিমরা বেঁচে থাকুক

মহানবী (দঃ) ধর্ম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন স্থির করলেন। মহানবী (দঃ) ভেবেছিলেন, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা তায়েফের মানুষের মন হয়তো আরও নরম পাওয়া যাবে।

মহানবী (দঃ) তায়েফ চললেন। তায়েফের প্রধান গোত্র ছিল বনু সাকিফ। আবদইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব নামে তিনভাই ছিল সে গোত্রের প্রধান। মহানবী (দঃ) প্রথমে তাদের কাছে গেলেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তাদেরকে। তারা দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না বরং তাকে নানা রকমের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে জর্জরিত করলো।

তারা যখন দাওয়াত কবুল করলো না, তখন মহানবী (দঃ) তাদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করলেন যাতে করে তাদের মত দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হতে না পারে।

কিন্তু উল্টোই করল তারা। লেলিয়ে দিল ছেলে-ছোকরা ও দাসদের। মহানবী (দঃ) রাস্তায় বের হলেই তারা তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো, পাথর ছুড়তো।

এর মধ্যেই মহানবী (দঃ) সত্যের আহবান তায়েফের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগলেন। পথের দু'ধার থেকে তাঁর পা লক্ষ্যকরে পাথর নিক্ষেপ করা হতে লাগলো। রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল তাঁর পা। চলতে না পেরে মাঝে মাঝে তিনি বসে পড়তেন। লোকেরা তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার সেই আগের মতই পাথর নিক্ষেপ করতো। এভাবে ক্রমে তাঁর জীবন সংশয় দেখা দিল।

অবশেষে মহানবী (দঃ) মক্কায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময় অত্যাচার আরও ভীষণ আকার ধারণ করল। একদিন তারা পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত করে তুললো। সর্বাঙ্গ থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক সময় অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলেন মহানবী (দঃ)। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে মহানবী (দঃ) ঢুকে পড়লেন একটি আংগুর বাগানে।

দেহের প্রবাহিত রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। জুতা খুলতে খুবই কষ্ট হলো তাঁর। ওযু করে মহানবী (দঃ) বিশ্ব-জগতের মালিক প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাযে তন্ময় হয়ে গেলেন। নামায শেষে প্রভুর উদ্দেশ্যে তিনি প্রার্থনার জন্য হাত উত্তোলন করলেন। কি প্রার্থনা করলেন তিনি? তিনি কি নিজের কষ্ট লাঘবের জন্য দোয়া করলেন? নাকি তিনি তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন? না তিনি এ সবের কিছুই করেননি।" ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা", পৃষ্ঠা ৭৪-৭৭)।

আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান লেখেন :

মদীনার ইহুদীদের ধর্মীয় অধিকার

মদীনার ইহুদীরা সব সময় বিরোধীতা করতো তথাপি তাদেরকে ধর্ম পালনের অধিকার হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বঞ্চিত করেন নি। (বালাজুরী ঃ ফতুহুল বুলদান ৭১ পৃঃ)।

'ধর্মে বল প্রয়োগ নেই'

বার বার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ইহুদী বনি নযির গোষ্ঠিকে মদিনা শরীফ হতে বহিস্কৃত করে দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। তখন মদিনাবাসী মুসলমানগনের যে সকল সন্তান ইহুদী ধর্মে ছিল, তাদের পিতামাতা জোর করে তাদের মুসলমান করতে চেয়েছিল। কিন্তু নবী করিম (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করে বলেছিলেন–

'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই' (আবু দাউদ শরীফ)।

একজন মুসলমানের দুই পুত্র খৃষ্টান ছিল। সে পুত্রদের বলপূর্বক মুসলমান করতে হযরত নবীকরিমের (সাঃ) নিকট অনুমতি চেয়ে ছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন– 'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই'ইসর ইবনে জরির)।

বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের সাথে ব্যবহার

খায়বারের ইহুদীদের সাথে মদীনার বনি-কাইনোকা ও বণি নাযির গোত্রের ইহুদীরা সংঘবদ্ধ হয়ে মদীনা আক্রমণের আয়োজন করেছিল। ইসলামের চিরশত্রু গাৎফান গোত্র ও তাদের সংগে মিলিত হয়ে বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমান নিধনে অগ্রসর হয়েছিল। মুসলিম সৈন্যের নিকট ইহুদীদের বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিল। নিরুপায় হয়ে ইহুদীরা হযরত নবী করিমের (সাঃ) নিকট আত্মসর্পণ করলো।

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী বিধর্মী বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শত্রুকে একেবারে নির্মূল করা হলো না। জোর করে মুসলমান করা হ'ল না। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তে ক্ষমা করলেন–

(১) ইহুদীরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না।

(২) মুসলমানদের ন্যায় তাদেরকে যুদ্ধ করবার জন্য বাধ্য করা হবে না।

(৩) তাদের ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদ পূর্ববৎ তাদেরই স্বত্বাধিকারে থাকবে।

(৪) উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ রাজস্ব স্বরূপ মদীনায় পাঠাতে হবে।

(৫) অন্য কোন কর তাদেরকে দিতে হবে না। (আলঃ নাদির ৩৩৯)

নাজরানের খৃস্টান

নাজরানের খৃষ্টানদের একটি ডিপোটেশন পাঠিয়েছিলেন হযরত নবী করিমের (সাঃ) নিকট। তিনি তাদের মেহমানদারী করেন এবং মসজিদে নববীর মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রথা মত উপাসনা করতে দেন।

উদারতা ও সহিষ্ণুতার নিদর্শন এর চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে?

নিউ টেস্টামেন্টে যীশুর এরূপ উদারতার কোন সাক্ষ্য নেই।

নাজরানের খৃস্টানদের প্রতি হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সনদ

(১) আল্লাহতায়ালার রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এই প্রতিজ্ঞা করছে যে, সর্ব প্রকার সম্ভবপর চেষ্টা দ্বারা তাদেরকে নিরাপদে রাখা হবে।

(২) তাদের দেশ, জীবন ও ধন-সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

(৩) তাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না।

(৪) কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হবে না।

(৫) কোন সন্ন্যাসীর ধর্মকার্যের ব্যাঘাত ঘটানো হবে না।

(৬) তাদের দেশের মধ্য দিয়ে সৈন্য চালনা করা হবে না।

(৭) যে পর্যন্ত তারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করে চলবে, সে পর্যন্ত এই সনদের শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকবে। [বালজুরী ফতুহল বুলদান ঃ ৭১ পৃষ্ঠা]।

সৈন্য বাহিনীর প্রতি নবীজী (দঃ)-এর নির্দেশ

সিরিয়ায় সেনাবাহিনী পাঠাবার সময় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) সৈন্যদের নির্দেশ দেন–

(১) বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। (২) ইহুদী, খৃষ্টানদের শিশু, মহিলা, ধর্মস্থানে বসবাসকারী লোককে হত্যা করবে না, (৩) কোন ফলবান বৃক্ষ বা দালান ধ্বংস করবে না (সিরাতুন নবী)।

ইসলামের এই সব উদারতার তুলনা খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মীয় ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)-এর নির্দেশ

খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) সিরিয়ার প্রথম অভিযানের সময় সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন–

ন্যায়পরায়ণতার সাথে চলবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করবে না, খেজুর গাছের কোন ক্ষতি করবে না, খাদ্যের জন্য ছাড়া গৃহপালিত পশু বা উট হত্যা করবে না। যারা মঠ, মন্দির, গির্জাতে নির্জন জীবনযাপন করে তাদেরকে শান্তিতে ধর্মের কাজ করতে দিবে।

জেরুজালেম শহরের খৃষ্টান অধিবাসীদের প্রতি হযরত ওমরের (রাঃ) সনদ

এই সনদ আল্লাহতায়ালার গোলাম আমিরুল মুমেনিন জেরুজালেমের অধিবাসীদের দান করছেন।

১) এই সনদ জেরুজালেমবাসীদের জীবন, সম্পত্তি, গির্জা, ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ লোক এবং তাবৎ খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের জন্য।

২) তাদের গির্জা কখনও দখল করা হবে না। সন্ন্যাসীদেরকে গির্জা থেকে বিতাড়িত করা হবে না। তৎসংক্রান্ত জমির উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

৩) ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ জোর জবরদস্তি করা হবে না।

৪) জেরুজালেমবাসীদের মধ্যে হতে যারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি সমেত গ্রীকদের সংগে চলে যেতে চায়, তাদের জীবন ও ভজনালয় এবং ক্রশ সমূহ রক্ষা করা হবে।

সনদের শর্তগুলি খলিফা এবং সমস্ত মুসলমান জাতি পালন করতে বাধ্য থাকবে।

হযরত ওমর (রাঃ) জেরুজালেম (বায়তুল মুকাদ্দেস) দখল করে মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায়তঃ স্বার্থ ও ধর্মগত অধিকার পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখে প্রত্যেকের সীমা নির্দেশ করে দেন। বিরোধী দর্ম এবং বিজিত জাতির প্রতি এরূপ উদারতা ও সহিষ্ণুতা ইহুদী বা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মুসলমানদের সাথে খৃষ্টানদের এবং খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের ব্যবহার

জেরুজালেমে দুটি ঐতিহাসিক দিন

জেরুজালেম নগরী। ১০৯৯ খৃষ্টাব্দ। ১৫ই জুলাই। বিকল ৩টা। খৃষ্টান ক্রুসেডারদের হাতে মুসলিম নগরী জেরুজালেমের পতন ঘটল। খৃস্টান বাহিনী বন্যা স্রোতের মত প্রবেশ করলো নগরীতে। খৃষ্টান অধিনায়ক গডফ্রের নির্দেশে নরবলির মাধ্যমে বিজয়োৎসবের ব্যবস্থা করা হল। নারী, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ও ইহুদী নাগরিকদের নিধন যজ্ঞ চললো তিন দিন ধরে। বীভৎষ সে দৃশ্য। কারো মাথা ছিঁড়ে ফেলা হলো, কারো হাত পা কাটা হলো, কাউকেও তীর বৃষ্টি করে মারা হলো, কাউকে মারা হলো পুড়িয়ে। অনেক মুসলমান গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল উমার মসজিদে, মসজিদের ভেতরেই তাদেরকে হত্যা করা হলো। ৩০০ মুসলিম নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আল আকসা মসজিদের ছাদে, তাকেরকেও রেহাই দেয়া হলো না। হত্যা করা হলো প্রত্যেককে। রাজপথ দিয়ে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল সে রক্তে। তিনদিনের হত্যাকাণ্ডে জেরুজালেম নগরীতে ৭০,০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হলো।

সেই জেরুজালেমে আর এক দৃশ্য

১১৮৭ খৃস্টাব্দ। ২রা অক্টোবর। ৮৮ বছর পর মুসলিম বাহিনী গাজী সালাহউদ্দীনের নেতৃত্বে বিজয়ী বেশে জেরুজালেম নগরীতে প্রবেশ করলো। নগরীর আতংক উদ্বেগ বিশাল খৃষ্টান নাগরিকদের চোখে-মুখে মৃত্যুর ছাপ। কিন্তু শান্ত সুশৃংখলভাবে মুসলিম বাহিনী নগরে পবেশ করলো। সকলের আগে চলছেন গাজী সালাহউদ্দীন। মুখ তাঁর প্রশান্ত, চোখে কোন উত্তাপ নেই। ৮৮ বছর আগে যারা জেরুসালেমকে কসাই খানায় পরিণত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণাও তাঁর চোখে মুখে পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিজয়ের পর ক্রুসেডারদের মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে গাজী সালাউদ্দীন অপরিসীম উদারতার পরিচয় দিলেন। প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ, নারীর জন্য পাঁচ ও শিশুর জন্য একটি করে স্বর্ণমুদ্রা মুক্তিপণ নির্ধারিত হলেও নামমাত্র মুক্তিপণ গ্রহণ করে তিনি বন্দীদের মুক্তি দিলেন। পরিশেষে দরিদ্র, বৃদ্ধ ও নারীদের তিনি বিনাপণে মুক্তি দিলেন। সহায় সম্বলহীন নারীদের তিনি প্রচুর পরিমাণে অর্থও দান করলেন।

হাইবেরিয়াসে সালাহউদ্দীন

ক্রুসেডের ৯০ বছর পার হয়ে গেছে। ইউরোপ থেকে তৃতীয় ক্রুসেডারদের নতুন দল এসে ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ওদিকে সুলতান সালাউদ্দীন খণ্ড বিখণ্ড মুসলিম শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে তুলছেন।

•১১৮২-৮৩ সন। মিসর সহ সমগ্র এশিয়া-মাইনর ও তুর্কী অঞ্চল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহউদ্দীনের পতাকাতলে আশ্রয়লাভ করল। অতঃপর এদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে সুলতান এবার মনোযোগ দিলেন ক্রুসেডারদের দিকে। সমগ্র ফিলিস্তিন তখনও তাদের করতলগত। ফিলিস্তিনের প্রত্যেকটি শহরে হাজার হাজার মুসলিম বন্দী অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। প্রায় ৮৪ বছর ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের মিনার শীর্ষ থেকে মুয়াযযিনের উচ্চকণ্ঠ শোনা যায়নি। জেরুসালেমের উমর মুসজিদের অভ্যন্তরে খৃষ্টানরা যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিল, তার রক্তের দাগও হয়তো মুছে ফেলা হয়নি তখনও। সুলতান সালাহউদ্দীন অধীর হয়ে উঠেছেন। একদিকে তাঁর এই অধীর চিত্ততা, অন্যদিকে খৃষ্টান ক্রুসোডারদের অত্যাচারও তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। শান্তির সময়েও মুসলিম বণিকদের কাফিলা বার বার লুণ্ঠিত ও মুসলিম বণিকরা নিহত হচ্ছিল তাদের হাতে। ১১৮৬ সনেও খৃষ্টান অধিনায়ক রেজিনাল্ড অতীতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করল। ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল সুলতান সালাহ উদ্দীনের। ৯০ বছরের পুরাতন খৃষ্টান ক্রুসেডের বিরুদ্ধে সুলতান সালাউদ্দীন জিহাদ ঘোষণা করলেন। সময়টা ছিল ১১৮৭ সনের মার্চ মাস। জিহাদ ঘোষণার পর সুলতান সালাহউদ্দীন আতারায় শিবির সন্নিবেশ করলেন। সালাহ উদ্দীনের প্রাথমিক প্রধান লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস।

তাইবেরিয়াসের রাজা গেড়ি লুসিগণানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে, রিমন্ড বিলিয়ান প্রমুখ বিখ্যাত ক্রুসেড অধিনায়করা সালাহ উদ্দীনের মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এল। তাদের অধীনে ১২০০ নাইট সহ অর্ধলক্ষ সৈন্য সমবেত হলো। সুলতান সালাহউদ্দীন ১২ হাজার ঘোড় সওয়ার ও অনুরূপ সংখ্যক পদাতিক সৈন্য নিয়ে তাইবেরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন। সিত্তিনের দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া গ্রামের সন্নিকটবর্তী প্রান্তরে খৃস্টান ও মুসলিম সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়াল। সুলতান সালাহউদ্দীন প্রথম বারের মতো খৃষ্টান ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হলেন। লুবিয়া প্রান্তরে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ক্রুসেডার সেই যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়ক সহ স্বয়ং রাজা ও তাঁর ভাই বন্দী হলেন। যুদ্ধে ৩০ হাজার খৃস্টান সৈন্য মৃত্যুবরণ করল। ১১৮৭ সনের জুলাই মাসে সুলতান সালাহউদ্দীন তাইবেরিয়াস পুনরুদ্ধার করলেন। প্রথম জিহাদে জয়ী হয়ে সুলতান সালাহ উদ্দীন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর চোখে আজ খৃস্টানদের বিরুদ্ধে কোন ঘৃণা নেই। কিংবা নেই কোন প্রতিহিংসার আগুন। ক্রুসেডাররা ১০৯৬ সনে তাদের প্রথম বড় রকমের সাফল্য অর্থাৎ এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর যে মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা থেকে এ মানসিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যুদ্ধ নয়, বরং জনৈক মুসলিম নামধারী বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এন্টিয়ক নগরী দখল করার পর আত্মসমর্পনকারী দশ হাজার মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে তারা হত্যা করেছিল। আর সুলতান সালাহউদ্দীন তাঁর প্রথম জিহাদে সাফল্য লাভ করার পর কোন খৃস্টানের গায়ে আঁচড়ও লাগল না। অগণিত লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ডের নায়ক রেজিনাল্ডকেই শুধু তার দু'শ সাঙ্গ-পাঙ্গসহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা

হলো। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে শহীদ আমীরদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য নৃত্য করে বেড়িয়েছিল, সেখানে সুলতান সালাহউদ্দীন তাইবেরিয়াসের খৃষ্টান রাজাকে হাতে ধরে নিজের কাছে বসিয়ে ঠাণ্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন।

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মহান শিক্ষা থেকে এই সহনশীলতার সম্ভব হয়েছিল।

ক্রুসেড ছিল খৃষ্টানদের ধর্মযুদ্ধ। ৬৩২ খৃষ্টাব্দ হতে শুরু করে মুসলমানেরা একে একে সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, স্পেন ও সিসিলিয় হতে খৃষ্টান শাসন উচ্ছেদ করে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হতে খৃষ্টান শক্তি ও সভ্যতা নিঃশ্চিহ্ন হতে চলেছিল। পরমত সহিষ্ণু ও উদার ইসলামের নীতির প্রতি দিন দিন সকল শ্রেণীর খৃষ্টান আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হচ্ছিল। ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য খৃষ্টানদের পোপ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য আহ্বান করলেন ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে। ইহা ধর্মযুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। তার ফলে সকল খৃষ্টানই এই যুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১০৯৪ খৃষ্টাব্দ হতে শুরু করে ১১২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত খৃষ্টানেরা মুসলমানের উপর বর্বরজনচিত নির্যাতন করেন। একর নামক স্থানের যুদ্ধে খৃষ্টান নরপতি রিচার্ড জয়লাভ করে মুসলমানদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন তা ঐতিহাসিক হিটির মন্তব্য থেকে তুলে দিতেছি-

When at the end of a month the money was not paid, Richard ordered the twenty seven hundred captives to be slaughtered-an act that stood in conpicuous contrast with Salah's treatment of prisoners at the capture of Jerusalem.

ইসলামের জ্যোতিতে আলোকিত সালাহউদ্দীন সম্বন্ধে লেনপোল লিখেছেন- Secret of Saladin's power lay in the love of his subjects. When others sought to attain by severity, by majesty, he acomplished by kindness.

মূর্তির নাকের বদলে মানুষের নাক

একদিন আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রীষ্টান পল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গেল। কে একজন গত রাত্রে যীশু খ্রীষ্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রীষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ধরে নিল তারা যে, এটা একজন মুসলমানেরই কাজ। খ্রীষ্টান নেতারা মুসলিম সেনাপতি আমরের কাছে এলো বিচার ও অন্যায় কাজের প্রতিশোধ দাবী করতে। আমর সব শুনলেন। শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খৃষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তাদের সংকল্প প্রকাশ করে একজন খৃষ্টান নেতা বললো, "যীশুখৃষ্টকে আমরা

আল্লাহর পুত্র বলে মনে করি। তাঁর প্রতিমূর্তির এরূপ অপমান হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেয়েছি। অর্থ এর যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়। আমরা চাই আপনাদের নবী মুহাম্মদের প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনি ভাবে তার অসম্মান করি।" এ কথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন আমর। ভীষণ ক্রোধে মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি খৃষ্টান বিশপকে লক্ষ্য করে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি। আমাদের যে কোন একজনের নাক কেটে আমি আপনাদের দিতে প্রস্তুত, যার নাক আপনারা চান।" খৃষ্টান নেতারাও সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। পরদিন খৃস্টান ও মুসলমান বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। মিসরের শাসক সেনাপতি আমর সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের, তাতে আমার শাসন দূর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাসিকা ছেদন করুন"।

এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খৃষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সে নীরবতায় নিঃশ্বাসের শব্দ করতেও যেন ভয় হয়। সহসা সেই নীরবতা ভংগ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বলল, "আমিই দোষী– সিপাহসালারের কোন অপরাধ নেই। আমিই মূর্তির নাসিকা কর্তন করেছি, এই তা আমার হাতেই আছে!" সৈন্যটি এগিয়ে এসে বিশপের তরবারির নীচে নিজের নাসিকা পেতে দিল। স্তম্ভিত বিশপ।" ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমের ভুল ধারণা", পৃষ্ঠা ৮০-৮৫)।

আব্দুল্লাহ মামুন আরিফ আল্ মান্নান লিখেন :

অমুসলিম প্রজাদের সাথে মুসলমান বাদশাহদের ব্যবহার

মানবতার মহান প্রতীক বাদশাহ্ নাসিরুদ্দিন

বিশাল রাজ্যের অধিপতি হয়েও বাদশাহ নাসিরুদ্দিন ফকিরের মতো জীবন যাপন করতেন। বাদশাহর দরবার ছিলো সবার জন্যে উন্মুক্ত। সব সময় তিনি সুযোগ দিতেন অন্য ধর্মাশ্রয়ীদের। সব রকমের সাহায্য-সুবিধা তাদের দিতেন।

একদিনের ঘটনা। একজন লোক এসেছে। তার সাথে তার একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু। খোদ বাদশাহের সাথে দেখা করতে চায়, দেখা না করে কিছুতেই যাবে না।

বাদশাহ তড়িঘড়ি হুকুম দিলেন, ওদের খাবার দিতে। বেগমকে এসে বললেন, তাঁর নিজের জন্যে যে রান্না তা এক্ষুণি দিয়ে দাও। বেচারীরা বহু দূর থেকে বুঝি এসেছে। ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে কোলের শিশুটা।

কিন্তু আগন্তুক সে খাবার খেতে রাজী নয়। সে জানালো, সে জাতিতে হিন্দু। বাদশাহ-বাড়ির পাক খেলে তারা বিপাকে পড়বে।

বাদশাহ বললেন, বেশ তাহলে তোমরা রান্না-বান্নার আয়োজন কর। যা যা প্রয়োজন লাগে হাজির হবে। একটুখানি শুধু কষ্ট করতে হবে।

আগন্তুক আবার বললো-তাও হয় না। আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। আর আপনি দাস মুসলমান। আপনার ঘরে খাওয়া মানে আমার জাত যাওয়া।

বাদশাহ এক মুহূর্ত ভাবলেন। পরে বললেন–আচ্ছা ময়রার দোকান থেকে মিষ্টি আনুক। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর কথা হবে।

খাওয়ার পর অবশেষে আগন্তুক তার আরজি পেশ করলো। তার নালিশ জনৈক রাজপোষ্যের বিরুদ্ধে। তার ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। তার বাড়িঘর ছারখার করে ফেলেছে। রাজদরবারে এর সুবিচার চাই।

বাদশাহ তখনি তৈরি হয়ে নিলেন। সরেজমিনে তিনি সব জানতে চান। তারপরে কথিত আসামীকে কঠোর সাজা দেবেন।

আগন্তুক হয়তো এতোটা ভাবতে পারেনি। বাদশাহ নিজে যাবেন বিচার করতে, এ তার কল্পনার অতীত।

বাদশাহ সেখানে পৌছে সংগে সংগে সাক্ষ্য প্রমাণ নিলেন। জনে জনে জিজ্ঞেস করলেন-কি ব্যাপার কি ঘটেছে।

লোকে বললো-ও লোকটা শঠ। শয়তান। পরের সাথে প্রতারণা করা ওর পেশা। এমনি করে ওর দিন গুজরান হয়।

স্বয়ং বাদশাহকে তকলিফ দেয়ার জন্যে লোকে ততোধিক ধিক্কার দিলো। বাদশাহর কাছে তারা করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী, বাদশাহ যেনো ক্ষমা করেন।

তাদের সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে বাদশাহ বললেন-চলো ভাই, তোমার বাড়িতে বসি। সেই সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। তোমার বাড়িতে দুটো মুখে দিই।

বেশিক্ষণ বাদশাহ অবশ্য অপেক্ষা করলেন না। তাঁর যে এখনো অনেক কাজ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়া চাই।

ব্রাহ্মণের বাড়িতে বসে বাদশাহ তাকে নিরিবিলি বললেন-তোমার কোন ভয় নেই। দোষ তোমার না, আমার। অমি বাদশাহ হয়ে তোমার অভাব মেটাতে পারিনি। আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন কিনা জানি না। তবে তুমি আমাকে মাফ করো।

ব্রাহ্মণ তখন লুটিয়ে পড়েছে বাদশাহর পায়ে। বাদশাহ তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললেন-ছিঃ ভাই, ওঠো। আমার যে কিছুই খাওয়া হয়নি। কই কিছু খেতে দাও। ঘরে যা আছে তাই আমি খাবো। আর বসবার সময় নাই।

ব্রাহ্মণ কেঁদে কেটে বলে-আমি অশুচি-অপবিত্র। আমার হাতে আপনি খাবেন।

বাদশাহ হেসে বলেন-ছিঃ ভাই মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা করে। ইনকার করে। ইসলাম তা বলে না। ধর্মের বিধান তা নয়।

বাদশাহ্ তারপর সংগে নিয়ে আসলেন সেই ব্রাহ্মণকে। তাকে বুঝিয়ে বললেন- সে যেনো আর কোনো গর্হিত কাজ না করে। তার যখন যা প্রয়োজন বাদশাহ্র কাছে পাবে।

বখতিয়ার খিলজীর মহানুভবতা

বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী তখন বাংলা শাসন করছেন। রাজা লক্ষণ সেন পালিয়ে গেছেন। মুসলমানদের শাসনে রাজ্যের হিন্দুরা বেশ সুখেই আছে।

রাজ্যের সুখের সংবাদ চাপা থাকলো না। সর্বত্র সুখের সংবাদ ছড়িয়ে গেলো। পৌঁছলো রাজা লক্ষণ সেনের কানে। রাজমাতা শুনলেন, রাণী শুনলেন। নিতান্ত অবিশ্বাসের মাঝেও বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন। এরই মধ্যে বিশ্বস্ত প্রমাণ তাঁরা পেয়েছেন। বিশ্বাস না করে পারেন?

লক্ষণ সেনের একমাত্র কন্যা শুনে উতলা হয়ে উঠেছেন। তাঁর স্থির সংকল্প তিনি ফিরে যাবেন সাধের নবদ্বীপ ধামে। রাজবাড়ি না হোক, রাজপথেই বাসা বাঁধবেন।

একদিন সত্যি সত্যিই দেখা গেলো রাজবাড়িতে কে যেনো চুপিসারে ঢুকছে। প্রহরী রুখে দাঁড়ালো, কে. কি তার পরিচয়। রাজ-দুহিতা নির্ভয়ে জানালেন-যা বলার তিনি রাজার কাছে বলবেন। তাঁর সাথে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান।

দ্বার রক্ষক তাঁকে সসম্মানে নিয়ে চললো রাজ সন্দর্শনে। সংবাদ নিয়ে বললো একটু অপেক্ষা করতে। একটু পরে উনি আসছেন।

রাজ-দুহিতা দেখতে পেলেন কে যেনো নামাজ পড়ছেন। খোলা দরজা দিয়ে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। সৌম্য প্রশান্ত বদন। সুললিত কণ্ঠস্বর।

এরপর রাজদুহিতার আরো অবাক হবার পালা। নামাজ শেষে সেই ব্যক্তিই তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন। তিনি বিনম্রভাবে তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছেন অন্দরে আসতে।

অসংকোচে রাজদুহিতা বললেন-তিনি রাজার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

সরদার ঘোড়-সওয়ার আবার আপ্যায়ন জানালেন-আসুন, ভিতরে আসুন।

সে কণ্ঠে কি যাদু ছিলো কে জানে। রাজদুহিতা সম্মোহিতের মতো তাঁর পিছু অনুসরণ করলেন। এ বাড়ির সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। সব অলিগলি, আনাচকানাচ তাঁর কতো চেনা। কতো না আপন।

সেই বিশাল হলঘরে বসে রাজদুহিতা অবাক হলেন। সেই আগের মতোই সব সাজানো গোছানো আছে। সবকিছু পরিপাটী ছিমছাম।

এ কথা সে কথার পর রাজদুহিতা তাড়া দিলেন-রাত হয়ে এলো। আমি এবার ফিরে যাবো। একবার শুধু রাজার দেখা চাই।

কথায় কথায় রাজদুহিতা অবশ্য মুগ্ধ হয়ে গেছেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে প্রকাশ করেছেন তাঁর পরিচয়। আনন্দের আতিশয্যে এতোটুকু গোপন রাখেননি।

কথার পিঠেই কথা দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার দুঃখ প্রকাশ করলেন সত্যিই রাত হয়েছে তাঁর খেয়াল হয়নি। তিনি অনুতপ্ত।

এবার সাদর আহ্বান এলো-আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। আর আপনার আহারের আয়োজন হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

তারপর রাজদুহিতাকে হতচকিত করে দিয়ে সরদার ঘোড়-সওয়ার তাঁর হাতে তুলে দিলেন চাবীর গোছা। পরম প্রত্যয়ের সুরে বললেন– যে ঘরে ইচ্ছা আপনি থাকতে পারেন। যে ঘর আপনার পছন্দ, সেই ঘর বেছে নিন। আর যে পাচক-পাচিকাকে প্রয়োজন তাকে দিয়েই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করুন। এ ঘর-দোর আপনাদের। আমি রক্ষণাবেক্ষণ করছি মাত্র।

বিনয়ে বিগলিত রাজদুহিতার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন, যাকে খুঁজছেন তাকে পেয়েছেন। শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে যিনি সবার হৃদয় জয় করেছেন, এই সেই বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী। নদীয়া নবদ্বীপ ধাম অভিযানের সরদার ঘোড়-সওয়ার, যার নাম লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে।

তারপরে এ কথা সে কথার পরে রাজদুহিতা সহাস্যে বলেন-আমরা যে অলক্ষ্যে বলি আপনি যবন, তা জানেন?

তেমনি হাসিমুখেই বখতিয়ার খিলজী জানালেন-জানি।

রাজদুহিতা বললেন-আপনি মুসলমান। আর আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে। বরং বলতে পারেন আপনার চির শত্রুর কন্যা। তবু আমরা নতুন করে জানলাম-আপনি সত্যি মহান, মহানুভব। আপনার তুলনা হয় না। আপনি খাঁটি মানুষ। খাঁটি মুসলমান। আপনাকে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।

বখতিয়ার খিলজীর চোখে মুখে তখন জয়ের গৌরব। পবিত্র ইসলামের পূত বাণী স্মরণ করে তিনি বলেন-আল্লাহর কাছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। সব মানুষকে সমান ভাবে ভালোবাসার নাম ইসলাম। আমি তাঁরই একজন নগণ্য খাদেম ইসলামের শিক্ষাই আসল শিক্ষা।

হিন্দু রাণীর সাহায্যে এগিয়ে গেলেন বাদশাহ হুমায়ুন

মোগল সম্রাট বাদশাহ হুমায়ুনের চরিত্রে মহৎ গুণের সামবেশ দেখা যায়। বাদশাহ হুমায়ুনকে বলা হতো জালিমের শত্রু। মজলুমের মিত্র। অতিবড়ো আপনজন অন্যায় করলেও তিনি প্রশ্রয় দেননি। যে কোন জাতি-ধর্মের প্রতি তাঁর ছিলো সমান মহানুভবতা। যে কোন জাতি বা যে কোন ধর্মের মানুষকে তিনি ভালোবাসতেন। তাদের ডাকে সাড়া দিতেন। তাদের বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, তাতে নিজের ক্ষয়-ক্ষতি হবে ভেবে

ভয়ে ভীত হননি। যে কারণে বাদশাহ হুমায়ুনের জীবন বিপন্ন হয়েছে বারবার, সে অবিচল আদর্শের মূল্য দিতে যেয়ে তাঁর সিংহাসন পর্যন্ত হাত ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। স্বজাতি স্বধর্মের লোকের চোখে বিরাগভাজন হয়েছেন।

চিতোরের রাণী এত্তেলা পাঠিয়েছেন। বাদশাহ্ হুমায়ুন পত্রখানা পড়লেন। রানী কর্ণবতীর সেই প্রথম আর শেষ পত্র। তাঁর আকুল আরজ, পত্রপাঠ মাত্র আসুন।

কর্ণবতী স্বহস্তে লিখেছেন, এই আমার রাখী পাঠালাম। আজ থেকে আমি আপনার ছোট বোন। আপনি আমার আদর্শ অগ্রজ। শীগগির এসে বোনের প্রাণ বাঁচান।

দিল্লীর দরবারে তখন সাজসাজ রব পড়ে গেল। উজীর-নাজির পাত্র-মিত্র পারিষদ রণ-সজ্জায় সাজছে। বাদশাহ্ তলব করেছেন সিপাহ্সালারকে। তাঁর কড়া হুকুম-এই অভিযানে বিলম্ব করলে চলবে না। এই মুহূর্তে সসৈন্যে প্রস্তুত হয়ে রওয়ানা হওয় চাই। ...

চিতোর অবরোধ করে বাদশাহ তখন সনৈসন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। বাদশাহ স্বয়ং সেনাপতি-সিপাহ্সালার।

কিন্তু দুর্ভাগ্য। বাদশাহ পৌছানোর অনেক আগেই রাণী কর্ণবতী জহর পান করেছেন। বিজয়ীর বেশে বাদশাহ্ হুমায়ুন চরম পরাজয় বরণ করলেন।

রাণী কর্ণবতীর চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বাদশাহ্ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছেন। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন–আমার কর্তব্য আমি করেছি। আমার দায়িত্ব আমার ওয়াদা আল্লাহ্র ওয়াস্তে আমি তা পালন করেছি। সে বিধর্মী হলেও আমাকে ভাই ডেকেছে। মুসলমান কখনো জালিমকে ক্ষমা করে না। হোক না সে জালিম মুসলমান। কোথায় সে বেইমান বাহাদুর শাহ। হোক সে আমার জ্ঞাতি-তাকে সমুচিত সাজা দাও। বন্দী করো বাহাদুর শাহকে। একজন সম্মানিতা রাণীকে সে অপমান করেছে। রাণী তার কারণে আত্মঘাতী হয়েছে। এ আঘাত আমি ভুলতে পারি না।'

বাহাদুর শাহ্ জানতেন না যে, মোগল সম্রাট হুমায়ুন সসৈন্যে ছুটে আসবেন। মোগল অধিপতি মুসলমানের কর্ণধার। অন্যদিকে রাজপুত রাণী বিধর্মী। মুসলমানের চিরশত্রু রাজপুত। বাহাদুর শাহ সে সব সম্যক বুঝে আক্রমণ করেছিলেন। চিতোর রাণী কর্ণবতী সহজে পরাজয় বরণ করবে তা তিনি জানতেন। শুধু জানতেন না বাদশাহ হুমায়ুন তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন।

মহান উদার বাদশাহ্ আলমগীর

প্রথম ঘটনা

একবার মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট বাহিনী সমর-সজ্জায় প্রস্তুত। পুরোভাগে স্বয়ং বাদশাহ্ আলমগীর। 'বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহিম' বলে রেকাবে এক পা দিয়েছেন। আর এক পা তখনো মাটিতে রাখা।

এমন সময় সেখানে দাঁড়ালো এক দীন-হীনজন। জরাজীর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। গায়ে পায়ে ধূলি ধূসরিত। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কাঁদছে।

হুকুমদার হায়দী হাঁক ছাড়ে, হঠ যাও। হুঁশিয়ার! বাদশাহ্ নামদার রওনা হবেন। যে যেখানে আছে-সরে দাঁড়াও।

ভীষণ ভয় পেয়েছে আগন্তুক। পালাতে পারলেই যেনো বাঁচে। পালাবার পথ খুঁজছে।

বাদশাহ্ আলমগীর তাকে দেখে ঘোড়া থেকে পা নামালেন। আগন্তুককে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন তার কি প্রয়োজন। কি জন্যে এসেছে সে।

আগন্তুকের আড়ষ্টতা তখনো কাটেনি। এতোক্ষণ ভয়ে প্রায় কাঠ হয়ে যাবার মতোন অবস্থা। বাদশাহর কথা শুনে ধড়ে প্রাণ এলো বুঝি।

বাদশাহ্ ওর কাছে এসে দাঁড়ান। মুখোমুখি হয়ে বললেন-যা বলার নির্ভয়ে বলো। আল্লাহর কসম আলমগীর সুবিচার করবে।

ব্রাহ্মণ আভূমি নত হয়ে জানালো তার নালিশ। তার ফরিয়াদ। সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে সে এসেছে, বহুদূর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। হাজার কষ্ট হোক তবু তাকে আসতে হলো। দাক্ষিণাত্যের রাজকর্মচারী তার একমাত্র কন্যাকে অপহরণ করেছে। কারণ রাজকর্মচারীর বিপুল প্রতাপ। সবার মুখ তিনি বন্ধ করে রেখেছেন।

বাদশাহ্ আলমগীর আর বিলম্ব করলেন না। ব্রাহ্মণকে সংগে নিয়ে চললেন। সদলবলে সিপাই-শাস্ত্রী, লোক-লস্কর ছুটে চললো।

দাক্ষিণাত্যে পৌছে বাদশাহ হুকুম করলেন আসামীকে এক্ষুণি পাকড়াও করে আনতে। কারো কোনো সুপারিশ তিনি শুনতে রাজি নন। বিচার না করা পর্যন্ত তিনি পানি স্পর্শ করবেন না। বাদশাহর প্রতিনিধির বিচার বাদশাহ নিজে করবেন।

বাদশাহ্ আলমগীর স্বয়ং এসে উঠেছেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। সেখানেই তাঁর বিচারালয় বসেছে। বাদশাহ্ আলমগীর নিজে বিচার করছেন। তাঁর সৈন্য-সামন্তরা ধরে এনেছে রাজকর্মচারী শরাফ খানকে। সেনাবাহিনী উদ্ধার করতে পেরেছে ব্রাহ্মণ কন্যা রাজিনীকে। কুমারী রাজিনী এখন রাহুমুক্ত।

রাজকর্মচারী শরাফ খানকে বাদশাহ্ নিজে বেত্রাঘাত করছেন। জনগণ চোখের সামনে দেখছে। তারা স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছে সব। বাদশাহ্ বলছে-তুমি মুসলমান নও, মোনাফেক। তোমাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

পরক্ষণেই বাদশাহ্ আলমগীর ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলেন-বলো বোন, তুমি কি বিচার চাও। ওই পাষণ্ডটার হয়ে তোমার কাছে আমি মাফ চাই। আজ তুমি আমার বোন। তোমার যা অভিযোগ অসংকোচে বলতে পারো। আমি তোমার মান রাখবো।

রাজিনী আর স্থির থাকতে পারলো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে লুটিয়ে পড়েছে বাদশার পায়ে বাদশাহ্ নামদার স্বয়ং এসে তাকে মুক্ত করেছে। এ যে কল্পনার অতীত।

—০৪

বাদশাহ আলমগীর সস্নেহে তাকে বললেন-যাও বোন, তুমি নির্ভয়ে থাক। তোমার কোন ভয় নেই। এই নাও আমার পাঞ্জা নিশান। যখন প্রয়োজন হবে আসবে। কেউ তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এই এলাকায় আমি তোমাকে বরগাদারী দিয়ে গেলাম। ভাইয়ের এই সামান্য দানটুকু মাথায় পেতে নাও।

বিদায় বেলায় রাজিনী দাবী জানালো-বোনের বাড়িতে এই বেলাটা থাকতে হবে। খালি মুখে ফিরিয়ে দেবো না। পরম প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণ মিনতি করলো-বাদশাহ নামদার দুদণ্ড অপেক্ষা করুন। আপনার আহারের আয়োজন করছি।

সে দৃশ্য দেখে তখন চারপাশ থেকে আনন্দের সোরগোল উঠেছে। জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। সত্যিই তুমি মহান উদার বাদশাহ আলমগীর।

দ্বিতীয় ঘটনা

আর একবার বিজাপুর অভিযানে চলেছেন আলমগীর। সারি সারি সৈন্য-সামন্ত দাঁড়িয়ে আছে। পুরাভাগে বাদশাহ। সে যুদ্ধে তিন স্বয়ং সিপাহসালার। তাঁর হুকুম হলেই সেনাবাহিনী এগিয়ে যাবে।এক পায়ে সব খাড়া।

বিজাপুরে আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। ওদিকে মারাঠা দস্যু শিবাজী আবার সন্ধির শর্ত ভংগ করেছে। জাঠ শিখরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। জয়সিংহ আর যশোবন্ত সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার খবর এসেছে। গোপনে গোপনে তারা বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছে।

বাদশাহ নিজেই সেজন্যে যাচ্ছেন। সরেজমিনে সব তদন্ত করবেন। স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। বিজাপুরের বিদ্রোহ দমন করার পর যাবেন আরো দূর দাক্ষিণাত্যে। এই শেষবারের মতো মারাঠা দস্যু শিবাজীর বিষ-দাঁত ভেংগে দেবেন।

বারবার শিবাজীর বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও তাকে মাফ করে দিয়েছেন। শিবাজী বার বার শপথ করেছে আবার শপথ ভেংগেছে।

বাদশাহ সেই কারণে বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে চলেছেন। অভিযানের আগে সেনাবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছেন। প্রতিটি অভিযানের সময়ই তিনি সেনাবাহিনীকে সঠিক নির্দেশ দিয়ে দেন। আল্লাহর কসম থাকে তারা যেনো কোনো অন্যায় কাজ না করে। যত্রতত্র অত্যাচার থেকে তারা যেনো বিরত থাকে। বিশেষ করে শিশু আর নারীর কোনো ক্ষতি যেনো না হয়।

নকীবের মুখে শেষ মুহূর্তে বাদশাহ জানতে চাইলেন কোন খবরাখবর আছে কি না। কারো কোনো প্রয়োজন। কিংবা কারো কোনো ফরিয়াদ।

বাদশাহ আলমগীরের বরাবরের অভ্যাস যাবার বেলায় সব জেনে যান। তাঁর হুকুম তামিল করে নকীব। যে কোন ব্যাপার তাকে বিদায় মুহূর্তে জানায়।

বাদশাহ শুনলেন বারানসী থেকে এক ব্রাহ্মণ এসেছে। নকীব তাকে সংগে নিয়ে এসেছে। বাদশাহ নামদারকে সে কিছু বলতে চায়।

বাদশাহ বললেন–যা বলার নির্ভয়ে বলো। কোনো ভয়ের কারণ নেই।

ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কিছু কিছু শুনে বাদশাহ বেশ বুঝতে পারলেন বেচারীরা বিব্রত। বড্ডা বিপাকে পড়েছে। তা না হলে অতোদূর পথ পাড়ি দিয়ে আসতো না।

বিজাপুর বিজয় আর হলো না। দাক্ষিণাত্য অভিযানও স্থগিত থাকলো। বাদশাহ মোড় ঘুরালেন বারানসীর দিকে। সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন বারানসী অভিযানের। সংগে নিয়ে চললেন বাদী ব্রাহ্মণকে। তাকে আশ্বাস দিলেন সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকতে। সব ব্যবস্থা তিনি করবেন।

বারানসীর দ্বারপ্রান্তে পা দিয়ে বাদশাহ তলব করলেন সেখাকার শাসনকর্তাকে। মীর্জা হাসান-হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলো।

বাদশাহ ফরমান দিলেন বরানসীর মন্দিরগুলো মেরামত করার। কোনো মন্দিরের কোনো রূপ ক্ষতি সাধিত হলে তা যেনো সংগে সংগে ঠিক করে দেয়া হয়। বাদশাহ স্বচক্ষে সব দেখবেন। যতোদিন পর্যন্ত মন্দির মেরামত না হয় বাদশাহ ততোদিন সেখানেই অবস্থান করবেন। বারাণসীর প্রবেশ-পথ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না।

মীর্জা আবুল হাসন করজোড়ে জানালো, কোনো মন্দিরেরই কোনো ক্ষতি হয়নি। সবগুলো অক্ষত অবস্থায় বিরাজ করছে। কেবল পূজার পূর্বে সেগুলোর নামমাত্র সংস্কারের দরকার। যথারীতি ঠিক সময়েই সে ব্যবস্থা করা হয়। সেই মোতাবেক কাজ করবেন।

বাদশাহ তার কোনো কথাই শুনলেন না। বললেন ঃ এক সপ্তাহ সময় দেয়া গেলো। এর মধ্যে যদি সব ঠিকঠাক না হয় তাহলে গর্দান থাকবে না।

মীর্জা হাসান হতভম্ব। তার কোনো কথাই বাদশাহ মানতে রাজি নন। সে বিব্রতবোধ করছে।

বেচারী ব্রাহ্মণও এতোবড়ো অভিযোগ করেনি। বাদশাহ অল্পেই অনেক বেশি অনুমান করে নিয়েছেন। তাঁর ধারণা হয়তো বা মন্দির ভেংগে-চুরে ফেলেছে। মন্দিরগুলোর সর্বনাশ হয়েছে।

অবশেষে ব্রাহ্মণ সবিনয়ে জানালো তার আরজ। বাদশাহকে বললো ঃ মন্দিরের ক্ষতি সাধনের কথা সে বলেনি। মন্দিরের পুরোহিত বদলানোর ব্যাপারে সে আবেদন জানিয়েছে। মন্দিরসমূহের প্রধান পুরোহিত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছে। পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করার মতো কোনো গুণ তার নেই।

বাদশাহ শুনে মন্তব্য করলেন ঃ সে দোষও আমার সুবাদারের। এই কর্তব্য তার অনেক আগেই সমাধা করা উচিত ছিলো। সে পারেনি। সুতরাং তার সমুচিত সাজা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাদশাহর আগমনবার্তা পেয়ে তখন দলে দলে লোক আসছে। বারাণসীর উপকণ্ঠ লোকে লোকারণ্য। বাদশাহ তাদের মুখেও সেই একই কথা শুনলেন। হিন্দুরা দল বেঁধে বাদশাহর কাছে পুরোহিতের বিরুদ্ধে নালিশ করলো।

বাদশাহ্ তলব করলেন পুরোহিতকে। তার বক্তব্য শুনলেন। বুঝতে পারলেন সে নির্দোষ নয়।

বাদশাহ তাকে বললেন ঃ বেশ তোমাকে সপ্তাহখানেক সময় দিলাম। এর মধ্যে তোমার সৎ গুণাবলীর প্রমাণ দাও। যদি তাতে ব্যর্থ হও তাহলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।

সমবেত হিন্দু জনতা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলো-বাদশাহ আলমগীর জিন্দাবাদ। বাদশাহ্-নামদার জিন্দাবাদ।

সবশেষে বাদশাহ সেই ব্রাহ্মণকে আবার কাছে ডাকলেন। তাকে কানে কানে বললেন কি করতে হবে। ব্রাহ্মণ আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো।

সেই মুহূর্তেই পুরোহিত-প্রধান ভেবে-চিন্তে তার প্রার্থনা জানালো। বাদশাহর দরবারে তার আকুল আবেদন আজ থেকেই সে পুরোহিতের পদ ত্যাগ করছে। যথার্থই এ কাজের সে অনুপযুক্ত। বাদশাহ্ নামদার যেনো তার অন্য ব্যবস্থা করেন। রুজি-রোজগার তার যেনো বন্ধ না হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য কোনো অবলম্বন তার নেই।

বাদশাহ জানতে চাইলেন-সে কোন কাজ করতে পারবে নিজ মুখেই বলুক-বাদশাহ তাতেই রাজী।

পুরোহিত জানালো তার পক্ষে সুবিধা হয় রাজকর্মচারীর কাজ। এক সময় সে জয়সিংহের সেনাদলে ছিলো। পরে অনন্যোপায় হয়ে পালিয়ে এসেছে। কোনো কিছু না পেয়ে বাধ্য হয়ে পুরোহিতগিরি করছে। এ তার পেশা নয়।

পুরোহিত আরো বললো ঃ বাদশাহ্ আলমগীরের মাহনুভবতার পরিচয় পেয়েই সে অকপটে সব স্বীকার করছে। বাদশাহর সম্পর্কে আগে যা সে শুনেছে সব মিথ্যা। সব ফাঁকি। সে নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাচ্ছে বাদশাহ্ কতো মহান! কতো উদার!

বাদশাহ্ আলমগীর তৎক্ষণাৎ তার হাতে তুলে দিলেন নিজের তর্‌বারি। বললেন ঃ এই নাও তোমার পুরস্কার। হুকুম জানালেন তাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে তে। এই অভিযানে সে হবে অন্যতম অগ্রনায়ক।

সে সংবাদ শুনে ব্রাহ্মণ দলবলসহ আবার আরজ জানালো ঃ হুজুর কি সর্বনাশ করছেন। ও লোকটা নেমক হারাম। বেঈমান। সব জেনে-শুনে আপনি ওকে এহেন পদমর্যাদা দেবেন না।

সেদিন সমবেত হিন্দু জনতার সামনে বাদশাহ্ আলমগীর বিদায়ী ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ আমি আজ আছি কাল নেই। কিন্তু আমি ওয়াদা করছি, এখানে মানুষ থাকবে। এখানে মন্দিরও থাকবে। হিন্দুরা আমার প্রজা আমার কারণে তারা যদি বিপাকে পড়ে সে দোষ আমার। তারা যদি পথভ্রষ্ট হয় তার জন্যেও আমি দায়ী। বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের

প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামের নীতি। আল্লাহর বিধান। তার বরখেলাফ আমি করবো না। ("ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের ভুল ধারণা," পৃষ্ঠা ১০৪-১১১)।

ইসলামের ধর্মীয় শিক্ষা ও মুসলমানদের জীবনের বাস্তব উদাহরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ মামুন আরিফ আল মান্নান চমৎকার ভাবে কিছু বাস্তব উদাহরণ প্রদান করেছেন তাই বিস্তারিত উদ্ধৃতি দেওয়া হল। একজন ভালো মুসলমানের নিকট অমুসলমানরা নিরাপদ। শুধু পাপীমুসলমান, যাদেরকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মুসলমানই বলা যায় না তারাই বিধর্মীদের মত বর্বর আচরণ করতে পারে। আর এই ধরণের কতিপয় বর্বর মুসলমানের হতে নিরীহ মুসলমানরাও জুলুমের শিকার হয়। এসব আমরা কোন কোন মুসলিমদেশে কমবেশী প্রত্যক্ষ করেছি।

ভারতে সংখ্যালঘু দলন

ভারতে সংখ্যালঘুদের ভিতর শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মুসলমান। তাতে প্রায় ১৮ কোটির মত মুসলমান হয়। পূর্ব ভারতে কতিপয় রাজ্যে খৃষ্টানরা সংখ্যাগুরু। তাই সেখানে তারা কিছুটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলমানরা সর্বত্র সংখ্যালগুই একমাত্র ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরছাড়া। কিন্তু কাশ্মীরের সেই অংশটুকুতেও আট লক্ষ সেনা ও অন্যান্য বাহিনী মুসলমানদের জীবনকে করেছে দুর্বিসহ। এমন দিন নেই যেদিন কোন কোন মুসলমান শাহাদাত বরণ করছেনা, নারী নির্যাতন হচ্ছে না।

গুজরাটের বর্বরতা

২০০২ সালে গুজরাটে যে বর্বরতা হয়ে গেল তা লোমহর্ষক ও মর্মস্পর্শী। কিছু মানুষ যে কত নীচুতে নামতে পারে তারই পমাণ এতে রয়েছে। এই গণহত্যা ও গণধর্ষণ যারা করেছে তারা মানবতাকেই হত্যা ও ধর্ষণ করেছে।

ভারতের এই কলুষিত পরিবেশে দু'একজন ভালো মানুষও রয়েছেন যাদের হক কথায় ভারতের এই বর্বরতম ঘটনাবলীর ক্ষত উন্মোচিত হয়েছে। আমরা আমাদের এই বইয়ে সেই সব বিবেকবান ব্যক্তি ও কিছু পত্র-পত্রিকা, সংস্থার মূল্যবান বক্তব্য সংকলন করেছি। তাদের বক্তব্যটাই তুলে ধরনে এটা জোরালো হবে বলে সেই ভাবে তা প্রকাশ করা হোল। আমরা তাদের ভাষাকে পরিবর্তিত করে পরোক্ষ উক্তিতে যাই নাই। রেকর্ড হিসাবেও এ ভাবে তাদের মন্তব্য, বক্তব্য, সাক্ষ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে সাধারণ পাঠক, গবেষক ও কলামিষ্টদের নিকট।

হর্ষ মানদার– ভারতের একজন আইএএস (ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস– ভারতের প্রশাসনিক চাকুরি) কর্মকর্তা। তাঁকে বিবেকবান বলতে হবে। তিনি গুজরাটে এই জঘন্যতম গণহত্যা ও গণধর্ষণ প্রত্যক্ষ করে ক্ষোভে দুঃখে লিখেছেন কতিপয়

মর্মস্পর্শী নিবন্ধ। মহাকবি ইকবাল যে হিন্দুস্তানকে সমগ্র জাহানে শ্রেষ্ঠ বলেছিলেন তা আর নেই, বলেছেন হর্ষ মানদার। তাঁর নিবন্ধের নাম "সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান ... আব নহী রাহা।" তিনি লেখেন,

"যদি আপনি একবার অল্পসময়ের জন্য কোন একটা (আশ্রয়) শিবিরে বসেন, তাহলে তারা (দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থরা) আপনার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করবে, সেগুলো এমনই ভীতিপ্রদ ও বেদনাদায়ক যে আমার কলম লিখতেও কেঁপে ওঠে। যে নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ সেইসব মহিলা ও শিশুদের প্রতি ঐসব সশস্ত্র যুবকের দল করেছে, পূর্বের কোন দাঙ্গায় নাকি তা দেখা যায়নি। দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা নারোদা পাত্তিয়া থেকে পালিয়ে আসা পরিবারের এক মহিলা নিজের তিনমাসের বাচ্চা হারানোর কথা বলতে গিয়ে বলেন- তিনি এক পুলিস কনষ্টেবলের কাছে পালানোর রাস্তা জানতে চান, কিন্তু সে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। যার ফলে আমি এক ভিড়ে আটকা পড়ে যাই। যারা তার উপর এবং তার বাচ্চার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।"

তিনি লিখেন, "এবার নারীদের ওপর যে ভাবে অত্যাচার, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমন আগে কখনও দেখা যায় নি, যেন গুজরাতে সন্ত্রাস ও বর্বরতার জন্য এটাও একটা অস্ত্র ছিল। প্রায় প্রত্যেক স্থান থেকে মহিলা ও যুবতীদের গণধর্ষণের খবর আসতে থাকে, এমনকি তাদের পরিবারের লোকজনের সামনে তাদেরকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হতে থাকে।"

তিনি দুঃখ করে বলেন যে পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে মহাকবি ইকবালের সেই বিখ্যাত গীত আর গাওয়ার যোগ্য হবেনা ভারতীয়রা। তিনি লেখেন, "তারমধ্যে একটা হল সেই গীত, যেটা আমরা খুবই গর্বভরে গেয়ে থাকি, সেই গীতের ভাষা- 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা'। এই গীতকে আমরা পুনরায় গাইবার যোগ্য থাকবনা।"

হিন্দুস্তান কি আর আসলেই "সারা জাহাঁ সে আচ্ছা" রয়েছে? আসলে হিন্দুস্তানের কেউ কেউ এখন ইহুদী-ইসরাইলের জঘন্য সব নীতি নিজেরাই পালন করে বর্বরতার চূড়ান্ত করছে। মানবতাই আজ আসামীর কাঠগড়াতে এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ডের জন্য।

ভারতে এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ড হলেও আর নিষ্ঠুর ভারতীয়রা ও তাদের এদেশীয় এজেন্টরা তা আড়াল করতে বাংলাদেশে কল্পিত সংখ্যালঘু দলনের ভূয়া দলিল প্রণয়ন করে দেশে বিদেশে বিতরণ করছে। আমরা বলব আমরা এই বইয়ে কিছু হৃদয়বান ভারতীয়ের যে সব দলিল উত্থাপন করেছি, তা পাঠ করুণ ও নিরপেক্ষ ভাবে তা দেখুন। কথায় বলে "ধর্মের কল বাতাসে নড়ে"। সত্যকে চাপিয়ে রাখা যাবে না। কুরআন বলে, "বলো, 'সত্য এসেছে আর মিথ্যা অন্তর্ধান করেছে। মিথ্যাকে অন্তর্ধান করতেই হবে।' (১৭ সূরা বনি- ইসরাইল : ৮১ আয়াত)।

সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্তান ... আব নহী রাহা

হর্ষ মানদার

যদি আপনি আহমাদাবাদের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণশিবিরগুলোতে যান, প্রায় ৫৩ হাজার মহিলা, পুরুষ ও শিশুরা ২৯টি অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে, (দাঙ্গার প্রথম দিকের বর্ণনা) তাহলে আপনার চোখে অশ্রু স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হবে। রিলিফের মালপত্রের বাণ্ডিলগুলো লোকেরা এমনভাবে আঁকড়ে ধরছে, যেন এই দুনীয়ায় এটাই একমাত্র তাদের জন্য। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের দৈনন্দিন কাজে ফিরে আসার চেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু যদি আপনি একবার অল্পসময়ের জন্য কোন একটা শিবিরে বসেন, তাহলে তারা আপনার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করবে, সেগুলো এমনই ভীতিপ্রদ ও বেদনাদায়ক যে আমার কলম লিখতেও কেঁপে ওঠে। নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতাপূর্ণ আচরণ সেইসব মহিলা ও শিশুদের প্রতি ঐসব সশস্ত্র যুবকের দল করেছে, পূর্বের কোন দাঙ্গায় নাকি তা দেখা যায় নি।

এক পরিবারের ১৯ জন সদস্য সম্পর্কে আপনি কি মন্তব্য করবেন, যাদের বাসগৃহে পানিভরে দেওয়া হয় এবং তাতে অতি শক্তিশারী বিদ্যুৎ সংযোগ করা হয়। জুহাপাড়ার ক্যাম্পে একটা ছয় বছরের শিশু নিজের মা ও ছয়জন ভাই বোনের নির্মমভাবে নিহত হওয়ার ঘটনা নিজচোখে প্রত্যক্ষ করেছে, একমাত্র সেই বেঁচে গিয়েছে, কেননা সে বেহুশ হয়ে পড়েছিল, লোকেরা তাকে মৃত মনে করে ছেড়ে চলে যায়।

দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা নারোদা পাতিয়া থেকে পারিয়ে আসা পরিবারের এক মহিলা নিজের তিনমাসের বাচ্চা হারানোর কথা বলতে গিয়ে বলেন– তিনি এক পুলিস কনস্টেবলের কাছে পালানোর রাস্তা জানতে চান, কিন্তু সে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়। 'যার ফলে আমি এক ভিড়ে আটকা পড়ে যাই।' যারা তার উপর এবং তার বাচ্চার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এবার নারীদের ওপর যেভাবে অত্যাচার, হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে, তেমন আগে কখনও দেখা যায় নি, যেন গুজরাতে সন্ত্রাস ও বর্বরতার জন্য এটাও একটা অস্ত্র ছিল। প্রায় প্রত্যেক স্থান থেকে মহিলা ও যুবতীদের গণধর্ষণের খবর আসতে থাকে, এমনকি তাদের পরিবারের লোকজনের সামনে তাদেরকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হতে থাকে।

আহমাদাবাদে যত লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, যেমন সমাজসেবী, সাংবাদিক, অনুন্নত সম্প্রদায়, তারা সকলেই একমত যে, গুজরাতে সংঘটিত, এটা দাঙ্গা নয়, বরং একেবারে পরিকল্পনা মাফিক সন্ত্রাসবাদীদের সংগঠিত আক্রমণ, ব্যাপক গণহত্যা চালানোর

উদ্দেশ্যে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এক ট্রাকভর্তি লোক উত্তেজনমূলক স্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছিল তার পিছনে আরও এক ট্রাকভর্তি লোক যাচ্ছিল যাদের কাছে বিস্ফোরক পদার্থ, দেশীয় অস্ত্র, ঢাল এবং ত্রিশুল ছিল। তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করে দাঙ্গা বাধানোর নির্দেশ চাইতে দেখা যাচ্ছিল। একবিশেষ কেন্দ্র থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল, সেখান থেকেই সংখ্যালগুদের বাসগৃহ, বাণিজ্যকেন্দ্র, প্রভৃতির অবস্থানও বলে দেওয়া হচ্ছিল। এই ট্রাকগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক গ্যাস সিলিণ্ডারও ছিল। ধনী মুসলিমদের গৃহ, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রথমে লুট করা হয়, তারপর রান্নার গ্যাসের মুখ কিছুক্ষণের জন্য তাদের ঘরের দিকে খুলে রাখা হয়,অতপর তাদের মধ্যে দক্ষ ব্যক্তি সেখানে অগ্নি সংযোগ করে। দেখতে দেখতে বাসগৃহ, মসজিদ ও দরগাহসমূহ ভস্মে পরিণত হয়, অবশেষে সেখানে হনুমান ও গেরুয়া ঝাণ্ডা উড়তে থাকে।

মানসিকভাবে অনুভূতিহীন এবং কর্তব্যপালনে গাফিলতিপরায়ণ রাজ্য পুলিস ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে এখন ভালভাবে স্বীকার করতে হবে যে, বিভিন্ন বিভাগের সাথে যুক্ত সিভিল ও পুলিস প্রশাসনের কার্যকলাপ (যারা নিজ কর্তব্যপালনে গাফিলতি দেখিয়েছে, অথচ আইন তাদেরকে নিজ কর্তব্য নিরপেক্ষভাবে নির্ভিক ও সাহসিকতা, ধৈর্য্য ও শান্তি সহকারে পালন করতে বলে) নিরপেক্ষ ছিল না। যে কোন এক্জন সরকারী অফিসার (পুরুষ অথবা মহিলা) সেনাবাহিনীর সাহায্যে দাঙ্গাকে প্রতিরোধ করতে পারত।

আমি শুনেছি যে, উচ্চপর্যায়ের অফিসারদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হচ্ছে, যারা পুলিসকে হিংসায় সামিল হওয়া থেকে বিরত রাখে নি, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঔদাসীন্যের পরিচয়। যদি এই অফিসারগণ তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতেন, তাহলে তারা নিশ্চয় নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করত। বর্বরতা অবিচার ও মানুষের বিপদের সময় সভ্যসমাজ, গান্ধীবাদী আন্দোলনকারীরা, উন্নয়নমুখী সংস্থাসমূহ, এন.জি.ও-র কর্তাব্যক্তিরা এবং গুজরাতীদের মানববন্ধু অভিদায় ভূষিত প্রতিষ্ঠানসমূহ একেবারেই অদৃশ্য ছিল। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে ঠিক দাঙ্গার সময় সবরমতী আশ্রমবাসীরা নিজেদের ধন সম্পদ ক্ষতির আশঙ্কায় আশ্রমের দরজা বন্ধ করে দেয়।

আহমদাবাদের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মুসলিমদের যদি কোন ভরসার কথা বলা হয়, তাহলে সেগুলো হলো মুসলিম সংগঠনসমূহ। এ যেন মুসলিমদের মানসিক কষ্ট, তাদের ক্ষয়ক্ষতি, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিচারের জন্য অন্য মুসলমানকেই ভুগতে হল। তবুও এই সফরে, গর্বের বিষয় ও আশার আলো আমি গুজরাতেই দেখেছি, যেখানে মজিদ আহমদের মত পুরুষ এবং রওশন বহিনের মত মহিলকে দেখেছি, যারা অক্লান্তভাবে সেইসব ত্রাণশিবিরের জন্য নিজেদেরকে ওয়াকফ্ করে দিয়েছেন। যারা সর্বদাই তাদের আশেপাশে রয়েছেন।

আমনচক ক্যাম্পের মহিলারা সেইসব যুবক স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য দু'আ করতে ক্লান্ত হয় না। যারা ভোর চারটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত এই বিষয়ে আশ্বস্ত করতে থাকেন যে,

তাদের শিশুরা বিনা খাদ্য ও বিনা দুগ্ধে থাকবে না, এবং তারাও তাদের সুবন্দোবস্ত না করে এখান থেকে সরবে না। তাদের নেতা মজিদ আহমদ একজন গ্রাজুয়েট। তার রং প্রস্তুতির কারখানা জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার কাছে তার নিজের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ভাবনার অবসর নেই। প্রতিদিন তাকে ১৬০০ কিলোগ্রাম সব্জি সংগ্রহ করতে হয়, ক্যাম্পে আশ্রয়প্রার্থী ৫০০০ বক্তির খাদ্যের জন্য। রওশন বহিনেরও অশ্রু বা ক্রোধের অবকাশ নেই। তিনি খুবই অল্পসময় ঘুমান, অথচ তার স্বেচ্ছাসেবীরা অধিকাংশ শ্রমিক শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলা, তারাই শিবির সামলে রেখেছেন। তিনি তাদের জন্য অস্থায়ী গোসলখানা করেছেন, খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী ছাড়াও শত শত ব্যক্তিকে তারা সান্ত্বনা দিচ্ছেন, যারা এক প্রাইমারী স্কুলের মাঠে সমবেত হয়। যখন আমি সেই সব শিবিরের কাছ দিয়ে যাই, তখন খুবই অবাক হয়ে ভাবি যে, এরকম দুর্দিনে গান্ধীজী কি বলেছিলেন? আমি কলকাতার দাঙ্গার (১৯৪৭) কথা মনে করতে লাগলাম, যখন গান্ধীজী শান্তির জন্য 'ব্রত' রেখেছিলেন। একজন হিন্দু তার কাছে এইকথা বলার জন্য এল যে, মুসলিম দাঙ্গাবাজরা তার যুবক ছেলেকে হত্যা করে দিয়েছে, সে তার ক্রোধ ও আক্রোশ প্রকাশ করল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। বলা হয়ে থাকে যে, গান্ধীজী তার উত্তর দিয়েছিলেন এইভাবে যে, যদি সত্য সত্যই তুমি নিজ বেদনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাও, তাহলে ঠিক তোমার পুত্রের মত একটা মুসলমান যুবক অনুসন্ধান কর, যার পিতা-মাতাকে হিন্দু দাঙ্গাবাজরা হত্যা করেছে। তাকে নিজের ঘরে আন এবং ঠিক নিজের পুত্রের মত তাকে মুসলিম আকীদা অনুযায়ী মানুষ কর যেমনভাবে সে জন্মসূত্রে হয়েছে, তাহলে তুমি নিজের দুঃখ, নিজের ক্রোধ ও প্রতিশোধস্পৃহাকে ভুলতে পারবে।

আজ গান্ধীজীর মত কোন আওয়াজ নেই, আমাদেরকে আন্তরিকভাবে এইরূপ আওয়াজ অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের 'ন্যায় বিচার', প্রেম ও সহ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাহলে গুজরাতে হত্যাকারীরা আমাদের কাছ থেকে যা যা ছিনিয়ে নিয়েছে, এগুলো তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিদান আমাদেরকে দেবে। তার মধ্যে একটা হল সেই গীত, যেটা আমরা খুবই গর্বভরে গেয়ে থাকি, সেই গীতের ভাষা– "সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা'। এই গীতকে আমরা পুনরায় গাইবার যোগ্য থাকব না।

এই নিবন্ধের লেখক একজন আইএএস অফিসার যিনি অ্যাকশন অ্যান্ড ইন্ডিয়ায় কর্মরত।

ভাষান্তর ঃ ফায়জুল বাশার

আমেদাবাদে এক দাঙ্গা-পর্যটকের স্মারক সংগ্রহ

রামকমল ঝা

প্রাককথা : আমি অত্যন্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একথা বলছি যে আমি প্রধানমন্ত্রীর (রাজতরী) বাক্য এতটুকু বিকৃত করব না, কখনো না কক্ষনো না কক্ষনো না। কারণ,

তিনি যখন প্রথম লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, যখন তিনি এভারেস্টের চূড়োয় উঠেছিলেন, যখন তিনি চাঁদে পা রেখেছিলেন, তখন আমার অস্তিত্বই ছিল না, এমনকি আমার বাবার ঔরসে শুক্রকীট হিসাবেও নয়।

সেই জন্যই হে প্রধানমন্ত্রী আপনার 'রাজনৈতিক জীবনের ৫০ বছর' বইটি যদি এর পরের বার আমার দিকে মেলে ধরেন, আমি এর প্রত্যেকটা পাতার প্রতিটি লাইনকে প্রতিটি শব্দকে এমনকি প্রত্যেকটা অক্ষরকেও চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেব যতক্ষণ না আমার ঠোঁট ব্যথা হয়ে যায়।

আমি একজন ধর্মনিরপেক্ষ (এই পাতাটা লক্ষ্য করুন এই শব্দটায় একটা পুড়ে যাওয়া ফুটো আছে) গোধরার ঘটনায় দুঃখ না পাওয়া এক পাষাণ হৃদয়। কাজেই আমি গত সপ্তাহে যখন আমেদাবাদ গেলাম, আমি সেখান থেকে স্মারক হিসাবে একটা আগুনে পোড়া দেহ কিংবা এক ফালি জরায়ু নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম।

আমি নরেন্দ্র মোদির পকেট মারতে চেয়েছিলাম তার রুমালটা নেবার জন্য। আর রুমালের গন্ধটাও। সেই তপ্ত অন্ধকারে তার হিন্দু ঘাম আর মুসলিমদের চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল সেই রুমালে। আমার ইচ্ছা ছিল শাহ্ আলম ত্রাণ শিবিরের একটা ভ্রাম্যমান পায়খানা তুলে নিয়ে এসে দেশের প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাড়ির সমান দূরত্বে রেসকোর্স রোডে বসিয়ে দেওয়ার। আর ইচ্ছে ছিল ৮৪,০০০ ভীতসন্ত্রস্ত শিশু, মহিলা এবং পুরুষকে সেখানে মল ত্যাগ করতে বলার।

বিশ্বাস করুন, এগুলি এমন কিছু একটা ভয়ঙ্কর নয়, যতটা শুনে মনে হচ্ছে। অনুভূতি হারালে সব কিছুই সহনীয় হয়ে যায়, সে হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক।

কিন্তু আমার গুজরাট সফর উদ্দেশ্যহীন হয়ে গেল। পোড়া দেহগুলি কবর দেওয়া হয়ে গিয়েছে আর জরায়ুটা ক্ষুদে দুটি পা, ছোট্ট মুখাবয়বে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর তারপর 'সহমত' সংস্থার নারী সমাজ কর্মীদের সঙ্গে পায়ে পায়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌছে গিয়েছে।

আর সেখান থেকে সম্ভবত জর্জের বাড়িতে তাকে বলতে গিয়েছে যে, এটা ১৯৮৪-র দাঙ্গার মত তেমন আলাদা কিছু নয়। ত্রাণশিবিরে আমি মানুষের লম্বা লাইন দেখেছি শৌচাগারের বাইরে। আর যেহেতু আমি সংখ্যালঘুদের প্রশ্রয় দিই, তাই আমি 'সবিশেষ সুবিধা' দিয়ে তাদরে ওখান থেকে সরে আসি। আমি শৌচাগারটা আর তুলে আনিনি।

আমার আগের পরিকল্পনা ছেড়ে আমি শহরের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা সফর শুরু করলাম এবং কয়েকটি অতি নগণ্য স্মারক জোগাড় করলাম– কয়েকটি বই। বইতো অত সহজে পোড়ে না। এগুলি সব হাইস্কুলের পাঠ্য বই। বইয়ের পাতাগুলি এতই ঠাসাঠাসি থাকে যে সেখানে হাওয়ার সাহায্যে আগুন পৌছে পোড়াতে পারে না। মানুষের শরীরের মত তারা সহজ দাহ্য নয়। সেগুলিতে দেখানোর ও বলার মতো কিছু জিনিস আছে।

এ চাইল্ড'স ইংলিশ ওয়ার্ক বুক লার্নিং টু কমিউনিকেট– এস কে রাম ও জে এ ম্যাসন (অক্সফোর্ড ইউনির্ভাসিটি প্রেস, ১২৪ পৃ.) এই বইটা গুলবার্গ সোসাইটির একটা জনহীন বাড়ির বারান্দায় (এখানে ৩৮ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে এবং ১২ জনের খোঁজ নেই) প্রায় ৬০ দিন ধরে পড়েছিল। প্রথমে এতে আগুন লাগে, তারপর ৪৫ ডিগ্রির ঝাঁঝালো রোদ। বইটির বাঁ দিকের কোণে লেগে থাকা স্যাঁতস্যাতে দাগ প্রত্যেকটি পাতায় ছড়িয়ে গিয়েছে। এখানে দমকলের লোকেরা এসেছিল লাশগুলি ধোয়ার জন্য। এটা নিশ্চয়ই তাদের হোস পাইপের জল থেকে এসেছে।

বইটাতে শিশুর হাতের লেখা থেকে আমি উদ্ধার করতে পারিনি সে ছেলে না কি মেয়ে। তাতে কোন নাম লেখা ছিল না, শুধু মাত্র ভিতরের পাতায় একটা ফোন নম্বর ছিল, সেটাও সেই শিশুর হাতেরই। আমি সেই নম্বরে ফোন করি– 'হ্যালো'– একটা মহিলা কণ্ঠ টেলিফোনের ওপারে।

'আমি একটা স্কুলে পড়া বাচ্চাকে খুজছি'– আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি।

"এটা 'দি স্কুল পোস্ট' পত্রিকা দপ্তর"– ঐ নারী কণ্ঠ জবাব দেয়। "আমরা স্কুলে ছাত্রদের জন্য একটা মাসিক পত্র প্রকাশ করি"।

হয়ত এই বাচ্চাটা, যার বই আমার হাতে, একটা কবিতা অথবা একটা ছবি এঁকে পাঠিয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, "আপনাদের পত্রিকার কোন ক্ষুদে লেখকের হারিয়ে যাবার খবর পেয়েছেন কি?"

"এখন গরমের ছুটি চলছে, সব স্কুলই বন্ধ। দুঃখিত।" জবাব দেয় সেই মহিলা।

বাচ্চাটার লেখা শেষ হয়েছে ৮৪ পৃষ্ঠায়। এরপর আর বইটি পড়া হয়নি তার। কারণ বইয়ের লাইনের ফাঁকগুলিতে কিছু লেখা নেই। বইটির ৪৩ পৃষ্ঠায় 'ফায়ার ইন এ হোটেল' নামে একটি অধ্যায় আছে। সেটি জন ব্রাউন নামে এক অন্ধ এবং তার কুকুর চামকে নিয়ে লেখা। ওরা আগুন লাগা একটা হোটেলে আটকে পড়েছিল। ওই অধ্যায়ের যে লাইনগুলির নিচে বাচ্চাটা দাগ দিয়েছিল সেগুলি এরকম "আমি ধুঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। আম আমার ঘরের দরজায় আগুন টের পাচ্ছি। দরজাটা এত গরম হয়ে গিয়েছে যে, আমি সেটা খুলতে পারছি না। আমি একটা তোয়ালে ভিজিয়ে দরজার নিচে গুঁজে দিলাম। আমি আন্দাজে আন্দাজে জানালার কাছে চলে গেলাম, সেটাকে খুলি দিলাম। কিন্তু দেখতে পাই না বলে নিচে নামতে পারলাম না।"

কিন্তু আমি তো দেখতে পাই। আমি বাচ্চাটার জানালাটা মনে মনে দেখতে পাচ্ছি। সেখানে শুধুই জানলার মাপে গাঢ় অন্ধকার। অন্য একটা পরিচ্ছেদে বাচ্চাটা দাগ দিয়েছে, প্রতিটি বাক্যের নীচে, এমনকি ছবিও এঁকেছে কিছু। নিচের দিকে একটা কবিতা আছে 'ডাউন চাইল্ড' নামে। "আই লিভ ইন দি টাউন ইন এ স্ট্রীট, ইট ইজ ক্রাউডেড উইথ

ট্রাফিক অ্যান্ড ফিট। দি হাউজেস অল ওয়েট ইন এ রো, দেয়ার ইজ স্মোক এভরি হোয়ার আই গো। দেয়ার ইজ ওনলি ওয়ান থিং দ্যাট আই লাভ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি স্কাই ফার অ্যাবাভ। দেয়ার ইজ প্লেন্টি অফ রুম ইন দি ব্লু ফর ক্যাসলস্ অফ ক্লাউড, অ্যান্ড মি টু্য"।

যখন প্রধানমন্ত্রী গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাতে যাবেন মানালি অথবা অন্য কোথাও, তিনি হয়ত এই কবিতা তার ভাবনা অনুযায়ী নতুন করে লিখবেন। কেউই জানে না গুলবার্গ হাউসে কত শিশু মারা গিয়েছে কারণ তাদের ছোট্ট শরীরগুলি পুড়ে এতই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, সনাক্ত করাই কঠিন ছিল। এর মধ্যে একজনই প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন, আমরা জানি তিনি এহ্সান জাফরি।

একটি আই আই টি– দিল্লীর গবেষণাপত্র : শিরোনাম– 'দি ইউজ অফ ডিমিথাইল ফরমামাইড ইন দি প্রিন্টিং অফ কটন অ্যান্ড পলিয়েস্টার / কটন বেন্ড উইথ র‍্যাপিডোজেন কালার', আর ভি চ্যবন ও ডি কে সিনহা, ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল টেকনোলজি, আই আই টি দিল্লী।

শিশুটির বারান্দার সামনে মাটিতে বইটি পড়েছিল। একটা ভাঙ্গা শক্ত ধাতুর টুকরোতে গবেষণা পত্রটি সেঁটে ছিল গরম হাওয়ার কল্যাণে। এছাড়াও সেখানে পড়েছিল ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো। দেখে মনে হচ্ছিল একটা নীল রঙের শাড়ির টুকরো এবং আরো কয়েকটা বই যেমন, 'জাভা-২', 'কমপ্লিট রেফারেন্স', 'ওরাক্‌ল ভল্যুম-ওয়ান', 'ওরিয়েন্টেশন কোর্স : বেসিক রেফারেন্স মেটিরিয়াল ফর ইংলিশ ইউসেজ', 'কমপিটিশন সাকসেস রিভিউ : জি. কে, জুন ২০০০'।

কোন কারণ ছাড়াই আমি এই গবেষণা পত্রের লেখক অধ্যাপক চাবনকে ফোন করলাম।

"আমি এই পেপারটা বেশ কয়েকবছর আগে লিখেছিলাম"– চ্যবন বলেন। "বোধহয় ৯ কি ১০ বছর আগে। আমার সহ লেখক সিন্‌হা তখন এম টেক্-এর ছাত্র। এখন সে কলকাতার জুট ইন্সটিটিউট-এ পড়াচ্ছে।"

'আমি আপনার পেপারটা আমেদাবাদে একটা বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি। ওই বাড়িটাতে অনেক মানুষকে খুন করা হয়েছে।"

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর অধ্যাপক চ্যবন বলেন, 'আমি কি বলব, ছাত্রটি নিশ্চয়ই টেক্সটাইল রিসার্চ বিভাগে ছিল। ওই পেপারটা তৈরির সময় আমরা আমেদাবাদে আমাদের পরীক্ষামূলক কাজগুলি করেছিলাম। কাপড় রং করার একটা অনুকূল পরিবেশ পদ্ধতি নিয়ে ছিল গবেষণাটা।"

ক্লাস টুয়েলভ কমপোজিশন, নবনীত পাবলিকেশনস : আর একটা বই। বইটা টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া পাতার পর পাতা বরোদার বেস্ট বেকারির মেঝে এবং সিঁড়িতে ছড়ানো ছিল। (এখানে ১২ জনকে পুড়িয়ে মারা হয় তার মধ্যে ২ জনকে বেকারি চুল্লিতে)।

প্রত্যেকটি পাতার ডান দিকটা এমন ভাবে পুড়েছে যেন আগুন একটা রুল আর শিখা দিয়ে সোজা লাইন টেনে দিয়েছে। এটা একটা হিন্দী গুজরাতি ইংরাজি বই। ২৬৭ পাতার লেটার রাইটিং পরিচ্ছেদে একটা অনুশীলনী দেওয়া ছিল– "রাইট দি ফলোইং লেটার : সেলিম শেখ, এ রেসিডেন্ট অফ ২১ সরস্বতী সদন, দরিয়াপুর, আমেদাবাদ, টু হিজ্ সুরাট ফ্রেন্ড মহেন্দ্র প্যাটেল অন কম্যুনাল হারমনি।" (আমেদাবাদের সরস্বতী সদনের অধিবাসী সেলিম শেখ তার সুরাটবাসী বন্ধু মহেন্দ্র প্যাটেলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে লিখছে– এই মর্মে একটা চিঠি লেখ)।

সে স্মারক আমি নিয়ে ফিরতে পারিনি

শাহ্ আলম ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া ৪ থেকে ৭ বছরের ৪টি মুসলমান বালক হল এই স্মারকটির মালিক। আমি শিবিরে ঢুকতেই ওরা আমার পিছু নেয়। আমাকে গোড়ালির উপর ভর করে হাঁটতে দেখে ওরা হাসাহাসি করছিল। আমি জুতো খুলে হাঁটছিলাম গরম পাথরের উপর দিয়ে। আমি ওদের দিকে ফিরে হাসলাম, ওরা আমার দিকে এমন শূন্য দৃষ্টি নিয়ে তাকালো যে আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করি।

এই বই আর পাতাগুলি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আমার পড়ার ঘরে রাতে বাতানুকূল পরিবেশে একটা প্লাস্টিক ফোল্ডারে নিরাপদে ঠাণ্ডা এবং অন্ধকারে সযত্নে রাখা আছে। কখনো কখনো সবার অলক্ষ্যে আমি এগুলিকে বার করে নিয়ে আসি, এগুলির গন্ধ নিই।

এর কারণ এই নয় যে, আমি এক ধর্মনিরপেক্ষ পাগল। আসলে আমার বইয়ের গন্ধ ভালো লাগে। ভালো লাগে দুধারে সাজানো বইয়ের তাকের মাঝখানের গলির গন্ধ, কলেজ হোস্টেলের গন্ধ, সদ্য পালিশ করা বইয়ের তাকের গন্ধ, পুরনো বইয়ের গন্ধ। আর এখন ভালো লাগছে এই বইগুলির প্রথম মালিকদের জীবন্ত গন্ধ হওয়ার গন্ধ।

আমি যদি সত্যি সত্যি জোরে শ্বাস টানি তাহলে একটা অব্যবহৃত অ্যাস্ট্রের গন্ধ আর রোদে পোড়া শুকনো মেঝে থেকে উঠে আসা গন্ধের একটা মিশ্রণ আচমকা আমার নাকে লাগে। গন্ধটা অত্যন্ত হালকা, জুন মাস, জুলাই মাস একের পর এক চলে যাবে এবং এটা ফিকে হতে থাকবে, থেকে যাবে গন্ধহীন এই পেপারগুলি, বিবর্ণ আর ভঙ্গুর পেপারগুলি। আর এজন্যই আমি রেস্‌কোর্স রোড-এ ভ্রাম্যমান পায়খানা বসাতে চেয়েছিলাম।

উপসংহার : আচ্ছা, গোধরার ব্যাপারটা কি? হ্যাঁ, অবশ্যই একটা টিফিন্ বাক্স, হয়তো বা একটা বেডিং ছিল ওই ট্রেনের পোড়া কোচে। একটা বাচ্চা মেয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, তার মুখটা জানালার গরাদ চেপে বসেছে প্ল্যাটফর্ম আসতে দেখে। মা তার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, নিতে নিতে তাকে বলছে, চল নামার সময় হয়েছে। আর তারপরই সেই খুনে উচ্ছৃঙ্খল দলটার আগমন। যারা জিজ্ঞাসা করে কেন তুমি গোধরার

দগ্ধ মৃতদের জন্য চোখের জল ফেলছো না, তাদের জন্য আমার একমাত্র উত্তর– জাহান্নামে যাও, আমি তোমাদের প্রশ্নটাকেই মর্যাদা দিতে রাজি নই।

আমি তাদের একটা কথাই বলব, যখন মুসলমানেরা মোট জনসংখ্যার ৮৭ শতাংশ হবে, যখন তারা গুজরাট এবং কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় বসবে, যখন ৯৮ শতাংশ আই পি এস এবং আই এ এস অফিসার হবে মুসলমান সম্প্রদায়ের, যখন তারা সবাই আমাদের স্বার্থের প্রশ্নে নির্লিপ্ত হয়ে যাবে এবং আমাদের মৃত্যু দেখতে থাকবে, যখন মোল্লারা প্রধানমন্ত্রীর অফিসে আনাগোনা করতে থাকবে এবং তাদের ভেঙ্গে দেওয়া একটা মন্দিরের জায়গায় মসজিদ গড়া নিয়ে ক্রমাগত আলোচনা করবে, যখন তারা আমাকে আমার হিন্দু নামের জন্য কোনো ঘর ভাড়া দেবে না, তখনই কেবল অমি সেই বাচ্চা মেয়েটা, যে জানলার শিকে মুখ চেপে বাইরের মুসলমান জনতাকে দেখছিল, তার দিকে তাকাব।

ততক্ষণ পর্যন্ত আমি প্রধানমন্ত্রীর শাহ্ আলম শিবিরে দেওয়া ভাষণ থেকে সান্তনা পেতে চাইব– "আমার হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে"। তিনি বলেছিলেন, "কোন মুখ নিয়ে আমি বিদেশে যাব? আমার নিজের মানুষেরা তাদের নিজের দেশেই উদ্বাস্তু। কিভাবে এই সব সম্ভব হল?"

যদি তিনি এরকম কথা না বলতেন, তার কথাগুলি মানবতার কারণে ভাড়াটে লেখকরা বিকৃত না করতো। আজ এমনই দিন যখন অপনি কোন ব্যাপারেই নিশ্চিত নন।

Indian Express, 13th May, 2002

নবান্ন, মে ২০০২, থেকে গৃহীত

ভাষান্তর : বরেন ভট্টাচার্য্য

বধ্যভূমিতে

গোপাল মেনন

সেই ভয়ঙ্কর নরমেধ যজ্ঞের যাত্রাপথটা শেষ হল। অদ্ভুত পরিহাস হচ্ছে যে, আমাদের যাত্রাটা শুরু হয়েছিল কোয়েম্বাটুর থেকে। তখন ক'দিন ধরেই তামিলনাড়ুর শহরে পচনশীল পাত্রটা বলে উঠেছিল সাম্প্রদায়িকতার গ্যাঁজলা ওঠা বিষে। কিন্তু ভয়ঙ্করতম হিংস্র দাঙ্গাটা প্রত্যক্ষ করেছিলাম কোয়েম্বাটুরে, ১৯৯৭ সালে, পুলিশ যখন ১৯ জন মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছিল।

তখন আমি ওখানে ম্যানেজমেন্ট পড়ছি। 'পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবারটিস-এ (PUCL) আমার অনেক বন্ধুবান্ধব ছিল। ওরাই অনুরোধ করেছিল কোয়েম্বাটুর দাঙ্গার প্রামাণ্য তথ্যচিত্র তুলে রাখতে। তার জন্য ওরা অর্থ সংগ্রহের মরিয়া চেষ্টা করেও

প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা জোটাতে পারে নি। ফলে দাঙ্গার তথ্যচিত্র তোলার ভাবনাটা রূপ পায়নি শেষপর্যন্ত।

সেটাই ছিল শুরুর মুহূর্ত। ইতিমধ্যে আমার ম্যানেজমেন্ট কোর্সের পড়া শেষ হয়েছে। চাকরি-বাকরির কথা না ভেবে দিল্লীর সংগঠন 'Other Media communications'-এ যুক্ত হয়ে পড়ি। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মালিন্য আর ক্লেদের বিরুদ্ধে সভ্য নাগরিক সমাজের সব ধরনের প্রচেষ্টাগুলি তথ্যচিত্রে প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরা। যে প্রয়াসগুলি মেনস্ট্রিম মিডিয়ায় অসে না বললেই হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২, গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস জ্বালিয়ে দেওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল। আমি তখন নাগা সমস্যা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারির কাজে ব্যস্ত। ২৭ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর গুজরাটের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তপন বোস এবং এম বিজয়ন দু'জনেই ফিল্মমেকার। তাঁরাই প্রথম গুজরাটের দাঙ্গার ভিডিও ডকুমেন্টশনের কথা ভেবে আমার সঙ্গে দিল্লীতে যোগাযোগ করেছিল।

আহমেদাবাদে যখন পৌছলাম চারিদিকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের পরিবেশ। আমরা যাঁর আতিথ্যে ছিলাম তিনি এতটাই ভয়ার্ত ছিলেন যে, আমাদের দিল্লী ফিরে যাবার পরামর্শও দিয়েছিলেন। ঠিক তখনই অসীম রায় নামে একজন ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাকটিভিস্ট, সিটিজেন ইনিসিয়েটিভের সদস্যও তিনি। অনেকগুলি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মঞ্চ এই সিটিজেন ইনিসিয়েটিভ। মল্লিকা সারাভাই-এর মত বিশিষ্ট নাগরিকরাও এই সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত।

অসীম রায়ই আমাকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া দাঙ্গায় সব হারানো মানুষগুলোর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। শরীর আর মনে ক্ষতবিক্ষত, বিধ্বস্ত সব দলাপাকানো মানুষদের ভয়ার্ত অস্তিত্ব। জাহাঙ্গীর নগরের ত্রাণ শিবিরটাতে আমি প্রথমে গিয়েছিলাম। খুব দ্রুত সেইসব ক্লীষ্ট যন্ত্রণায় বিদ্ধ মানুষের ভিড়ে ঘেরাও হয়ে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের শিবিরে আসার কারণটা জানতে পেরে সকলে একসঙ্গে যেন ফেটে পড়ল। তবে সাহস যোগানোর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ আবেদন– তোমরা বলো। সারা দেশকে দেখাও আমাদের অবস্থা।

আমাদের গাইড বন্ধুরা চা, পার্লে বিস্কুটের প্যাকেট আর পাঁচশো টাকা দিল ওদের। এক বৃদ্ধা আমাকে বললেন, কীভাবে তাঁর ঘর-গৃহস্থালি সবকিছু শেষ করে দিয়েছে।– তুমি এখন যদি সেই ধ্বংসস্তুপে যাও, দেখবে গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রলের বোতল আর কেরোসিনের খালি টিন। ওরা আমাদের ছাদ ভেঙে ফুটো করে পেট্রলের বোতলে আগুন জ্বালিয়ে আমাদের ঘরের মধ্যে ফেলে সব জ্বালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সিলিন্ডার ভয়ঙ্কর শক্তিশালী বোমার মত ফেটে দেওয়াল, ঘরের ছাদ, ঘর, মানুষ আর তাদের জীবনযাত্রা সবকিছু উড়িয়ে দিয়েছে।

ক্যামেরার চোখে দেখেছিও তাই। মুসলিমদের বাড়ি, দোকান, কারখানা, কারবার সবকিছু খুব পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্য হিসেবে বেছে ধ্বংস করা হয়েছে। প্রথম ক'দিনের

ঘটনার পর FICCI-র হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ ৫৬ কোটি টাকা। CII-এর হিসেবে ২০০০ কোটি টাকা। কিন্তু একেবারে মাটিতে দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে আগুন আর রক্তের মধ্যে দিয়ে যাঁরা হেঁটে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন তাঁদের হিসেবে এইসব অঙ্কে প্রকৃত ক্ষতির অভাবনীয় ব্যাপকতার সামান্য প্রতিফলনও নেই।

খুব হিসেব করে, আশ্চর্য নিখুঁত পরিকল্পনায় একটি সম্প্রদায়ের অর্থনীতির ভিত্তিটাকে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। মুসলিমদের আর্থিক উদ্যোগের সমস্ত স্তরকেই; শিল্পপতি থেকে মাঝারি দোকানদার, রেস্তোরাঁ, দরিদ্র রিক্‌সাওয়ালা– সবার আর্থিক মেরুদণ্ড কীভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে মুছে ফেলা হচ্ছে– না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

নারদা-পাতিয়ায় আশ্রয় নেওয়া শাহ্ আলম ক্যাম্পে দুর্ভাগ্যদের সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। ধ্বংস আর হত্যালীলার সবচেয়ে ব্যাপক বধ্যভূমি নারদা-পাতিয়া। খুবই সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের ঘরের সব হারানো সম্ভ্রান্ত মহিলাদের পরিবারের সবাই খুন হয়েছে নৃশংসভাবে। প্রাসাদোপম বাড়ির সব কিছু বলতে সবকিছুই লুঠ হয়েছে নিঃশেষে। পারিবারিক সম্পত্তি, ওঁদের বিপুল পণ্যে ঠাসা বিশাল ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলিতে ছাই ছাড়া অবশিষ্ঠ কিছু নেই। যদিও সবকিছু লুঠ করার পরই জ্বালানো হয়েছে সুবিশাল দোকানগুলি। তারপরে ধ্বংস করে আক্ষরিক অর্থে সেই বিশাল অট্টালিকাগুলিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

–আমরা জানতাম না বাইরে, রাস্তার বাঁকে ৫০০ জন বজরঙ্গী শোর্ড আর পেট্রল নিয়ে শিকারের অপেক্ষায় ছিল। যে মেয়ে, যে বয়সেরই হোক বাঁচার জন্য কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য বেরিয়েছে, তাদেরকেই রাস্তায় ফেলে ধর্ষণ করেছে ওরা, তারপর খুন করেছে।

যখন জতুগৃহে বন্দী শিশুরা একফোঁটা জলের জন্য কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছে, অবুঝ তাদের মুখে ঢেলে দিয়েছে কেরোসিন তেল। যখন জীবনে এরকম ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক নেমে আসে, তখন ভোঁতা লোহার শাবলেও বিদ্ধ করে, খুঁচিয়ে মারাটা কত সহজ হয়ে যায়।

– আমার বোনের পরিবারে ১১ জন সদস্য ছিল। তাদের ৩ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাও হাসপাতালে। মৃত্যুর অনেক কাছাকাছি। বাকিরা সবাই ছাই। হারগোড় নাভিমূল কিছু খুঁজে পাবে না।

–আমার বোনের কাছে বেশকিছু টাকা ছিল। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে যে মা পালাচ্ছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে, তার আর কীই বা করার থাকতে পারে।

–আমার কাছে যত টাকা আছে সব নিয়ে নাও। শুধু আমার বাচ্চাগুলিকে ছেড়ে দাও। এই সওদা খুব ঘৃণা ভরেই প্রত্যাখান করেছিল। স্পষ্ট বলেছিল– না, এই হারামির

বাচ্চাগুলি আর তুই মরবি। খুব দ্রুত কেরোসিনে ভিজিয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল তারা। তার আগে অবশ্য টাকাগুলি গুণে নিতে ভোলে নি তারা।

যদি যান তবে মুসলিম এলাকার প্রতিটি বাড়িতে দু-চারটে মৃতদেহ পাবেন। অর্ধদগ্ধ পচে ফুলে ওঠা বিকৃতদর্শন সব মানুষের লাশ।

–আমারই গর্ভবতী আত্মীয়ার পেট কেটে বাচ্চাটাকে বার করে দু'টুকরো করে কেটে আগুনে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

–আমার সামনে একজন মহিলাকে রাস্তায় ওরা বলাৎকার করল। তারপর খুব শান্তভাবে তার হাতদুটো কেটে ছুঁড়ে ফেলল আগুনে।

–আমার চোখের সামনে এক মায়ের পেট থেকে বাচ্চা বার করে অস্ফুট সেই মানব শিশুকে তলোয়রের মাথায় গেঁথে নিশানের মত তুলে দেখিয়েছে সবাইকে। তারপর ঐ তলোয়ারে গাঁথা বাচ্চাটার সঙ্গে আমাদেরও কাছের মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বলেছে– বল জয় শ্রীরাম। যারা বলেনি, দ্বিতীয়বার সুযোগ দেয়নি। এককোপে কেটেছে।

এইসব শুনতে শুনতে মাথার মধ্যে শূন্যতা ভরে ওঠে। অস্তিত্ব বিপন্ন করা এক বিচ্ছিন্নতার অবসাদ গ্রাস করলো আমাকে। সকলেই গভীর বিষাদে মগ্ন। কেউ ফেরার নেই তাদের। রক্তের সম্পর্কের কেউ আর বেঁচে নেই।

এক ক্রুদ্ধ এবং কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ যুবক বলল,– আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে। কোনো কিছু আর বলার নেই আমার। কোনো সাক্ষাৎকার, কোনো অভিযোগ, কোনো আবেদন জানাবার নেই কারো কাছে।

আমি ভেবেছিলাম যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের এই আবেগ আমি ক্যামেরায় তুলতে পারবো সহজেই। আমার সঙ্গে ছিল একটি মাত্র ক্যামেরাই। টেলিভিশন ক্রুরা নানান যন্ত্রপাতি আর বিপুল সরঞ্জাম নিয়ে চারিদিকে ঘুরছে। আর শিবিরের মানুষগুলো ওদের দেখে স্তপের মত জমাট বাঁধছে একে অপরের সঙ্গে।

কিন্তু একবারই, যখন আমি ঈশানপুরে গিয়েছিলাম, যেখানে প্রাচীন এবং আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক প্রত্নমূল্যের হাসান মালিক দরগা উঁচু ক্রেন আর ভারি বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই ধ্বংসস্তুপের মাঝে যখন দাঁড়িয়ে আছি, আচম্বিতে অগণন মানুষ যেন মাটি ফুঁড়ে আমাকে ফিরে ধরে ভীষণ তপ্ত গনগনে অভিযোগে ছিঁড়ে খুঁজে ফেলছিল। আমি খুব দ্রুত কয়েকটা ছবি তুলে কোনোরকমে আমার বন্ধু অজিতপাল সিং-এর মোটর বাইকে চড়ে বসেছিলাম।

অজিতপাল সবেমাত্র সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। সেই পোড়া ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে দগ্ধ, অর্ধদগ্ধ শবদেহ আর উল্লসিত ঘাতকবাহিনীর দখলে থাকা নরকের চাইতেও তীব্র উপদ্রুত শহরের ধূমায়িত রাস্তা দিয়ে প্রান হাতে করে সে আমাকে যত্রতত্র নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়েছিল নিজেই।

আমার কাছে এই নরকযাত্রা এ কারণেও মনে রাখার মত, কেননা সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র লাভাস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকেই আবার মানুষের কণ্ঠে মানবতার কথাও বলেছিল। একজন হিন্দু অটোরিক্সাচালক আমাকে বলেছিল– একটা দুর্ঘটনায় ১৯৯১ সালে আমি যখন হাসপাতালে অচেতন অবস্থায় ভর্তি ছিলাম, ১৮ বোতল রক্ত লেগেছিল আমার। আমি জানি না, এই ১৮ বোতল রক্ত হিন্দু, মুসলিম না হরিজনের। তাহলে কেন এই হত্যা আর নৃশংসতা, কেন এই দাঙ্গা?

এটা কোনো অর্থেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়। এথনিক ক্লিনজিং। একটা সম্প্রদায়কে সবদিক থেকে ধ্বংস করার পরিকল্পিত সন্ত্রাস।

যদি গোধরার ঘটনা নাও ঘটতো তাহলেও এইরকমই ভয়াবহ ব্যাপকতায় গুজরাটে গণহত্যা আর ধ্বংসলীলা সংঘটিত হতো।

এটা সব অর্থেই সরকারী সন্ত্রাসবাদ।

মুসলিমদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে একটা নিবিড় সমীক্ষা হয়েছে।

প্রতিটি ধর্ষিতা রমণী, প্রতিটি শবদেহ, ভস্মীভূত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, কারখানা, মসজিদ, দরগা, মাজার প্রত্যক্ষ করতে পারছি আমি।

সাড়ে ১০ ঘন্টার ফিল্ম ফুটেজ নিয়ে তিনদিন বসে ভেবেছি আগুনে জ্যান্ত জ্বালানো, হত্যা, গণহত্যা, গণধর্ষণ, হাত-পা কেটে ফেলা, সব দৃশ্যই তো আছে। কি দেখাবো? কতটা দেখাবো?

পরে ঠিক করেছি উপদ্রুত সব হারানো মানুষের মুখ দিয়েই বলি। আর বিধ্বস্ত পোড়া শহরটার কিছু অংশ দেখাই। না হলে কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সেই হিংস্র পাশবিকতার অনিবার্যতাকে। আর সুচিন্তিতভাবে ভিডিও ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও কিছু স্টির ফোটোগ্রাফ ব্যবহার করেছি।

ছবিটা এডিট করে আবহ সঙ্গীতে একটি হাহাকার করা ভজন ব্যবহার হয়েছে। শুভা মুদ্গল ভজন গেয়েছেন। তাঁর সহশিল্পীরা বললেন, শুভা নাকি গান গাওয়ার আগে চা বা জল, কোনো কিছু পান করেন না।

ছবিটা দেখার পর গান গাওয়ার আগে ভেতরে ভেতরে একেবারে বিধ্বস্ত শুভা মুদ্গল বেশ কয়েক কাপ চা খেয়েছিলেন। ভেতরের কান্নাটাকে নেভাতে।

এটা মনিরত্নমের তোলা সুবিন্যস্ত গল্প আর ফর্মুলার ঠাস বুনোটে তৈরি দাঙ্গার বাণিজ্যিক ছবি নয়। এটা আক্ষরিক অর্থে রাজনৈতিক ছবি। এ ছবিকে কেউ শিল্প বলে ভাববেন না।

সৌজন্য : সমন্বয়

যখন রাত্রি নামে...

জাভেদ হুসেন। বয়স : ১৪

পিতা : রিক্সাচালক। মা : সেলাই করেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি আহমদাবাদের নারোরা পতিয়ার বস্তিতে জ্যান্ত মানুষ পোড়ানোর বীভৎসতম ঘটনায় একদিনে ৯১ জনকে হত্যা করা হয়েছিল। তার মধ্যে জাভেদের পরিবারে বাকি সদস্যরাও ছিল। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া জাভেদ রুমাল সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

তখন সকাল সাড়ে নটা। সবে চা-নাস্তা শেষ করেছি। বাইরে বহু মানুষের ভয়ঙ্কর গোলমালের আওয়াজ পেলাম। বৃষ্টির মতো বড় বড় পাথর ছুঁড়ছে। সকলের হাতে খোলা তলোয়ার, ছুরি, ভোজালি। সকলেই চিৎকার করে সুর ভাঁজছে 'জয় শ্রীরাম'। সকলেই বলছে 'মুসলিমদের খুন করো'। আমরা তখন পালাবার চেষ্টা করছি আতঙ্কে। কিন্তু ওদের ঘেরাওয়ে সকলেই আটকে পড়েছি। প্রত্যেকটা ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ঘরের মানুষগুলোকে তলোয়ারের খোঁচায় ঘরে ঢুকিয়ে শেকল আটকে দিচ্ছে। বাবা, মা আর আমার কাকার মেয়ে, আমার দিদি সকলে ছিলাম। দিদির বাচ্চা হবে দিন দু'য়েকের মধ্যে। নাম : কৌসর বিবি। ওরা দিদিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। জামা কাপড় খুলে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে পেটটা চিরলো। পেট থেকে মানুষের বাচ্চার মত কি একটা বার করে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপরে আমার মা-বাবাকে একে একে জোর করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল আগুনের মধ্যে। আমার ১৭ বছরের দিদি সোফিয়াকেও তাই করলো। আমার মাসীদেরও অগুনের মাঝে ঠেলে দিল। একটা পাইপ দিয়ে কেউ আমার মাথায় আঘাত করেছিল। আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন রাত্রি। আমার প্যান্টটাও পুড়ে গিয়েছিল। আমি পোড়া জঞ্জাল আর ছাইয়ের গাদা থেকে একটা কাপড় খুঁজে নিয়ে পরলাম। তারপর সেই রাত্রেই দশ মাইল হেঁটে আমার মালিকের বাড়ি পৌঁছেছিলাম। সারাটা পথ কেবলই মনে হয়েছে কেউ যেন পেছন থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে খুন করবে। মালিক আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে আমাকে এই শিবিরে পাঠানো হয়। আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। কয়েক মিনিটের বেশি কথা বলতে পারি না। ঘুমোতে পারি না রাত্রে। ওই দৃশ্যগুলি শুধু ফিরে ফিরে আসে। মার কথা মনে পড়ে। মা বলতো আমিই নাকি তার সব আনন্দ আর সহায়-সম্বল। যারা আমার মাকে খুন করেছে তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই– আমার বাবা-মা পরিবার আর আত্মীয়রা তাদের কি ক্ষতি করেছে? সব হিন্দুরা খারাপ নয়। আমাদের বস্তিতে আমার চার-পাঁচজন হিন্দু বন্ধু আছে। আমি বিশ্বাস করি না তারা এই ঘটনার মধ্যে ছিল। বাইরের লোকেরা এসে এইসব করেছে। আমার ক্যাম্প ছেড়ে যেতে ভীষণ ভয় লাগে। কখনো মনে হয় সব কিছুই তো শেষ হয়ে গছে, তাহলে ভয় কীসের?

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে আমাদের দেখতে এসেছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমার কী কষ্ট? কিন্তু আমি তাঁর কাছে জানতে চাই এ খুনখারাবি বন্ধ করার জন্য তিনি কি করেছেন? এসব শেষ হবে কবে?

মহম্মদ ইয়াসিম। বয়স : ৮

নারোত্তাজওয়ান নগর অগ্নিকাণ্ডে বেঁচে যাওয়াদের মধ্যে একজন। ইয়াসিমের মা আর ৯ ভাই বোনের মধ্যে ৬ জন খুন হয়েছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি। শরীরে ২০ শতাংশ পোড়া নিয়ে একটা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়াসিম বেঁচে যায়। বর্তমান ঠিকানা : সুরাট। দিদির সঙ্গে থাকে।

আমার বাবা ছাদে উঠে দেখছিল। একটা বড় দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসছে– বাবা চেঁচিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল আমাদের। আমরা সবাই ভয়ে বিছানায় হাতজোড় করে বসে কাঁদছিলাম। ওরা 'কেটে ফেল, মেরে ফেল' বলতে বলতে কাছাকাছি এসে পড়ল। পুলিশও ছিল ওদের সঙ্গে। হাতে তলোয়ার আর জ্বালানো মশাল ছিল। আমরা ঠিক করলাম বন্ধুর বাড়ি গায়ত্রী নগরের দিকে যাব। আমরা ভেবেছিলাম ওটাই নিরাপদ জায়গা হবে বাঁচার। ওরা হিন্দু। আমরা ওদের বাড়িতেই টিভি দেখতাম একসঙ্গে। ওদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। কিন্তু যখন ওখানে পৌঁছলাম, দেখলাম ওরাও সেই উন্মত্ত খুনে বাহিনীর মধ্যে আছে। আমার বন্ধু কেশুভাই, ভবানী সিং, গুড্ডু, এদেরকেও সেই ভিড়ের মধ্যে দেখলাম। আমরা বাড়ির সবাই শক্ত করে হাত ধরে দৌড়াচ্ছিলাম। কিন্তু পেছনে এগিয়ে আসা ভীষণ চিৎকারে আলাদা হয়ে গেলাম। পালাতে পালাতে পিছনে ফিরে দেখি মা ধরা পড়ে গেছে। পেট্রল ঢেলে মায়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। সারা শরীরে অগুনের লম্বা স্তম্ভ নিয়ে মা পাগলের মতো অর্তনাদ করে ছোটাছুটি করছেন। সকলেই চীৎকার করছে যন্ত্রনায়। আমিও ধরা পড়ে গেলাম। আমার গায়ে পেট্রল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা নিয়েই আমি সামনের পুকুরটায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। পুকুরে আরো তিনটে বাচ্চা ছিল। বাবলু, তার বোন আর মেহবুব। ওরা ফিরে গেলে আমরা কাছের একটা বাড়িতে কয়েকঘন্টা লুকিয়েছিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখলাম বাইরে থেকে কারা যেন শিকল টেনে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। মনে হল আমরাও এবার জ্যান্ত পুড়ে মরবো। ঠিক এমন সময় বাইরে বাবার গলা শুনলাম। আমার নাম ধরে ডাকছে। আমি কেঁদে উঠতেই বাবা ঘরের দরজা খুলে আমাদের বার করে আনলো।

আমি এখন আর ঘুমোতে পারি না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে চিৎকার করে জেগে উঠি। খেতে পারি না। মা, দাদা, দিদির কথা মনে পড়ে। হুসেন, খাজ্জো, আফরিন, শাহিন। চোখ বন্ধ করতে ভীষণ ভয় হয়। যদি কেউ ভাই আর গুড্ডু এসে আমাকে ধরে ফেলে তবে কি হবে? ওরা জানে আমি ওদের দেখে ফেলেছি। ওরা খুঁজছে আমাকে। বেশি লোককে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখলেই আমার ভেতরে কাঁপুনি লাগে।

অমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওদের খুঁজে বার করবই। যেভাবে আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে সে ভাবেই ওদের বাড়িগুলিও জ্বালিয়ে দেব। আমার মা, দাদা, বোনদের যেভাবে দু'টুকরো করে কেটেছে সেভাবেই ওদের কাটতে চাই। আমার খুব গায়ের জোর হবে প্রতিশোধ নেবার জন্য। আমি আর হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবো না।

রেশমা বানু। বয়স : ১১

গুজরাট বন্দের দিন আমাদাবাদের কাছেই রেশমার বাড়ি পিপলেজ গ্রামে প্রতিবেশী এক যুবতীকে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতায় ধর্ষতা হতে দেখেছে। বর্তমান ঠিকানা : শাহ্ অলম ত্রাণ শিবির।

আমাদের গাঁয়ে হামলা হবার আগের দিন রাত্রে পুলিশ এসে সব পুরুষ আর ছেলেদের ধরে নিয়ে গেল। এথেকে ৪০ জনকে রেখে গেল, সকলেই মেয়ে কিংবা ছোট বাচ্চা।

পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ প্রায় হাজার দু'য়েক হামলাবাজ এল। সকলের পরনেই সাদা ছোট প্যান্ট আর সার্ট। সকলের মাথায় কমলা রঙের পট্টি। ওরা এসেছিল ট্রাকে করে। তলোয়ার ছুরি নিয়ে সকলে চিৎকার করছে 'মিয়া লোগকো কাটো'। আমাদের বাড়ির সামনে মসজিদটা প্রথমে পোড়ালো। পুলিশও ছিল, তবে কিছু করছিল না দাঁড়িয়ে দেখছিল। ওরা ঘিরে ফেলেছিল গোটা গ্রামটাকেই। গাঁয়ের দেওয়াল টপকে আমরা যে কজন পারলাম, পেছনের কাঁটা ঝোপঝাড় ভরা মাঠে পালালাম। দেওয়ালের ওপার থেকে উঁকি মেরে দেখি ১০ জন ষণ্ডা মার্কা লোক আমাদেরই পাশে বাড়ির ১৬ বছরের মেয়েটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ও আর্তনাদ করছে বাঁচাও বাঁচাও বলে। ওরা ওর জামাকাপড় টান দিয়ে ছিঁড়ে ন্যাংটো করে একে একে ওর ওপর শুয়ে পড়ল। আমরা সকলে ভয়ে আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমরা প্রকাশ্যে এসে ওকে বাঁচাতে পারলাম না জানোয়ারগুলির হাত থেকে। ওদের পাশবিক আনন্দ শেষ হলে যখন দেখলো মেয়েটা তখনও বেঁচে ওরা ছুরি বার করে পেটে কয়েবার ঢুকিয়ে পাশের গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবর্জনার মতো। বিকেলে, আমরা গাঁয়ে ফেরার চেষ্টা করতেই একটা লোকক এসে আমার দিদি ফিরদৌসের হাত ধরে টানল। আমার মা আর কাকিমা ঝাঁপিয়ে পড়ে দিদিকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল। আমরা আবার কাঁটাঝোপের মাঠে ফিরে গেলাম। সারা রাত লুকিয়ে থেকে আলো ফুটলে হাঁটতে শুরু করলাম। শেষপর্যন্ত কোনোরকমে পৌছেছিলাম রহিম নগরে, কাকার বাড়িতে। কাকা আমাদের পুলিশি পাহারায় ক্যাম্পে পৌছে দিলেন। আমার এখন শুধু ভয় ওরা যেভাবে আমার গাঁয়ের মেয়েদের অবস্থা করেছে তারাই যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। এখনও তো হিংসা থামলো না। ক্যাম্পের মানুষের সঙ্গে

কথা বলতেও এখন আমার ভয় করে। যদি এদের মধ্যে ওই জানোয়ারগুলো লুকিয়ে থাকে? যদি ওরা আমাদের ধরতে ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে আসে?

সব হিন্দুরা খারাপ নয়। আমি আমার প্রতিবেশীদের জানি। ওরা একাজ করতেই পারে না। ওরা সব বাইরের লোক। কিন্তু পুলিশ তো আমাদের সাহায্য করল না। আমি বড় হলে পুলিশ হব। যাতে এরকম ভয়ঙ্কর বিপদে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

ইয়াসমিন সিকান্দর খান। বয়স : ১২

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। চমনপুরা গুলবার্গ সোসাইটিতে দাঙ্গাবাজদের আগুনে কংগ্রেস সাংসদ এহেসান জাফরিসহ ৪০ জনকে হত্যা করা হয়। তাতে মা আর বড় ভাইকে হারিয়েছে। বর্তমান ঠিকানা : দরিয়াখান গুম্মট রিলিফ ক্যাম্প, আহমেদাবাদ।

জাফরি সাহেবের বাড়ি পেরিয়ে গুলবার্গ সোসাইটির তেতলায় আমরা থাকতাম। ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে নাস্তা শেষ হয়েছে কি হয়নি রাস্তায় বহু মানুষের ভাঙ্কর গণ্ডগোল শুনতে পেলাম। ওরা পাথর বৃষ্টি শুরু করেছে আমাদের বাড়ির ওপরে। মা বললেন ঘরের ভেতরে থাকতে। সেইমত বাবা-মা আর আমরা ৬ ভাইবোন ভেতর থেকে তালা দিয়ে ঘরের মধ্যেই বসে রইলাম। একটা সময় ওরা আগুন লাগিয়ে দিল। মেঝের টাইলসগুলো ভীষণ তেতে উঠছে দ্রুত। তখন আমরা সকলেই জাফরি সাহেবের বাড়িতে দৌড়ে ঢুকে গেলাম। এ বাড়িটাকে সকলেই নিরাপদ মনে করেছিলাম আমরা। সেখান ততক্ষণে ১০০ জনের বেশি লোক। আমরা সকলেই ভয়ে কাঁদছি। তখন দাঙ্গাবাজদের একটা দল বাড়িতে ঢুকে পড়ল। আমার ভাই সেলিমকে ধরে মাথায় মারল ভারী সোর্ড-এর এক বাড়ি। সেলিম শুধু বলল, পাপা, তারপরেই মাটিতে পড়ে গেল। ওরা ঘরটায় আগুন লাগিয়ে দিল।

বাকি ভাইবোন আমরা কোনোরকমে ছাদে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। মা পেছনে পড়ে রইলেন। আমরা পাশে মাসির বাড়িতে গিয়ে বাথরুমে লুকিয়ে রইলাম। পাঁচ-ছ ঘন্টা পর যখন সবকিছু থামল পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করল। মানুষের মৃতদেহের পাহাড় ডিঙিয়ে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি, পোড়া লাশ মাড়িয়ে, আমাদের বেরিয়ে আসতে হল। ভাই সেলিমের ডাক এখনো মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। এই দাদা আমাকে একটু বেশি ভালবাসতো। এখনো আগুনের বিশাল কুণ্ডলীর মধ্যে আমাদের বাড়িটা আবছা দেখতে পাই। পুলিশ আমার মাকে খুঁজে পেল না আর। তিনি অন্য অনেকের মতো ভেতরে জ্যান্ত পুড়ে মরেছিলেন। কখনো, কখনো, এমনকি ঘুমের মধ্যেও আমার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। এতকিছুর পরে আমি আর হিন্দুদের সঙ্গে কিছুতেই থাকতে পারবো না। এমনকি এখনো ওরা আমাদের একা থাকতে দিচ্ছে না। বারে বারে আমাদের ক্যাম্পে হামলা করছে। প্রায় প্রতিদিন ক্যাম্পে বোমা ছুঁড়ছে। নয়তো ক্যাম্পের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে পুলিশ। ওরা চায় না মুসলিমরা হিন্দুস্তানে থাকুক।

ইমরান খান। বয়স : ১১

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। ২০ মার্চ, যখন হামলাবাজরা আসে, এলাকা আক্রান্ত হয়, পুলিশের গুলিতে প্রায় খুন হতে বসেছিল ইমরান। বর্তমান ঠিকানা : শাহ্ আলম ক্যাম্প।

তখন দুপুর। আমরা খেতে বসেছি। হামলাবাজদের বিশাল একটা দল তলোয়ার, ছুরি পাথর নিয়ে ঘিরতে শুরু করলো আমাদের এলাকাটা। বাবা-মার সঙ্গে আমিও দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম ইস্রাফ পালোয়ানের বাড়িতে। আমাদের দৃঢ় ধারণা ছিল ওর বাড়িটা নিরাপদ। কিন্তু ওখানে নীল ইউনিফর্ম পরা র‍্যাফ বন্দুক আর লাঠি নিয়ে ঢুকে এল ভেতরে। বাবাকে ধরে কোনো কথা না বলেই বেদম মারতে শুরু করলো। আমার মাকেও মারতে থাকল না থেমে। কোনো মাকে কেউ এভাবে মারতে পারে কোনোদিনই কল্পনা করিনি। আমাকে পায়ে মারতে শুরু করলো। আমি মরিয়া হয়ে বললাম, আমাদের মারছো কেন? আমরা তো কিছু করিনি? একথা বলার জন্য একজন র‍্যাফ আমার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে ট্রিগারে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে চুপ করতে বলল। আমি ভেবেছিলাম সত্যি সত্যি এবার মরতে বসেছি। কি সে সময়েই সামরিক বাহিনী এল। র‍্যাফকে থামালো তারাই। সেই রাতেই আমরা এই ক্যাম্পে চলে এলাম।

আমাদের এলাকায় আমার বহু হিন্দু বন্ধু ছিল। একসঙ্গে ক্রিকেট, বাস্কেটবল খেলতাম। কিন্তু ২৮ ফেব্রুয়ারির পর তারা ক্যাম্পের বাইরে আমাদের তাড়া করে ফিরছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'মুসলমানদের সঙ্গে আর খেলব না।' ওরা আর আমার বন্ধু নয়। আমি আর ওখানে ফিরব না কোনোদিন।

জগদীশ কুমার। বয়স : ১৫

বাবা-ছেলে দু'জনেই তরকারি বিক্রি করে। গোমতিপুরে রাইপুর মিলের কাছে থাকে। আটজনের পরিবার। দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে কোনোক্রমে বেঁচেছে। বর্তমান ঠিকানা : সরসপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুল রিলিফ ক্যাম্প, আহমেদাবাদ।

২৮ ফেব্রুয়ারির বিকেলে তখন আমরা বাড়িতে। হঠাৎ দেড়শো-দুশোজন দাঙ্গাবাজদের একটা দল উম্মত্তভাবে আসে। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা প্রত্যেকের মুখে পাগলের মতো চিৎকার 'মারো, মারো'। তারপর গুলি করতে শুরু করে, বোমা ছোঁড়ে, আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা পালাতে শুরু করি। পালিয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়ি। রাত্রের মধ্যে ক্যাম্প তৈরি হয়ে যায়। আমাদের বাড়িটা ভেঙে দিয়েছে। আমাদের বাড়িটা মুসলিমদের বস্তির ঘেরাও-এর মধ্যে একটা পকেটের মত অবস্থায় বন্দী। তবে বাইরের লোক এসে এসব করেছে বলেই আমার মনে হয়। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু আমি জানি না কিভাবে কি করব আমি।

সৌজন্য : সমন্বয়, মে, ২০০২।

একটি সংস্কৃতির শোকগাথা

আশিস নন্দী

রোয়ান্ডা এবং বসনিয়ার ব্যাপক সংঘটিত গণহত্যা থেকে পৃথিবীর তাবৎ গণহত্যাবলী সম্পর্কিত সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষানবীশরা একটা শিক্ষা অন্তত পেয়েছে যে– অচেনা নয়, বরং সংস্কৃতি এবং সামাজিক জীবনযাত্রার দিক থেকে নিকট সম্পর্কিত এমন দুটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি ঝগড়া বাধানো যায়, তবে তা উপযুক্ত পরিচর্যায় পাশবিক হত্যাকাণ্ডে পরিণত হতে পারে আর যখন নৈকট্য তিক্ততায় পর্যবসিত হয়, তখন পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিস্ফোরণ ঘটে, সেই বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে একেবারে অচেনা, ভয়ঙ্কর সব দানবের দল।

যাঁরা গুজরাটের পৈশাচিক ও বর্বর সাম্প্রদায়িক হিংসায় মর্মাহত হয়েছেন তাঁরা একবার রোয়ান্ডা ও বসনিয়ার গণহত্যার বিবরণ পড়ে নিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রেই দুটি সম্প্রদায় একে অপরের ঘনিষ্ঠ ছিল এবং জাতিগোষ্ঠী সাফাই (ethnic cleansing) অভিযান এই ক্ষেত্রে অচিরেই এক পাশবিক, অত্মঘাতী বিমোচনের (Self destructive exorcism) রূপ নিয়েছিল। এই রকম ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৬-৪৮ সালে দেশভাগের সময়কার কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডগুলিতে। পশ্চিম এশিয়ায় এখন যে মারণ-নাচ চলছে, আরব ও ইসরাইলীরা যে মারণখেলায় মেতে উঠেছে তা একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি।

দীর্ঘদিন ধরে গুজরাট এই ধরনের বিমোচনের জন্য তৈরি হচ্ছিল। এই রাজ্যে ৩৩ বছরের নিরবিচ্ছিন্ন দাঙ্গার এক নক্কারজনক অতীত রয়েছে। মাঝে মাঝে সাময়িক বিরতি মিলত ঠিকই, কিন্তু থাকত এক দমবন্ধকরা অস্বস্তিকর তথাকথিত শান্তির বাতাবরণ। বিগত কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে, শহরে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মানুষের এক লক্ষ্যণীয় অংশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লুটতরাজকে জীবিকার সোজা রাস্তা হিসেবে বেছে নিয়েছে। যেন এটা তাদের জীবনের অঙ্গ, এক ধরনের বিনোদন। এছাড়াও, সাময়িকভাবে সামাজিক মর্যাদা লাভের রাস্তা হিসাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে মনে করছে তারা। নিজ নিজ সমাজে তারা 'বীরের মর্যাদা'য় ভূষিত হচ্ছে– বিশেষত দাঙ্গার সময় ও তার অব্যবহিত পরে। সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে থাকায় এই সামাজিক মর্যাদা তাদের কাছে নিঃসন্দেহে এক পুরস্কার।

সাম্প্রদায়িক হানাহানি সর্বত্রই এক শহুরে ব্যাধি। গোপালকৃষ্ণ, আসগর আলী ইঞ্জিনীয়ার কিম্বা পি.আর. রাজাগোপাল বা আশুতোষ ভার্সনে (যাঁরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানির ও তার সঙ্গে জড়িত মানুষদের হালহকিকৎ নিয়ে চর্চা করেন) ভারবতর্ষের দাঙ্গার চরিত্র বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করছেন।

তবে গুজরাটের ক্ষেত্রে একটি বিশেষত্ব রয়েছে। এই রাজ্যের মধ্যবিত্তরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ভীষণভাবে সাম্প্রদায়িক। এরাই এখন সাম্প্রদায়িক হিংসার সক্রিয় মদতদাতা এবং প্ররোচক। এদেরই একটি অংশ সোৎসাহে লুঠতরাজ অংশ নিচ্ছে যারা সচরাচর এই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপে অন্ধের মত জড়িয়ে পড়ে না তাদেরকে সাম্প্রতিক গুজরাটে দাঙ্গা ও লুটতরাজে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেছে।

ভারতবর্ষে 'বাঙালীবাবু', কাশ্মীরের মুসলমানরা কিম্বা গুজরাটের উচ্চবর্ণের মানুষরা সাধারণত অসামরিক জাতি (non-martial race) হিসেবে পরিচিত। কিন্তু, বিগত একশ বছরে এদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে– তারাও হিংসার প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ বোধ করছে– বিশেষ করে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লড়াই ইত্যাদি করতে পারে– তদেরকে তারা এখন অন্য চোখে দেখতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের ধারণা সঞ্জাত এই 'নিষ্পাপ' হিংসা (redemptive violence) জনজীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের নিস্পৃহতা ও অপুরষসুলভ নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ ঘুচে যাবে এবং তারা 'সাহসী নায়ক' হিসাবে সমাজে মর্যাদা পাবে বলেই তাদের ধারণা।

গুজরাটে শহরগুলির ভূমিকা রয়েছে– যেটা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে (যেমন উত্তরপ্রদেশে) এত প্রকট নয়। এই রাজ্যে রাজনীতির চালচিত্রে নগর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই রাজ্যে শহর এখন পঞ্চাশটি, যার অধিকাংশই এখন বিকৃত মস্কিষ্ক-প্রসূত সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হানাহনির উর্বর ভূমি। ফলে, বর্তমানে গুজরাট শিল্পসমৃদ্ধ নাগরিক জীবনদর্শনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দর্শন পচনশীল এবং তা সমাজের ভেতর থেকে এক মারাত্মক হিংসার চোহরা নিয়ে অত্মপ্রকাশ করতে চাইছে। রাজ্যটি শুধুমাত্র এখন দাঙ্গা প্রবণই নয় প্রকৃতপক্ষে, সেখানে গৃহযুদ্ধ চলছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গুজরাটে দাঙ্গা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশিদিন স্থায়ী হয়– খুব বেশি হলে সাময়িক সন্ধি হতে পারে মাত্র। কিন্তু ভিতরে ভিতরে চাপা উত্তেজনা ও ঘৃণার পরিবেশ বজায় থাকবে এবং উভয় সম্প্রদায়ই পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তৈরি থাকবে। মোদ্দা কথা, গুজরাট বর্তমান অবস্থায় যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সেখানে বিরাজ করতে থাকবে বলেই আশংকা।

তবে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এই কারণে নয় যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা চক্র আই. এস. আই ঘটনা এমনভাবে ঘটিয়েছে। যদিও বহু ভরতবাসী মনে করেন এই সংস্থাটি ঈশ্বরের মত সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান বা সর্বপ্রজ্ঞাবান। কারণ অবশ্য এই নয় যে, এই রাজ্যে সংখ্যালঘুরা সাম্প্রতিক দাঙ্গার প্রধান শিকার। প্রকৃতপক্ষে সেখানে গৃহযুদ্ধের অবস্থা তৈরি হয়েছে এই কারণে যে গুজরাটের সংখ্যালঘুরা এখন জানেন যে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য তারা এখন আর রাজ্য সরকারের উপর ভরসা রাখতে

পারেন না। দেখা যাচ্ছে, অনেক সময়ই রাজ্য প্রশাসনের নীচের তলার বহু কর্মকর্তা দাঙ্গাকারীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু ১৯৮৪ সালের শিখ-বিরোধী দাঙ্গার পর গুজরাটই বোধহয় একমাত্র উদাহরণ, যেখান গোটা রাষ্ট্রযন্ত্র (কয়েকটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া) সংখ্যালগুদের বিরুদ্ধে গেছে।

এখানে গুজরাটের সংখ্যালঘুরা জেনে গেছে যে, ভাল হোক, মন্দ হোক নিজেদের সুরক্ষার ভার নিজেদের হাতেই তুলে নিতে হবে, তার জন্য তৈরিও হতে হবে, এটা সর্বনাশের নিদানমাত্র। এই মানসিকতা গৃহযুদ্ধের আবহাওয়াকে আরও উত্তপ্ত করবে এবং সন্ত্রাসবাদ লালন পালনের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করবে। 'অপারেশন ব্লুস্টারে'র চেয়েও শিখ-বিরোধী দাঙ্গাগুলি পাঞ্জাবে ১৯৮০-এর দশকে সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিতে বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। গুজরাটে দুই দশকের দাঙ্গাবাজী একইভাবে এমন বেপরোয়া মনোভাবের জন্ম দিয়েছে যা সন্ত্রাসবাদের উদ্ভবের পূর্বশর্ত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে যখন এক সদ্য কৈশোর পেরোনো ছাত্র হিসাবে আমি গুজরাটে গিয়েছিলাম তখন আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল যে সেখানে কোনোদিন কোনো বড়সড় দাঙ্গা হতে পারে। সেখানকার লোকজন তখন অতীতের দাঙ্গা ও ছোটখাটো সংঘর্ষ নিয়ে কথাবার্তা বলত। অবশ্য আমেদাবাদে বহু হিন্দুদের মুসলমানদের সম্পর্কে ভীত ও সন্দিহান বলে মনে হতো, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ভয় ও সন্দেহ ছিল অগুজরাটি মুসলমানদের সম্পর্কে, যাদের অধিকাংশই বৃহৎ বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকের কাজ করত। গুজরাটে হিন্দুরাও গুজরাটি মুসলমানদের তাঁদের সমাজের অংশ বলেই মনে করত। এই মুসলমানদের বড় অংশই ছিল ব্যবসায়ী জাত। যদিও সামাজিক দূরত্ব ছিল স্পষ্ট।

অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরালে একই চিত্র আমরা দেখতে পাব। চিত্রটা অনেকটা কোচিনের মত। ধর্মীয় ও জাতিগত ঐকতানের শহর হিসেবে কোচিনের অবস্থান নিয়ে কয়েক বছর আগে আমি পড়াশুনো করেছিলাম। একমাত্র তফাৎ সম্ভবত ছিল এই যে আমেদাবাদে কর্তৃত্বকারী জৈন-বেনিয়া সংস্কৃতিতে মুসলমানদের সম্পর্কে একটু বেশই অনীহা ছিল। কারণ তাদের মতে মুসলমানরা 'তামসিক' নীতির প্রতিভূ। মুসলমানদের প্রতি অপছন্দের এই মনোভাব অবশ্য একইভাবে তাদের প্রতিও ছিল যারা পাশ্চাত্যের আচার ব্যবহারে সম্পৃক্ত হয়ে বাইরে থেকে আমেদাবাদের নূতন, আধুনিক সুন্দর প্রতিষ্ঠানগুলিতে ভীড় জামচ্ছিল। সাবেকী আমেদাবাদ উভয়কেই দূরে ঠেলে রেখেছিল।

১৯৬৯ সালের দাঙ্গা এই শহরের আমূল পরিবর্তন আনতে শুরু করে, যদিও সে সময় পরিবর্তনগুলি অত স্বাভাবিক ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ার যাবতীয় ভাঙ্গার মতো ঐ দাঙ্গাও আর.এস.এস "প্রচারকদের" সক্রিয়তায় সুকৌশলে সংগঠিত করা হয়েছিল। দাঙ্গাজনিত হিংসার সুবাদে লাভবান হয়েছিল আর.এস.এস.। দাঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছিল

বিভিন্ন স্তরে ঘৃণা ও বিষোদ্‌গার– যার ব্যবস্থাপনায় ছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অবধারিতভাবেই আর.এস.এস। তাদের মদতে এভাবেই গুজরাটের শহরগুলিতে মুসলমানদের বাসস্থান নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হলো– সৃষ্টি হলো একটি সুস্পষ্ট ভেদরেখা। ফলশ্রুতিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গজিয়ে উঠল কিছু কিছু মাফিয়া গোষ্ঠী, যারা সবসময় দাঙ্গাবাজী করত এবং হাবভাবে স্ব স্ব গোষ্ঠীর স্বঘোষিত রক্ষাকর্তা হিসেবে নিজেদের তুলে ধরত।

তবে আনুপতিক হারে বেকার মুসলমান যুবকদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান সামাজিক দূরত্ব ইতোমধ্যেই আর একটি মাত্রা পেয়েছে। কাজ ও বাসস্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের দরুণ বহু মুসলমান বেকার যুবক এমন এমন পেশা বেছে নিচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্র বস্তিবাসী যুবকদের মধ্যে যেগুলোতে পারদর্শিতা দেখা যায়– চোলাই মদ, ড্রাগ চালান, দুর্বৃত্তদের আশ্রয়দান এবং খুচরো অপরাধে অংশ নেওয়া। শুধু তাই নয়, এরা যখন তখন রাস্তায় নেমে মারদাঙ্গা করতে পারে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হলো তখন যখন আমেদাবাদের বিখ্যাত বস্ত্রশিল্পের পতন শুরু হলো। একদিকে পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়া অন্যদিকে বস্ত্রশিল্পের দুরবস্থা সবমিলিয়ে মুসলমান সমাজ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

১৯৬৯ সালে গুজরাটের বুকে যে বিষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়েছে, তা-ই কালক্রমে ফুলে ফলে পল্লবিত হয়েছে। তারই বাৎসরিক ফসল হলো নিয়মিত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, গণহিংসা। এই সংস্কৃতির (!) বিষাক্ত ফুলটিকে পূর্ণবিকশিত হতে দেখলাম রামজন্মভূমি নিয়ে মাতামাতির সময়। মহারথী লালকৃষ্ণ আদবানী গুজরাটের মাটি দিয়ে রথযাত্রার পথে ছড়িয়ে দিলেন অসংখ্য দাঙ্গা। অচ্যুত ইয়াগনিকের মতে, এই প্রথমবার, নারী ও শিশুকে আক্রমণ ও উৎপীড়নের লক্ষ্য হিসেবে বৈধতা দেওয়া হ'লো। পাশবিকতায় ও বর্বরতায় দাঙ্গাগুলো তখন আরও কলুষিত হয়ে পড়ল।

বিগত দশকে গুজরাট তার ঐতিহ্যকে ম্লান হতে দেয়নি। ক্রমসংঘটিত দাঙ্গায় নারী ও শিশু শুধু আক্রান্তই হয়নি, শয়ে শয়ে খুন হয়েছে, উৎপীড়িত নারী ও শিশুদের মর্মান্তিক অবস্থা দাঙ্গাকারীদের পৈশাচিক উল্লাসে মাতিয়ে রেখেছে,– যা সভ্য সমাজে অচিন্ত্যনীয়। এমনকি গোধরার ঘটনা যাকে গুজরাটের দাঙ্গা ত্বরান্বিত করার অন্যতম কারণ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেখানেও দেখা যাচ্ছে নারী, শিশুরাই আক্রমণের প্রধান শিকার। প্রসঙ্গত ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একজন প্রত্যক্ষদর্শী অফিসারের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে কিছু অংশ তুলে দেওয়া যায়, 'তীব্রতম বিভীষিকা আর আতঙ্কের বিহ্‌লতা দশদিন তখন আমাকে বিবশ করে ফেলেছে। নারকীয় সন্ত্রাস ও গণহত্যার পরে মহাপ্রলয়ে বিধ্বস্ত গুজরাট থেকে আমি ফিরছি।... আমেদাবাদ দাঙ্গার ছোবল থেকে যারা বেঁচে গেছে, সেই মৃত্যুতাড়িত মানুষদের ত্রাণ শিবিরের মধ্য দিয়ে যদি যান, ২৯টি শিবিরে ৫৩ হাজার নারী,

পুরুষ অর শিশুর দলাপাকানো নিদারুণ অস্তিত্ব চোখে পড়বে। অস্বাভাবিক আঘাতে প্রস্তরীভূত শোকবিহ্বল জনসমষ্টির বিকট প্রদর্শনী!... কিন্তু এবার এই ত্রাণ শিবিরের কোন জায়গায় বসলে ওই ত্রস্ত মানুষগুলো কথা বলতে শুরু করবে। উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে মনে হবে বিশাল এক ক্ষতমুখ থেকে রক্তপুঁজের উদ্‌গীরণ। যে অবর্ননীয় বিভীষিকা আর আতঙ্কের কথা তারা বলেন, তা এত তীব্রভাবে পীড়াদায়ক যে মানুষের স্নায়ু সহ্য করতে পারে না।... গত শতাব্দীতে বিভিন্ন দাঙ্গায় এই দেশ লজ্জায়, ঘেন্নায় অধোবদন হয়ে নারী আর শিশুদের ওপরে নির্দয় বর্বরতার যা কিছু দেখেছে তার চাইতে অনেক বেশি সংগঠিত যুব বাহিনীর এবারের নৃশংসতা। এ পাশবিকতার কোনো নজির নেই।...

আটমাসের পূর্ণগর্ভবতী সেই আসন্ন প্রসবা মায়ের আর্তি আপনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কীভাবে অন্যের বোধিতে ঢোকাতে পারেন, যে মা তার সন্তানের ভিক্ষা দিয়ে চেয়ে পৃথিবী কাপানো আর্তনাদে প্রাণভিক্ষা চেয়েছিল? হ্যাঁ, দুটো প্রাণের ভিক্ষা!... তারা সেই গর্ভবতী জননীর পেট চিরে বার করে এনেছিল গর্ভস্থ সন্তান, পরিপূর্ণ অবয়বের মনুষ্য শিশুকে।... ধারালো ত্রিশূলে বিদ্ধ হয়েছিল সেই শিশুর কচি হৃৎপিণ্ড। স্থির মস্তিষ্কে খুবই পরিকল্পিত এই পদ্ধতির কথা সুস্থ মনের মানুষ কীভাবে চিন্তা করবে– যেখানে প্রথমে ১৯জনের পরিবারকে তাদেরই ঘরের উঠোনে অবরুদ্ধ করে, হোস পাইপের তীব্র স্রোতধারায় হাটু অব্দি ডোবানো হলো। তারপর হাই টেনসন বিদ্যুত প্রবাহের চালানে সেই অবরুদ্ধ জলরাশির মধ্যে দণ্ডায়মান, অজানা আতঙ্কের ভয়ঙ্কর আঘাতে প্রস্তরবৎ নারী শিশুসহ ১৯ জনকে হত্যা করা হলো।...

জুহাপাড়র ৬ বছরের সেই অভিব্যক্তিহীন পাথুরে চোখের ছেলেটির কথা শুনুন। যন্ত্রের মতো সেই নারকীয় হত্যার বর্ণনা, শুধুমাত্র লাঠি আর বন্দুকের আঘাতে তার মা আর ৬ ভাইবোনের হত্যাকাণ্ডের প্রলম্বিত প্রক্রিয়ার মধ্য পথে, সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ার দরুণ মৃত ভেবে যাকে ফেলে রেখে প্রমত্ত উল্লাসে ফিরে গিয়েছিল, হত্যাকারীর দল।...

আমেদাবাদের সবচেয়ে উপদ্রুত বসতি অঞ্চলের অন্যতম, নারদা পাতিয়া থেকে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর ছোবল এড়িয়ে ত্রাণ শিবিরে আসা অপ্রকৃতিস্থ, অবিশ্বাসী পরিবারটির কাছে সেই যুবতী মেয়ে আর তার তিনমাসের শিশুর পরিণতির কথা শুনুন। যে নাকি আজন্মলালিত বিশ্বাসে পুলিশকে রক্ষাকারী ভেবে, তারই নির্দেশিত নিরাপদস্থানের দিকে যেতে গিয়ে সোজা পৌছেছিল অপেক্ষমান ত্রিশূলধারীদের বেষ্টনীর মধ্যে। খুব দ্রুত কেরোসিন তেলের প্রস্রবনে অবগাহনের পর তিন মাসের শিশুসহ সেই যুবতী জননীকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করতে সময় লেগেছিল খুবই সামান্য।

আমি এমন কোনো দাঙ্গার কথা জানি না, যেখানে দাঙ্গার হিংস্র হাতিয়ার হিসেবে অকল্পনীয় যৌন-বর্বরতার অস্ত্রে অবিশ্বাস্য ব্যাপকতায় নারীদের ছিন্ন ভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত করে আমূল বিদ্ধ করা হয়েছে। গুজরাটের আকাশে এখনো ভয়াবহ আবিল প্রশ্বাসের এক পাশব-শব্দ আপনাকে অন্তহীন বর্বরতার সন্ধান দেবে।

গুজরাটের দশদিক থেকে আসছে গণধর্ষণের অকল্পনীয় পাশবিক সন্ত্রাসের সংবাদ। কিশোরী বালিকা থেকে যুবতী নারীদের তাদেরই পরিবারের পুরুষদের সামনে পেড়ে ফেলে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণ আর ছুরি, ভোজালী কিংবা ত্রিশূলে বিদ্ধ থাকা বাবা, দাদা, স্বামী বা পুত্রের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণার মধ্যে গভীরতর আরেক যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করার দুঃসহ যন্ত্রণা। মৃত্যুরও তো কিছু সম্ভ্রমের দাবী থাকে। শবদেহে পরিণত হবার আগে পর্যন্ত থাকে পৃথিবীর সব চেয়ে প্রিয়, নিজের জীবন আর বেঁচে থাকার আকুতি। অথচ গুজরাটে দাঙ্গার শবগন্ধী যৌনতা সেই অধিকারটুকু পর্যন্ত মৃত্যুপথযাত্রীদের দেয় নি।

গুজরাট বহুদিন আগেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে পরিত্যাগ করেছে। এই রাজ্যের রাজনৈতিক আত্মায় এখন তাঁর হত্যাকারীদেরই দাপাদাপী। বর্তমানে তারা শুধু গান্ধীজীকে পুনর্বার হত্যা করেই ক্ষান্ত না। তারা তাঁর মৃতদেহের উপর নৃত্য করছে। পাশবিক উল্লাসে মত্ত হয়ে চীৎকার করছে, ওদের অশ্লীল গালিগালাজে দিগ্বদিক কদর্য হয়ে উঠেছে। প্রত্যুত্তরে গান্ধীবাদীরা গুজরাটে নব্য নাৎসী শাসককুলের আঞ্চলিক মাতব্বরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নেওয়ার পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি নিষ্ফলা শান্তি মিছিলে শামিল হয়েছে। কেউই বিস্মিত হন না যখন সংবাদ মাধ্যম জানিয়ে দেয় যে শহরের সবরমতী আশ্রম বিপন্ন মানুষের প্রধান আশ্রয় স্থল না হয়ে কেবলমাত্র নিজেদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষার তাগিদে, আশ্রমের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

গুজরাটের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি ও মানসিকতার অবক্ষয় ও অধঃপতন এত প্রকট যে তা ঐ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়। কেবল নির্লজ্জের মত দাঙ্গার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করেই তিনি ক্ষান্ত থাকেননি। এমন অশ্লীল মন্তব্য তিনি করেছেন যা সভ্য নাগরিক সমাজের কলঙ্ক। দাঙ্গার স্বপক্ষে তার সাফাই গাওয়া অনেকটাই সার্বিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি স্লোবোদান মিলোসেভিচের সাফাই গাওয়ার মত। মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ সংঘটিত করার দায়ে অভিযুক্ত এই গণহত্যাকারী বর্তমানে বিচারের মুখোমুখি। আমি প্রায়ই অবাক হই কেন ভারতে এবং ভারতের বাইরে মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় গোষ্ঠীগুলি এখনও পর্যন্ত মোদীর বিরুদ্ধে গণহত্যার দায়ে আন্তর্জাতিক সমন জারি করতে পারল না। মোদীর কর্মকাণ্ড যদি ঘৃণ্য অপরাধ বলে ঘোষিত না হয়, তবে অপরাধের সজ্ঞা কী?

এক দশকেরও আগে এই নরেন্দ্র মোদী যখন আর.এস.এসের প্রচারক ভিন্ন আর কিছু ছিলেন না, যখন তিনি বিজেপির একজন স্বল্প সময়ের কর্মী ছিলেন। আমার সুযোগ হয়েছিল অচ্যুত ইয়াগনিকের সাথে নরেন্দ্র মোদীর এক সাক্ষাৎকার নেওয়ার। অবশ্য ইয়াগনিককে সৌভাগ্যবশতঃ এখন আর মোদী চিনতে পারেন না। (সৌভাগ্যক্রমে বলছি এই কারণে যে, মোদী ইয়াগনিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং পরবর্তী কালে তার কাজকর্ম ও লেখালেখি সম্পর্কে ধূর্তের মত অশালীন মন্তব্য করেছেন)। প্রসঙ্গত সেই

সাক্ষাতকারে ফিরে আসি। এই সাক্ষাতকারটি ছিল দীর্ঘ এবং বিভ্রান্তিকর; এরপর আমার মনে সামান্য সন্দেহও ছিল না যে মোদীএকজন হাড়ে মজ্জায় ফ্যাসীবাদী। আমি কখনও 'ফ্যাসীবাদী' কথাটাকে গলাগালি হিসাবে ব্যবহার করিনি। আমার কাছে এটা একটা diagnostic category যার মধ্যে কেবলমাত্র কোনো মানুষের ভাবগত ধরণ ধরণই থাকে না, থাকে ব্যক্তিত্বের ধরণ-ধারণ এবং মনোজাত ঢং যা নির্দিষ্ট ভাবাদর্শের সঙ্গে মানানসই। মোদী সম্পর্কে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তার চরিত্রের মধ্যে স্বৈরাচারী ব্যক্তিত্বের প্রায় সবগুলি বৈশিষ্ট্য উপস্থিত যা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোসমীক্ষক বা মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা দীর্ঘ গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতায় স্বৈরতন্ত্রী ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ করেছেন। তার চরিত্রের মধ্যে বেড়ে উঠেছে বদ্দসংস্কারে জারিত এক সন্দিগ্ধ মানসিকতা, নীতি বাগীশের ক্ষতিকর অনমনীয়তা, জীবন সম্পর্কে আবেহীন সঙ্কীর্ণতা, আত্মপ্রচারমুখিনতা এবং অবশ্যই হিংসার উদ্ভট কল্পনা বিলাস। আমি এখনও স্মরণ করতে পারি কত ঠাণ্ডা মাথায় মাপা মাপা শব্দ চয়ন করে তিনি বর্ণনা করেছিলেন– কেমনভাবে ভারতের হিন্দুদের আক্রমণ করার চক্রান্ত চলছে। প্রত্যেক মুসলমান কেমন বিশ্বাসঘাতক এবং সন্ত্রাসবাদী। মনে পড়ে, সাক্ষাৎকারের শেষে আমি ভীষণ উদগ্রীব হয়ে ইয়াগনিককে বলেছিলাম– আমি আর একজন কট্টর ফ্যাসিস্তকে দেখলাম, এতো দেখছি একদিন নরহত্যাকারী জল্লাদে পরিণত হবে।

বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতের গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যেভাবে আবর্তিত হয়েছে তারই সুযোগ নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর মত মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে আসীন হয়েছে। ভবিষ্যত দিনগুলিতে আমাদের সে সর্বনাশের প্রহর গুণতে হবে তা ভেবে আমি শংকিত হচ্ছি।

গুজরাটের দাঙ্গাগুলো ভারতীয় রাজনীতিতে এক নূতন পর্যায়ের সূচনা বলে চিহ্নিত হলো। আমরা কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদের কথা বলে থাকি এবং পাঞ্জাবে উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদকে কেমন করে স্তিমিত করেছি তাও গর্বভরে আলোচনা করি। এই জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছে বা জঙ্গীদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তারা জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র। যদি এটাই মনে করি যে পাকিস্তানের আই. এস. আই. এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীর উপত্যকার সমগ্র জনগণকে জংগী, সন্ত্রাসবাদী করে তুলেছে, তবু এটা ভুললে চলবে না যে কাশ্মীরের জনসংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ যা দিল্লী শহরের একতৃতীয়াংশ মাত্র।

গুজরাটের সাম্প্রতিক হিংস্রতা থেকে উদ্ভূত প্রবণতাগুলি অন্য যে কোনো রকম হিংস্রতা থেকে আলাদা। দেশভাগের সময়ের দাঙ্গাগুলির মতই তার সুদূরপ্রসারী চরিত্র। আবার অন্যদিক দিয়ে তর্কের খাতিরে বলা যায় দাঙ্গাগুলি এই প্রথম ভিডিওতে জায়গা করে নিল– অর্থাৎ টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনেই দাঙ্গা গুলি ঘটে চলল– এর প্রভাব সারা দেশজুড়ে ও আন্তর্জাতিকভাবে পড়বে। ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুরা জাতি

বিশষুদ্ধকরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা সচক্ষে দেখেছেন, দেখেছেন কেমন করে মুসলমান সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত সংঘটিত হয়েছে। আর গুজরাটী মুসলমানদের মধ্যে যে বেপরোয়া মনোভাব জন্ম নিয়েছে, সেটা অন্যত্রও সংক্রামিত হতে পারে।

আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে আমরা আমাদের দেশের ১২ কোটি মুসলমানদের সম্পর্কে কী ভাবব, যখন তাদের অভিজ্ঞতা কি এবং তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রায় বেপরোয়া হয়েছে উঠেছে। অদূর ভবিষ্যতে অন্তত পক্ষে গুজরাটেরও কি প্যালেস্তাইনের দশা হবে? আপাতদৃষ্টিতে মোদী তার কাজ (!) করলেন। সংঘ পরিবারের দ্বিজাতি তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে একটি আবর্জনা যা ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষকে দ্বিতীয়বারের জন্য ভাগ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে, এবার মনের ভাগটা হলো। আমাদের, আমাদের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনির– সর্বোপরি, গুজরাটিদের গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা শিখে নিতে হবে। সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হানাহানির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার জন্য গুজরাটের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অনেক চড়া মূল্য দিতে হবে।

সেমিনার, মে-২০০২, Society Under Seize সংখ্যায় প্রকাশিত 'Obituary of a culture' নিবন্ধ

ভাষান্তর : পাঁচু গোপাল মণ্ডল

বাৎসল্য ও প্রতিহিংসা : হিন্দু জাতীয়তাবাদে নারী

মনীষা শেঠি

রামজন্মভূমি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে আর এস এস, ভি এইচ পি, বিজেপির যে ছবিটি বারবার জনমানসে ছায়া ফেলেছে তা হল সাধ্বী ঋতাম্ভরা এবং তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ, যা সর্বত্র বিপুল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের যে পুরুষতান্ত্রিক আদর্শ, সেই আদর্শকে মূলধন করে ঋতাম্ভরা শুধু পুরুষ শ্রোতাদের পৌরুষই জাগ্রত করেননি "বাবরের ছেলেমেয়েদের" বিরুদ্ধে, বহু সংখ্যক মহিলাকেও আনতে পেরেছেন কর সেবায়, মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক, এবং এমনকি, যৌন আগ্রাসনেও।

অযোধ্যায় দু'লক্ষ করসেবকদের মধ্যে পঞ্চান্ন হাজার ছিলেন মহিলা, মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তাঁদের উপস্থিত ছিল সর্বাধিক। ভি.এইচ. পি-র মহিলা সংগঠন 'দুর্গাবাহিনী'র বিতরণ করা প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, এই 'অগ্নিপরীক্ষা'র সময়ে মহিলাদের অবশ্যই 'বীরাঙ্গনা' এবং 'রণচণ্ডী'র রূপ ধারণ করতে হবে। বহু শহরে হিংসা ছড়ানো

আক্রমণাত্মক মিছিলগুলির পুরোভাগে দেখা গেছে নারীদের। ভি.এইচ. পি সমর্থিত 'পোগ্রোম' বা সরকার সমর্থিত সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের পক্ষে বিপুল সমর্থন আদায় করতে পেরেছে এই ঘটনা। যে বুদ্ধিজীবীরা এযাবৎ শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক এবং নারীবাদী ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁদের ভাবনাচিন্তা এই উগ্র বাস্তবতায় বিরাট ধাক্কা খেয়েছে। বিভাজন রেখা দেখা গিয়েছে অন্যান্য সাধারণ মহিলা সংগঠনগুলির সঙ্গেও।

উগ্র নারীত্বের বিশ্লেষণ হিসাবে বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রায় সব লেখকই এই উগ্রতার কারণ হিসাবে সমাজ ও জাতির সাম্প্রদায়িকীকরণকে দায়ী করেছেন। কিন্তু আরো বেশি ফলপ্রসূ হতো সেইসব প্রক্রিয়া এবং সংগঠনগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রে যেগুলি অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ সময়ে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করেছে হিন্দু জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দু জাতীয়তাবাদী নারী হিসেবে 'রামভক্তে'র রূপ পরিগ্রহ করতে। 'রামভক্তে'র অবস্থান তাঁদের দিয়েছে এক উগ্র, প্রতিশোধপরায়ণ, আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গি, যা আবার ঐতিহ্যবাহী ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরম্পরাকে উল্লঙ্ঘন করে না।

এই রচনায় আমাদের লক্ষ্য হবে সেইসব অশুভ পথগুলিকে চিহ্নিত করা যেগুলির মধ্যে 'সেবিকা সমিতি' অতি বিশ্বস্ত নারী সদস্য তৈরি করে এবং 'দুর্গাবাহিনী' সেই সদস্যদের অগ্নিময়ী দেবী দুর্গার নামে সংহত করতে সমর্থ হয়।

উগ্র হিন্দুনারীর রূপকল্প পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ আর বিংশ শতাব্দির প্রথমে আসা জাতীয়তাবাদে, সক্রিয় যোদ্ধা নারীর অস্তিত্ব এ সময় অনুভূত হচ্ছে। অন্যদিকে চিরাচরিত 'জনমদুখিনী'র আদর্শ, যা প্রকৃতপক্ষে সব স্ত্রীরূপকল্পেরই প্রাথমিক গঠন, তাও পাশাপাশি বিদ্যমান ছিল। নারীত্বের প্রকৃতি নির্মাণে, তা উগ্র হবে কি নম্র, পুরুষ প্রকৃতির এক অদ্ভুত অবদান আছে, কারণ প্রকৃত পৌরুষের অভাবেই বিভিন্ন সময়ের নারীভাবমূর্তির কাঠামো তৈরি হয়।

সত্ত্বা ও সংগঠনের প্রশ্ন

পৃথিবীর কোনো সমাজেই সরল, একমাত্রিক লিঙ্গ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই। ব্যক্তির বহুমাত্রিক ক্রিয়াকলাপ, আলোচনার সাপেক্ষে বিভিন্ন লিঙ্গের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়; এই অবস্থানগুলিও তাই বহুমাত্রিক। এহেন সামাজিক প্রক্রিয়ার বশবর্তী হয়ে মেয়েরা বলি বা পণ্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে গেছেন। বিভেদসৃষ্টিকারী আরো বহু অস্তিত্ব, যেমন, শ্রেণী, জাত, ধর্ম ইত্যাদিও লিঙ্গভেদ প্রথার অন্যতম মাত্রা যোগ করেছে। তাই যখনই আমরা সমৃদ্ধ নারী বা পুরুষ হওয়ার বিভিন্ন পন্থার কথা আলোচনা করি, বিভিন্ন ভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিও সেইসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়ে। জাত এবং শ্রেণীগত মতাদর্শ লিঙ্গ বৈষম্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার, স্ত্রী যৌনতাকে সম্মান দিয়ে মায়ের ভাবমূর্তিতে জাতিরাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের তত্ত্বকে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাতি বা শ্রেণীর লিঙ্গভেদপ্রথায় নিমজ্জিতকরণ একটি সত্যকেই পরিস্ফুট করে সেটি হল– ব্যক্তিসত্ত্বার প্রশ্নটি প্রায় অনিবার্যভাবেই ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

লিঙ্গভেদ প্রথা তাই, প্যাট্রিসিয়া উবেরয়ের (Pactricia Úberoi) মতে, ক্ষমতার সমীকরণে একটি নির্ণায়ক হিসাবে কাজ করে।

বিভিন্ন লিঙ্গের ব্যক্তিগুলির স্ব-উপস্থাপনার প্রক্রিয়া, সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোগুলি সৃষ্টি বা পরিবর্তনের রাস্তাগুলি বুঝতে গেলে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে হবে।

অন্যান্য তত্ত্বের মতো, সংগঠনও একটি লিঙ্গভেদমূলক ধারণা। যৌনতা এবং লিঙ্গবৈষম্যের উপরে পুরুষ বা নারী প্রকৃতি নির্ধারিত হয়, আবার বিভিন্ন সতংগঠনিক ক্ষমতায় সেই প্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করে। বহু সংস্কৃতিতে পুরুষ প্রকৃতির সঙ্গে উদ্যম, আগ্রাসন এবং উগ্রতা আর নারী প্রকৃতির সঙ্গে নিষ্ক্রিয়তা, দাসত্ব এবং গ্রহীতাবৃত্তির উচ্চকিত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

শেরি ওর্টনার (Sherry Ortner) মহিলাদের তথাকথিত সাংগঠনিক অদক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত থাকা ধারণা যা নারীকে প্রকৃতির আর পুরুষকে সভ্যতার কাছাকাছি বলে মনে করে, তাকে দায়ী করেন। এইভাবেই, নারীরা গার্হস্থ্য জীবন আর পুরুষেরা সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতিভূ হয়ে বিবেচিত হন। মিশেল রোসাল্ডো (Michele Rosaldo) নারী পুরুষের এই গৃহ-সমাজ এবং প্রকৃতি-সভ্যতার বৈপরীত্য থেকে উদ্ভুত অবস্থানগত পার্থক্যের উৎস হিসাবে নারীর মা এবং সন্তানপালনকারিনীর ভূমিকাকে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি গার্হস্থ্য জীবনের কেন্দ্রে মা-সন্তান আর সামাজিক জীবনের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় পুরুষ পরিচালিত বিভিন্ন পদসম্বলিত সংস্থা বা সংগঠনের ক্রিয়াকলাপকে রেখেছেন, যা মা-সন্তান কেন্দ্রীক কর্মকাণ্ডকে অধীনস্থ করে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যাবলী, মূলধনভিত্তিক শিল্পায়নের উপর ক্রমবর্দ্ধমান গুরুত্ব, জন্মদাত্রী হিসাবে নারীর ভূমিকার ক্রমঅবমূল্যায়ন এবং ঘর ও ঘরের বাইরের কাজগুলিতে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন, শুধু মহিলা সংগঠনগুলির সম্ভাবনাই বিনষ্ট করে না, তা এই ধরণের বিভেদমূলক সামাজিক ব্যবস্থাকে কোনো প্রশ্ন করারও অবকাশ দেয় না। রাষ্ট্র, ব্যক্তিসম্পর্ক, স্থানীয় ক্ষমতান্তরগুলির অসম্পূর্ণতা বা ব্যর্থতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইলে নীরবতা ফেরৎ আসে। মুক্ত, বাজারী, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঠিক একই ভাবে দেশীয়, নিজস্ব অর্থনীতির উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করছে।

সমাজের এই দ্বিত্বঅস্তিত্ব আধুনিক জীবনের উপহার, যাকে উনবিংশ শতকের পশ্চিমী সমাজতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া বোঝা যাবে না। উনবিংশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধের সমাজতাত্ত্বিকরা নারী-পুরুষ সম্পর্কের রূপান্তর, যা পারিবারিক কাঠামোতেও ধরা পড়ছিল, অনুধাবন করে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসন্ন মনে করেন। নারী-পুরুষ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতি হিসাবে মাতার অধিকার অবশেষে পিতার অধিকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এই ঘটনাই 'অধিকার' শব্দটিকে নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা দিয়ে সব ঐতিহাসিক বদলগুলির মূল কারক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নতুন তত্ত্ব হিসাবে যা

প্রতিষ্ঠিত হল তাতে নারী গৃহের এবং পুরুষ পেলেন সামাজিক প্রভূত্বের একচ্ছত্র অধিকার। স্বীকৃত গণমাধ্যম এবং সংস্থাগুলি পুরুষের আয়ত্তে চলে আসে, নারীরা শুরু করেন রীতিবহির্ভূতক্ষেত্রে ক্ষমতার ব্যবহার। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যা পূর্বে বলা পারিবারিক ধারণারই বর্ধিত অংশ, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনের এই বিভাজনকে আরো স্পষ্ট রূপরেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র নিজেই যেন একটি পুরুষ এবং পরিবারের প্রধান। বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাও নারীকে শুধুমাত্র গ্রহীতার ভূমিকাতে দেখা কিন্তু উচিৎ হবে না; তাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতার পুনরুজ্জীবন সম্ভব এবং সেই ক্ষেত্রে চিরাচরিত সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাজগুলির স্রোত বাধা পেতে পারে। নারীদের সামাজিক ভূমিকা, প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা গৃহে যে ভূমিকায় থাকেন, তারই রাজনীতিকরণ বলা যায়। সংগঠন তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু আপত্তি বা সম্মতিকে তুলে ধরে; যার মাধ্যমে তাঁরা স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে সমর্থ হতে পারেন আবার নাও পারেন।

পিতৃতন্ত্র অসাম্য ও অধীনতামূলক অন্য যে কোনো ব্যবস্থার মতোই কাজ করে। তার ভিত হল দমন, পীড়ন এবং নারীদের সমর্থন, যা বিভিন্ন মাত্রায়, ছড়িয়ে থাকা সমাজের নানা অংশ থেকে আদায় করা হয়। এইভাবে তৈরি হয়, গ্রামচির (Gramsci) ভাষায়, একতন্ত্র। প্রকৃত 'সমর্থন' চেনা এবং আদর্শগত আধিপত্যের আন্তর্জাতিকীকরণ আবার মেকী সচেতনতা ও নিজ স্বার্থের ভ্রান্ত মূল্যায়নের জন্ম দিতে পারে। এই বাস্তবতা এড়াতে সামাজিক স্তরগুলি বুঝে, সেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীকে চিহ্নিত করা দরকার যেগুলি পিতৃতন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে এবং ক্ষমতা রাখে আদর্শগত ও বাহ্যিক আচরণগুলিকে এমনভাবে বদলাবার যাতে পিতৃতন্ত্রের আয়ু ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

পিতৃতন্ত্রের পক্ষে 'সমর্থন' ঠিক কীভাবে সমাজ থেকে আসে তা জানত গেলে 'বিনিয়োগ' ও 'ক্ষতিপূরণ'-এর আপেক্ষিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করতে হবে। পেরো এত অল (Perrot et al)-এর মতে নারীরা বাধ্য স্ত্রী এবং কর্তব্যপরায়ণ মায়ের ভূমিকা পালন করেন বিনিয়োগের একটি পন্থা হিসাবে, এবং তার মাধ্যমে তাঁরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছু সুবিধা আদায় করতে সমর্থ হন। এই সুবিধাগুলি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের বহুস্তরীভূত সামাজিক অসাম্যকেও মেনে নিতে হয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতো বিষয়ের সঙ্গে নারীদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গেলে এই সত্যটি মাথায় রাখতে হবে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী নারীর পরম্পরা

হিন্দুধর্মের সক্রিয় নারীদের উপর সাম্প্রতিক রচনাগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে লেখকরা মেয়েদের সক্রিয়ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার ভূমিকাটি 'রামজন্মভূমি' আন্দোরনের সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবে, নারীশক্তির এহেন প্রকাশ খুব নতুন নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আসা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ভারতীয় বা হিন্দু নারীর রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। ঐ সময়ে

সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্করকেরা নারীকে কেবল বীজরোপনের জমি হিসাবে নয়, তাঁদের কর্মক্ষেত্রেও সক্রিয় কর্মী হিসাবেও দেখেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, পার্থ চ্যাটার্জির মতে, নারীদের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং নারীবাদী বিষয়ে, অন্যদিকে ছিল সামাজিক, বস্তুবাদী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই রকম কঠোর বিভাজন বাস্তবে সম্ভব নয়, আর নারীদের অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্ন এহেন বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে– এই ধারণাও সঠিক নয়। গণবিতর্কে বরং তাঁদের কর্ম ও অধিকারমূলক প্রশ্ন আরো বেশি করে উঠতে থাকে।

নারীরা, তাঁদের সংগঠন, যৌনতা, এসবই জাতীয়তাবাদীর আন্দোলনে ক্রমশ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ঐতিহাসিকরা উচ্চবর্ণের পুরুষ সমাজ-সংস্কারকদের উপরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আড়ালে থেকে গেছে সেইসব সমালোচনামূলক প্রবন্ধ, যা মূলতঃ পশ্চিমভারতে, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের দ্বিচারিতার মূলে কুঠারাঘাত করে। নরীশিক্ষাই হোক, বা বিধবা নারীদের সন্তানদের জন্য অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই হোক; বর্ণভেদ প্রথা, লিঙ্গ বৈষম্য ইত্যাদি নিয়ে জ্যোতিবা ফুলের অনুপুঙ্খ প্রবন্ধ সরাসরি ব্রাহ্মণ সংস্কারক এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ফুলের কণ্ঠস্বর এই অস্বস্তিকর সত্যকেই স্পষ্টতা দেয় যে নারীদের অধিকারসংক্রান্ত প্রশ্ন তখনও জাগ্রত।

বিভিন্ন ঘরোয়া সামগ্রী, যেমন, চরকা, খাদিবস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে গান্ধী যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নারীদেরও সংগ্রাম হিসাবে চিহ্নিত করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের মতো আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ সামাজিক স্বীকৃতি পেল। একই সময়ে, কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে, আরেকটি পুরুষতান্ত্রিক স্রোতও বহমান ছিল যা চারিত্রিকভাবে উগ্র হিন্দু এবং আপোষবিমুখ। হিন্দু মহাসভা এবং আর্যসমাজ পরিচালিত 'শুদ্ধি' এবং 'সংগঠন' প্রক্রিয়াগুলি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উচ্চাশা এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সময়ে সংগঠিত হওয়া মুসলিমদের সম্পর্কে আতঙ্কই প্রতিফলিত করে। মুসলিমদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্ব এবং ল্যান্ড এ্যালাইনেশন এ্যাকট (১৯০১) কংগ্রেসের উগ্র হিন্দুদের স্বার্থে আঘাত করে।

এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে হিন্দুদের সংখ্যার ক্রমপতন, যা ঔপনিবেশিক জনগণনায় প্রতিফলিত হয়। 'মুমূর্ষু জাতি' হিসাবে হিন্দুদের অভিহিত করা শুরু হল। ইউ.এন. মুখার্জীর 'হিন্দুস : এ ডাইয়িং রেস' এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'হিন্দু সংগঠন : সেভিয়ার অফ এ ডাইয়িং রেস', বই দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। হিন্দুদের শারীরিক অসামর্থের সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক অসামর্থ্য এবং নিষ্ক্রিয়তাকে সম্পর্কিত করা হল। পাশাপাশি মুসলিমদের উগ্র প্রজনন ক্ষমতা এবং উগ্রতার প্রতি প্রবণতা, তাঁদেরকে করে তোলে বৃটিশদের থেকেও ঘৃণিত এবং বিপজ্জনক। মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য হিসাবে উগ্রতাকে চিহ্নিত করা হতে লাগল, তা সে যৌন উগ্রতাই হোক বা সামরিক।

১৯২৪-এ আর্যসমাজীরা 'রঙ্গীলা রসুল' নামে একটি উর্দু পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সেই বইটিতে মহম্মদের যৌন পছন্দ ও জীবনের এক বিকৃত এবং অনুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া হয়–

যদি অসুস্থ হও, বিবাহ কর!

যদি নিভন্ত প্রদীপকে আবার প্রজ্জ্বলিত করতে চাও, বিবাহ কর।

যদি মেয়েটি সুন্দরী হয়, বিবাহ কর!

যদি মেয়েটি বিত্তশালিনী হয়, বিবাহ কর!

বাগিচার ফুলগুলি বুলবুলকে মুগ্ধ করুক, আমি মুগ্ধ আমার রঙ্গিলারসুল এর মোহে...

আর্য সমাজ, হিন্দু মহাসভা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ মুসলিমদের হাতে, আলাউদ্দীন খিলজীর সময় থেকে শুরু করে, হিন্দু নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরিতকরণের মিথ প্রচার করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। মূলতঃ হিন্দু বিধবাদের মুসলিম লালসার লক্ষ্য হিসাবে দেখানো শুরু হয়, কারণ বৈধব্যের কারণে তাঁরা সঙ্গীহীন থাকতে বাধ্য হতেন, অবদমিত থাকত তাঁদের বাসনা। উনিশ শতকের অসূর্যম্পশ্যা, পবিত্র, যৌনবাসনাহীন হিন্দু নারীর চিত্রে সেই প্রথম ফাটল ধরে, যে ছবিটি ইসলামিক এবং পশ্চিমী প্রভাবেও অটুট। এই বাস্তবতা হিন্দু বিধবা নারীদের শুধু রক্ষণই নয়, তাঁদের আচার-আচরণ সবরকমভাবে নিয়ন্ত্রণ করার আবশ্যিকতাকেও সামনে তুলে ধরে, বিধবাবিবাহের প্রশ্নটি সামাজিক গুরুত্ব পায়, এমনকি দয়ানন্দের 'নিয়োগ' প্রথা (যে প্রথা বিধবা হিন্দুনারীদের প্রজননক্ষমতা পরিচর্যার মাধ্যমে তাঁদেরকে সম্ভাব্য ধর্মান্তরের হাত থেকে রক্ষা করে), একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করল।

শুধুই সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, যথেষ্ট গুণসম্পন্ন হিন্দু সন্তানসন্ততি প্রয়োজন অনুভূত হল, যারা ভয়শূন্য হৃদয়ে হিন্দু মহিলাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারবে। হিন্দু মহাসভার সচিব দেবরতন শর্মা বললেন, "এই কাপুরুষ জনসাধারণের দেশ থেকে কীই বা আশা করা যায়? কোহাট, সাহারানপুর, মালাবার এবং আজমীর এর ভয়ঙ্কর ঘটনা যখন ঘটল তখন এরা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।"

হিন্দু নারীরা প্রজননশীল এক আধার হিসাবে বিবেচ্য হলেন। যাঁদের গর্ভ হতে ভবিষ্যৎ হিন্দু যোদ্ধাদের জন্ম হবে। হিন্দু নিবীর্যতাকে পলায়নপর মনোবৃত্তিরূপে অভিহিত করে ঘোষণা করা হল সেই কাজ ও প্রস্তুতির যাতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বিজয় লাভ সম্ভব হয়। প্রচার করা হল যে হিন্দুদের মান আর্য ঐতিহ্য সাপেক্ষে ভয়ঙ্করভাবে নিম্নগামী হয়েছে এবং এই পতন রুখতে বীর্যবান, তেজস্বীপুরুষ এবং শিক্ষিতা, আধ্যাত্মিক চেতনা স্বপন্ন নারী প্রয়োজন। মারাঠা, শিখ, রাজপুতদের মতো সম্পদায়রা, যাদের মুসলিম শাসনকর্তাদের মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে, এক এবং অভিন্ন হিন্দু অস্তিত্বের অংশরূপে তারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দু বীরত্বকে পূর্ণ মহিমায় বিকশিত করতে তাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্যবাদ নিষিদ্ধ হল ক্ষত্রিয়ধর্মে। যদি মুসলিম এবং ইংরেজ অপশাসনে হিন্দু তেজস্বীতা নষ্ট হয়ে গিয়ে

থাকে তবে যুদ্ধ করেই, ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং আরো বেশি করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে, সেই গৌরব ফিরে পেতে হবে। এক ইউরোপীয়ান মহিলা, সাবিত্রী দেবী, যিনি ভারতে বসবাস শুরু করেন এবং আর্য আধিপত্যে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। এক জায়গায় লিখলেন, "দিন দিন এটা আরো স্পষ্ট হচ্ছে যে হিন্দুদের জাতীয়তাবোধের চেতনা উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সামরিক গুণগুলিকেও পুনরুদ্ধার করতে হবে; হিন্দুদের একটি সামরিক জাতিরূপে পরিচিত হতে হবে।"

শরীরগঠনের চেতনা জাগ্রত হল। শারীরিক শক্তিবৃদ্ধি অপরিসীম গুরুত্ব পেল। জায়গায় জায়গায়, আখড়া গড়ে তুলে লাঠি ও তলোয়ার চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে লাগল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে এই বীর্য বা তরুণরাই এগিয়ে যেতেন।

এই প্রেক্ষাপটে পুরুষ আধিপত্যের দুটি ধারা সৃষ্টি হল। একটি অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্গের হিন্দু পুরুষদের মধ্যে বহমান হয়, যাঁরা তাঁদের পৌরুষের লজ্জাহীন প্রদর্শন শুরু করেন, তা সে যুদ্ধেই হোক বা যৌনতায়। অন্যটি দেখা গেল সেই পুরুষদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের যৌনশক্তির উত্তরণ ঘটালেন আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং শারীরিক সংযমের মাধ্যমে। পৌরুষ ছিনিয়ে আনতে হবে মুসলিম অধিকার থেকে– এই ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চিরাচরিত কাপুরুষ হিন্দু এবং বীর্যবান মুসলিমদের স্থান বদল করে দেওয়া হল সাহিত্যে, কবিতায় এবং প্রচারমূলক পত্রপত্রিকায়। হিন্দু পুরুষ শুধু হিন্দু নারীর কাছেই নয়, মুসলিম নারীর কাছেও ঈপ্সিত– তবে সেই আবেদনকে রুখতে হবে আত্মসংযম দিয়ে। গোলওয়ালকর লিখলেন এক মুসলিম নটীর কথা যার প্রেম তাঁতিয়া টোপী দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছিলেন। আর. এস.এস.-এর মুখপত্র, 'অর্গানাইজার', এমত প্রচার শুরু করল যে মুসলিম নারী হিন্দুপুরুষকে বিবাহ করতে চান শুধু এই জন্যেই নয় যে তিনি বীর্যবান, উপরন্তু, এই বিবাহের মাধ্যমে সেই নারী মুসলিম সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশি স্বাধীনতা, সম্মান এবং উদারতাও পাবেন বলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষ অবস্থানেও এক বদল আনতে পারল। যদি মুসলিম নারীদের যৌনতা এবং প্রজননশক্তি হিন্দুপুরুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে তার চেয়ে বড় জয় হিন্দুজাতির কাছে আর কিছুই হতে পারে না।

তবে, নারীরা কি শুধুই নিছক অলঙ্কার হয়ে থাকবেন? থাকবেন একটি জাতির লজ্জা বা সম্মান এর চিহ্ন হয়ে বা চিরাচরিত শিকার বা লক্ষ্যবস্তু হয়ে? না, বরং তাঁদেরকে হতে হবে আত্মরক্ষায় সমর্থ বীরনারী। অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিতা হয়ে হিন্দু নারী মুসলিম অসুরকে বধ করছেন, এমন রূপকল্পের চর্চা শুরু হল। 'সংগঠন' এর প্রচারমূলক প্রস্তিকা, 'সংগঠন কা বিগু' তে নারীরা বললেন, "সংগঠন নামক বিপ্লবের সদস্য হিসাবে যে যে ভগিনীরা যোগদান করবেন, তাঁরা প্রত্যেকে নিজেদের কাছে এক-একটি ছোরা রাখবেন যা প্রয়োজনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করা যায়... 'সংগঠনে' থাকার প্রাথমিক ধর্মীয় দায়িত্ব হল নিজ নিজ সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া।"

হিন্দুনারীরা যে এই আদর্শে রীতিমতো উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তা অনুধাবন করা যাবে সরলা দেবীর কাজে। বঙ্গ দেশের এই মহিলা বাঙালী পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত নিয়েছিলেন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্থানীয় বীরপুরুষদের কীর্তি প্রচার এবং অস্ত্রচালনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করে। এই প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠ'-এর শান্তির কথা মনে পড়বে, শান্তির মত সরলাও বিবাহের পর গার্হস্থ্যজীবনই বেছে নিয়েছিলেন।

বিশ শতকের প্রথমে নারীশিক্ষার সংরক্ষণশীল জগতেও এক পরিবর্তন আসে। উত্তম স্ত্রী বা মা তৈরি নয়, বীরাঙ্গনা সৃষ্টিই হয় নতুন লক্ষ্য। আর্যসমাজ কর্তৃক পরিচালিত 'পাঞ্চাল পণ্ডিত' নামের মাসিক পত্রিকায় 'সুবীরা' নামে এক নায়িকা জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'সুবীরা' হল সেই সাহসিকা যে নিজ ধর্মের নীতিতে একনিষ্ঠ থেকে দক্ষতার সঙ্গে আধুনিক অস্ত্র চালনাও করতে পারে।

এই ধরণের স্ত্রীচরিত্রই আজকের ঋতাম্ভরা বা উমা ভারতীর উত্তরসূরী। নম্র, পেলব নারীর জায়গা নিয়েছে নিয়মিত পরিচর্যায় গড়ে তোলা সুগঠিত হিন্দু নারী। এঁরা অস্ত্রছাড়া লড়তে পারেন, জানেন আগ্নেয়াস্ত্র চালনাও। হিন্দু ধর্মের অগ্নিময়ী, প্রহরণধারিণী মাতৃমূর্তিরা, যেমন, কালী, দুর্গা, এদের উপাস্য। ঝাঁসীর রাণীর মতো ঐতিহাসিক বীরাঙ্গনার চরিত্রও তাঁদের কাছে পান দেবীদের সমান সম্ভ্রম।

যোদ্ধানারী কিন্তু তাঁর মা বা স্ত্রীর ভূমিকা বিস্মৃত হননি; কারণ হিন্দু মা বা স্ত্রীর ভূমিকাই তাঁদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রবেশপথ দিয়েছে। হিন্দু পুরুষর পৌরুষ, এবং ধর্ম ও নারীকে রক্ষা করার ক্ষমতাকে প্রতিস্পর্ধা জানাচ্ছে বীরনারীদের এহেন ভূমিকা। উগ্র নারীদের উদ্দেশ্য মুসলিম শিকার করে হিন্দু পুরুষের হৃদয়ে বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারণ করা।

'মা'র ভূমিকায় নারীরা সন্তানদের মধ্যে নির্ভীকা, দেশপ্রেম এবং মুসলিম বিদ্বেষ চারিয়ে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো জায়গায় আছেন। কিন্তু বীর সন্তান তৈরি করতে গেলে নীরব, নির্যাতিত, দেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে অজ্ঞ মা নয়, চাই ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক জ্ঞানসম্পন্ন আত্মবিশ্বাসী মা। দুঃখভরে সাবিত্রী দেবী লিখছেন, "রাজনৈতিক শিক্ষা এবং জাতীয়তাবোধের অভাবই মেয়েদের দেশের সমস্যা সম্পর্কে নিরাসক্ত করে রাখল।" হিন্দু নারীদের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, "মুসলিম অত্যাচারকে ব্যক্তিগত পর্যায়ের আঘাত হিসাবে নিতে হবে, শুধুই কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের অসম্মান নয়, সমগ্র হিন্দু জাতির প্রতি অশ্রদ্ধাই জ্ঞাপন করবে কোনো হিন্দুর উপর মুসলিম অত্যাচারের ঘটনা, তা সেটি যেখানেই ঘটুক না কেন। নারীরা ঘৃণাভরে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের পুত্র, স্বামী বা ভ্রাতাদের বলবেন সেই অপমানের সমুচিত জবাব দিতে। ছোটো ছেলেরা 'ম্লেচ্ছ' এবং ভারতীয় সৈন্যের পুতুল নিয়ে খেলছে কিনা বা মেয়েরা দুর্গাবতী, পদ্মাবতী, এবং লক্ষ্মীবাই-

এর আদর্শে বড় হচ্ছে কিনা সেটা দেখা এই মায়েদের কর্তব্য।" 'ইজ্জৎ' বা সম্মানের গুরুত্ব শিরোধার্য করে। পারিবারিক ও দেশের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে নারীরা এই শক্তিক্ষেত্র তৈরি করবেন।

সাবিত্রী দেবীর বক্তব্য অন্য একটি কারণেও আগ্রহব্যঞ্জক; ইউরোপীয়ান মহিলারা লুপ্ত আর্য সভ্যতায় গৌরব স্মরণ করেন রোমান্টিক দ্যোতনায়, তাঁদের চেষ্টা থাকে সমকালীন রাজনৈতিক আবহে সেই গৌরব ফিরে পাওয়ার। সিস্টার নিবেদিতা, এ্যানি বেসান্ত এবং সাবিত্রী দেবী এই গোত্রের ইউরোপীয়ান মহিলা। 'সঙ্ঘ' সাহিত্যে এঁরা প্রণম্য নারী, 'সেবিকা সমিতি'তে উপাস্য।

সমিতির' নারীরা এবং 'দুর্গা বাহিনী'

'সমিতি' প্রতিষ্ঠা করা হয় এক বিজয়াদশমীতে, যে দিন দেবী দুর্গার অশুভশক্তির উপর জয় ঘোষণার দিন। 'সমিতি'র তত্ত্ব লক্ষ্মীবাই কেলকার-এর মস্তিষ্কপ্রসূত, তিনি ঐ সংগঠনের প্রথম 'প্রমুখ সঞ্চালিকা', যে পদটি 'সরসঙ্ঘচালকে'র ঠিক নীচে।

কেলকার মহাত্মাগান্ধীর চরকা আন্দোলন বা পিকেটিং-এ নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ঐ সময়েই তিনি এমন একটি স্বাধীন নারী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, যেটি দেশের স্বার্থে কাজ করবে। অন্য সূত্রের মতে, প্রতিরক্ষাহীন হিন্দু নারীর বেদনা ও অসহায়তাই তাঁকে সংগঠন তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করে। মনে রাখতে হবে, কেলকার বা রেখা রাজে, কেউই কিন্তু মুসলিম পুরুষের হাতে হিন্দু নারী নিগ্রহের আশঙ্কা করছেন না। তাঁদের মতে হিন্দু পুরুষই বরং, হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করেন এবং সেই মহিলার পুরুষ আত্মীয়রা তাঁকে রক্ষা করতে অসমর্থ হন। সেই কারণে, সঙ্ঘের নীতিতে আত্মরক্ষার্থেই সবল হতে হবে হিন্দুনারীকে। তিলক এবং বিবেকানন্দের প্রভাবও অনেকে এই ক্ষেত্রে স্মরণ করেছেন। বিবেকানন্দের 'আদর্শ হিন্দু নারী' কেলকারকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। 'সমিতি'র কর্তব্য ছিল পশ্চিমী নারীদের আন্দোলন থেকে হিন্দু নারীর দৃষ্টি দেশের সংস্কারমূলক কাজের দিকে ফেরানো, যাতে ভবিষ্যৎ ভারত দেশপ্রমিক এবং চরিত্রবান নাগরিক পায়।

'সঙ্ঘ' পরিবারে নারীঅন্তর্ভুক্তির জন্য কেলকার প্রথমে হেডগেওয়াড়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁকে বলা হয় যেহেতু নারীদের জীবন, মনোচরিত্র এবং কার্যাবলী ভিন্ন, সেহেতু তাঁদের জন্য পৃথক সংগঠনই প্রয়োজন। এইভাবেই জন্ম হয় 'রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'র। 'সঙ ঘ' এবং 'সমিতি'কে রেললাইনের দুটি সমান্তরাল বাহুর মতো এগিয়ে যেতে হবে একই দিকে, একই উদ্দেশ্যে। নারী সংগঠনের পৃথক অস্তিত্ব দুটি পৃথক লিঙ্গের স্বতন্ত্র কিন্তু পরিপূরক সংগঠনকেই শুধু বাস্তবায়িত করল না, এটি 'সঙ্ঘ' পরিবার যে একটি অযৌন অস্তিত্ব তাও প্রমাণ করেছে। 'সঙ্ঘে'র নীতি অনুযায়ী হিন্দুধর্ম এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল নিজ নিজ যৌনতার উপর নিয়ন্ত্রণ।

উত্তর ভারতের 'সেবিকা সমিতি'র কর্ত্রী আশা শর্মার মতে, নরী-পুরুষের মেলামেশার ফলে সংগঠন কেবল বিকৃতিই জন্ম নেয়, এবং যে সব সংগঠন কঠোরভাবে এই মিশ্রণ বন্ধ করতে পারে না, তাদের পতন অনিবার্য– যেমনটা ঘটেছে বৌদ্ধ মঠে। 'সমিতি'র পত্রপত্রিকায় যে দর্শন প্রচারিত হয় তা হল, নারীদের মধ্যে নেতৃত্ব এবং কর্তব্যবোধ জাগরুক করতে হবে যাতে তাঁরা দেশের স্বার্থে আত্মবলিদান করতে পারেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, গার্হস্থ্য জীবনে মা, বোন, স্ত্রী'র ভূমিকা ঠিকঠাক পালিত হওয়ার প্রেক্ষাপট রচনা করা, যাতে এই নারীরা তাঁদের পুরুষ আত্মীয়দের সঠিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেন। পুরুষের একক অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় কিন্তু পারিবারিক সম্পর্কের বাইরে একক নারী অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। 'সেবিকা'দের মতে নারী পরিবারে এক বিশেষ ক্ষমতা উপভোগ করেন, কারণ মূলতঃ তাঁদের হাতেই থাকে সন্তানের মানসিকতা গঠন করার কাজ। অহম্ এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি নারী সংগঠনের মূল কথা। মনে রাখতে হবে, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে'র 'স্বয়ং' কথাটি 'সমিতি'র নামে অনুপস্থিত। এই কারণেই আশা শর্মার মতে, নারী সংগঠনগুলি 'সঙ্ঘ' অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

'সমিতি'র আভ্যন্তরীণ কাঠামো সঙ্ঘেরই মতো, 'প্রমুখ সঞ্চালিকা' সেখানে নির্বাচিত হন না, পূর্বসূরী নতুন 'সঞ্চালিকা'কে বেছে নেন। প্রাথমিক স্তরে থাকে 'শাখা', সদস্যরা এখানে প্রতি দিন বা সপ্তাহে মিলিত হন। 'পদ্ধতি' বা আলোচনার রকমও সঙ্ঘেরই মতো : আদর্শগত মতনির্মাণ বা 'বৌদ্ধিক', তাত্ত্বিক মতবিনিময় বা 'চর্চা', যা পুরুষেরই অধিকার বলে সাধারণতঃ মনে করা হয়, এ সবের মাধ্যমেই সদস্যদের শিক্ষিত করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'বর্গ', শিক্ষক-জ্ঞান বিতরণ করেন, ছাত্র সেই জ্ঞান আহরণ করেন অজিজ্ঞাসুচিত্তে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয় যতক্ষণ না সেটি একেবারে সাধারণ জ্ঞানের পর্যায়ে চলে যায়। এমনকি, কবিতা বা গানও রচনা করা হয় সেই বিষয়ের উপর, মেয়েরা সেই গান বা শ্লোক কণ্ঠস্থ করে হৃদয়স্থ করেন। বহু কবিতা বাচ্চাদের ছড়ারই কিছু ভিন্ন সংস্করণ, যাতে হিন্দু রাষ্ট্রের তত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছে। 'চর্চা'য় কোনো অবাধ আলোচনা হয় না। 'প্রমুখ'দের মধ্যে কেউ বক্তব্য পেশ করেন, তারপর সেই বিষয়ের উপর মতামত চাওয়া হয়। এই জায়গাতেই 'সেবিকা'রা তাঁদের তর্ক করার, বোঝাবার এবং হিন্দুদের স্বার্থে হিন্দুদের জাগ্রত করার গুণগুলিকে ক্ষুরধার করেন। 'শাখা'য় শারীরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়– তাতে থাকে যোগ, নানা বৈচিত্র্যময় খেলা, ছুরি ও লাঠি চালনা, জুডো এবং কারাটে। ছুরি ব্যবহার ক্ষেত্রটি যদিও খুব সীমিত, তবু প্রশিক্ষণগত দক্ষতার আত্মবিশ্বাস অন্য মাত্রা যোগ করে সদস্যদের ব্যক্তিত্বে।

'সমিতি' সেইসব মহিলাদের ডাকযোগে শিক্ষাও দিয়ে থাকে যাঁরা নিয়মিত 'শাখা'য় উপস্থিত থাকতে পারেন না। তাঁরাও এই প্রকল্পের আওতায় আছেন যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে

'শাখা'র কাজকর্ম পরিচালনা করেন; এই কারণে প্রতি তিন মাসে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। বার্ষিক শিবির পরিচালনা করা হয়, যেগুলি দুই থেকে পনের দিন স্থায়ী হতে পারে। সদস্যদের নথি রাখা হয় (আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে সদস্যপদ দেওয়া হয় না), প্রায়সাড়ে তিন থেকে পাঁচ হাজার 'শাখা' এইভাবে চলে।

বিশ্ব বিন্দু পরিষদের 'মাতৃশক্তি' নামক সংগঠনটির ক্রিয়াকলাপ আবার সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। 'মাতৃশক্তি' মনে করে 'সমিতি'র মতো নারী সংগঠনগুলি মেয়েদের সমতা আর অধিকারের নামে কেবল তার ছায়ামাত্র দেয়, উপরন্তু মাতৃত্বের স্বর্গীয় অধিকারেরও অবমূল্যায়ন করে। নারীদের অস্তিত্ব পরিবার থেকে বহির্বিশ্বে প্রসারিত করার ভাবনায় এই সংগঠনটি এক সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। স্কুল চালানো, হস্টেল নির্মাণ, লাইব্রেরি স্থাপন, রক্তদান এবং চিকিৎসা শিবির পরিচালনার কাজ 'মাতৃশক্তি'র উদ্যোগে সম্পন্নহয়। স্বামীপরিত্যক্তা মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সৃষ্টিও অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই প্রকল্পগুলির গুরুত্ব অবশ্য দ্বিতীয় সারিতে, কারণ প্রথম সারিতে আছে হিন্দুজাতির সীমারেখা নির্দিষ্ট করে তাকে মুসলিম ও খ্রীস্ট প্রভাব মুক্ত করা। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে মিশনারী প্রভাব ঠেকাতে 'মাতৃশক্তি' কাজ করে। আবার, মুসলিম আগ্রাসন থেকে মহিলাকে রক্ষা করতে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সৃষ্টির কথা ভাবে; পণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতাকে নতুন সমীক্ষার সম্মুখীন করে হিন্দু সমাজকে বিধর্মী প্রভাব মুক্ত করার উদ্দেশ্যে।

'মাতৃশক্তি' যদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে, 'দুর্গাবাহিনী'র উদ্দেশ্যে তবে বিক্ষোভমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করা। ভি.এইচ.পি'র তত্ত্বাবধানে সেই বিক্ষোভ হতে পারে পণপ্রথা, অশ্লীল ছবি বা পশ্চিমী অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। আশ্চর্যের নয়, 'দুর্গাবাহিনী' জন্ম নেয় ১৯৯৪ এর শেষদিকে, রামমন্দির আন্দোলন যখন তুঙ্গে। বহু যুবতী ও মহিলা 'বাহিনী'র সদস্য হন। সেবা, সুরক্ষা ও সংস্কার– এই সংগঠনটির প্রচারিত নীতি। নিজ পরিবার ও দেশের সেবা; 'আত্ম' ধর্ম ও জাতির সুরক্ষা (এম. এফ. হুসেনের আঁকা নগ্নিকা সরস্বতী ও 'ফায়ার' নামক চলচ্চিত্রে দুই নরীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে 'দুর্গাবাহিনী'ই ছিল প্রথম সারিতে) নিজ পরিবার ও সন্তানদের অহিন্দু এবং 'অসংস্কৃত' ব্যক্তিদের হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা 'বাহিনী'র লক্ষ্য। স্কুল এবং চিকিৎসা পরিষেবার বিশাল জাল মারফৎ হিন্দুত্বের অধিকার সেইসব গোষ্ঠীতেও পৌছায়। যেগুলি আগে আয়ত্তে ছিল না। বড় বড় শহরে বহিরাগতদের বস্তিতে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়, এই দুর্গারা পৌছে যান হিন্দু সভ্যতার মন্ত্র নিয়ে।

'বাহিনী'র সাধারণ সদস্যারা বেশিরভাগই নিম্নবর্ণের মহিলা, কিন্তু নেত্রীরা আসেন উচ্চবর্ণের ঐতিহ্যবাহী সঙ্ঘ পরিবারগুলি থেকে। 'বাহিনী' এবং 'সমিতি'র সদসদের বৈপরীত্য একটি কৌশলগত সত্যকে স্পষ্টতা দেয়– 'সমিতি' বিক্ষোভ এড়িয়ে চলে।

'বাহিনী'র জন্ম হয়েছে বিক্ষোভ থেকে। 'সমিতি'র প্রাথমিক কাঠামো এবং কাজকর্মের প্রায় অনুরূপ প্রতিবিম্বই 'বাহিনী'তে পাওয়া যাবে, যদিও শেষোক্ত সংগঠন নিজেকে শক্তি সাধনা ক্ষেত্র বলে পরিচিত করে।

সংগঠনগুলির বহু সমতার মধ্যে একটি হল ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের সমার্থক অস্তিত্ব। প্রকৃতপক্ষে, নারীজগতে ধর্মই তাঁদের প্রবেশপথ করে নিয়েছে। 'মাতৃশক্তি'র প্রচারপুস্তিকায় 'সৎসঙ্গে'র মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু করে। ধীরে ধীরে 'চিন্তন' বা পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার স্তরে মেয়েদের উন্নীত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। 'সমিতি' সাংগঠনিক বিপর্যের সম্মুখীন হয় যখন গান্ধীহত্যা পরবর্তী সময়ে আর এস. এস. নিষিদ্ধ সংগঠন ঘোষিত হয়। এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠে তারা আবার জনসংযোগ গড়ে তোলে ভজন অনুষ্ঠান ও রামায়ণ, মহাভারতের উপর আলোচনার আয়োজন করে। 'শাখায়' 'ভারতমাতা কী জয়' এর পরেই উচ্চারিত হয় 'হিন্দু ধর্ম কী জয়'; রামকে দেখানো হয় জাতীয় নায়ক হিসাবে। রামভক্তি এবং দেশভক্তির কোনো তফাৎ থাকে না।

সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপ এবং মতাদর্শের প্রসার ঘটাতে প্রথম ধাপটি প্রস্তুত করেন ওয়ার্ধার যুবতী 'সেবিকা'রা। নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে সংগঠনের ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাঁরা তৈরি করেন বহু 'শাখা'। 'শাখা' এবং 'সৎ সঙ্গ' গড়ে তোলা হয় পরিবারের কায়দায়, সদস্যরা একে অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন। বৃদ্ধ এবং অসুস্থদের সেবা করা হয়, তাই যখন 'শিবির' থেকে ডাক আসে পরিবারগুলি তাদের মেয়েদের সেখানে পাঠাতে মোটেই দ্বিধা করে না।

উদার এবং বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও, আলোচ্য সংগঠনগুলি বিরোধীপক্ষেরই বহু ইস্যুকে ধর্মের মশলায় জারিয়ে প্রচার করেন। কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে যায়। 'সমিতি'র পত্রপত্রিকায় পেশাদার মহিলাদের উচ্চ প্রশংসা করা হয়, প্রচারিত গল্পের নায়িকারা বিবাহের প্রশ্নে নির্দিষ্ট মতামত জানান।

পুরাকালে অভিজাত রমনীরা 'স্বয়ম্বর' প্রথার মাধ্যমে বংশগৌরব, সামরিক নৈপুণ্য ইত্যাদি দেখে স্বামী নির্বাচন করতেন। একটা গণ্ডির মধ্যেই তাঁদের পছন্দ আটকে থাকত। ঠিক একইভাবে, 'সমিতি'র পত্রপত্রিকায় অভিক্ষিপ্ত নায়িকারা নিজেদের প্রেক্ষাপট মনে রেখেই পাত্রস্থ হন। শ্রেণী বা জাতের কৌলিন্য বজায় থাকে, অটুট থাকে 'সঙ্ঘে'র ছত্রছায়া। সাধারণ আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলিতে 'সঙ্ঘ' এবং সংশ্লিষ্ট নারী সংগঠনগুলি একসুরে মতামত জানায়। মুসলিমদের ব্যক্তিগত আইন সম্পর্কে ভি. এইচ. পি'র স্বামী মুক্তানন্দ সরস্বতীর বক্তব্য, "একজন হিন্দুর কেবল একটি স্ত্রীই বর্তমান থাকতে পারে, অন্যদিকে একজন মুসলিমের থাকে পাঁচটি স্ত্রী। কেন এ বৈষম্য? যদি কোনো হিন্দু পঁচিশটি স্ত্রী একইসঙ্গে রাখতে চান তবে তিনি তাই করুন।"

সমতাসম্পন্ন সাধারণ আইন বলবৎ করার উদ্যোগের আছে বহু উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে সঙ্ঘের একজাতি এক সংস্কৃতি এক আইন এর মতাদর্শ বার বার সামনে তুলে ধরা হয়। একইসঙ্গে পুনরাবৃত্তি করা যায় যে মুসলিম পুরুষ লম্পট। কারণ নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে তার বহু স্ত্রীর প্রয়োজন হয়, এবং সেইহেতু মুসলিম ধর্ম নারীদের কাছে অসম্মানজনক। তুলনামূলক হিন্দুধর্ম অনেক উদার, কারণ তা নিজের পরিধির মধ্যে হওয়া বদলগুলিকে সহজভাবে নিতে পেরেছে। যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই পরের দাপে 'দুর্গাবাহিনী' এবং 'সমিতি' প্রচার করে যে মুসলিম নারী নির্যাতিত কিন্তু তাদের সদস্যরা জাগ্রত হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী উদার মহিলা।

নারীশক্তির মডেল

হিন্দু জাতীয়তাবাদী মহিলারা ধর্মনিরপেক্ষা নারীদের ব্যর্থতা উল্লেখ করে ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রটিকে নারীশক্তি উপযোগিতার সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বলে তুলে ধরেছেন। নারী তাঁদের কাছে কেন্দ্রীয় শক্তি; সমস্ত সৃষ্টির আদি আধার নারী হলেন 'নির্মাত্রী'। নিজ সৃষ্টি পুরুষের সমান অধিকার তিন যখন চাইবেন তখন দেবত্বের বিভা লাগবে তাঁর অস্তিত্বে। আলোচ্য হিন্দু নারীরা তাঁদের সাংগঠনিক ক্রিয়াকলাপের মূলে রাখেন 'নারীশক্তি'র তত্ত্বকে, বিপ্রতীপ অবস্থানে থাকে ধর্মনিরপেক্ষ নারীবাদের ধারণা– 'নারী মুক্তি'। 'নারী মুক্তির' প্রবক্তারা মাতৃত্ব, পরিবার, ও শিকড়হীন নারীঅস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যে বিশ্বাস আবার কোনোভাবেই 'নারীশক্তি'র সমর্থকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

'সমিতি'র দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু ভাববিনিময়কারী চিন্তাক্ষেত্র আছে। সত্যযুগ, কলিযুগ ইত্যাদি নিয়ে হিন্দুদের যুগবিাগ একটি ক্ষেত্র; অন্যটি তৈরি হয়েছে হিন্দু, মুসলিম খ্রীষ্টানদের শাসন সাপেক্ষে ঐতিহাসিক সময় বিভাগগুলিকে নিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রেই নারীরা কেন্দ্রবিন্দু। সত্যযুগ বা হিন্দুশাসনকালে নারীরা ঋষির মর্যাদা পেতেন। আধ্যাত্মিক চেতনায় মৈত্রেয়ী, গার্গী ছিলেন প্রণম্য। বৈদিক সাহিত্যে স্ত্রী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। উপনয়ন অনুষ্ঠান পরিচালনা করার অধিকারও তাঁদের ছিল। কলিযুগ-এ নারীরা তাঁদের নৈতিক অধিকার হারালেন; মুসলিম শাসনকাল ও পশ্চিমী সভ্যতার কুপ্রভাব শুরু হওয়ার সময়, এই কলিযুগ। কাজেই, সমস্ত সামাজিক অত্যাচার যেমন শিশুবিবাহ, সতীদাহ এবং পর্দাপ্রথা 'বর্বর' মুসলিমদের উপহার বলা যায়। মুসলিম শাসনকালে যদি তাদের লালসার শিকার হন নারীরা, ইংরেজ শাসনকালে তাঁরা তবে পণ্যে পরিণত হয়েছেন। নারীদেহ হয়ে গেছে বিক্রয়যোগ্য বস্তু। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ শুধুই এক রাজনৈতিক ধারণা নয়, তা মানসিক দাসত্ব ও ক্লিন্নতারও অন্য নাম। নারীরাই পারেন স্বীয় কার্যের দ্বারা এই অসাম্যশৃঙ্খল ভেঙে নিজেদের নৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে।

'সেবিকা'রা যখন করসেবায় শ্লোগান দেন, 'হিন্দু হী আদি অন্ত হ্যায়' বা 'পুরা বিশ্ব বদল হো যায়েগা, এক নয়া সৃষ্টিকা নির্মাণ হোগা' তখন অনন্ত এক ধর্মের গতি ও

পুনরুজ্জীবনের দৃশ্য সামনে ভেসে ওঠে। জাগতিক সব শর্ত লঙ্ঘনকারী এই কল্পনা কিন্তু ঠিক মেয়েলী নয়।

আলোচ্য সংগঠনগুলি যে যে মূর্তি এবং চিহ্নগুলি ব্যবহার করে তার প্রতিটিই নারীদের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার বলে সংগঠন মনে করে, সেইসব গুণ সমৃদ্ধ। লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী, বিশ্ববালার মতো যোদ্ধা নারী, অহল্যাবাই, রানী চেন্নামার মতো প্রশাসক; মীরবাই এর মতো ভক্তিমতী; সীতা, সাবিত্রী, অনুসূয়ার মতো চিরকালীন প্রভাবের ব্যক্তিত্বকে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। কৈকেয়ী এবং মন্দোদরী যদিও এই তালিকায় খানিকটা হঠাৎই ঢুকে পড়েছেন। লোভেল কারণে অতিনিন্দিত হয়েও কৈকেয়ীর সামরিক দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সেই নৈপুণ্য রাজা দশরথের প্রাণ রক্ষা করে এবং রাণীর অনুগ্রহভাজন করে রাখে। মন্দোদরী দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন নারী ছিলেন, রাজা রাবণ তাঁর কথায় কর্ণপাত না করার কারণে ধ্বংস হয়ে যান।

'সমিতি'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবি হলেন 'ভারতমাতা'। দেবি এখানে দেশ, সেবিকা হলেন জাগ্রত হিন্দু নারী। এককভাবে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়ার চেয়ে সম্মিলিতভাবে তা গাওয়াই অভিপ্রেত, কারণ তাতেই সর্বাধিক শুভ ফল লাভ করা সম্ভব। দেশমাতৃকার পবিত্রতা দেশবাসীর অখণ্ড ভক্তিতে অটুট থাকবে– সাভারকরের এই তত্ত্ব স্মরণ করে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মাতৃভূমিই সমস্ত দেবত্বের উৎস। তাঁর স্নেহ অপার– সব মায়েদেরই যা সাধারণ গুণ। দেশমাতার কন্যাসন্তানের মতো সেবিকারা তাঁদের মায়েরই প্রতিমূর্তি– তাঁরা পবিত্র, নিরহঙ্কার, নির্ভীক, দক্ষ এবং ঐক্যবদ্ধ। ক্ষমতায় মাতৃভূমি দুর্গার সমান, আবার তিনি পার্বতীর মতোই শুভদা। দেশমাতা, দুর্গা, পার্বতী, এবং জাগতিক মা, সবাই এক অস্তিত্বে বিলীন। 'দুর্গাবাহিনী'র নারীরা তাঁদের প্রার্থনা-সঙ্গীতে দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনীর রূপটিকে স্মরণ করেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইঙ্গিতবাহী সেই মন্ত্রে কর সেবিকারা উজ্জীবিত হন।

'সমিতি'কে একটি আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ দিতে চেয়ে কেলকার সৃষ্টি করলেন দেবী অষ্টভুজার রূপ। মহালক্ষ্মীর প্রচুর্য, মহাসরস্বতীর মেধা, এবং মহাদুর্গার শক্তি– এই তিনের যোগফল দেবী অষ্টভুজা। তাঁর স্থান ভারতমাতার নীচে, কারণ দেশমাতৃকাই কেবল পূজা পাবেন। অষ্টভূজা যাঁর আঁটটি হাতের প্রতিটি আটটি বিভিন্ন গুণ, যেমন, পবিত্রতা, শক্তি, আত্মত্যাগ ইত্যাদিকে নির্দিষ্ট করে, এমন এক মডেল যার মতো প্রতিটি সেবিকাকে হতে হবে।

শান্ত, উগ্র, দয়াময়ী এইরকম নানাবিধ দেবীমূর্তি আসলে একটি মানসিক সত্তারই বিভিন্ন প্রকাশিত রূপ। নারীকে সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ সমান দক্ষতায় চালিয়ে যেতে হবে। ধ্বংস হবে মুসলিম, সৃষ্টি হবে হিন্দু ও হিন্দুত্ব। সংসারধর্ম ত্যাগ করে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার প্রেরণা জোর পেয়েছে সাধ্বী ঋতাম্বরা এবং উমা ভারতীর সাফল্যে।

ত্যাগের এই মন্ত্রে কিন্তু জাতপাত, অর্থনীতি এবং রাজনীতির জগতের এক ব্যক্তির ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যটি অন্তর্নিহিত আছে। উচ্চ আদর্শ এবং নীতিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এঁরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জগতে প্রভাব বিস্তার করতে চান। এঁরা বলেন সমাজকে কলুষমুক্ত করতেই তাঁদের এই উদ্যোগ যা এক আধ্যাত্মিক যাত্রারই প্রসারণ। উদ্যোগ ফলপ্রসূ হলে সার্থক হবে এই যাত্রা।

সাধ্বী ঋতাম্ভরা বলছেন, "আপনারা কি মনে করেন আমরা ভোটের কাঙাল? আরে আমরা তো মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রজ্ঞায় ভর দিয়ে সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়ে যেতে পারি। দিল্লীর ক্ষমতা আমরা চাই না। আমরা আমাদের নাম চাই, চাই রামজন্মভূমি"।

সাধারণ কল্পনায় 'ত্যাগ' মানে মানব মনের কাম ও অর্থের কুপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। অপ্রত্যাশিত নয়, ভারতের বহু সমাজ সংসকারক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁদের বিখ্যাততম উদাহরণ গান্ধী, সন্ন্যাসীর উত্তরীয় পরিধান করেছেন। সন্ন্যাসীর চারপাশে থকে আত্মত্যাগের এক স্বর্গীয় বলয়। অবিবাহিতা থেকেও ঋতাম্ভরা কিন্তু বক্তৃতায় সরাসরি যৌন রূপক ব্যবহার করেন পুরুষের পৌরুষ জাগ্রত করতে, "... আপনারা যদি এখনও না জাগেন, গো-হত্যা হবে সর্বত্র। এই মারাত্মক পরিণতি হবে আপনাদেরই জন্য। ইতিহাস বলবে, এর জন্য হিন্দুরা নিজেরাই দায়ী ছিল। সময়ের এই আহ্বান স্বীকার করুন ..।" নারীর এই আহ্বানে পুরুষেরা সাড়া দিতে পারেন কেবল তাঁদের উগ্রতা প্রদর্শন করে। এতে সাধ্বীর পবিত্রতা অটুট রইল, কিন্তু শ্রোতাদের শারীরিক প্রমত্ততা চলে গেল তুঙ্গে। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের সময় এই উত্তেজনাই কাজ করে। স্মরণ রাখতে হবে, আর. এস. এস. এর মতাদর্শে গান্ধীকে ব্যঙ্গ করা হয় কারণ তিনি নাকি সন্ন্যাসকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব দিয়েছিলেন হিন্দু জাতিকে এক নিবীর্য ও জড়দগব অস্তিত্বে পরিণত করতে। নারীদের যৌনতাবর্জিত হয়ে হিন্দুধর্ম পালন করা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় মোটেই। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে উমাভারতী বলেছেন, পারিবারিক সম্পর্ক ছাড়া ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশের একমাত্র উপায় হচ্ছে সন্ন্যাস। নারীকে হয় কারো মা, স্ত্রী বা কন্যা হতে হবে, অথবা হতে হবে সন্ন্যাসিনী। সাবিত্রী দেবীর প্রদর্শিত পথে স্ত্রী ছিলেন স্বামীকে বা পরিবারের অন্য পুরুষকে নিষ্ক্রিয়তার মোড়ক থেকে মুক্ত করার কারক, এই একই কাজসাধ্বী করছেন জনসাধারণকে উত্তেজিত করে তুলে। তাঁর কণ্ঠস্বরের ওঠানাম, উজ্জ্বল হলুদ বস্ত্র এবং স্ব-আরোপিত পবিত্রতা তাঁকে করে তুলেছে চিত্র-নায়িকাদের মতোই অমোঘ আবেদনময়ী। তিনি নায়িকাদের মতোই অলভ্য। করসেবকরা অযোধ্যার দেওয়ালে লেখেন, "আমি জীনাত আমনের শয্যাসঙ্গী", অথবা "আমি সায়রা বানুর সঙ্গে শুই।" উল্লিখিত দুই মুসলিম অভিনেত্রীই অত্যন্ত সফল ও সুন্দরী নায়িকাদের মধ্যে পরিগণিত হন। এইভাবে হিন্দুদের সম্মিলিত কল্পনায় মুসলিম নারীকে করে তোলা হচ্ছে অনায়াসলভ্য।

উপসংহার

যৌথ পরিবারের নিগড়ের বাইরে 'শাখা' বিবেচিত হয় সম্পর্ক তৈরি করার একটি ক্ষেত্র হিসাবে, যে সম্পর্কগুলি গোষ্ঠী থেকে ক্রমে জাতিতে বিস্তৃত হয়।

সংগঠনের মাধ্যমে হিন্দু উগ্রতা নারীদের পৌঁছে দিচ্ছে জনসাধারণ ও কাজের মাঝে। সারা বিশ্বকে নিজের বাড়ি মনে করার আদর্শে তাঁদের দীক্ষিত করা হচ্ছে। সুষমা স্বরাজের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে, যিনি বারবার নিজেকে দেশের একজন 'প্রকৃত কন্যা' হিসাবে পরিচিত করেন, অন্যদিকে থাকে সোনিয়া গান্ধীর 'পুত্রবধূ' রূপে নিজেকে পরিচিত করার মেকী দাবী। সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজেকে ব্যক্ত করার এই প্রচেষ্টার পিছনে আছে নারীর জাতপাত ও গোষ্ঠী ভাবনাচিন্তা। দুটি উদাহরণ : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মণ্ডলবিরোধী বিক্ষোভে বিবৃতি দেন যে তাঁরা কর্মহীন স্বামী চান না কারণ নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষণ হলে, উচ্চবর্ণের পুরুষদের কর্মসংস্থান হবে না।

উত্তর প্রদেশের এক গ্রামে বর্ণভেদপ্রথা লঙ্ঘন করে বিবাহ করার "অপরাধে" এক যুগলকে ফাঁসী দেওয়া হয়। সেই গ্রামের উচ্চবর্ণের মহিলারা এই শাস্তির স্বপক্ষেই সওয়াল করেছেন।

নারীবাদীরা নারীদের অস্তিত্ব এবং ঐক্য সামাজিক সম্পর্কের বাইরেও সম্ভব বলে দাবী করেন। একক ব্যক্তি হিসাবে এই নারী অস্তিত্বে সংশয় আছে হিন্দু ধর্মের উগ্র সদস্যদের। দু'তরফের বক্তব্য মনে রেখে এটা বলা যায়, কোনো সম্পর্কেরই স্থায়ী কোনো ছাঁচ নেই। সময় ও সামাজের দাবীতে হামেশাই সম্পর্কজনিত অবস্থানকে বদলে ফেলা হয়, কোনো সময় বদল হয়ে যায় ক্ষেত্র।

এই রচনায় আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সেইসব প্রক্রিয়াগুলিকে স্পষ্টতা দেওয়া যা নারীকে কোনো কোনো সময় উগ্রমূর্তি ধারণ করতে সমর্থ করে। আলোচনামূলক অথবা ব্যবহারিক সাংগঠনিক অভ্যাস, ভারতমাতার রূপকল্প, অগ্নিবর্ষী অথচ কৃপাময়ী দেবীরা, সাহসিকা ঐতিহাসিক নারী বা বিনত পৌরাণিক স্ত্রী– এ সবই নারীকে উদ্বুদ্ধ করে, প্রয়োজন ও বিপদের সময় প্রতিহিংসাময়ীর ভূমিকা পালন করতে, আবার সাধারণ সময়ে তিনি ফিরে আসেন চিরাচরিত বাৎসল্যময়ী মা বা অনুগত স্ত্রী'র আদলে। 'আনন্দমঠে'র শান্তি বা বাস্তবের সরলা দেবী ঠিক এমনই ছিলেন।

'Avenging Angels and Nurturing Mothers : women in Hindu Nationalism'.

Economic and Political Weekly, April 2002

ভাষান্তর : ঈশিতা গোস্বামী

আদিবাসী কণ্ঠস্বর ও হিংসা

গনেশ দেবী

২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা মার্চ-গুজরাট তখন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। পূর্ব সীমান্তে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল তখনও ছিল শান্ত। পাঁচমহলের দুটি জেলা ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। এই অঞ্চলের প্রধান শহর গোধরা। আদিবাসী অধ্যুষিত এই অঞ্চলেও আদিবাসী, হিন্দু ও মুসলমান শান্তিতে একসঙ্গে বসবাস করছিল। একমাত্র আদিবাসী শ্রমিকরা দীর্ঘ মিছিল করে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছিল কার্ফু কবলিত শহর থেকে গ্রামের দিকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০ কিঃ মিঃ-এর চেয়েও বেশি হাঁটা পথ। তারা হেঁটে গেছে নীরবে, মাথার উপর লোটাকম্বলের বোঝা চাপিয়ে, হৃদয়ে একরাশ যন্ত্রনা চেপে রেখে। তারা ভয়ে এমনি সন্ত্রস্ত ছিল যেন তারা ফাঁদে আটকে পড়া জন্তু জানোয়ারের দল।

প্রতি বছর অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাজের সন্ধানে প্রায় ৬০ হাজার আদিবাসী শ্রমিক বরোদায় চলে আসে। দাঙ্গা শুরু হওয়ার তৃতীয় দিনেই তারা গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করল। ফিরে আসার সময় ছিল না কোন যানবাহন। তাই শরণার্থীদের মতই হেঁটে ফিরে আসছিল। বিধ্বস্ত দেশ থেকে যে বাঁচার তাগিদে ওদের পালিয়ে আসা।

তেজগাধ ছিল সেই আদিবাসী গ্রাম যেখানে সর্বপ্রথম কোন মুসলমানের দোকানে আগুন লাগানো হয়। মার্চের ৪ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় এই লুঠতরাজের ঘটনা ঘটে। রাত্রে আরও দুটো দোকান আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বরোদা জেলা পুলিশের গ্রামীণ শাখা গোধরার ঘটনার বিলম্বিত প্রতিক্রিয়া আশাই করতে পারেনি। মঙ্গলবার সিনিয়র ডেপুটি পুলিশ সুপার কেশব কুমার যিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির উপর আদিবাসী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন, তিনি শান্তি পুনর্স্থাপনে তাঁর প্রয়াসের সাথে আমাকেও যুক্ত হতে বললেন। আমরা যখন তেজগাধে গিয়ে পৌছলাম, তখন দেখলাম একটি কাপড়ের দোকানে লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটাচ্ছে কিছু উন্মত্ত জনতা। ডেপুটি পুলিশ সুপার টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে সেখান থেকে ছোট উদেপুরের দিকে রওনা হলেন। সংগে বর্তমান বি জে পি সাংসদ ও প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ। দাঙ্গা প্রতিরোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা আলোচনা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। রাত্রে টহলদারির জন্য সেনাবাহিনীর পাঁচ ট্রাক জওয়ান এখানে এসে হাজির হয়ে যাবে– এই তাঁর আশা। দাঙ্গার ঐ রাতে তেজগাধে সেনাবাহিনীর কেউই উপস্থিত ছিলেন না। গ্রামের আরও দোকান আর বাড়ী-ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। তেজগাধে সামান্য মুসলিম বসতি আছে। ওখানে জনসংখ্যা ৭৫ শতাংশই আদিবাসী, ১৫ শতাংশ হিন্দু আর ৫ শতাংশ মুসলমান। প্রাথমিক অবস্থায় যারা দোকানপাট বাড়ি ঘরে আগুন লাগিয়েছিল তারা এসেছিল মদমত্ত অবস্থায় আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে। কিন্তু প্রথমবার যখনই আক্রমণ সংগঠিত হলো তখই অন্যান্য গ্রামের

অধিবাসীরা নিজে থেকেই ঐ আক্রমণাত্মক অভিযানে সামিল হলো। কোন উস্কানীর প্রয়োজন হলো না। চলতে থাকল অবাধ লুঠপাট।

তেজগাধের ঘটনা দেখিয়ে দিল কী পদ্ধতিতে আর কেমন করে ধাপে ধাপে অশান্তির আগুন লাগানো যায়। অন্ততঃ পক্ষে, দাঙ্গা প্রথম দিন শহরগুলিতে সংগঠিত হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে আটঘাট বেঁধে। আক্রমণগুলি ছিল আশ্চর্যজনকভাবে নিখুঁত। এর উল্টোদিকে, পাঁচমহল, খেদা, বরোদা প্রভৃতি জেলার গ্রামগুলিতে দেখা গেল অন্ধ ক্রোধের নির্মম অভিব্যক্তি। কিন্তু তেজগাধের ঘটনাবলী ছিল উভয় দিক থেকেই আলাদা। এটা মনে করা যায় না যে হিংসার সামগ্রিক মাষ্টার প্ল্যানের সাথে এগুলোর কোনো যোগাযোগ আছে। গোধরার উন্মত্ততার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে তেজগাধের ঘটনাবলীকে মনে করা যায় না।

তেজগাধের মুসলমান জনতা গ্রামেই থাকছিল। প্রাত্যহিক কাজকর্মও চালিয়ে যাচ্ছিল কোন আশঙ্কা ও ভয়ভীতি ছাড়াই।

ঐদিন স্থানীয় কিছু মানুষ অন্য একটি গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে হুমকী দেয় বলে জানা যায়। প্রাথমিকভাবে বলা হয় তেজগাধের সমস্ত মুসলমানরা ঐ গ্রামে মুসলমান জনতাকে রক্ষা করতে চলে যায়। বলা হয়, তেজগাধের অধিবাসীরা তেজগধের মুসলমানদের আক্রমনাত্মক মনোভাবে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ফলে, ৪ঠা মার্চের সন্ধ্যেবেলা তেজগাধে এক মুসলমান মালিকের একটি দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের সরপঞ্চ কৃষ্ণকান্ত শাহ যারা লুঠতরাজ শুরু করতে চাইছিল তাদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাদের প্রবল চাপ ও হুমকীর কাছে তাকে মাথা নত করতে হয়। লুঠতরাজ করতে আসা লোকেরা ছিল বহিরাগত। ঘটনার পর তেজগাধের কেউ লুঠেরাদের নাম বলতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কেউই বলল না কেন মুসলিমরা অন্য গ্রামে চলে গেল আর কেউ কেন ফিরে এল না তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে, যখন তাদের দোকানপাট, বাড়ীঘর, যানবাহন খেপে খেপে সময় মেপে মেপে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউই বলতে প্রস্তুত ছিল না কীভাবে এত কেরোসিন জোগাড় করা সম্ভব হল এবং কারাইবা উন্মত্ত জনতাকে নেতৃত্ব দিল। কেউই ব্যাখ্যা করবে না কেন শুধুমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পত্তিতেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তেজগাধে গণহত্যা চলেছিল ধীর লয়ে। প্রতিদিন একটি বা দুটি দোকান পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। প্রথম ঘটনাতেই উন্মত্ত জনতা জড়ো হয়েছিল টিমলা, কোরাজ এবং আছালা–এই সব জায়গা থেকে। একই পঞ্চায়েতের অধীনে হলেও লিমডিবাজার থেকে এদের দূরত্ব এক বা দুই কিলোমিটার, লিমডিবাজারই হচ্ছে দাঙ্গার মূল কেন্দ্রবিন্দু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘটনাতে তা আরও বেড়ে গেল। আশেপাশের গ্রামের আদিবাসীরা লুঠের মালে তাদের অংশ চেয়ে বসল। তেজগাধের আধিবাসীরা তাদের বাড়ীঘরের দরজা বন্ধ করে

রেখেছিল। যেন স্ব-আরোপিত কার্ফুতে তারা বন্দী। যখন সরকারীভাবে কার্ফু জারি করা হলো তখন বাড়তি কোন অনুভূতির ব্যাপার ছিল না; পরিস্থিতিকে নিয়মতান্ত্রিক করে নেওয়া ছাড়া। গ্রাম দেখাশুনা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ বাহিনী সংখ্যায় ছিল নিতান্তই কমক। উন্মত্ত জনতার দুই তিনটি আক্রমণ ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার পরে পরেই পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ক্রিয়করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

এই ভাবে তেজগাধে দাঙ্গার দ্বাদশ দিনেও আর একটি বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলো। গ্রামবাসী বা পুলিশ কেউই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে এগিয়ে এল না। যথারীতি অশান্তি চলতে থাকল। যদি শহরে দাঙ্গাগুলোর বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে নিখুঁত আক্রমণ আর গ্রামীণ দাঙ্গার বৈশিষ্ট্য হয় অন্ধ উন্মত্ততা, তবে তেজগাধের বৈশিষ্ট্য ছিল একেবারেই রীতিমাফিক। বিলম্বিত লয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে দেওয়া ছিল এর বৈশিষ্ট্য। এই রীতিমাফিক বৈশিষ্ট্য থেকে এটা স্পষ্ট যে গুজরাটের দাঙ্গার এই পর্বের শেষে সাম্প্রদায়িকতাবাদের মর্মবস্তু পেছনে চলে এসেছে আর সামনে এসে গেছে আদিবাসী সংস্কৃতির রীতিনীতি।

তেজগাধের ৩০ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পানওয়াদ। দুদিন পর পানওয়াদে যখন গণ্ডোগোলের সূত্রপাত, তখন দাঙ্গার নেতৃত্বে আদিবাসী সম্প্রদায়ের আসীন হওয়া প্রায় প্রস্তুতই ছিল বলা যায়। গণ্ডোগোল লাগাতে যারা ভীষণ তৎপর তারা ইতোমধ্যেই আদিবাসীদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যাতে তারা প্ররোচিত হয়। যে সমস্ত গুজব তারা ছড়িয়েছিল বলে শুনেছি তার অন্তত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য :

প্রথম ঃ একজন আদিবাসী নাকি স্বপ্নে দেখেছেন যে রাঠওয়া উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত সুন্দর, মর্যাদাসম্পন্ন ও সবচেয়ে পবিত্র যে গাছ সেই মহুয়া গাছক কেটে রাস্তা অবরোধের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ভগবান বাবো পিথোরা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ এবং মহুয়া বৃক্ষের যারা ক্ষতিসাধন করেছে তদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার দাবী নাকি তিনি জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় ঃ পুলিশ বাহিনী নাকি বিশ্বাস করে যে অদিবাসীদের একটি মন্ত্র জানা আছে যা দিয়ে তারা পুলিশ বাহিনীর ব্যবহৃত রাইফেলকেও স্তব্ধ করে দেয়, তাই পুলিশ নাকি তাদের অস্ত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে।

তৃতীয় ঃ একজন নির্দিষ্ট রাঠওয়া নাকি সবচেয়ে বড় রাঠওয়া হওয়ার জন্য দেবতার আদেশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যদিও তার বয়স মাত্র ২২ বছর। যাদুখেলার সব বৈশিষ্ট্যগুলি সে রপ্ত করেছে তাই তাকে হত্যা করা সম্ভব নয় অতএব সেই নাকি পারে আদিবাসীদের নেতৃত্ব দিতে।

চতুর্থ ঃ মুসলমানরা নাকি আদিবাসী রমনীদের ধর্ষণ করেছে এবং অদিবাসী মেয়েদের তুলে নিয়ে গিয়ে শহরে বিক্রি করে দিয়েছে।

পঞ্চম ঃ মুসলমানরা কাশ্মীর দখল করেছে, অদিবাসীদের শোষণ করছে এবং হাজতে ৫০ জন আদিবসী মহিলাকে আটক করে রেখেছে।

পানওয়াদের অবস্থান ভৌগোলিক দিক থেকে এক ও অদ্বিতীয়। ওখান থেকে প্রায় ২০টি ছোট, বড় গ্রামে স্বল্প সময়ে হাঁটা পথে আসা যায়। বেশ কয়েক বছর ধরে হিন্দু সঙ্কীর্ণতাবাদী আন্দোলন এখানে সক্রিয়। কিছু কিছু জৈন ধর্মাবলম্বী সাধু, সম্ভবত রাজস্থান বা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসে এই অঞ্চলের কাওয়ারা নামের একটি গ্রামে বসবাস করছেন। জনসাধারণের উপর তাদের যথেষ্ট প্রভাব। পানওয়াদে মুসলমান ব্যবসায়ীরা বেশ বিত্তশালী। এদের অনেকেই সুদের কারবারের সঙ্গে যুক্ত আর সুদের হারও বেশ চড়া- ৬০ শতাংশ থেকে ১২০ শতাংশ।

সুদের কারবারীদের প্রতি ঘৃণা বা ছড়িয়ে দেওয়া গুজব অথবা যেকারণেই হোক, পানওয়াদে আদিবাসীদের একটা বড় জমায়েত হয়েছিল। এখানেই ছিল বিপদের সংকেত। সংবাদপত্র খবর দিয়েছে যে ওখানে নাকি ৫ হাজার পর্যন্ত জনসমাগম হয়েছিল। তাকে মাথায় রেখে বলা যায় প্রত্যেকটি গ্রাম থেকে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন এসেছিল। তাছাড়া, যারা লুঠপাটে অংশগ্রহণ করছিল তাদের সংখ্যা যে কোন সময়েই ২০০ জনের মতো ছিল।

তেজগাধের প্রথামাফিক বৈশিষ্ট্যের বড় সংস্করণ দেখা গেল পানওয়াদে। এই সময়ে আদিবাসীরা তাদের চিরাচরিত ধনুক বহন করছিল। সাধারণভাবে, তারা অস্ত্র হিসাবে তীর ব্যবহার করে না। যখন তারা কাউকে হত্যা করতে মনস্থ করে তখন তারা ধাতব পালিউ বা ধারিউ ব্যবহার করে। আর যখন কোন চোর বা শত্রুর সাথে লড়াই করে তখন ব্যবহার করে বন্দুক, এদের অনেকেই বন্দুক ব্যবহারের লাইসেন্স পেয়েছে। অন্যরা বেআইনিভাবে মধ্যপ্রদেশ থেকে কেনে। মধ্যপ্রদেশ ওখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কেবল পাখি শিকারের জন্য তীর ব্যবহার করে।

সুতরাং, পানওয়াদে যখন উন্মত্ত জনতার আক্রমণ সংঘটিত হলো তখন তাদের হাতে প্রথামাফিক সাজসজ্জার মত তীরধনুক ছিল। কিন্তু যখন তারা বুঝল কেবলমাত্র মন্ত্র দিয়ে পুলিশবাহিনীকে গুলি চালনা থেকে বিরত রাখা যাবে না তখন তারা সঙ্গে বন্দুক আনার কথা ভাবল এবং পরের দিন, আক্রমনের দ্বিতীয় দিনে তারা সঙ্গে বন্দুক নিয়ে গেল। সিনিয়র ডেপুটি পুলিশ সুপার কেশব কুমার অত্যন্ত সাহসী ও বিবেকবান পুলিশ আধিকারিক। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অদিবাসীরা বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সামনে, গুলির তোয়াক্কা না করে। বন্দুকের মোকাবিলা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে মন্ত্রের ও গুজবের ওপর এদের কী অগাধ বিশ্বাস! আদিবাসী জীবনের পেক্ষাপটে দাঙ্গা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন। ছোট উদেপুর অঞ্চলের আদিবাসী জনসমাজের বিদ্রোহে ফেটে পড়ার কোন পরিকল্পনা ছিল কি? রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন জঙ্গী বিরোধিতার

জন্য ঐ অঞ্চলে কোন প্রকাশ্য বা সুপ্ত আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল কি? সাম্প্রদায়িক বি জে পি আদিবাসী জীবনে ঐ ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পেরেছিল কিনা যাতে হিন্দুত্বের স্পৃহা স্থানীয় আদিবাসী সংস্কৃতিকেও ছাপিয়ে যেতে পেরেছিল? অন্যভাবে বলা যায় গুজরাটের আদিবাসী অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কতজনের হত্যার পেছনে আদিবাসী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং এই হত্যা বিজেপির কতটুকু সাফল্য? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ দাঙ্গাকে অনুধাবন করা ও আদিবাসী জীবনের অবস্থা বোঝার জন্য।

গোটা পর্বে তেজগাধ ও পানওয়াদে মুসলিম হত্যা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। গুজরাটের অন্যান্য অঞ্চলে সংঘ পরিবারের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের মতই যেন। তেজগাধে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল পাঁচ দিন পরে, যেমন পানওয়াদে হয়েছিল নয় দিন পরে। তাছাড়া, কাশ্মীর, অযোধ্যা এবং সীমান্তের এপারে-ওপারে সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে সচেতনতা আদিবাসী গ্রামগুলিতে নেই বললেই চলে। বহু গ্রামেই সারপঞ্চরা নিরক্ষর বা অর্ধসাক্ষর। এই গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক মাধ্যম প্রায় অনুপস্থিত। এই সময়ে একজন শিক্ষিত রাঠওয়া যুবক বন্ধু আমাকে একটা নোট পাঠিয়েছিল। একটি গাছের মৃত্যু তার মানসিক জগতে যে আলোড়ন তুলেছে, এই নোট তাই ব্যক্ত হয়েছিল। গাছটি ছিল এটা বড় নিমগাছ। গুজরাটিতে যাকে বলে লিমডা, এবং তার থেকেই নাম হয়েছে লিমডিবাজার– যেখানে লুঠতরাজ চলছিল। লুঠেরা নিমগাছেও আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। গাছটি এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে একটি জীবনস্রোতের সাক্ষী। জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হলো ওটিকে। ১০ দিন ধরে তা পুড়ল, ধীরে ধীরে, যেন প্রথামাফিক। অর্জুন রাঠওয়া ঐ নোটে লিখেছিল, "পথচারীদের ছায়া দেওয়া চাড়া লিমডার কি আর কোন ধর্ম ছিল? লিমডা কি একজন আদিবাসীর মতো ছিল না? যে হিন্দুও না মুসলমানও না। তারা একে ধ্বংস করল কেন? সে কি কারও শত্রু ছিল? আদিবাসীরাও এই নিম গাছের মতই ধ্বংস হচ্ছে। তারা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তারা সমূলে উৎপাটিত হচ্ছে।"

এই নোটটিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আদিবাসীদের যোগসূত্রহীনতার কথাই বলতে চাওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। তাহলে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের যে বিক্ষোভ তার উৎসটা কী? এর সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে এই যে বেনিয়াদের পক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে বেনিয়াদেরই আড়ালে রেখে আদিবাসীদের দিয়ে যুদ্ধ করিয়ে নেওয়া।

দাঙ্গার একদম প্রথম দিকের দুটি ঘটনা আদিবাসী মানুষের সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায় অংশগ্রহণে অনিচ্ছারই প্রকাশ। ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যেবেলায় পাঁচমহল থেমে মুসলমান যাত্রীদের নিয়ে একটি ট্রাক তেজগায়ের মধ্য দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল অন্য একটি জিপ। জিপও যাত্রী বোঝাই অবস্থায় চলছিল। ট্রাক দ্রুত চলছে বলে জিপটি জায়গা করে দিতে রাস্তার ধারে চলে গেল। ঐ অঞ্চলে জিপ সবচেয়ে জনপ্রিয়

যানবাহন এবং সেগুলোতে অসম্ভব রকমের ভীড়ও হয়। জিপের দুদিকে যাত্রীরা ঝুলে যাতায়াত করে।

জিপটি রাস্তার এত ধারে চলে এসেছিল যে রাস্তার ধারে একটি গাছের সঙ্গে তার সংঘর্ষ হয়। জিপের ধারে ঝুলতে থাকা যাত্রীদের চার জন (একজন মহিলা সহ) ঘটনাস্থলে মারা যায়। গ্রামবাসীরা জানতো যে ট্রাকটির জন্যই আসলে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল, সেই ট্রাকটিতে যাত্রীরা সবাই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। যারা আসছিল তারা পাঁচমহল ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে নয় এবং অন্য কোন দিনেও নয় একেবারে গোধরার উন্মত্ত ঘটনার দিনেই। তেজগাধের অধিবাসীরা ট্রাকটিকে নিরাপদে গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে দিল কোনোরকম ক্রোধের প্রকাশ না ঘটিয়েই। সাধারণ আর একটা দিনের মত হলে, কিছু বলার ছিল না। কিন্তু ঐরকম উত্তেজক পরিস্থিতিতে এই ঘটনা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল ২৮ শে ফেব্রুয়ারী হরিদাসপুরে। তেজগাধের প্রাচীনতম স্থান। হরিদাসপুরে ১৭০টি পরিবারের বাস। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সেখানে বংশগত সম্পর্ক আছে। ওখানকার এক আদিবাসীর মৃত্যুতে সকলেই সেদিন পূর্বাহ্নে জড়ো হয়েছিল মৃতের অন্ত্যেষ্টি ও তার প্রতি শোক জ্ঞাপনের জন্য। সমবেত হয়েছির প্রায় ১২০০ জন। ঐ সমাবেশে অন্য অঞ্চলর কিছু নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য গোধরার ঘটনার বদলা নেওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু সমাবেশে এই বাসনার পক্ষে কোন সায় পাওয়া যায়নি এমনকি সমবেত জনতাকে আচারমাফিক সুরা পান করতে দেওয়ার পরেও নয়। গোধরার গণহত্যার ঘটনা সেদিন সমস্ত খবরের কাগজের শিরোনামে স্থান পেয়েছে অথচ হিন্দুত্বের ভাবাবেগের প্রতি এরকমই ছিল আদিবাসীদের সমর্থন! ঐখানে যারা সেদিন উপস্থিত ছিলেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তাদের কেউ কেউ জানান যে তাদেরকে বলা হয়েছিল, মুসলমানদের আক্রমণ করার জন্য যারা 'সাহস' দেখাতে পারবে তাদের বিনামূল্যে কেরোসিন ও মদ সরবরাহ করা হবে।

গণ্ডোগোল সৃষ্টিকারীরা ১লা মার্চ তেজগাধের সারপঞ্চের কাছে মুসলিম পরিবারগুলোকে পুড়িয়ে মারার প্রস্তাব নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি তার পঞ্চায়েতের অধীনে কোনরকম হিংসাকে বরদাস্ত করতে অস্বীকার করেন বলে খবর পাওয়া যায়। ২রা ও ৩রা মার্চ দেখা গেল, গ্রামের সাম্প্রদায়িক লোকগুলি বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ পরিত্যাগ করে অন্য যুক্তি খাড়া করছে। পরিবর্তিত যুক্ত ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। ওরা বলতে থাকল যে মুসলমান ব্যবসায়ীরা উদ্ধত হয়ে উঠেছে। বলা হলো স্থানীয় ভাষায়, যে ওদের বড় বেশি চর্বি হয়েছে। এই যুক্তিই কেল্লা ফতে করে দিল এবং ৪ঠা মার্চ সন্ধ্যেবেলা যখন মুখ্যমন্ত্রী মোদি হাস্যকরভাবে উচ্চারণ করে যাচ্ছিলেন, 'রেকর্ড ৭২ ঘন্টার মধ্যে দাঙ্গাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা গেল', তখনই মুসলমান দোকানে প্রথমবারের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হচ্ছ।

দোকানটির মালিক ছিলেন পঞ্চান্ন বছর বয়সী ইয়াকুব খত্রী। দোকানে ছিল বিস্কুট আর চকলেটের মতন দ্রব্য সামগ্রী। ইয়াকুব খত্রী পাঁচ একর কৃষি জমির মালিক। তার ভাই ঘনি তেজগাধের মসজিদের সংগে যুক্ত, অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। যাইহোক, এই দোকান ইয়াকুবের আর্থিক অবস্থানের স্পষ্ট ছবির প্রতিফলন নয়। তাঁর একটি বড় বাড়ি আছে। আরও দুটি দোকান আছে, কিছু দূরে। খাদ্যশস্য, চামচ, কাঁটাচামচ, ছুরি, হাতের বালা ও জুতো ইত্যাদির দোকান। স্বাভাবিকভাবেই ইয়াকুব খত্রীকে লক্ষ্য করে এই আক্রমণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রতিশোধের স্পৃহাকে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার অপচেষ্টাকে সম্ভব করলো।

যখন, লুঠতরাজের এই ঘটনা ঘটল, তেজগাধের মুসলমান সম্প্রদায় তখনও গ্রামে ছিল, আক্রমণ মোকাবিলা করার চেষ্টা তারা করেছে, কিন্তু উন্মত্ত জনতা জড়ো হয়েছিল অনেকে এবং প্রতিরোধও ছিল দুর্বল। অপরাধস্থলে পুলিশবাহিনীর একজনও ছিল না। তিন দিন আগে তেজগাধের মুসলমানরা এই ধরনের আক্রমণে ভীত হয়ে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল। দুপুরের পরে দাঙ্গা শুরু হলে তা সারা সন্ধ্যে ধরে চলতে থাকল। পরে আরও দুটো দোকানে আগুন লাগান হলো। রাত্রে সমস্ত মুসলমানরা পালিয়ে গেল। কেউ জানত না কোথায় হবে তাদের আশ্রয় স্থল। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ইয়াকুব খত্রীর দোকান পুড়িয়ে দেওয়ার সময় মুসলমানরা উন্মত্ত জনতার দিকে গুলি ছোঁড়ে। এই গুজবের অর্থ হলো মুসলমানদের হাতে বেআইনি অস্ত্র আছে আর তা মজুত আছে মসজিদে-এই একঘেয়ে অভিযোগের পক্ষে যুক্তি সামিল করা।

এরপর যার দোকান ধ্বংস করা হলো তার নাম খাদারভাই। বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। একটি ময়দা কল, কাপড়ের দোকান ও একটি মুদি দোকানের মালিক। অগ্নিসংযোগের পরের ঘটনা চল্লিশ বছর বয়সী দিলওয়ার ভাইয়ের কাপড়ের দোকান ও তৎসংলগ্ন চামচ, কাঁটা চামচ, ছুরি ও জুতোর দোকানে। এর পরের শিকার পঞ্চান্ন বছর বয়সী আমেদভাই। তাঁর খাদ্যশষ্যের ব্যবসা আর প্যাণ্ডেল ও মাইক ভাড়া দেওয়ার ব্যবসা। নাসিরভাই এর পরে আক্রান্ত হলেন। ছুরি, চামচ, কাঁটাচামচ বা খাদ্যশষ্যের ব্যবসা ছিল তার।

এই সংকটেই দাংগাকারীদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অনেকটা ফ্যাকাশে হতে থাকে। যারা এই দাংগা সংগঠিত করেছে ও তাতে টাকা পয়সা দিয়েছে তাদেরকে দেখে মনে হয়েছে তারা সম্পূর্ণভাবে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ কব্জা করতে ও প্রতিযোগিতা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটিয়ে দেওয়ার ব্যবসায়ী কৌশল হিসাবে এই কার্যকলাপ চালাচ্ছে। আর বাকী যারা দাংগায় অংশগ্রহণ করেছে তাদের কাছে ঘটনাগুলো লুটপাটের সুযোগ মাত্র। আমি ইতোমধ্যে তেজগাধের দাংগার প্রথামাফিক দিক, তাকে কিভাবে পানওয়াদের দাঙ্গা সংঘটিত করার কাজে লাগানো হয়েছিল সেই সম্পর্কে মন্তব্য করেছি।

উক্ত পাঁচটি গুজব ছড়াতে দাংগাকারীরা সফল হয়েছিল আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে। এক ধরণের পরিস্থিতি সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তৈরি করতে পেরেছিল। ব্যবসায়ীদের (যারা অবশ্যই সূদের কারবারী) আক্রমণ করার যে ইচ্ছে আদিবাসীদের ছিল তাই সংঘাতের আকারে স্পষ্টভাবে সামনে চলে আসে। মুসলমান ব্যবসায়ীদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেনিয়াদের বেছে নেওয়াও এ ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে। দাংগায় যারা মদত যুগিয়েছিল সেই হিন্দু বেনিয়ারাও এই ভেবে ভয় পেতে শুরু করেছিল যে আদিবাসীরা যেভাবে লুটপাটে উৎসাহ দেখিয়েছে তা চলতে থাকলে কোন সময় তাদের নিজস্ব দোকানপাটও আদিবাসীদের লুটপাটের লক্ষ্যস্থল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং দাংগা সংগঠনকারী মস্তিষ্ক ইয়াকুব খত্রীর বাকী দুটি দোকানও ভস্মীভূত করতে মনস্থ করল। প্রথম দফায় যা কিছু করা হয়নি। গনির সাথে ইয়াকুবের যে সম্পর্ক তাতে মনে হয়েছে যেন ইয়াকুবের উপর আক্রমণ তেজগাধের মসজিদের উপর আক্রমণেরই নামান্তর।

পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা হলো একজন প্রবীন ও সম্মানীয় মুসলমানকে। লাখপতি নামে তার জনপ্রিয়তা আছে। স্থানীয় কারবারের একসময়ের চুড়ামণি এখন ভাগ্যের সহায় তেমন পাচ্ছেন না তাই তার অবস্থা এখন পড়তির দিকে। সাম্প্রদায়িক আবেগ যখন আগুনের চেহারা ধারণ করল, দাংগাকারীরা আক্রান্তদের আর্থিক মর্যাদা কী তা ভেবে দেখার কোন অবকাশই পায়নি। সুতরাং দরজি ভিখা বা গরীব চাষী ফকির ভাই যার জমির পরিমাণ এক একরেরও কম কিংবা অবসরপ্রাপ্ত কেরানী ইউসুফভাই– এদের প্রত্যেকের বাড়ি ঘর দোর ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দাংগায় ব্যবসায়ী স্বার্থ এতটুকু দমে যায়নি। মুসলমান ব্যবসায়ীরা তাদের মালপত্র, যে গুদামে রাখত, তাতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো। মুসলমান আবাসিকদের ছেড়ে আসা বাড়িঘরে উন্মত্ত জনতা মূল্যবান জিনিষপত্র খুঁজে বেড়িয়েছে, লণ্ডভণ্ড করেছে। সর্বশেষে আক্রমণ করা হলো বসীর খত্রীর ঠাণ্ডা পানীয়ের ও কাপড়ের দোকান। দুই সপ্তাহব্যাপী দাংগার এই দিনগুলিতে তেজগাধে পুলিশের উপস্থিতিতে এটা প্রমাণিত যে, দাংগা সংঘটিত হতে পেরেছিল পুলিশ যথেষ্ট সংখ্যায় না থাকার জন্যে নয়, বরং দাংগাকারীদের সাথে পুলিশের যোগসাজসের জন্যেই। দাংগাগুলোর উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ হচ্ছে ৪ঠা মার্চের পরে পঞ্চায়েত সদস্য বা স্থানীয় হিন্দু বেনিয়ারা দাংগাকারীদের প্রশমিত করার কোন চেষ্টাই করে নি।

ওরা ছাড় দিয়েছিল সাবির ভাইয়ের বাড়িকে। সাবির ভাই পঞ্চায়েতের একজন নির্বাচিত সদস্য এবং বর্তমানে তেজগাধের মুসলমান জনতার প্রতিনিধিত্ব করেন। পাঁচশো বা তার কিছু বেশি মুসলমান বসবাসকারীকে তেজগাধে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কারণ গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনের এস-৬ কোচ এরা নাকি আক্রমণ কচ্ছিল এবং

আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, আদিবাসী অঞ্চলে হিন্দু সুদের কারবারীদের সাথে মুসলমান সূদের কারবারীদের প্রতিযোগিতা। এইভাবে পানওয়াদে তীব্র দাংগার দিনগুলিতে সবাই শুনতে পেয়েছে এই দাংগা কেন সংঘটিত করা হলো। মুসলমান সুদের কারবারীদের নাকি একটি শিক্ষা দেওয়ার জন্য; এরা নাকি সহ্যের সীমানা অতিক্রম করেছে।

এটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল যে হিন্দুদের সমর্থনে দাংগা আদিবাসীরা এই পর্যায়ে চেয়েছিল। ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় সত্য ছিল অন্য বরং কোন আদিবাসী গ্রামকে দাংগায় জড়িয়ে দিতে হলে আগে যথেষ্ট পনিমানে তোষামোদের আশ্রয় নিতে হত। আকছার ভয় দেখানোতো হতই। সাধারণত, পনেরো/কুড়ি জনের একটি দল গ্রামের সরপঞ্চকে গিয়ে বলল 'আমাদের "বহিনী" দাও, মুসলমাদের অক্রমণ করার জন্য'। চক্রের দুই একজন নেতাগোছের তারাই একথা বলল। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অংশগ্রহণ যারা করবে তাদেরকে আইনের আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করা হবে এই আভাস দেওয়া হলো আর যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিল না তাদের হুমকী দেওয়া হলো। উস্কানীদাতারা যেহেতু শাসক দলের তাই ঐ ধরনের আশ্বাস ও হুমকীর মোকাবিলা করা বেশ ভয়ের ব্যাপার।

পানওয়াদের দাংগার সময় ও তার আগে, এক রাঠওয়া যুবককে একজন পুরোহিত হিসেবে পরিচয় করিয়ে চারিদিকে জোর গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হলো। সেই যুবক প্রতিশ্রুতি দিল যে মুসলমানদের আক্রমণের 'কাজে' কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে প্রত্যেককে দুই লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে। যারা অস্বীকার করল এই আহ্বানে সাড়া দিতে তাদের সে হুমকী দিল। এই যুবকটির নিজের না আছে অর্থ, না আছে কোন রাজনৈতিক যোগাযোগ যার জোরে সে এই হুমকী দিতে পারে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে, রাঠওয়ারা খুব কম কথার মানুষ, সাধারণ আলাপচারিতাতেই আ/দুটোর বেশি শব্দ উচ্চারণ করে না এবং সাধারণত মিথ্যের আশ্রয় ওরা নেয় না। যদি কোন রাঠওয়া খুন করে তখন পুলিশকে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, যে খুনী নিজেই থানায় এসে তার অপরাধের কথা জানিয়ে যাবে। সুতরাং, এহেন যুবক যখন এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বোড়চ্ছে তখন সে যে ফাঁকা আওয়াজ দিচ্ছে না, এটা বলাই বাহুল্য। নিশ্চিতভাবে বলা যায় অর্থবলে বলিয়ান ব্যক্তিরাই এই যুবকের পেছনে আছে এবং সে তাদের হয়েই এ-কাজ করতে চাইছে। মোটকথা, দাংগাগুলো সংগঠিত করেছিলো হিন্দু সুদের কারবারীরা। এমনকী এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আইনী সাক্ষ্য হাজির করতে যদি সময়ও লাগে, তবুও একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় দাংগার পরে প্রশাসনের কোন কুম্বিং অপারেশন কখনওই কোন আসল অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারবে না, বরং দাংগায় জড়িয়ে পড়া হতভাগ্য দরিদ্র মানুষের কিছু শাস্তি হবে এই ভিত্তিতে যে তাদের বাসস্থানে চুরি করা কিছু বাসন-কোসন পোশাক-আশাক, বা খাদ্যশষ্য পাওয়া গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে পঞ্চমহলে কারবার করার স্বীয় অধিকারকে রক্ষা করতে এই সহুকররা কীভাবে আদিবাসীদের দিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তা

এই গবেষণা থেকে জানা যায়। এর থেকে যে কেউ জোর দিয়ে এইকথা বলতে পারেন যে পশ্চিম ভারতে আদিবাসীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী সুদের কারবারীদের খপ্পরেই পড়ে আছে। ভবিষ্যৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য আদিবাসীদের যথেচ্ছভাবে হ্রাস পেয়ে গেছে বিশেষ করে তখন থেকেই যখন আদিবাসীরা বনাঞ্চলর উপর তাদের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। রাজস্ব বিভাগের রেকর্ড অনুযায়ী কেবলমাত্র এক টুকরো জমির মধ্যে একটুকরা জমির মধ্যে যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। সেই জমি স্বাভাবিক নিয়মেই ভাগ হতে থাকে। যদিও রাজস্ব বিভাগের রেকর্ডে এই ভাগাভাগির প্রতিফলন পড়বে তার কোন অর্থ নেই। যে জমিতে তারা বৃষ্টির জলের সাহায্যে চাষাবাদ করে তার মাধ্যমে আদিবাসী চাষী বাঁচার মত যা প্রয়োজন তার তুলনায় যথেষ্টই উৎপাদন করে। কোন বছর বৃষ্টিপাত কম হলেই চাষাবাদ মার খায় ফলে আদিবাসী চাষী ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে।

আদিবাসী অধুষিত এলাকায় ব্যাংকের কাজকর্ম নিলর্জ্জভাবে আদিবাসী-বিরোধী। প্রথমতঃ ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণ চেক ক্লিয়ারিং-এর কাজে নিযুক্ত শাখার সংখ্যা খুবই কম। এমনকী যদি কম নাও হয় তবুও তাদের কাজকর্মে আদিবাসী স্বার্থ খুব একটা প্রাধান্য পায় না, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের জোনাল অফিস বা নাবার্ডের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও। ব্যাংকের মানেজার কোন আদিবাসী লোকের সঙ্গে আলাপচারিতা করছেন– এতো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কোন আদিবাসী ব্যাংকের অফিসে ঢুকে অপমানিত হননি– এ খুব কমই দেখা যায়।

তারপর লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্রের প্রমানাদির ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ– একজন আদিবাসীর সমর্থ্যের বাইরে। স্বাভাবিকভাবেই, এই জটিল পরিস্থিতির সুযোগ নেয় বেসরকারী ঋণের কারবাসীরা। এরা কাগজপত্র বা প্রমাণাদির ব্যাপার স্যাপার খুব সরল করে দেয়। কোন আদিবাসী এলাকায় যে সমস্ত মানুষ তাদের কাছে মক্কেল হিসেবে হাজির হয় তাদেরকে এরা নামে চেনে। এদের শর্ত যথেষ্ট নমনীয় এবং ঋণ পরিশোধের অংক ও সময় প্রাথমিকভাবে বেধে দেওয়া হয়। বৃষ্টির মরশুমে ভাল বৃষ্টি না হওয়ায় জন্য চাষবাস মার খেলে ঋণ পরিশোধের সময়টা বাড়িয়ে দেওয়া হয় আর বিনিময়ে 'দয়া' পরবশত ঋণের কারবারীসুদের অংক বাড়িয়ে নেয় যা মাসে শতকরা পাঁচ টাকা থেকে বারো টাকা পর্যন্ত অর্থাৎ বছরে শতকরা ষাট থেকে একশোচুয়াল্লিশ টাকা। প্রথম তিন মাসে যে সুদ ধার্য হয়তা কুড়ি শতাংশ হারে একশো টাকা ধার নেয় শুরুতেই সে হাতে পায় সত্তর টাকা, যদিও ঋণের পরিমাণ কিন্তু একশো টাকা।

ঋণ ফেরত দিতে হয় না। খাদ্যশষ্য, বনজ সম্পদ বা কাঠ দিয়েও এই ঋণের অর্থ মেটানো যায়। কী হারে তা হবে, ঠিক করে দেবে ঋণের কারবারী স্থানীয় বাজার দর দেখে। সুদসহ আসল মেটাবার ক্ষেত্রে খাদ্যশষ্য যথেষ্ট না থাকলে, ঋণগ্রহীতা অন্য আর একজন ঋণ কারবারীর কাছে যাবে ক্যাশ টাকা ধার নিতে যাতে সে প্রথম কারবারীর সুদ

সহ আসলটা পুরোপুরি মিটিয়ে দিতে পারে। লেনদেনের দুই শতাব্দীর এই কারবারে ঋণের কারবারীরা অকল্পনীয়ভাবে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। অন্যদিক আদিবাসীদের ঋণের জালে এমন জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেখান থেকে তাদের পরিত্রাণের পথ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে।

ঋণের কারবারীরা তেজগাধ বা পানওয়াদের মত বড় বড় গ্রাম বা শহরে বাস করে। জায়গাগুলিতে সাপ্তাহিক হাট বসে। আদিবাসী চাষীরা প্রতি সপ্তাহে হাটে যায়, সুদের কারবারীদের অভিবাদন জানাতে। ওরা ভাবে যে এতেই ওদের ঋণ পাবার যোগ্যতা থাকবে।

রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য রাজনীতিবিদরাও ঋণ কারবারীদের উপরই বেশি নির্ভর করে আসছে। কারণ ওরাই ভোট ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ কারবারীদের স্বার্থ ও তাদের মতামতের প্রতি কোন বিরূপ মনোভাব দেখানো রাজনীতিবিদদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সংরক্ষিত নির্বাচনকেন্দ্রগুলি থেকে আদিবাসী মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়নে নানান বিধি নিষেধ আরোপ করা হতো। তা না করলে ঋণের কারবারীদের স্বার্থ যে রক্ষিত হয় না। সুতরাং আদিবাসী অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারকারী, গুরুত্বপূর্ণ কোন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হচ্ছে দেখলেই সেই অঞ্চলের মানুষগুলো যাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে তারই পদক্ষেপ নেওয়া হতো।

খারাপ পরিকাঠামো, অর্থের নিরবচ্ছিন্ন টানাটানি, আগ্রাসী বেকারী, নিরক্ষরতা, পেছিয়ে পড়া প্রযুক্তি– যা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ যা তাই বেসরকারী ঋণের কারবারের শ্রীবৃদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। আদিবাসী অধ্যুষিত এক জেলা থেকে আর এক জেলায় পরিস্থিতির তফাত থাকতে পারে; কিন্তু আদিবাসী জীবনের পশ্চাদপদতা ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়া আদিবাসী এলাকার অভিন্ন সাধারণ অসুখ।

রাঠওয়া আদিবাসীদের জংগী প্রকৃতির অন্যান্য কারণও বিদ্যমান। ঐ সব কারণগুলোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে পানওয়াদের সমাজতত্ত্বের দিকে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে তাকানো প্রয়োজন এবং আধুনিকতার সাথে এদের দ্বন্দ্ব কেমনভাবে এক ভিন্নধরণের অসন্তোষ তৈরি করছে তাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

ভাদোরা জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত শহরগুলির মধ্যে পানওয়াদ মধ্যপ্রদেশের সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থিত। ভিল সম্প্রদায়ের ভাষা ও আচার-আচরণ কোনভাবেই রাঠওয়াদের থেকে আলাদা করা যায় না এবং এই দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি অঞ্চলে বসবাস করেন। অপরাধমূলক আদিবাসী আইনের আওতায় এদের চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই আইন বৃটিশ শাসন জারি করে ১৮৭১ সালে। কারণ, অতীতে এই আদিবাসী গোষ্ঠী ইন্দোর ও ধারের

মারাঠা রাজাদের পক্ষে মরসুমী সৈন্য হিসেবে কাজ করত। কিন্তু ১৯৫২ সালে 'ডিনোটিফাই' করে দেওয়ার পর তাদের কাছে মাঝে মাঝে অপরাধে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে নি। ফলে সীমান্ত বরাবর এই ডিনোটিফাইড ভিলদের সম্ভাব্য আক্রমণের আশংকায় পানওয়াদের সন্নিহিত গ্রামগুলার নিম্ন পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বনজংগল সাফ করার কাজ চলতে থাকে। উদ্দেশ্য, অনেক দূর থেকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। ছোট উদয়পুরের কাঠের কারবারীরা যারা বাকি বনাঞ্চলের কামদার সংঘ নিয়ন্ত্রণ করত তারাই ঐ অঞ্চলে জংগল সাফাইয়ের কাজে উৎসাহ দেখায়। সময়টা ১৯৬০-এর দশক।

বনজংগল কেটে ফেলার পরে পানওয়াদ অঞ্চলে দেখা দিল পরিবেশগত বিপদ। ঐ অঞ্চলের কৃষিজাত আয় জেলার অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের কৃষিজাত আয়ের তুলনায় কম। সমস্যা থেকে বেরোবার জন্যে পানওয়াদের আদিবাসীরা সাক্ষরতা ও শিক্ষায় মনোনিবেশ করল। কিন্তু নিকটবর্তী স্থানে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় আদিবাসী যুবক যুবতীরা বড় জোর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেই ক্ষান্ত থাকে। তাদের কর্মসংস্থানেরও কোন ব্যবস্থা হয় না। এদের অনেকে সুরাটে হীরে কাটার কাজে বা কচ্ছে নির্মাণ শ্রমিক বা কৃষিশ্রমিকের কজ করতে চলে যায়। বহু বছর গুজরাটের খনিজ উন্নয়ন নিগমের কাদিপানিং প্রকল্পে এদের কর্মসংস্থান হয়েছিল। কিন্তু কয়েকবছর আগে আইনী ও প্রশাসনিক জটিলতায় সেই উদ্যোগ বাধার সম্মুখীন হয়। ঐ সময় থেকেই আদিবাসী যুবকেরা এই অঞ্চলে ড্রাগের চোরাচালান ও ছোটোখাটো অস্ত্র বিক্রীর কাজে জড়িয়ে পড়ে। এই অস্ত্র তারা নিয়ে আসতে থাকে মধ্যপ্রদেশ থেকে, নিয়ে যায় ভাদোদারায় সেখানে ক্রেতারা দর কষাকষি করে ওগুলো কেনে, আসলে ভাদোদরার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করার জন্যে। যারা এই অস্ত্র বিক্রী মারফৎ সহজেই অর্থ রোজগার করে, তারা স্বল্পকালীণ ঋণের কারবারীতে নিজেদের পরিণত করে হিন্দু নাম ও হিন্দু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর চিন্তাপ্রসূত আন্দোলনের প্রতি সেবাপরায়ন মনোভাব গ্রহণ করে। হিন্দু ধর্মীয় চৌহদ্দিতে এদের প্রবেশের ফলে ঐ অঞ্চলে হিন্দু সংকর্ণিতাবাদী আন্দোলনের বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হতে থাকে।

১৯৯৯ সালে যখন ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু হয় তখন পানওয়াদের সন্নিহিত গ্রামগুলিতেও আমরা আদিবাসীদের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করি। ঐ গোষ্ঠীগুলো ছিল কানালওয়া, চিমলি, দুংগার গ্রাম, শিহাদা, ঝাঁঝারঝোল, পানভাদ, মোধালিয়া, রংপুর, ঝাখা, কাভরা, গানথিয়, গাবাদিয়া। তিনবছরের অনাবৃষ্টির সময় যখন অন্যান্যগ্রামে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলো ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ পরিশোধ করতে প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তখন এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো এক দিনেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঋণের দেয় অংক পরিশাধ করে দিয়েছে। আমি দেখে বিস্মিত হয়েছি যে বহু সময় ঋণ শোধের জন্য যে টাকার নোট তারা নিয়ে এসেছে সেগুলো পর পর নম্বর অনুক্রমে সাজানো আছে। নিশ্চিতভাবেই সেগুলো গরীব আদিবাসীদের কাছ

থেকে সংগৃহীত নয়। অন্যান্য গ্রামে স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীদের বেলায় এই অর্থসংগ্রহ ময়লা ও পুরোনো কারেন্সী নোটের মাধ্যমেই হয়ে থাকে– শ্রমিকরা যেভাবে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য এখানে সেখানে নোট গুজে রাখে। তাহলে এটা নিশ্চিত যে ঐ অর্থ ব্যাংক থেকেই তুলে নিয়ে আসা হয়েছে।

স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নীতিগতভাবে আর কোন ব্যাংক এ্যাকাউন্ট নেই। কেবল সেই অ্যাকাউন্টই আছে যার মাধ্যমে আমরা তাদের সাহায্য করে যাই। পিছন ফিরে তাকালেই আমি বলতে পারি যে ঋণের কারবারীদের কাছ থেকে যে অর্থ এসেছে গোষ্ঠীপ্রধানের হাতে ঋণ দেওয়ার নামে তা ঐ ক্ষুদ্র-ঋণ প্রকল্পকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যেই। পানওয়াদের আদিবাসীরা ব্যাংকের নামমাত্র বারো শতাংশ সুদের আওতার বাইরে এসে সুদের কারবারীদের একশো কুড়ি শতাংশ সুদের অওতায় ঢুকে পড়ার জন্য মানসিকভাবে বেশ প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। নয়া হিন্দু, অর্ধ শিক্ষিত, বেকার যুবক এই গোটা প্রজন্মের কাছে হিন্দু সুদের কারবারীরা 'আদর্শ' হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেল। আর ড্রাগ ও বেআইনী বন্দুক নিয়ে কাজকারবার নিয়ম হয়ে দাঁড়াল।

হিংসার উৎস হলো মনোজগত, হাতের অস্ত্র নয়। আদিবাসী জনমানসের গঠন কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক নয়, তবে তা নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয়। সামন্ত্রতান্ত্রিক নয় কারণ রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে তাদের মনোভাবে স্পষ্ট, সেখানে রাষ্ট্রের জায়গায় গোষ্ঠীর প্রাধান্য। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে গোষ্ঠীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ও বিশুদ্ধতা, আদিবাসী সমাজে মহিলাদের প্রতি মনোভাব বাইরের এজেন্সী কর্তৃক মহিলাদের দূষিত করার সীমাহীন ভয়ভীতি দ্বারা প্রভাবিত। যখন কোন আদিবাসী মহিলা তার নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরের কোন পুরুষকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো নিশ্চিত রক্তপাত। যদিও আদিবাসী সমাজের মেয়েরা নিজেদের গোষ্ঠীর ভেতর থেকে পরিবার ও আত্মীয়দের ন্যূনতম বাধা ব্যতিরেকে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে; কিন্তু কখনও গোষ্ঠীর বাইরে নয়। যাই হোক, অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্রুত বদলে যাওয়ার দরুণ আদিবাসীদের সামাজিক শৃংখলার উপর ক্রমবর্ধমান চাপ পড়ছে।

পানওয়াদ-ছোট উদেপুরের উত্তরে অবস্থিত আদিবাসী জেলা পাঁচমহলে মহিলাদের মর্যাদায় নজিরবিহীন পরিবর্তন দেখতে পাওয়া গেছে। আদিবাসীদের মধ্যে বর কনের মা ও বাবাকে যৌতুক দেয়। কনের মূল্য অধিকাংশ অদিবাসীদের মধ্যে নিতান্তই কম ও আনুষ্ঠানিক। কিন্তু পাঁচমহলের ঋণগ্রস্থ আদিবাসীদের মধ্যে অনেকে কনের মূল্যকে আয়ের বিকল্প উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে। আগে যা ছিল এক বা দুই হাজার টাকা, এখন তা উঠেছে ষাট হাজার টাকায়। ফলস্বরূপ, বিয়ে হয়ে যাওয়া মাত্রই স্বামী স্ত্রীকে আমেদাবাদ বা ভাদোদরা মত শহরে নিয়ে যায়। সেখানে তারা দুজনে মিলে শ্রমিকের কাজ করতে শুরু করে যাতে আত্মীয়স্বজন ও সুদের কারবারীদের কাছ থেকে ধার নেওয়া

বিপুল পরিমাণ অর্থ তারা পরিশোধ করতে পারে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই ঋণ পরিশোধ চলতে থাকে।

ভিটে ছেড়ে চলে আসা নারী শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুণ। ঠিকেদার ও শহরবাসীদের যৌন উৎপীড়নের তারা শিকার। পাঁচমহলের আদিবাসীরা যাতে তাদের মেয়েদের বিক্রী করে তার জন্য এদের বর্ণ হিন্দুদের তরফ থেকে টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে। পানওয়াদ অঞ্চলের আদিবাসীরা এই পরিবর্তনের সঙ্গে পরিচিত। পানওয়াদের পূর্ব দিকে মধ্যপ্রদেশের অবস্থান। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসী মহিলাদের অপমান ও লাঞ্ছনা পাঁচমহলের আদিবাসীদের থেকেও বেশি। তপশীলভুক্ত নয় যেমন বেদিয়া, কানজার প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। সেখানে তরুণী মেয়েদের যৌনকর্মে বাধ্য করা যেন নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। পানওয়াদ অঞ্চলে আদিবাসী রমনীদের প্রতি এই আচরণ আদিবাসী মননে প্রভাব ফেলেছে। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত পুলিশ রেকর্ড থেকে দেখা যায় অঞ্চলে সর্বাধিক খুনের ঘটনা ও মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং গুজব ছড়ানো হল, পঞ্চাশ জন আদিবাসী মহিলাকে মুসলমানরা শ্লীলতাহানি করেছে। ঐ পরিস্থিতিতে এই গুজবের পাল্টা প্রতিক্রিয়া যদি আদিবাসীরা ব্যক্ত না করত তাহলে সেটা হতো খুবই আশ্চর্যের। এই সুসংগঠিত হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনাকারীরা তেজগাধে এই গুজব কিন্তু কাজে লাগায় নি। তাই পানওয়াদে হিংসায় মাত্রা তেজগাধের চেয়ে ছিল বেশি।

গুজরাটের আদিবাসীদের মধ্যে হিংসার লাগামহীন বৃদ্ধির কারণ যারা অনুধাবন করতে চান তারা একটি তথ্য কাজে লাগাতে পারেন তাহলো ২০০২ সালের মার্চ মাসের দাংগার আগের ছয় সপ্তাহ সময় কালে তেজগাধ ও হরিদাসপুর অবস্থিত একটি ছোট এলাকায় যেখানে জনসংখ্যা মাত্র ১২০০, সেখানে হঠাৎ করে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল (১) মনসুরভাই দালাসুখভাই বয়স পঞ্চান্ন সৎসর (২) চিখাভাই দালাসুখভাই, বয়স ৪৫ বৎসর (৩) কাঞ্চনভাই ছাগনভাই, বয়স ৪০ বৎসর (৪) কামরিবেন তেলসিংভাই, ৪০ বৎসর (৫) মনিয়াভাই রূপলাভাই, ৪০ বৎসর, (৬) সিংগলিবেন নাথিয়াভাই ৫৫ বৎসর (৭) সানসুভাই সোরিয়ভাই, বয়স ১৩ এর সাথে ১০ বছর ও এক বছরের দুটি শিশু মারা গেছে যাদের নাম রেকর্ডে ছিল না।

তালিকাভুক্তদের সকলে রক্তাল্পতাজনিত কারণে মারা গেছে, তা কিন্তু নয়। এই ধরণের রোগীরা সাধারণভাবে দশ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন। এদের অনেকেই বলা যায় মারা গেছে অপুষ্টি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অবহেলার কারণে। কোন সরকারই স্বীকার করবেন না যে কত গরীব লোককে ন্যূনতম পথ্যের অভাবে মারা যেতে হয়।

যদি জনগণের একটি বড় অংশকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, শোষণ ইত্যাদির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়, তাদের অর্ধ সাক্ষরতা ও বেকারী তাদেরকে সামাজিক মূল্যবোধের সংগে দ্বন্দ্বে

অবতীর্ণ করে এবং নয়া রোল মডেল সোজা রাস্তায় অর্থ রোজগার করার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে যুক্তিহীন জংগী প্রবণতা উর্বর জমি পেয়ে যায়। পানওয়াদও তার ব্যতিক্রম হতে পারত না।

ভাদোদরা জেলার ছোট উদেপুর ও কাওয়ান্ত তালুকের আদিবাসীদের ২০০২ সালের মার্চ মাসের দাংগা সংঘটিত করার আগে তেজগাধ বা পানওয়াদের হাটে সশস্ত্র আক্রমণ করার পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র অথবা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ যা কিনা সেখানে হিংসাকে সমাজ পরিবর্তনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে- এগুলো বিশ্বাস করলে দাংগার মূল কারণ চিহ্নিত করা কখনো সম্ভব হবে না।

১৩ই মার্চ, জেলা শাসক ভাগেশ ঝা ও পুলিশের সিনিয়র উপ-অধিকর্তা কেশব কুমারকে কর্তব্যরত অবস্থায় দেশী বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। ৩১শে মার্চ সাংবাদিক সাহিদ শেখ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনটি দ্যা টাইমস্ অব্ ইন্ডিয়ার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল এই শিরোনামায় "Tribals fox cops with guerrilla warfare tactics".

মুসলমান নাগরিকদের সম্পত্তির উপর আদিবাসীদের আক্রমণ কি হিন্দুত্বের ভাবাদর্শের বিজয় বলে চিহ্নিত হয়েছিল? আদিবাসী ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন এমন মানুষই এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বাচক শব্দে দিতে পারেন। মনে হতে পারে আদিবাসীরা বিজেপির ঘোর সমর্থক পরিণত হয়েছে। কিন্তু সত্য হলো আদিবাসীরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। ভারতবর্ষে দু-ধরণের সম্প্রদায় বিরাজমান- এক ধরনের যারা জাত ও ধর্মের অঙ্গীভূত আর এক ধরণ, যারা অঙ্গীভূত নয়। যেহেতু সমস্ত সরকারী দরখাস্তেই উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যে আদিবাসী হলেও হিন্দু, খৃস্টান না মুসলিম তা উল্লেখ করতে হবে তাই অধিকাংশ আদিবাসীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে তারা হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা খৃস্টান।

যাইহোক, আদিবাসীরা যখন নিজেকে হিন্দু হিসেবে দাবী করবে তখন কোন হিন্দু কি বলবে যে সে আদিবাসী? যদিও আদিবাসী দৃষ্টিকোণ থেকে 'আদিবাসী' এবং 'হিন্দু' সামাজিক সত্তা হিসেবে উভয় উভয়ের থেকে আলাদা নয়, কিন্তু হিন্দু দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলাদা। বিগত পঞ্চান্ন বছর যাবৎ ভারতবর্ষের রাজনীতির চর্চায় এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়েছে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের কথা এবং এই কারণেই আদিবাসী স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন বহুলাংশে ঘটেছে। যদি ধর্মীয় আচার ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কাঠামোর দিকে তাকানো যায় তাহলে দেখা যায় আদিবাসীরা হিন্দুদের থেকে লক্ষ্যণীয়ভাবে পৃথক। আদিবাসীদের মধ্যে যোগ, সন্যাস, বর্ণাশ্রমের কোনো জায়গা নেই। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী কিছু হিন্দু দেবতাকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, কিন্তু কেউই পুরোপুরি গ্রহণ করে না। দেবতা বা দানব সম্পর্কে আদিবাসীদের যে কল্পনা তা হিন্দুদের

কল্পনা থেকে লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। আদিবাসী রামায়ণে ও মহাভারতে কাহিনীর বিন্যাস ও কল্পনা ঐ দুই মহাকাব্যের হিন্দু সংস্করণ থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে আলাদা। পুরোহিততন্ত্র, প্রতিষ্ঠান হিসেবে আদিবাসীদের মধ্যে যেভাবে কাজ করে তা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যেভাবে কাজ করে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

প্রকৃতপক্ষে, একটি আদিবাসী গোষ্ঠী তার গোষ্ঠীরই দ্বারা অনুমোদিত ও তার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতপাতকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা বিকশিত করতে পারে না। যা কিনা সমাজে উচ্চনীচের সামাজিক ভেদাভেদের মধ্যে আটকে থাকে। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সমস্ত আদিবাসী একই 'জাত'-এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হিন্দু-জাতব্যবস্থার মত তাদের সামাজিক কাঠামো নেই। সংক্ষেপে, ঐটিই ছিল কারণ যখন সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের তালিকা তৈরি করা হয় তখন একজন তপশীলি জাতিভুক্তকে তপশীলি উপজাতি থেকে ধারণাগতভাবে আলাদা দেখানো হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সমস্ত সম্প্রদায়কে আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এইভাবে, পর্তুগীজ পর্যটনকারীরা ভারতবর্ষে 'ট্রাইব' এবং 'কাস্ট' এই শব্দগুলিকে একই অর্থে ব্যবহার করত। কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকাল পর্যন্ত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে এটা যথেষ্ট পরিষ্কার হয়েই ছিল যে, বিভিন্ন আদিবাসীও জনজাতি গোষ্ঠী রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী রাষ্ট্রের ধারণা গ্রহণ করতে প্রস্তুতও ছিল। আদিবাসী গোষ্ঠীর সরকারীভাবে দুটো তালিকা তৈরি হয়েছিল। একটি 'অপরাধী আদিবাসী গোষ্ঠী' যা ১৮৭১ সালে ও অন্যটি 'আদিবাসী গোষ্ঠী' যা ১৮৭২ সালে তৈরি হয়। আদিবাসীদের তালিকা উপনিবেশিকোত্তর সময়েও গ্রহণ করা হয়েছিল একটি প্রয়োজনীয় সমাজতাত্ত্বিক উপকরণ হিসেবে। আবার, আইনগত দিক থেকে বৈষম্যের শিকার "অপরাধী আদিবাসী গোষ্ঠী" কে ডিনোটিফাই করে তাদেরকে ST, SC ও OBC মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

আদিবাসীদের সুস্পষ্ট অতীত, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক বন্ধনের প্রতি এক ধরণের মনোভাব আছে এটা ধরে নিয়ে বলতে হয় হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান হিসেবে আদিবাসীদের স্বাতন্ত্র, হিন্দু হিসেবে হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যের চেয়েও অনেক বেশি জটিল ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। হিন্দু স্বাতন্ত্র্যের ধারণাটিও খুবই জটিল। কাজেই, আদিবাসীরা হিন্দু এই কথা জোর দিয়ে বলাটা ব্যাপকতম অর্থে এই দাঁড়ায় যে বিশাল উপমহাদেশে সভ্যতার বহুবিধ সাংস্কৃতিক ফেডারেশনে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর অবস্থান হিন্দু-জাত ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে।

এই জিজ্ঞাসা সমীচীন, কেন একজন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দুত্বের ধারণার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করবে, যদি না সে হিন্দু জাত ব্যবস্থায় প্রবেশ করার স্বতোপ্রণোদিত

সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও হিন্দু জাতব্যবস্থার সবচেয়ে নীচুতে তার স্থান থাকবে। কিন্তু এই ধাঁধানো প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একথা অবশ্যই বলা দরকার যে, হিন্দুত্বের অর্থ মানে হিন্দু হওয়া নয়। আশা করা যায়, হিন্দুত্বের প্রবক্তারা ও হিন্দুত্বের অর্থকে হিন্দু হয়ে যাওয়া মনে করেন না। অন্যকথায়, একজন হিন্দুর কাছে হিন্দুত্বের অর্থ আর একজন খৃষ্টানের কাছে খৃষ্টধর্মের অর্থ এক নয়। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুত্বের অর্থ তার প্রবক্তারা যা মনে করেন তা হলো ভারতবর্ষ প্রাথমিকভাবে একটি হিন্দুরাষ্ট্র– এই ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা। এটা কোন ধর্মীয় দর্শন বা সমাজ সংস্কার আন্দোলন নয়। এটা একটা রাজনৈতিক দর্শন যার ভিত্তি হলো সাংস্কৃতিক জাত্যাভিমান। এই রাজনৈতিক দর্শনে যে ধারণার উপর জোর দেওয়া হয় তা হলো ভারতবর্ষের অহিন্দুরা সংখ্যালঘুর অবস্থান গ্রহণ করবে এবং সংখ্যালগুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নির্ভর করবে সংখ্যাগুরুর কাছ থেকে সে কতটা সুনাম অর্জন করার ক্ষমতা রাখছে তার উপর। এটা সেই ভাবাদর্শ যা হিন্দুদের অন্ধ তাত্ত্বিক হিন্দু হতে পরামর্শ দেয় এবং তা ভারতীয় মুসলমান ও খৃস্টানদেরও অন্ধ তাত্ত্বিক মুসলমান বা খৃস্টান হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেনা।

হিন্দুত্বের ভাবাদর্শের অন্তস্থলে যে ভাবনা কাজ করে তা হলো সংখ্যাগুরুর "মঙ্গল"কে সংখ্যালঘুর "মঙ্গল" হিসাবে দেখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর অধিকারের প্রশ্নে যে কোন উচ্চারণকে সংখ্যাগুরুর রাজনৈতিক কর্তৃত্বের কাছে হুমকী ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এইরূপ সংখ্যালঘুরা তাই হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের কাছে জাতীয়তবিরোধী ও সমাজবিরোধী। এছাড়া, সংখ্যালঘুর সংখ্যা বাড়াবার যে কোন প্রচেষ্টাকে হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা আগ্রাসন ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজী নয়। কাজেই, খৃষ্ট ধর্মে রূপান্তর, বা কোন হিন্দু মেয়ের মুসলমান বা খৃষ্টান ছেলের সঙ্গে বিবাহকে অবাঞ্ছিত বা উস্কানীমূলক কাজ হিসাবে তারা দেখে।

যাই হোক, ইরান বা পুর্বতন আফগানিস্তানের ইস্‌লামিক মৌলবাদীদের সাথে হিন্দুত্বের প্রবক্তাদের পার্থক্য আছে। ইস্‌লামিক মৌলবাদীদের কাছে জাতি বা সংখ্যা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তারা চায় সমস্ত মুসলমানরা ইসলাম মতবাদকে 'বিশ্বস্ততা'র সাথে অনুসরণ করুক। হিন্দুত্বের মতাদর্শ প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রের ধারণার দ্বারা সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী সংখ্যাগুরুর ভাবাদর্শের চারপাশে এই মতবাদ আবর্তিত হয়। ইস্‌লামিক মৌলবাদ হলো ধর্মীয় জংগীপনা। (এই মত অবশ্য বিতর্কিত– সংকলক)। হিন্দুত্ব হচ্ছে 'জাতীয়তাবাদী' আচারসর্বস্বতা। ইস্‌লামিক মৌলবাদ ইসলাম ধর্মের উদারীকরণে ভেতর থেকে বাধা দেয়। আর হিন্দুত্ব অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের সামনে বিপদের হুমকী দেয়, যাতে পারিপার্শ্বিক সম্প্রদায় ও বিশ্বাসের মানুষগুলো তাদের স্বাতন্ত্রের জোরালো প্রকাশ ঘটাতে না পারে। কিন্তু এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় মতাদর্শই কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে গভীর অবিশ্বাসের চোখে দেখে।

হিন্দুত্বের প্রবক্তারা স্বপ্নে ভাবে যে কোনদিন হয়তো ভারতবর্ষ একটি হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আদিবাসীরা যারা হিন্দু নয়; তাদের হিন্দুত্বের পক্ষে খুব বেশি উৎসাহ দেখাবার প্রয়োজন নেই। তাহলে কীভাবে ২০০২ সালে মার্চের দাংগায় আদিবাসীরা মুসলমানদের উপর পৈশাচিকভাবে ঝাপিয়ে পড়ল? ২০০২ সালের মার্চের ঘটনাবলী এই দিক নির্দেশ করতে পারে যে আদিবাসীরা গোধরার হত্যাকাণ্ডের বদলা নিতেই গুজরাটে হিন্দুদের সংগে জোটবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তে আসার আগে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আদিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাস সম্পর্কে কিন্তু খুব বেশি সচেতন নন। আদিবাসীরা জানেন না বাবর কে ছিলেন? তিনি বা তার কোন উত্তরসূরী হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে তার জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করে থাকতে পারে– এমন কথাও তাদের জানা নেই। সাভারকার বা হেডগেওয়ার সম্পর্কেও তারা কিছুই জানে না। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ কী চায় তাও তারা জানে না। এদের কেউই রামসেবক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করে নি, অযোধ্যাতেও যায়নি। শাহ বানো মামলার কথা অথবা জামা-মসজিদের ইমামের কথা তারা কখনও শোনেই নি। ইসলাম ধর্মের যে চেহারাটা তারা দেখেছে এবং দেখছে তা হলো স্থানীয় সুদের কারবারীদের চোহারা। 'হিন্দুত্ব' আন্দোলনের একমাত্র যে চেহারা আদিবাসীরা জেনেছে তা হলো পঞ্চায়েত ও বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি'র উপস্থিতি। যদিও এটা সত্যি যে আদিবাসীরা মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বেশি নৈকট্য বোধ করে, আরও যা সত্যি তা হলো তাদের যোগাযোগ বা সম্পর্ক– সবটাই স্থানীয় ইস্যু ও রাজনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আদিবাসীদের সচেতনতার ব্যাপক সীমাবদ্ধতার কথা কংগ্রেস নেতৃত্ব ভালই জানত। আদিবাসী অঞ্চলের উপর বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেসের আধিপত্যকালে এই দলটি আদিবাসীদের শিক্ষিত ও সংবেদনশীল না করার লক্ষ্যে খুবই যত্নশীল থেকেছিল। বিশুদ্ধ ভোট ব্যাংক হিসেবে তাদের রেখে দিতে হবে। দারিদ্র্যই তাদেরকে একমাত্র ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারে। চার দশক ধরে অদিবাসী অঞ্চলে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণকালে তাদের পেছিয়ে পড়া অবস্থায় রেখে দিতে কংগ্রেসের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। এরই ফলে আদিবাসীরা বিশ্বাস করতে থাকলো যে তাদের পেছিয়ে পড়া অবস্থা হচ্ছে এক ধ্রুব সত্য। আজ যখন কোন আদিবাসী বসে 'আমরা পাছাত',– পছিয়ে পড়া; সেইসময় তাদের অবস্থা সম্পর্কে তারা ঘূণাক্ষরেও কিছু জিজ্ঞাসা করে না, কোন রকম সন্দেহ প্রবণতাও তাদের মধ্যে তৈরি হয় না। কংগ্রেস জানত যে যদি আদিবাসীদের পশ্চাদপদ রেখে দেওয়া যায়, তাহলে তারা কোনোদিন সমস্যাগুলোকে রাজনৈতিকভাবে দেখার চেষ্টা করবে না।

বি জে পি জানে না আদিবাসীদের দারিদ্র্য কীভাবে দূর করা যায়। এই নয় যে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে এদের খুব উৎসাহ আছে কারণ এরাও

আদিবাসীদের ব্যাপক ভোট ব্যাংক হিসেবেই দেখতে চেয়েছে। প্রায় একদশক ধরে প্রতিটি রাজ্যের আদিবাসী অঞ্চলে সংঘ পরিবার সক্রিয়। এর অন্যতম ভগ্নী সংগঠন, বনবাসী সেবা সংঘ (ভি.এস.এস.)-এর মাধ্যমে আদিবাসীদের মধ্যে হিন্দুত্বের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বনবাসী সেবা সংঘ আদিবাসীদের আদিবাসী না বলে বনবাসী বলে থাকে। আদিবাসীর অর্থ ভূমি পুত্র।

ভি.এস.এস. ইতিহাস সম্পর্কে আর.এস.এস-এর দৃষ্টিভংগীর সমর্থক। এই দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী আর্যরা হচ্ছে ভারতবর্ষের মৌলিক অধিবাসী। ভি.এস.এস-এর মত অনুযায়ী আদিবাসীরা অনার্য। তারা কী করে মৌলিক অধিবাসী হবেন? সুতরাং, এইভাবেই আদিবাসীদের আদিবাসীত্ব হিন্দুত্বের কাছে বেশ বড় বিপদ।

ভি.এস.এস খৃষ্টীয় মিশনারীগুলোকে আদিবাসীদের প্রধান শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করছে। আদিবাসীরাও মিশনরীদের ভালভাবেই জানে। ধর্মান্তরের কথা তারা বোঝে। তারা জানেন যে তাদের ঐতিহ্যবাহী গান গাওয়া ও বাবো পিথোরার মত ঐতিহ্যবাহী দেবতাদের ছবি আঁকা বা তাঁদের উপাসনা করা মিশনরীরা অনুমোদন করে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গুজরাটের দংগ জেলায় বা উড়িষ্যা ও বিহারের মত অন্যান্য রাজ্যে খৃস্টীয় মিশনারীরা হিন্দুত্বের কর্মসূচীর সমর্থক আদিবাসীদের বিক্ষোভের মুখোমুখী হয়েছে।

যাই হোক, এটা মজার ব্যাপার যে, অদিবাসীরা যারা দংগ জেলায় খৃষ্টান গীর্জার উপর আক্রমণ করেছে বা পাঁচমহলে বা বারোদা জেলায় মুসলমান বাড়িঘর ও দোকানপাটের উপর আক্রমণ করেছে তারা এখনও নিজেদের আদিবাসী হিসেবেই পরিচয় দিচ্ছে। বনবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে তারা অস্বস্তি বোধ করছে। অন্য কথায়, ভি.এস.এস ও বি জে পি আদিবাসীদের মধ্যে ঘৃণার রাজনীতি সরবরাহ করার ব্যাপারে সাফল্য পেলেও তারা কিন্তু আদিবাসীদের স্বাতন্ত্রবোধকে গুলিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সফল হয় নি।

আদিবাসীরা শত্রু হিসেবে যাদের মনে করে এসেছে তাদের সম্পর্কে উগ্র ঘৃণাবোধ তারা ধরে রেখেছে। কংগ্রেস কর্তৃক সংরক্ষিত দরিদ্র এবং বি জে পি কর্তৃক সরবরাহকৃত ঘৃণার রাজনীতি মিলেমিশে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার হতে পারে। যেহেতু, সমস্ত সংখ্যালঘুদের প্রশ্নাতীতভাবে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে এই দাবিই 'হিন্দুত্ব'র স্বাভাবিক পরিণতি। বশ্যতা জানাতে হবে আদিবাসীদেরও হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার প্রতি, জানাতে হবে সার্বিক আনুগত্য। আর এই হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আর্যয়ানী। সুতরাং, আদিবাসী উপজাতি ও বনবাসী হিন্দুদের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী।

পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের সীমিত পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের আক্রমণ করতে ও আদিবাসীদের উস্কে দেওয়ার মধ্য দিয়ে 'হিন্দুত্ব' যে ফয়দা তুলেছে তাকে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। যাইহোক, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এর যে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়তে শুরু

করেছে তা রাজ্যের পক্ষে চূড়ান্ত ক্ষতিকারক ছাড়া আর কিছুই নয়। ২০০২ সালের মার্চ মাসের দাংগার সময় রাজ্যের প্রশাসনকে আদিবাসী অঞ্চলে দৃশ্যত লোপ পেয়ে যেতে দেখা গেল। আবার তাকে প্রতিষ্ঠিত করা–এ এক দুরূহ কাজ। দাংগার সময় মুসলমানেরা এক অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছে। একই যন্ত্রণায় কাতর সেই সব হিন্দু পরিবার যাদের আত্মীয়স্বজন গোধারার ঘটনায় নিহত হয়েছে। গুজরাটের অর্থনীতিতে এক বড় রকমের বিপর্যয় ঘটে গেছে। উঠে দাঁড়াতে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে, অবশ্য যদি দাঁড়াতে পারে। সবচেয়ে ধাক্কা খেয়েছে সুস্থ জীবনবোধ। এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি আসতে অনেক বছর লেগে যাবে। গুজরাটে আদিবাসীদের সংঘর্ষে টেনে আনা হয়েছে। এক সীমাহীন হিংসা ও আত্মবিনাশের মুখোমুখি আজ তারা দাঁড়িয়ে। ঘটে যাওয়া দাংগাগুলোর ফলাফলে আজ মুসলমানদের ত্রাণ শিবিরে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। যা ছিল, সর্বস্ব খুইয়েছে তারা। তারা এতটাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে যে মারমুখী প্রতিবেশীদের মধ্যে তাদের পোড়ো বাসস্থান আর দোকানপাটও ফিরে পেতে তারা প্রস্তুত নয়। গুজরাটের ভূমিকম্পে কুড়ি হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রভূত সহযোগিতা ও সাহায্যের হাত প্রসারিত হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ভূমিকম্পে পীড়িত সমস্ত মানুষকে পুনর্বাসন দিতে ব্যর্থ হয়। দাঙ্গা প্রায় একলক্ষ মানুষকে উৎখাত করেছে ও অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলিম যারা কাজ হারিয়েছে তাদের এই তালিকায় রাখা হয় নি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কোনদিন পুনর্বাসন পাবে– এর কোন সম্ভাবনাই নেই।

গুজরাটে দাংগার আর একটি মারাত্মক ফল হোল আদিবাসীরা সেখানে আজ ঘৃণার রাজনীতির শিকার, যাকে সহজেই অ-মুসলমানদের বিরুদ্ধেও ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গুজরাটে আশি লক্ষ আদিবাসী যাদের অদিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র, অনাহারে দিন কাটাতে হয়। এই চিন্তাহীন রাজনৈতিক দুঃসাহসের দীর্ঘ মেয়াদী পরিণাম ভয়ঙ্কর। তেজগাধ ও পানওয়াদের মত গ্রামগুলিতে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে তখন কানে তারা লাগানো চিল-চিৎকার যা ওরা ২০০২ সালের মার্চ মাসে শুনেছে তা ওরা কোনোদিন ভুলতে পারবে না। দাংগার সময় এই আর্তনাদের মধ্যে ছিল দুঃখ ও ভয়ের সমন্বয়। তার মধ্যে ছিল না কোন ঐশ্বরিক স্পর্শ। খুবই করুণার কথা, অদিবাসীরা দাংগার সময়ই ভাষা খুঁজে পেল, অবশ্যই কোন আদর্শ বা লক্ষ্য পূরণের জন্য নয়, নয় তাদের জীবনের কোন মানোন্নয়নের জন্য। একটি সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট এক হিংস্র দাঙ্গায় এরা জড়িয়ে পড়ল।

গুজরটে দাংগার ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণে এসে যাওয়া, দিন আনে দিন খাই মানুষের কৃষির কাজ কিংবা শহরে শ্রমিকের কাজে ফিরে যাওয়া কিংবা ভারতবর্ষের গণমাধ্যম দুর্নীতি ও সামাজিক বিপর্যয়ের মত অন্যান্য নানান সমস্যার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার অনেক দিন পরেও হিংসার কদর্য রেশ এই মানুষগুলোর মনে থেকেই যাবে। সরকার ও দলের

পরিবর্তন ঘটিয়ে দাংগাকে চাপা দেওয়ার বা হিংসাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা আমাদের সাময়িক শান্তির চেয়ে বেশি কিছু এনে দিতে পারবে না। একটি স্থায়ী সমাধান পেতে গেলে আমাদের প্রয়োজন সমস্যার শিকড়ে গিয়ে তার মোকাবিলা করা। সেই কাজ আমাদের প্রত্যেককে করে যেতে হবে প্রতিটি জায়গায়, প্রতিদিন।

গুজরাটে হিংসার ঘটনাবলীর দিনগুলিতে আমার বারবার মনে পড়ছিল আলবেয়ার কামুর আলোড়নকারী উপন্যাস "দ্য প্লেগ"- এর কথা। মহামারি চলাকালীন ওরান শহরের অস্বাভাবিক জীবনের ছবি আঁকা হয়েছিল ঐ উপন্যাসে। আমলারা উদ্ভূত বিপর্যয়কে ব্যবহার করেছিল অনৈতিকভাবে অর্থ উপার্জনের সুযোগ হিসেবে, আর দেবতারা মানুষের প্রতি কতখানি বিরূপ তারই প্রমাণ হিসেবে ধর্মীয় নেতারা ঐ মহামারিকে চিহ্নিত করেছিলেন, আর অন্যান্যরা নিরাপদ স্থানে পালিয়ে আসতে চাইছিল। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ডঃ মিরাসলের, যিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে সম্পূর্ণ অবিচল। তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর স্বদেশভূমিতে থেকে যাওয়া ও মহামারির বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা, এটাই তাঁর কাছে একমাত্র বিকল্প, পছন্দসই সিদ্ধান্ত। কিছুদিন বাদে মহামারির প্রকোপ কমে গেল, এই কারণে নয় যে ডঃ মিরাসলে মহামারিকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন। রহস্য জনক ভাবেই তা অন্তর্হিত হয় ঠিক যেমন তার প্রকোপ নেমে এসেছিল।

বামুর চিন্তায় মহামারির এমন প্রকোপ ও অন্তর্ধান উভয়ই অসম্ভব। কিন্তু, তিনি যে বক্তব্য জোরের সাথে তুলে ধরেছিলেন তা হলো যখন কেউ কোন সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করে তখন সে তার গৃহীত-সিদ্ধান্তের প্রতি নৈতিক দায় স্বীকার কর নেয়। অস্তিত্ববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন হচ্ছে একটির পর একটি সিদ্ধান্তের মিলিত ছবি। ঈশ্বর, সত্য বা ন্যায়ের মর্মবস্তুর কোন অস্তিত্ব নেই বলে কোন মনমতো বিকল্প বেছে নেওয়া ও পছন্দসই সিদ্ধান্ত নেওয়া এক দুরূহ কাজ।

আজ, আমাদের পক্ষেও বাছবিচার করে কোনো বিকল্পের প্রতি পছন্দসই সিদ্ধান্ত ওেয়া সম্ভব নয়। আজ আমরা এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি যেখানে আমরা যদি প্রতি মুহূর্তেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করি তবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সংগে যোগ সাজশের দায় আমরা এড়াতে পারব না। তাই, গঠনমূলক কর্মকাণ্ডই আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ। তা ছাড়া আর কোনো বিকল্প আমাদের কাছে নেই। অন্যথায়, আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

'Tribal Voice and Violence' Seminar, May 2002 Society Under Seize

ভাষান্তর : সুদীপ্ত সাহা রায়

স্বাধীনতার জন্য যারা একটা মাছিও মারেনি তারাই আজ দেশরক্ষক

জাভেদ আখতার

যে দেশের মানুষ খেতে পায় না পরনের কাপড় পায় না, সেখানে নিরক্ষরের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এবং যে-দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের রোজগার নেই, সে দেশে এক ধর্মের মানুষকে আরেক ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে, খুন জখম ও উৎখাত করার প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে? যে কোনো ধর্মের মানুষই মাথার উপরে ছাদ চান, পরার কাপড় চান, অসুখ হলে একটু ওষুধ চান। আর চান খাদ্য। মানুষের এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে যারা এই গণহত্যা ও লুঠপাটের তাণ্ডব চালাচ্ছে তারা আসলে জনগণের স্বার্থবিরোধী কাজই করছে। কারণ, এর মাধ্যমে এরা মানুষের দৃষ্টি মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

উর্দুরই 'খড়িবোলি'-কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরা যখন দেবনাগরী ভাষায় লিখলেন, তখন তার উপর হিন্দুত্ব আরোপিত হল এবং নাম হয়ে গেল হিন্দী। অর্থাৎ শুধু লিপি পরিবর্তন করেই একই ভাষার উপর দুটি ধর্মের ছাপ এঁকে দেওয়া হল। আবার হিন্দীতে যিনি প্রথম পুস্তক রচনা করেছিলেন তিনিও একজন মুসলমান। তাঁর নাম মালিক মহম্মদ জৈসি। আসলে ভাষার তো কোনও জাত বা ধর্ম হয় না, এলাকা হয়।

বৃটিশরা তাদের শাসন বজায় রাখার স্বার্থে কখনো হিন্দুদের, কখনো মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ জাগিয়ে তুলতো। এ অনেকটা সেই গল্পের বাঁদরের পিঠে-ভাগের মত। আর মানুষের চরিত্রও বড় অদ্ভুত। ভাল জিনিস শিখতে অনেক সময় লাগলেও, খারাপটা গ্রহণ করে বড় তাড়াতাড়ি।

ধর্মনিরপক্ষতার অপরাধে গান্ধীজীকে খুন করল আর এস এস। তার ফলে আর এস এস দলটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। দু'বছর পরে এই শর্তে তাদের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় যে, তারা কখনো রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নেবে না, শুধুমাত্র সমাজসেবামূলক কাজ করবে এবং দলের নিজস্ব সংবিধান রচনা করে তার ভিত্তিতে দল পরিচালনা করবে, যেখানে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র থাকবে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালে দলের রাজনৈতিক/কাজকর্ম পরিচালনার জন্য আর এস এস তার রাজনৈতিক ফ্রন্ট তৈরি করল। আমরা জানি যে কোনো বড় রাজনৈতিক দলেরই ছাত্রফ্রন্ট, যুবফ্রন্ট, মহিলাফ্রন্ট, মজদুর-কিষাণফ্রন্ট ইত্যাদি থাকে। কিন্তু এখানে চমকপ্রদ ব্যাপার এই যে, বিজেপি রাজনৈতিক দলটি নিজেই মূল সংগঠন আর এস এস-এর ফ্রন্ট মাত্র। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী যখন কংগ্রেস ছেড়ে এলেন তখন আর এস এস-এর চার প্রচারককে তাঁর কাছে

পাঠানো হয়েছিল। এঁরা হলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, বলরাজ মাধোক এবং দীনদয়াল উপাধ্যায়। (মনে রাখবেন, আর এস এস শুধু প্রচারকই হয়। কোনও বিচারক হয় না। তার কারণ সেখানে বিচার করার অধিকারী একজনই। তিনি গুরুজী।) এরা সবাই মিলে তৈরি করলেন জনসঙ্ঘ। এই জনসঙ্ঘ পরবর্তীকালে জনতাদলে যোগ দেয় এবং তারও পরে বিজেপি গঠন করে। কিন্তু এদের প্রাথমিক আনুগত্য আর এস এস-এর প্রতিই থাকে। এই হচ্ছে এদের দেশভক্তি, আর এই হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামে এদের ভূমিকা।

আর এস এস এখন দেশের সংস্কৃতির অভিভাবক সেজে বসেছে। এরা যা বলছে এবং করে দেখাচ্ছে, সেটা যদি আমাদের দেশের সংস্কৃতি হয় অর্থাৎ গর্ভবতী নারীর পেট থেকে সন্তানকে বের করে আগুনে ফেলে দেওয়া, দশ বছরের মেয়েকে গণধর্ষণ করা এবং অসহায় মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালানো ও লুটপাট করা– তাহলে ধিক্ এমন সংস্কৃতিকে। এই লোকগুলেকে মানুষ বলতেও ঘেন্না হয়। আমার দুর্ভাগ্য যে, তবু এদের মানুষ বলতে হচ্ছে। তবে আপনারা এই ভ্রান্তিতে থাকবেন না যে, এরা মুসলমানের শত্রু। মুসলমানরা এদের সাথে কোনও অন্যায় করেছিল বলেই এরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করছে– অনেক মানুষ এই প্রচারে ধোঁকা খাচ্ছেন। আসলে যারা এদের কথা এবং নির্দেশ মেনে চলতে রাজি নন তাদের প্রত্যেকের শত্রু এরা। যারা এদের মত করে ভাবতে চান না, তাদের এরা নিশ্চিহ্ন করে দিতে যায়। তার জাতি, ধর্ম, ভাষা যাই হোক না কেন।

একটা প্রশ্ন চলেই আসে, গুজরাটের অন্যান্য মানুষরা প্রতিবাদ করছেন না কেন? তার দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত গুজরাটের সব হিন্দুই চান যে, মুসলিমদের উপর ঐ পাশবিক বর্বরতা চলুক অথবা বিবেকবান হিন্দুরাও ততটাই সন্ত্রস্ত যতটা মুসলমানরা। গুজরাটের মানুষ ভীত হয়ে উঠছে কারণ, তারা দেখছে আইনের রক্ষকরাই দাঙ্গায় মদত দিচ্ছে, খুন করছে, ঘর জ্বালাচ্ছে। অসহায় মানুষ কার কাছে যাবে? কার কাছে বিচার চাইবে? কার কাছে অভিযোগ জানাবে?

যা কিছু গুজরাটে ঘটছে, আপনারা জানেন, আমিও জানি এর অনেকগুলো কারণ আছে। অন্যতম কারণ হল গণ-মাধ্যমের ভূমিকা। আজ অনেক চ্যানেল হয়েছে কিন্তু সব চ্যানেলের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রশ্নাতীত নয়। দ্বিতীয় কারণ হল, যারা এই নৃশংসতা এতদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের এই কাজগুলিকে গোপন করতে চাইছে না সত্যিই ভয়ানক। তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে কিছু হিংসাত্মক ঘটনা যদি দু'তিনদিনের মধ্যে ঘটে শেষ হয়ে যেত, তাহলে আমরা জানতেই পারতাম না যে, এর পেছনে কী গভীর ও ভয়ানক চক্রান্ত আছে। যারা খুন করছে, ঘর জ্বালাচ্ছে বা অন্যান্য বীভৎস কাজ করছে তাদের উদ্দেশ্য শুধু সেটুকু নয়। তাদের উদ্দেশ্য হল এই নারকীয় দৃশ্য সাধারণ মানুষের সামনে ঘটিয়ে তাদের সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত করা। তারা মানুষকে যেন বলতে চায়,

এই দেখো আমরা এইসব বীভৎস ঘটনা ঘটাচ্ছি, দেখি তোমরা কী করতে পারো। আসলে গুজরাটের সঙ্ঘ পরিবার সারা গুজরাটকে তথা সারা ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেন বলছে, এই যে তোমাদের সংবিধান এটা আমরা কোনোদিনই পছন্দ করিনি, একে আমরা মানছি না। এই যে তোমাদের আদালত একে আমরা তোয়াক্কা করিনা। এই যে তোমাদের মানবাদিকার কমিশন একে আমরা থোড়াই পরোয়া করি। যা তোমাদের মিডিয়া বলছে তাও আমরা পরোয়া করিনা। এবার দেখি তোমরা কী করতে পারো?

এতদিন সঙ্ঘপরিবারের একটা মুখোশ ছিল। তার নাম অটলবিহারী বাজপেয়ী। এখন সেই আবরণটুকুও মুছে গেছে এবং সেটা মুছে দিয়েছেন স্বয়ং অটলবিহারী। তিনি প্রথমদিকে এমন ভূমিকা পালন করেছিলেন, যাতে লোকের মনে হচ্ছিল সঙ্ঘপরিবার যাই হোক বাজপেয়ীজী একজন সহনশীল, নরমপন্থী মানুষ। কিন্তু মানুষের সেই ভুল ধারণা তিনি সম্পূর্ণভাবে দূর করে দিয়েছেন। কারণ তিনি এবং সঙ্ঘপরিবার এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ঐ আবরণটুকু আর রাখার প্রয়োজন নেই বরং এখন কথাবার্তা খোলাখুলি বলাই ভাল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যে প্রধানমন্ত্রীর আসন এক সময় জওহরলাল নেহেরুর মত জাতীয় নেতারা অলঙ্কৃত করতেন, সেই আসনেই আজ বসে আছেন আর এস এস-এর একজন প্রচারক। একজন প্রধানমন্ত্রী দেশের কোটি কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী। তিনি যখন বলেন, 'আমরা' তখন সেই 'আমরা' শব্দটির মধ্যে ভারতের কোটি কোটি মানুষের স্বর প্রতিফলিত হয়। কিন্তু অটলবিহারী যখন 'আমরা' বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারি তিনি কেবলমাত্র আর এস এস ও সঙ্ঘপরিবারের কথাই বলছেন। ফ্যাসিজমের স্বরূপ আমরা ইতিহাস থেকেও অনুধাবন করতে পারি আবার ভূগোল থেকেও অনুধাবন করতে পারি। ইতিহাসের দিকে তাকালে আপনি হিটলার মুসোলিনীর মত ফ্যাসিস্টদের দেখতে পাবেন। আমি কয়েকদিন আগে ভূপালে গেছিলাম, এই বিষয়েই একটি সভা হয়েছিল সেখানে। আর এস এস-এর কয়েকজন যুবক ওখানে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। আমি তাদের একটাই কথা বলি যে, যদি আপনাদের মনে হয় নরেন্দ্র মোদী যা করেছেন ভাল করছেন, গুজরাটে সঙ্ঘপরিবার বা আর এস এস যা চালাচ্ছে তা প্রশংসনীয়, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু যদি কখনো ভুলক্রমে আপনাদের মনে হয় যে, নরেন্দ্র মোদী অন্যায় করছেন, আর এস এস সঠিক কাজ করছে না– তাহলে কি আপনাকে আপনার এই বক্তব্য গুজরাটে দাঁড়িয়ে বলার অধিকার দেওয়া হবে? আমার কথা ভুলে যান। ভাবুন, সেখানে আপনার কী অবস্থা হবে?

হিন্দু তালিবানরা হিন্দু পাকিস্তান বা হিন্দু আফগানিস্তান বানানোর চেষ্টা করছে। যে কোনো হিন্দুস্তানী, সে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাই যাই হোক না কেন, যদি আর এস এস-এর বিরুদ্ধে সরব হয়, তাহলেই তাকে তারা দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে। এরা এই

দেশের হামলাকে কীভাবে মোককাবিলা করা যাবে– আপনারা ভাবুন। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকলে এরা আরো সুযোগ পেয়ে যাবে। একা কারোর পক্ষে এদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়– শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি ভারতবাসীকে এক হয়ে লড়তে হবে।

(কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংহতি কমিটি আয়োজিত সভায় প্রদত্ত উর্দু ভাষণের অনুবাদ।)

অনুবাদ : দোপাটি চক্রবর্তী।

উদারচেতা বন্ধুরা, নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণে উঠে দাঁড়ান

শাবানা আজমি

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরেই 'মুসলিম' শব্দটি অভিযোগ হিসাবে সর্বপ্রথম আমার দিকে ছুড়ে দেওয়া হয়। আমি এমন এক সংকীর্ণতামুক্ত বিশ্বজনীন পরিবারে বড় হয়েছি যেখানে হোলি, দেওয়ালি, ক্রীসমাস, ঈদ সমান উৎসাহে উদ্‌যাপিত হয়ে এসেছে।

আত্মপরিচয় আমার ক্ষেত্রে বহুমুখী। আমি কে- এই প্রশ্নের জবাবে আমি অবশ্যই বলব যে আমি একাধারে নারী, অভিনেত্রী, সমাজকর্মী, মুসলিম, কন্যা, জননী, জায়া ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ভারতে তখন সচেতন ভাবে এক সম্মিলিত প্রয়াস চালানো হচ্ছে যাতে ব্যক্তির আত্মপরিচয়কে যে ধর্মমতে তার জন্ম, সেখানেই বেঁধে ফেলা যায়। কিন্তু ভারতের প্রাণ হল এর সমন্বয়ী সংস্কৃতি। সে কারণেই অভিন্ন ধর্মমতের অংশীদার হয়েও একজন কাশ্মীরী মুসলমানের সাথে তামিলনাড়ুর মুসলমানের যতটুকু মিল, একজন কাশ্মীরী হিন্দুর সাথে তার মিল অনেক বেশি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর ক্রমাগত অভিযোগে অবস্থা এমন দাঁড়াল যেন মুসলমান হওয়াই এক অপরাধ বিশেষ। আমি পা ঠুকে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলাম- হ্যাঁ, আমি একজন মুসলিম। তার জন্য আমায় কী প্রায়শ্চিত্ত করতে বলো? আমি এমন একজন মুসলিম যার বাবা-মা দেশভাগের সময় ভারতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভারতে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে এবং বহুত্ববাদ দেশের শক্তি হয়ে উঠবে।

তাহলে কিভাবে তাঁদের কন্যাকে, যার তখন জন্মই হয়নি, নতুন করে দেশের প্রতি আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে বলা যেতে পারে? ক্রিকেট খেলায় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের বিজয়ে শতখানেক বিপথগামী মুসলমানের উল্লাসে কেনই বা পনেরো কোটিকে বিদ্রূপ করা হবে? যখন অশোক সিংঘল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তাদের রকমারি কাজকর্মে লিপ্ত থাকে, তখন কি সকল হিন্দুকেই আগুনে সেঁকা হয়?

দেশভাগের পর ধর্ম নিরপেক্ষ মুসলিমরা নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণে আরো বড় প্রয়াস নেওয়ার জন্য নিজ সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড থেকে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনকি মুরাদবাদ, ভিওয়ানিতে মুসলিমদের নৃশংসভাবে জবাই করার পরও তাঁরা সরেই থেকে ছিলেন।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার ফলস্বরূপ দাঙ্গাগুলি হয়ে ওঠে উদারমনস্ক মুসলিমদের ঘুম ভাঙ্গানিয়া আজান ধ্বনি। এই দুঃসময়ে সম্প্রদায়ের সহায়তায় অগ্রসর না হলে, পরে অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের কথায় কেউ আর কর্ণপাত করবেন না, সে কথা তাঁরা বোঝেন।

তাই, এই প্রথম মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা ত্রাণ ও পুর্ণবাসনের কাজে প্রকৃতই পথে নামেন। কিন্তু ঘটনা হল, সংকটের সময়ে একত্রিত এই গোষ্ঠীগুলি পরবর্তীকালে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে কারণ তাঁরা লাগাতার সক্রিয়তার কর্মীসুলভ মানসিকতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আর-এস-এস কিংবা ভি-এইচ-পি-র মতো দীর্ঘ স্থায়ী লক্ষ্য নিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর কর্মসূচীও তাঁদের ছিল না।

রাজনীতিকদের হাতে কামানের খোরাক হিসাবে নিজেদের ব্যবহৃত হতে দেওয়ার বিষয়টি নাকচ করার সময় হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই এসে গেছে। সীমান্তে যুদ্ধ, আই-এস-আই, মদ্রাসা, পোটো ইত্যাদি জুজু দেখিয়ে চারিদিকে আতঙ্কবিকার ছড়ানোর প্রতিটি অপপ্রয়াসকে উত্তরপ্রদেশের হিন্দুরা যেভাবে প্রতিহত করেছেন, তা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

সাধারণ একজন হিন্দু, শিখ বা খ্রিস্টানের মতোই সাধারণ একজন মুসলমানের চিন্তার প্রধান বিষয় হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। তাহলে কেন একজন মুসলমানকে শুধু মুসলিম নেতার খোঁজ করতে হবে? কার্য্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদেরও যে কোনো নেতৃত্বে আস্থা রাখা উচিত।

আমার মনে হয় যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অপপ্রচার প্রতিহত করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা রয়ে গেছে। কারণ হল, উদারপন্থী মুসলিমরা এর কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি। মনে হয় এ সবের জবাব দেওয়ার সময় এসে গেছে।

বিষয়টিকে হিন্দু ও মুসলমানের সংঘাত হিসাবে দেখা বন্ধ করা উচিত। আদতে এটি উদারপন্থীদের সাথে মৌলবাদীদের সংঘাত। তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল ধর্মনিরপেক্ষ ও উদারপন্থীদের সাথে আমাদের একসাথে হাত মেলানো উচিত। অভিন্ন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সকলের জোট বদ্ধ হওয়া আবশ্যিক।

অজানাকেই আমরা ভয় পেয়ে থাকি। তাই একে অপরকে জানার জন্য সচেতন প্রয়াস নেওয়া সঙ্গত। সকল মুসলমানই হানাদার– এমন মিথ্যাচার আমাদের খণ্ডন করতে

হবে। আমাদের দেশের ইতিহাসে আকবরের মতো বহু শাসকই যে এ দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন, সেই সত্যের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

হিন্দু ও মুসলিমরা এখানে বহু বছরধরে একত্রে শান্তিতেই বাস করছেন। হায়দ্রাবাদ থেকে আমার কাকা আমায় জানিয়েছেন যে সেখানে মহরমের সময় যখন মুসলিমরা 'তাজিয়া' বার করেন, তখন হিন্দুরা দুধ ঢেলে সেই তাজিয়াকে স্নান করান। রাজস্থানের সাধুদের কাঠের খড়ম তৈরি করেন মুসলিমরা। মুসলমানেরাই 'ওড়নি'র রঙের ও ছাপাইয়ের কাজ করে থকেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যখন অযোধ্যা মন্দিরের সাথে কাশী ও মথুরার আওয়াজ তোলে তখন বেনারসের মানুষজন রুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন যে সেখানে তাঁরা কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চান না।

হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে।

'Liberal stand up to be counted,' Decc an Chronicle, 10th March 2002.

ভাষান্তর : অসীম চট্টোপাধ্যায়

'এখনও এখনও যদি ঘরে বসে নিজেকে বাঁচাই'

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

গুজরাতের সাম্প্রতিক কাণ্ড নিয়ে এত লেখা হয়েছে, এত কথা হয়েছে, এত ছবি ও চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে, ভয় হয়, যাই লিখি, পুনরাবৃত্তি হয়ে যাবে। অন্তত কিছু পাঠকের কাছে এ লেখার কোনো অংশ সেইরকমই মনে হতে পারে।

ঠিক কী ঘটেছিল এবং তীব্রতা অনেক কমে গেলেও, এখনও মে মাসের শেষেও, কী ঘটে চলেছে, গুজরাতে?

ধর্মভিত্তিক দাঙ্গা কোনো নতুন ঘটনা নয়। এদেশে এমন দাঙ্গার বয়স প্রায় দেড় থেকে দুশ বছর।

আমরা, ভারতীয়রা, শুধু ইতিহাস-বিস্মৃত নই, ইতিহাস-ভীরুও। সেই জন্যেই ইতিহাস যে-সত্যের সংবাদ দেয় তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে যেটুকু শেখা দরকার, যতটুকু গ্রহণ ও বর্জন করা প্রয়োজন তা করতে পারি না। এবং ভীরুরা যা করে আমরাও ঠিক তাই করি। নিজের কাঁধ থেকে দায়টা সরিয়ে দিই অন্যের কাঁধে। এদেশের দাঙ্গার দায় একসময়ে নির্দ্বিধায় চাপিয়ে দেওয়া হতো ব্রিটিশদের ওপরে। সন্দেহ নেই সাম্রাজ্য চালাবার জন্যে তারা মানুষকে নানাভাবে ভাগ করে ফেলতে চাইত এবং করে ফেলতও। আরবে বা আফ্রিকায় সে-ভাগের মুখ্য ভিত্তি ছিল জাতিগোষ্ঠি ও ট্রাইব।

এদশে ধর্ম প্রধানত মানুষকে ভাগ করে দিয়ে শাসন করার এই নীতি সফল করতে এদেশের ইতিহাসই বদলে দিয়েছিল। তাদের লেখা নতুন ইতিহাসে প্রাচীন যুগ হয়ে উঠেছিল হিন্দু শাসনের স্বর্ণযুগ। মধ্য পর্যায়ের মুঘল যুগ চিহ্নিত হয়েছিল অন্ধকার যুগ বলে। সেই ইতিহাস পড়ে ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দুমনে ভাবনার কোন রঙের মেঘ জমতে পারে তা সহজেই আঁচ করা যায়।

সে মেঘের একটিমাত্র দৃষ্টান্তেই তার চরিত্র বোঝাও যাবে। সেই মেঘই তো ছিল নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথায় ও বুকে, যখন তিনি 'ভারতে যবন' (১৮৭৪) লেখেন। সে নাটকে 'মুসলমানদের ননা অত্যাচারের ছবি আঁকা হয়েছে। ভারতলক্ষীর মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে, 'যতদিন আর্য সন্তানগণ পুণ্যভুমি হতে যবনগণকে দূরীভূত করতে না পারবে ততদিন অবধি প্রিয় ভারতভূমির সুখে বঞ্চিত হলেম, আদরের আর্যসন্তানগণের নিকট হতে বিদায় হলেম।'

আবার এসবের প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান মনে কোন স্রোত প্রবাহিত হত তা অনুমান করাও কঠিন নয়। ফলে ব্রিটিশ আমলে মাঝারি বা বড় কোনো-না-কোনো আকারের দাঙ্গা লেগেই থাকত, প্রায় বিরামহীন।

কিন্তু সব পাপই কি ইংরেজের? আমাদের, ভারতীয়দের কোনো ভাগ নেই তাতে? ইংরেজ চলে যাওয়ার অর্ধ শতাব্দী পরেও কেন তবে গুজরাত ঘটে? স্বাধীন ভারতে কেন খোদ রাজধানীতে নির্মম শিখ নিধন ঘটে যায়? ইংরেজ আমলে কখনও দিল্লি বা গুজরাতের মতো 'পোগ্রোম' ঘটেছে বলে জানা যায় না। এইপাপে আমাদেরও কোনো অংশ আছে নিশ্চয়ই! আর তাই স্বাধীনতার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে ধর্মীয় অসহনশীলতা, হাঙ্গামা, দাঙ্গা এবং আক্রমণ। ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গুজরাতে যা ঘটে চলেছে তাই এ কথার সাক্ষ্য।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ গোধরায় ঠিক কী ঘটেছিল, কারা ঘটিয়েছিল তা নিয়ে তর্ক এখনও শেষ হয়নি। নানা ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। তদন্ত চলছে। তবে সে তদন্ত কোনওদিন শেষ হবে কিনা এবং হলেও প্রকৃত সত্য জানা যাবে কিনা তা কেউ জানে না। এর মধ্যেই গোধরাকাণ্ডের একেবারে মাঝখানে ঢুকে পড়েছে বিজেপি-কংগ্রেস ভোট রাজনীতির মত্তহস্তী। এমন পরিস্থিতিতে সত্য সাধারণতঃ মুখ দেখায় না। অতএব...

যেটুকু নিশ্চিতভাবে জান গেছে তা হল ওইদিন সকালে অযোধ্যা থেকে আসা সবরমতি এক্সপ্রেস স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই দুটি কামরাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ৫৮ জন নিরীহ মানুষ জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরা যান। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন নারী ও শিশু। কয়েকজন করসেবকও ছিল।

কারা ঘটাল এমন ভয়ংকর ও নৃশংস কাণ্ড? কেন ঘটাল? কেমন করে ঘটাতে পারল?

এইসব ভয়ানক জরুরি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। পাওয়া হয়ত প্রায় অসম্ভবই।

কেন্দ্রীয় সরকারের কেউ কেউ, ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিয়েছিলেন, সবই আইএসআই-এর কাজ। আজকাল প্রায় সব অপরাধের ব্যাখ্যাই আই এস আই দিয়ে করা হয়। এ প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, কাণ্ডটা ঘটিয়েছে গোধরার মুসলমান জনতা। গোধরা এমনিতেই খুব দাঙ্গাপ্রবণ। প্রায় সমান সমান সংখ্যক হিন্দু মুসলমানের গঞ্জ-শহর গোধরায় প্রায় প্রত্যেক বছর অন্তত একবার দাঙ্গা বাধে। ফলে দু-পক্ষই প্রায় সর্বদাই তৈরি থাকে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা অথবা উভয়ের জন্যে। সুতরাং আগুন জ্বালাবার পেট্রল বা নির্মম হাতের অভাব হয়নি।

সবরমতি-অযোধ্যা এক্সপ্রেসে বছরভরই করসেবকদের যাতায়াত। গোধরাস্থ স্টেশনে এবং রেললাইনের দুধারে গরিব মুসলমানদের বস্তির মানুষকে তাদের লাঞ্ছনায় জ্বলতে হয় প্রায় নিয়মিত। ২৭ ফেব্রুয়ারিও তারা স্টেশনের মুসলমান হকারদের কাছ থেকে খাবারদাবার, জিনিসপত্র নিয়ে দাম না দিয়েই ট্রেনে উঠে পড়ছিল। দোকানীরা প্রতিবাদ করতেই মারধর হয়, হাঙ্গামা বাধে। এক দোকানীর মেয়ে নাকি বাবাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। করসেবকদের কেউ মেয়েটিকে নাকি ট্রেনে তুলে নেয়। বাবা হাহাকার করে ওঠেন। মিনিট কয়েক দূরে ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর অগ্নিকাণ্ড। আটান্নজনের নির্মম মৃত্যু। তারপরই জ্বলে ওঠে গুজরাত। এখন জ্বলছে।

তৃতীয় একটি ব্যাখ্যাও শোনা যায়। আরএসএসের সংগঠিত দাঙ্গাবাজরাই 'গোধরা' ঘটিয়েছে। বৃহৎ ও ভয়ংকর এক পরিকল্পনারই অঙ্গ এটি। সমগ্র গুজরাত জুড়ে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের দাঙ্গাবাজদের হাতে সংখ্যালঘুর গণলুণ্ঠন, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, গণহত্যা (একেই বলা হয় 'পোগ্রোম') ঘটাবার ব্লু প্রিন্ট তৈরি হচ্ছিল বছরখানেক ধরেই। তা শুরু করার জন্যে একটা উপলক্ষ প্রয়োজন ছিল। গোধরা সেই উপলক্ষ। হিটলার বাহিনী যেমন ইহুদি ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পোগ্রোম শুরু করার উপলক্ষ পাওয়ার জন্যে নিজেরাই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল জার্মানির পার্লামেন্ট ভবন রাইখস্ট্যাগে।

এ ব্যাখ্যার সত্যাসত্য বিচারে না গিয়েও গুজরাতকাণ্ডের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। তার একটি হল, এমন কাণ্ড ক্রোধ বা ঘৃণার স্বতঃস্ফূর্ত ও অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ হতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী মোদী যতই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের আশ্রয় নিয়ে বলুন, 'এভ্রি অ্যাকশন হ্যাজ ইটস রিঅ্যাকশন, অপোজিট অ্যান্ড ইকোয়াল'। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদবানী যতই বলুন, গোধরা না ঘটলে গুজরাতে কিছুই ঘটত না, গুজরাত কাণ্ডের চরিত্র, তার নানা বৈশিষ্ট্য চিৎকার ডেকে ডেকে বলছে, যেন

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, গুজরাতহত্যালীলা গোধরার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া নয়। তার চেয়ে ঢের বেশি। একেবারে অন্য কিছু। আগে থেকে ছক কষা সুপরিকল্পিত কিছু। রুশ ভাষায় যার নাম 'পোগ্রোম', এবার তা এসে গেল এদেশের বিভিন্ন ভাষাতেও।

কী সেইসব বৈশিষ্ট্য?

এক. একটা ঘটনার স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, সে-ঘটনা যত নৃশংস ও ভয়ংকরই হোক, কতদিন ধরে চলতে পারে? দুদিন? সাতদিন? পনেরো দিন? তিনমাস ধরে চলে নাকি, 'স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া'?

'গুজরাত' যে সুপরিকল্পিত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতৃত্বই তার সাক্ষী। ছিয়ানব্বই বছরের পণ্ডিত, মহাভারত বিশেষজ্ঞ, শ্রদ্ধেয় গুজরাতি ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক কেশবরাম কাশীরাম শাস্ত্রী ভিএইচপি-এর গুজরাত রাজ্য শাখার সভাপতি। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন, 'সকালবেলা (২৮ ফেব্রুয়ারি) বসে আমরা তালিকা তৈরি করি' (রিডিফ ডট কম)। কিসের তালিকা? মুসলমানদের দোকানপাট, ব্যবসাস্থল, ঘরবাড়ি, বাসস্থানের তালিকা। এই তালিকা তৈরি করতে ভোটার তালিকা, কর্পোরেশনের ট্যাক্সের বিবরণের কাগজপত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়। কমপিউটার ব্যবহার করা হয়। আক্রমণকারী গ্রুপ তৈরি করে তাদের নেতার হাতে তালিকা তুলে দেওয়া হয়। তালিকা মিলিয়ে আঠাশেই শুরু হয়ে যায় পাগ্রোম। আমেদাবাদ যেন বার্লিন। ঠাণ্ডা মাথায় সংগঠিত এমন ভয়ংকর কাণ্ডকে কি কোনো মতে বলা যায় 'আক্রান্ত হিন্দুত্বের প্রচণ্ড ক্রোধের স্বতস্ফূর্ত বিস্ফোরণ?'

দুই. শুধু আমেদাবাদ নয়, আঠাশেই অ্যাকশান শুরু হয়ে যায় মুম্বাই-আমেদাবাদ দীর্ঘ হাইওয়েতে। দূর দূর শহরে, গঞ্জে এমনকী গ্রামেও। সেসব জায়গায় তখনও গোধরার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পৌছয়নি, অত দ্রুত পৌছানো সম্ভবই নয়। কাজেই এ কাণ্ড গোধরার প্রতিক্রিয়া, না সুদৃঢ় প্রত্যয়ী এক কেন্দ্রের নির্দেশে পরিচালিত রাজ্যব্যাপী সুপরিকল্পিত পোগ্রোম?

তিন. এই আক্রমণের আর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো। যে কোনো দাঙ্গায় সাধারণত মারা পড়ে গরীবরাই। ধনীদের গায়ে আঁচ লাগে না। গুজরাতের পোগ্রোমে গরীবদের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত এলাকার ধনী মুসলমানরাও ডজনে ডজনে নিহত হয়েছে। তাঁদের নারীরা ধর্ষিতা হয়েছেন, তাঁদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। এমন একটি পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ঘটনা এখন সকলেরই জানা। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন এম.পি.। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী সকলেই তাঁর বিশেষ পরিচিত। তাঁদের কাছে টেলিফোনে বারবার আবেদন করেও তিনি ফল পাননি। তাঁর বিশাল বাড়ির সব দরজা-জানলা বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি ও তাঁর পরিবারের বাকি সতেরোজন আগুনে ভাজা ভাজা হয়ে মারা যান।

চার. এবার গুজরাতের ঘটনার একটি অর্থনৈতিক দিক চোখে পড়বেই। বেছে গেছে বিশেষভাবে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা হয়েছে মুসলমানদের ব্যবসা। বিভিন্ন শহরে-গঞ্জে ঘটেছে একই ব্যাপার। মুম্বাই-আমেদাবাদ হাইওয়েতে তাঁদের প্রায় পাঁচশ ধাবা লুঠ ও ধ্বংস করা হয়েছে। পরে 'পুনর্বাসনে' সেসব নিশ্চয়ই 'হাতবদল' হয়ে যাবে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না, মুসলমানদের ব্যবসাপত্র দখল করে নেওয়া এই পোগ্রোমের অন্যতম লক্ষ।

পাঁচ. পোগ্রোমে বা দাঙ্গায় সাধারণত অংশ নেয় সমাজের তলদেশের মানুষ, গরীব লুম্পেনরা। এবার গুজরাতে আক্রান্তদের মতোই আক্রমণকারীদেরও চেহারায় একটা বদল দেখা গেছে। মধ্যবিত্ত, এমনকি ধনী হিন্দু পরিবারের মানুষও নেমে পড়েছে। তেমন ঘরের মহিলারাও সরাসরি অংশ নিয়েছে পোগ্রোমে যা আগে কখনও কোথাও দেখা যায়নি। এদের অনেকেই দামি গাড়ি নিয়ে এসেছে। 'কাজে' হাত লাগিয়েছে। লুঠের মাল গাড়িতে তুলে জায়গামতো পৌছে গেছে।

ছয়. গুজরাতের পোগ্রোমে ব্যয় হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। এ পোগ্রোম যেমন পরিকল্পিত তেমনই অসম্ভব ব্যয়বহুল। বহু জায়গায় অগ্নিসংযোগের জন্যে গ্যালন গ্যালন পেট্রোলের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে শত শখ গ্যাস সিলিন্ডার। বাইরে থেকে, শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে লোক আনতে, লুঠের মাল সরাতে। মাদ্রাসা, মসজিদও ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে ফেলতে অসংখ্য প্রাইভেট গাড়ি, ম্যাটাডোর, বড় বড় লরি ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়েছে। এসবের খরচ তো কম নয়। তার ওপর টাকা দিয়ে মদ দিয়ে আক্রমণে লাগানো হয়েছে গরীব, ঝোপড়িপট্টির বাসিন্দা বহু হরিজনকে। এত টাকা কারা জোগাল, কেন জোগাল, এ প্রশ্ন খুব অপ্রাসঙ্গিক নয়।

সাত. রাজ্য সরকারের প্রশাসন, পুলিশ এবং পৌরসভা শুধু পরোক্ষভাবে নয়। প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছে আক্রমণকারীদের। খবর পেয়েও পুলিশ আসেনি। এলেও আক্রান্তকে সাহায্য করেনি; অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেছে। কোথাও কোথাও নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অসহায় নারীপুরুষশিশুকে তুলে দিয়েছে উন্মত্ত জনতার হাতে।

কোনো কোনো মন্ত্রী দিনরাত বসে থেকেছেন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে। কোনো বিবেকবান, আইনভক্ত অফিসার ব্যবস্থা নিতে গেলেই তাঁদের হাত চেপে ধরেছেন। চোখের সামনে আইনকে ধর্ষিত হতে দেখে, অসহায় মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে দেখেও কিছু করতে না পারার গ্লানিতে ও ঘৃণায় বেশ কয়েকজন প্রবীণ আইএএস অফিসার পদত্যাগ করেছেন। এমন কাণ্ড দেশের কোথাও কোনো দাঙ্গাতে এর আগে ঘটেনি। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হর্ষ মান্দার। তিনি পদত্যাগ করে সরাসরি নেমেছেন প্রতিরোধে, প্রতিকারে। তাঁর লেখা বই থেকেই ('ক্রাই, মাই বিলাভেড কান্ট্রি') বিশ্ববাসী জানতে পেরেছেন সত্যিই কী ঘটছে গুজরাতে। তিনিই জনিয়েছেন, ভবনগরের ডি-এস-পি রাহুল শর্মা, পাটন-এর ডি-এস-পি রাজীব রঞ্জন কিংবা কচ্ছের এস-পি বিবেক

শ্রীবাস্তবের মতো আই-পি-এস অফিসাররা বিবেক অনুযায়ী কাজ করায়, অসহায় মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ানোয়, দৃঢ় হাতে আইনশৃংখলা রক্ষা করায় এবং দাঙ্গাবাজদের হাতেনাতে গ্রেপ্তার করার 'অপরাধে কীভাবে নিরামিষ জায়গায় ট্রান্সফার হয়েছেন। কীভাবে তাঁদের ঠুঁটো জগন্নাথ করে বসিয়ে রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে মাদ্রাসা, মসজিদ, ঘরবাড়ি ধ্বংস করতে এবং আগুনে পোড়ার পর ধ্বংসস্তূপ সরাতে ব্যবহৃত হয়েছে বহু বুলডোজার। ধ্বংসস্তুপ সরিয়ে কোথাও রাতারাতি রাস্তা বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সে কাজে রোলার ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও অস্থায়ী মন্দির বানিয়ে কোনো দেবতার মূর্তি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবারে 'বাবরি স্টাইল!'

অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্ত বিস্ফোরণে যে-মানুষ পথে নামে তারা কোথায় পায় বুলডোজার, রোলার, লরি, প্রাইভেট গাড়ি, পেট্রোল, গ্যাসসিলিণ্ডার, মুসলমান বাসিন্দার ঠিকানার তালিকা, তাদের ব্যবসাস্থালের ঠিকানার বিবরণ? সুশৃংখল, চমৎকার এবং বহুদিন ধরে তৈরি করা পরিকল্পনা ছাড়া এমন ঘটে না, ঘটতে পারে না।

আট. পরিকল্পনা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। তোড়জোড় টের পেয়ে ভয় পেয়েছিলেন বহু মুসলমান ব্যবসায়ী। তাঁরা বাঁচার জন্যে একটা কৌশল করেছিলেন। দোকানপাট, ব্যবসা সংস্থার নাম পালটে দিচ্ছিলেন। ব্যবসাতে নামের 'গুডউইল' একটা বড় ব্যাপার। তবু, বাপ-ঠাকুর্দার আমলের 'ইসমাইল স্টোর্স' সাইনবোর্ড বদলে রাতারাতি হয়ে যাচ্ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডার'। বাঁচার জন্যে মানুষ কী না করে!

কিন্তু মৌলবাদীদের হাত থেকে অত সহজে বাঁচা যায় না। দুটি গুজরাতি সংবাদপত্র 'গুজরাত সমাচার' এবং 'সন্দেশ' বছর খানেক ধরে এইভাবে বদলে যাওয়া সাইনবোর্ডের আসল নামের তালিকা ছেপে যাচ্ছিল। টার্গেটের তালিকা তৈরি হচ্ছিল। তখন কোথায় গোধরা? কোথায় ভস্মীভূত দুই বগি? এই তালিকাই তো মহাপণ্ডিত শাস্ত্রীজিরা তৈরি করেছিলেন গোধরার পরের সকাল!

নয়. 'গুজরাতে'র সবচেয়ে ভংকর বৈশিষ্ট্য পোগ্রোমে অসংখ্য মানুষের, হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণ। সমাজের নানাশ্রেণী ও স্তরের মানুষের। এত মানুষ গুণ্ডা হতে পারে না, দুষ্কৃতি বা সমাজবিরোধী হতে পারে না। এদের মধ্যে সাধারণ, স্বাভাবিক স্বভাবের মানুষও আছেন, অনেক। তবু তাঁরা নেমে গেছেন পথে। এই 'নেমে পড়াকেই ভি-এইচ-পি নেতা বলেছেন 'হিন্দু জাগরণ'। এই জাগরণই তিনি ঘটাতে চান ভারত জুড়ে। তিনি বলেছেন সমগ্র ভারতকে তাঁরা গুজরাত বানিয়ে তবে ক্ষান্ত হবেন।

বহুদিন ধরেই হিন্দুত্বের নামে মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। হিন্দুত্বের নামে মানুষের হীনতর প্রবৃত্তির কাছে, ঘৃণা, ভয়, লোভ, ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ-এর কাছে আবেদন জানানো হচ্ছে। ঠিক এই কাজটাই করে থাকে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ। এ আবেদন হৃদয় ও মস্তিষ্কে একবার ঢুকে গেলে একটি সৎ যুবক অনায়াসে নাথুরাম গড়সে হয়ে যায়। শহিদের অহংকারে হাসিমুখে উঠে যায় ফাঁসির মঞ্চে। ঘৃণায় অন্ধ হয়ে ধর্ষণ করে কোনো

পবিত্র নারীকে। ক্রোধে উন্মাদ হয়ে হত্যা করে। মৌলবাদী আবেদন ধর্মের নামে তাকে বিচারবুদ্ধিরহিত এক অন্ধ জীবনে পরিণত করে। তখন তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নেওয়া যায়। গুজরাতে হাজার হাজার মানুষের মগজ ধোলাই করে তাদের দিয়ে ঠিক তাই করিয়ে নেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে।

হিন্দুত্বের নামে এই মৌলবাদী মগজ ধোলাই-এর কাজ গত এক যুগ ধরে চলছে। পশ্চিমে গুজরাতেরই সমুদ্র তীরের সোমনাথ মন্দির থেকে একদিন আদবানীজির রথ রওনা হয়েছিল পূর্বে অযোধ্যার বাবরি মসজিদের দিকে। ভারতের বুক চিরে হিন্দুত্বের নামে সে রামরথ ধর্মীয় ঘৃণা আর বিদ্বেষের বীজ ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে গিয়েছিল। বিজেপি শাসনে সারা দেশে, বিশেষত গুজরাতে মগজ ধোলাই চলছে ইতিহাসই বদলে দিয়ে। শেখানো হচ্ছে, হিটলার বড় মাপের দেশপ্রেমিক ছিলেন। সে দেশের সংখ্যালঘু ইহুদিদের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপ জার্মানিকে, জার্মানির জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করেছিল।

নাৎসিরা বলত, খাঁটি জার্মানদের গর্ববোধ করা উচিত আর্য বলে। আর-এস-এস শেখাচ্ছে 'গরব সে কহো হম হিন্দু হ্যায়'। নাৎসিরা বলত, জার্মানির সব দুর্দশার জন্যে দায়ী ইহুদিরা। আমাদের মূল্যে ব্যাটারা কত বেড়েছে দেখ! আরএস বলছে, খুব বেড়েছে ওরা, বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওদের অনেক বড় করা হয়েছে। দেশের স্বার্থেই ওদের ছাঁটতে হবে। এদেশে থাকতে হলে হিন্দুত্ব মেনে নিয়েই থাকতে হবে ওদের। একই বলে মিলেমিশে থাকা! গোয়াতে জনসভায় সেই কথাই বলেছেন বজপেয়ীজি। আরএসএস যাঁর 'আত্মা'। আর সেই কথাই বলেছে আরএসএস তাদের বাঙ্গালোর অধিবেশনে।

পাঠক, একবারও ভাববেন না গুজরাত শুধু গুজরাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মগজ ধোলাইয়ের কাজ, হিন্দুত্বের নামে ঘৃণার অভিযান চলছে সারা দেশ জুড়ে। আপনার পাড়াতেও। একান্তে ডেকে প্রাণ খুলে কথা বলে দেখুন, আপনার প্রতিবেশীদের, এমনকী আপনার পরিবারেরও দশজনের মধ্যে অন্তত চারজন ওই ভাষাতেই কথা বলবে। 'সত্যি খুব বেড়েছে ব্যাটারা! একটু শিক্ষা হওয়া দরকার ছিল ওদের!' মগজ ধোলা এর কাজ চলছে সারা দেশ জুড়ে। আপনার পাড়াতেও চলছে, আপনার বাড়িতেও। অজান্তেই চলছে, এমনকী যাদের মগজ ধোলাই হয়ে যাচ্ছে তাদেরও অজান্তেই চলছে। কিন্তু চলছে। দিনরাত, অবিরাম চলছে। এই চলার জোরেই ওরা বলতে পারে, সারা ভারতকে গুজরাত করে দেবে।

যদি ওরা বেঁচে যায়, যদি ওরা পেরে যায় এদেশকে গুজরাত করে দিতে, ভারত আর ভারত থাকবে না। হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তানের মৌলবাদী অভিযানের চাকার নীচে গুঁড়িয়ে যাবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এই ভারতবর্ষ। নানা ধর্ম, নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির বহুমুখী

বৈচিত্র্য না থাকলে এদেশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হতে হতে ফিরে যাবে আলেকজান্ডারের কালে। খণ্ড খণ্ড সেই দেশ কি হতে পারে ভারতবর্ষ? হতে পারে আমাদের মাতৃভূমি?

এসব কথা নিতান্তই রাজনীতির কচকচানি বলে ভাবতে পারেন আপনি, ভেবে মনকে শান্ত থাকার উপদেশও দিতে পারেন। গুজরাতের ধর্ষিত শরীর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতে পারেন,

'শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোড়ে কামান
চোখ বুজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান,
বলব বৎস, সভ্যতা যেন থাকে বজায়!'

এতে আপনার মনে আপাতত শান্তি বিরাজ করতে পারে। কিন্তু ওরা যদি বেঁচে যায়? ওরা যদি পেরে যায় ভারতকে গুজরাত করে দিতে? তা হলে আজ গুজরাত যেভাবে ধর্ষিত হচ্ছে সেইভাবে আপনার ভগিনী বা পত্নী বা কন্যা বা মা অথবা আপনার বাংলা যেদিন ধর্ষিতা হবে, সেদিন তাদের রক্ষা করা দূরের কথা, তাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না কেউ। কারণ, তাকাবার মতো কেউ আর বাকি থাকবে না।

গুজরাত থেকে গোয়া : এক কুৎসিত মুখের আত্মপ্রকাশ

মইনুল হাসান

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী আজকাল 'ক্ল্যারিফিকেশন' প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চিহ্নিত হতে শুরু করেছেন। দেশজ রাজনীতির যে কোনো জটিল সময়ে কোনো বক্তব্য রাখার পর পরেই একটা করে বিস্তারিত বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বিলি করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৪৮ ঘন্টা পরেও। ২০০০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের সঙ্ঘ পরিবারের সমাবেশে বলেন, 'আমার স্বয়ংসেবক থাকার অধিকার কেউ নিতে পারবে না।' পরে ব্যাখ্যা দেওয়া হল তিনি নাকি দেশের স্বয়ংসেবক বলেছেন। ৬ ডিসেম্বর ২০০০ বললেন, সোনিয়া গান্ধী সম্বন্ধে, 'তিনি একজন মহিলা এবং বিদেশী মহিলা।' ১৯শে ফেব্রুয়ারি মুসলিমদের হুমকি দিলেন যে, তাদের ভোট না পেলেও উত্তর প্রদেশে বি জে পি ভোটে জিতবে। দুটো ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পিছন পিছন ক্ল্যারিফিকেশন এসেছে।

১২ এপ্রিল ২০০২ দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা বলেছেন তা অসততার দিক দিয়ে সর্বকালীন রেকর্ড। দাঙ্গার নামে গুজরাতে যখন গণহত্যা হচ্ছে, লক্ষাধিক সংখ্যালঘু মানুষ যখন ত্রাণশিবিরে হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে ধূসর প্রান্তরের দিকে, তখন প্রধানমন্ত্রী এলেন গুজরাতে। মুখ্যমন্ত্রীকে বললেন রাজধর্ম পালন করতে। হতাশ কণ্ঠে বললেন, বিদেশে মুখ দেখাব কী করে– বললেন, আমরা কিছুটা হলেও

আশ্বস্ত হলাম এবার সমস্যার সমাধান হবে। সুতরাং ১২ এপ্রিল গোয়ার প্রকাশ্য সভার দিকে সবাই তাকিয়ে ছিল। কিন্তু মুখোশ খুলে তখন নোংরা কুৎসিত সঙ্ঘী মুখটা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। আবার একপেশে প্রধানমন্ত্রী প্রায় উসকানি দিলেন। ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদকে এক করে দেখালেন। সেদিনই কয়েকঘণ্টা পরে তার ক্ল্যারিফিকেশন এল।

গোয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বি জে পি-র সাংগঠনিক সভা উপলক্ষে পানাজিতে প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই ভাষণটি দেন প্রধানমন্ত্রী। মুখোশটি খুলে পড়েছে। যে ভাষণ দিয়েছেন তার অনেক বিষয় থাকলেও তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত তিনি ব্যক্ত করেন। প্রথমত বলেছেন, 'গোধরার ঘটনার পর যা ঘটেছে তা খুবই নিন্দনীয়। কিন্তু বিষয় হচ্ছে, কে এটা শুরু করেছে?' পুরো ঘটনার সাম্প্রদায়িকীকরণের সবচাইতে ঘৃণ্য চেষ্টা এটি। এখন পর্যন্ত গোধরার ঘটনা কারা বা কে ঘটিয়েছে তা নির্দিষ্ট হয়নি। কিন্তু মুসলিমদের দিকে আঙুল তুলে বলা হচ্ছে 'শুরু করেছে'– তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। উপহাস করা হচ্ছে যারা দাঙ্গায় নিঃস্ব হয়েছে, যখন তাদের প্রয়োজন প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা এবং সাহায্য।

দ্বিতীয়ত. সমগ্র মুসলিম সমাজকে আন্তর্জাতিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। 'যেখানেই মুসলিমরা আছে, সেখানেই তারা অন্যদের সঙ্গে বাস করতে চায় না, শান্তিতে বাস করবার চাইতে তারা নিজেদের ধর্মপ্রচার-এর মাধ্যমে অন্যদের মনে ভয় ও সন্ত্রাস ও ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা হিন্দু সংস্কৃতি-র বিপরীত।' গোয়ায় যাওয়ার আগে তিনি সরকারি সফরে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে ১৫/১৬ জন আল কায়েদা গোষ্ঠীর লোক গ্রেপ্তার হবার খবরে উৎসাহিত হয়েই বোধহয় বলেন, 'যেখানেই মুসলিমরা বেশি সংখ্যায়' বাস করছে, সেখানকার শাসকগোষ্ঠী মনে করছে ইসলাম আগ্রাসী মনোভাব নেবে।'

তৃতীয়ত. 'আমরা' ভালো এবং আলাদা যারা এদেশে 'পরে এসেছে।' আমরা তত আগে থেকেই ধর্মনিরপক্ষ যতদিন মুসলিম এবং খ্রীস্টানরা এদেশে এসেছে, আমরা অনুমতি দিয়েছি তাদের প্রার্থনার এবং ধর্মপালনের।' পুরো বক্তৃতাটি দেবার পর তাদের ক্ল্যারিফিকেশন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, 'ইসলামের দুটি ভাগ। এটি সহনশীলতা, শান্তি আর একটি সন্ত্রাসবাদী ও জেহাদী। তাঁর বক্তব্যগুলির বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ আমরা নিচ্ছি।

ইসলামের কথা

ইসলাম পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। উষর আরব ভূমিতে এই ধর্মের উৎপত্তি। প্রধান ধর্মগ্রন্থ– কোরান। হজরত মহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ– মুসলিমরা বিশ্বাস একেশ্বরবাদী। একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য অনেক ধর্মের চাইতে এই ধর্ম নতুন। সুতরাং আধুনিক পৃথিবীর কিছুটা হলেও এই ধর্মের তত্ত্বের মধ্যে অছে। অন্যান্য ধর্মের দুর্বলতা যেমন, এখানেও তা আছে। একসময় মধ্যপ্রাচ্য থেকে এই ধর্মমত আফ্রিকা, ইউরোপ, ভারতীয় উপমহাদেশ, চীন প্রভৃতি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কোরান- ধর্মগ্রন্থটি সব ভাষাতে পাওয়া যায়। মুসলিমরা বিশ্বাস করে এটা আল্লাহর বাণী। কোরানে সব আছে, আবার কিছুই নেই- দুটো ধারণাই ভুল। কিন্তু একটি বিষয় বার বার বলা হয়েছে তা শান্তির কথা, ভ্রাতৃত্বের কথা, পারস্পরিক আদানপ্রদানের কথা। সুতরাং যে কোরান বিশ্বাস করবে সে সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না। কোরানে অযথা নরসংহারের সমর্থন নেই। বাজপেয়ী যতই ইসলামের দুটো মুখ দেখান তা অনৈতিহাসিক- মুসলিমদের মূল ধর্মগ্রন্থে তার সমর্থন নেই। কোরান সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা যে, এটা বোধহয় কেবল মুসলিমদের জন্য। কিন্তু কোরানে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের কথা বলা হয়েছে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির মতোই। সমগ্র মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ধর্মীয় ঘটনাবলীর উল্লেখ ছাড়াও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে ইতিহাসের কাহিনী, গ্রহ-নক্ষত্র, দিনরাত্রি, প্রকৃতির নিয়মাবলী ও তার প্রকাশ, ভালোমন্দের বিচার, সৎকর্ম ও সামাজিক কল্যাণের বিবরণ। কোরানের ভাষার অনেকেই প্রশংসা করেছেন। মহাকবি গ্যেটর কথা বলি- "It enforces our reverence. It's style in accordance with its contents and aims is stern, grand, terrible ever and truly sublime.This book will go on exercising through all ages a most potent inflence. সেই গ্রন্থে কী করে দু-মুখের সন্ধান পাওয়া যাবে?

এছাড়াও সারা পৃথিবীতে ইসলামের অবদান অস্বীকার করার উপায় কারও নেই। সভ্যতার বিকাশে, জ্ঞান চর্চায় ইসলাম এক বিরাট অবদান রেখেছে। ইসলামের অবদান উল্লেখিত হয়েছে রাসেল, গিবন, কার্লাইল, এম এন রায় ছাড়াও স্বামী বিবেকানন্দ,, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখাতে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথাটা এখানে উল্লেখ করি- 'যদি রাজশক্তির প্রভাবে এবং বল প্রয়োগেই এদেশে ইসলাম বিস্তার করে থাকত, তাহলে তো রাজধানীর আশেপাশেই মুসলমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা যেত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে দিল্লি থেকে যে অঞ্চল যত দূর সেখানেই ততই মুসলমান বেশি।' সভ্যতার বিকাশে ইসলামের অবদান- আজকের পৃথিবী যে গ্রীক কাব্য ও দর্শন পেয়েছে তা আরবীর মাধ্যমে। খ্রীষ্টিয় পাদ্রীদের হাত থেকে এই দর্শনকে রক্ষা করেছে ইসলাম। অঙ্ক শাস্ত্রে ইসলামের প্রভাব কে অস্বীকার করবে? অঙ্কশাস্ত্রে বীজগণিত সংযোজনার কৃতিত্ব ইসলামধর্মাবলম্বীদের। যে হিন্দুত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এত বাড়াবাড়ি সেই হিন্দু শব্দটাই তৈরি হয়েছে মুসলমানদের মাধ্যমে। আমি কোনো কিছু প্রমাণ করার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করিনি। শুধু বক্তব্য হচ্ছে-আমরা না জেনে সমস্যাটি বাড়িয়ে দিচ্ছি অথবা জেনে বুঝে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছি আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা এবং মনের উদারতাকে। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনে আমার মনে হয়েছে- ইতিহাস তাঁর না জানার কথা নয়। তাহলে তাঁর সুরে ইতিহাসের কথা কই? তাঁর সুরে সাময়িক হিংস্র লোভের জয়ের ইচ্ছা কেন?

সন্ত্রাসবাদ-মুসলিম বিশ্ব

গত ১১ সেপ্টেম্বর এর পর সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে। পশ্চিমী কর্তারা চালিয়ে দিয়েছেন যে, লড়াই হচ্ছে সভ্যতার। পশ্চিম দুনিয়া বনাম ইসলাম। আর চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলিই সন্ত্রাসবাদী– তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আফগানিস্তানের যুদ্ধের পর এখন অন্যান্যদের 'সহবত' শিক্ষা দেওয়া হবে।

যে সংবাদগুলো চেপে যাওয়া হচ্ছে অথবা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এ-ব্যাপারে একটু সেদিকে নজর ফেরানো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রথমে মনে হচ্ছিল গোঁড়াপন্থী মুসলিম নেতারা বোধহয় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং জিতে যাচ্ছে। কিন্তু পরেই প্রমাণিত হয়েছে এটা অতিকথন মাত্র। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময়ই মনে হয়েছিল অন্তত পাকিস্তান এবং সৌদি আরবে তালিবানীদের পতাকা উড়বে। পাকিস্তানে হাজার হাজার মানুষ তালিবানদের সমর্থনে মিছিল করেছে। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত বিপরীত হয়েছে। লস্কর-ই-তৈবা ও জৈশ-এ-মহম্মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। উগ্রপন্থী ইসলামি গোষ্ঠী পাকিস্তানে তৎপর। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের সমর্থন করছেন না। মডারেট পাকিস্তানিদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মুশারফের পিছনে। তবুও মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আল কায়েদা গোষ্ঠীর কিছু লোক ধরা পড়েছে সিঙ্গাপুরে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাতেই উৎসাহিত হয়েছেন। কিন্তু কিছুটা খোঁজখবর নেবার ইচ্ছা যদি থাকত তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে বৃহত্তর মুসলিম সমাজ তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করে না। উদারপন্থী মুসলিমরা জায়গা নিতে শুরু করেছেন। কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব ইসলামিক ল, আব্দুল হামিদ আনসারি বলেছেন, 'আমরা আমাদের নিজেদের সুন্দর করে সাজাতে ততক্ষণ পারি না যতক্ষণ আমরা আমাদের আসল চেহারাটা সুন্দর করতে পারছি।' বিখ্যাত একটি পত্রিকায় একথা প্রকাশিত হয়েছে। সমস্যা হচ্ছে এই কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে চাইছি না। এদেশেও তার প্রভাব আছে। সংবাদপত্রগুলিও অন্য ভূমিকা পালন করছে। তারা যতখানি ইমাম বুখারির কথা শুনতে চাইছে– ততখানি শাবানা আজমির কথা শুনতে তৎপর নয়।

একথা ঠিক সমগ্র বিশ্বে মুসলিমরা কিছুটা হতাশ, অবসন্ন। বিভিন্ন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত ও জরাজীর্ণ। কিন্তু তারাই আবার ঘুরে দাঁড়াবার প্রয়াস নিচ্ছে। বিষয়টি হিন্দু-মুসলমানের নয়। বিষয়টি আধুনিক মানুষের আধুনিক চিন্তা প্রসারের কাজ প্রকৃত ভারতবাসীর। কোনো সন্ত্রাসবাদীকে তারা পছন্দ করতে পারে না। ঠিক এই জায়গায় আপনার কিছুটা সমর্থন প্রত্যাশিত ছিল, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। তা না করে আপনি এমন নির্মম আঘাত করেছেন– যা

অত সহজে মুছে যাবে না। বছরের পর বছর এই আঘাত সহ্য করবে দেশের বিপুল সংখ্যার জনগণ– আপনার ক্ল্যারিফিকেশনের মলমে তা সারবে না।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ঃ আরও কয়েকটি কথা

আমাকে খুবই বাধ্য হয়ে ভারতীয় সংবিধানের ২৫(১) নং ধারাটি আর একবার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে 'জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য এবং এই ভাগের অন্য বিধানাবলীর অধীনে, সকল ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে ধর্মস্বীকার, আচরণ ও প্রচার করিবার অধিকার সমভাবে থাকিবে।' সম্প্রতি কনস্টিটিউট অ্যাসেমব্লিতে সংবিধান নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছিল তা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। শ্রদ্ধায় অমি অবনত হয়েছি কি ধৈর্য ধরে সংবিধানে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কিত ধারাগুলি সংযোজন করা হয়েছে এবং তা করার আগে দিনের পর দিন ভারতের উজ্জ্বল সন্তানরা আলোচনা করেছেন, পাতার পর পাতা বক্তব্য লিখেছেন। তারপর মহান বৈঠকটি তা গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনোদিকে না তাকিয়ে বললেন, 'আমরা' 'তাদের' ধর্ম পালনের অনুমতি দিয়েছি। দেশের সংবিধানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞা বোধ হয় প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে আর কেউ করেননি। আর রাষ্ট্র নেতাদের প্রতি অভক্তি– সেকথা না বলাই ভালো। আমি আবার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না যে, ২০০১ সালের ১১ এপ্রিল তেহরানে ইরানী মসলিসে তিনি উল্লেখ করেছেন 'আমরা কোনো ধর্মকে বিদেশী মনে করি না।এক হাজার বছরকাল ধরে ইসলাম আমাদের জাতীয় জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে।' হঠাৎ মত পালটে মুসলিম ও খ্রীস্টানরা হয়ে গেল 'ওরা'।

আর একটা অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর কথাতে, তা হলো 'আমরা' আর 'ওরা'। 'আমরা' অর্থাৎ সংখ্যাগুরু অংশ আর 'ওরা' হলো সংখ্যালঘু। প্রধানমন্ত্রী দাবি করতে পারেন সমগ্র 'সংখ্যাগুরু' অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি অথবা তাঁর দল? অথবা সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব করছে নির্দিষ্ট কেউ! হতেই পারে না। তাহলে পার্থক্যের এই রেখা কেন? এই রেখা আলোচনা হয়েছিল জার্মানীতে। তারপরেই ফ্যাসিবাদের দ্রুত উত্থান। দাঙ্গার আগে সারা গুজরাটে 'আমরা' আর 'ওরা'তে সমগ্র গুজরাতকে সরকারিভাবে ভাগ করার উদ্যোগ প্রায় সমাপ্ত হয়েছিল। নরহত্যা হয়েছে অবর্ণনীয়। প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব কেবল আর গুজরাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যে কোনো জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আমরা কোনো বিচ্ছিন্নতা দেখতে পাচ্ছি না। তার কারণ তিনি ধারাবাহিকভাবে আর এস এস-এর মতাদর্শের কথা এবং আনুগত্যের কথা স্বীকার করে চলেছেন। ১৯৯৫ সালের ৭ মে 'অর্গানাইজার' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে তিনি বলেন 'সঙ্ঘ, আমার আত্মা'। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কে ১৯৮৯ সালের ৭ এপ্রিল মুম্বাইতে তিনি বলেন, 'হিন্দুরাই হল জায়গাটির যুক্তিসঙ্গত দাবিদার।'– এরই সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রী হবার পর তিনি বলেছেন, রামমন্দির একটি জাতীয় ভাবনা।

সুতরাং বহুদিন ধরে এই প্রচার চালানো হচ্ছে যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী একটা নমনীয় মনোভাব নিয়ে চলেন, তিনি কবি মানুষ। কিন্তু ক্রমেই মুখোশটি খুলে পড়েছে। সত্যিই আর এসএস-এর এক নেতা বলেছিলেন যে, বাজপেয়ী তাঁদের মুখোশ। অপমানকর এই মন্তব্য নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল এ কথা ঠিক– কিন্তু বিষয়টি যে একেবারে সত্যি একথা প্রমাণিত হচ্ছে।

শেষ কথা

এই প্রবন্ধের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমি একান্তই ওয়াকিবহাল। এখানে ধর্মগুলি সম্পর্কে মূল আলোচনায় স্থান দেবার সুযোগ নেই। কিন্তু অন্য কয়েকটি বিষয় আজ আমাদের খুব সহজভাবে জানা প্রয়োজন। সারা পৃথিবীতে একশ কোটির বেশি মানুষ ইসলাম ধর্মে অনুগত। ১৪০০ বছরে পুরাতন ধর্মটি জড় পদার্থ নয়। সারা পৃথিবীতেই আধুনিকতার ও গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ দেখা গেছে। ধর্মগুলির দর্শনচিন্তাকে সেই ধারাতেই প্রবাহিত হতে হবে। গণতন্ত্রীকরণের রাস্তা বন্ধ করে কেউ বাঁচতে পারবে না। ইসলাম ধর্মও নয়। যারা ইসলামকে রাষ্ট্রের ধর্ম নির্দিষ্ট করেছেন তাঁদেরও গণতন্ত্রের রাস্তায় যেতে হবে। উন্নয়নের পথ সেটাই। সেই সংগ্রাম চলছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আবার এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার 'সহবত' শিক্ষা দেবার চেষ্টা এবং 'ওরা' বলে ঠেলে সরিয়ে দিলে সমগ্র পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে। আমাদের জীবনচর্চাকে যুক্ত করতে হবে সম্প্রতির শক্ত ডোরে। হৃদয়ের দুয়ার আলগা করে সবাইকে নতুন মানুষ হয়ে ওঠা ছাড়া সমাধান নেই। প্রত্যাশাটি অসম্ভবের কাছাকাছি। কিন্তু অর্জনের সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

হিন্দুত্ববাদ রচনা করে চলেছে গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ এই সময়ের দাবি তাই ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ

অমিতাভ চন্দ্র

জ্বলেছে গোধরা। জ্বলেছে আমেদাবাদ। জ্বলেছে সারা গুজরাত। সেই আগুনের তীব্র দহন অনুভব করেছে সারা ভারত। দহনের সেই সাংঘাতিক জ্বালা এখনও অনুভূতিতে প্রতিনিয়ত বর্তমান। সারা ভারত জুড়েই আজ আতঙ্কের এক পরিমণ্ডল। উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা তো নিজেই একটা আগ্নেয়গিরি। তার থেকে বিস্তর অগ্ন্যুৎপাত নিয়মিত ঘটনায় পর্যবসিত। হিন্দুত্ববাদী বর্বর করসেবকদের নিরন্তর দাপাদাপি আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টিতে যথেষ্টই সফল। গুজরাতের আগুন এখনও নেভেনি। সেখানকার পৈশাচিক

গণহত্যা এখনও অতীত হয়ে যায়নি, পরিণত হয়নি ইতিহাসের বিষয়ে। গুজরাত গণহত্যা প্রতিনিয়ত আঘাত হানছে আমাদের চেতনাকে, আমাদের বিবেককে করছে নিরন্তর কশাঘাত। কি লিখব গুজরাত গণহত্যা নিয়ে? চোখের সামনে সারাক্ষণ ভাসছে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি হয়ে থাকা অগ্নিদগ্ধ চার বছরের শিশুটির মুখ। সে জানেও না, কেন তাকে জীবন শুরুর সময়েই পুড়তে হল আগুনে। চোখের সামনে অবিরত চলে আসবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই যুবকটির ছবি, তুই হাত জোড় করে যে কাতর আবেন জানাচ্ছে তার প্রাণরক্ষার। অসহায়তার, বিপন্নতার অভিব্যক্তি সন্ত্রস্ত সেই যুবকটির চোখে মুখে, তার সারা শরীর জুড়ে। অসহায় বোদ করি প্রতিনিয়ত। খবর পড়ি মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির, আর বাড়তে থাকে নিজের অসহায়তা। কী লিখব এই পরিস্থিতিতে? তবুও লিখতেই হয়। এই লেখাই তো আমার প্রধান সম্বল, প্রধান অস্ত্র। আমার অন্তরে সঞ্চিত যাবতীয় বেদনা, ঘৃণা, ক্রোধ, আমার যাবতীয় প্রতিবাদ, সব কিছুরই প্রকাশ ঘটানোর প্রয়াস গ্রহণ করি আমার এই লেখার মাধ্যমেই। অত্যন্ত অক্ষম এক প্রয়াস, তবুও তো তা ধারণ করে আছে আমাদের সকল বেদনা-ঘৃণা-ক্রোধ-প্রতিবাদ।

২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। পশ্চিম গুজরাতের গোধরায় আমেদাবাদগামী সবরমতি এক্সপ্রেসে লাগানো হল আগুন। ভস্মীভূত হল কয়েকটি কামরা। আগুনে পুড়ে মারা গেল ৫৮ জন করসেবক। তারা ফেরত আসছিল অযোধ্যা থেকে, যেখানে তারা জমায়েত হয়েছিল ভেঙ্গে, গুঁড়িয়ে দেওয়া বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের কর্মসূচি নিয়ে। এই সবরমতি এক্সপ্রেসের চারটি কামরা বোঝাই ছিল অযোধ্যা ফেরত 'রামভক্ত' করসেবকে। এই চারটি কামরাই ছিল আক্রমনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু, যদিও অন্যান্য কামরাগুলিও আক্রামণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অভিযোগ হল, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত দুষ্কৃতকারীরাই ট্রেনে অগ্নি সংযোগের মতো এই মারাত্মক দুষ্কর্মটি ঘটিয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল করসেবকদের পুড়িয়ে মেরে ভারতে সন্ত্রাস ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা। আরও অভিযোগ হল, সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ছিল এই অগ্নি সংযোগ, সমস্ত রকম পূর্ব প্রস্তুতি নিয়েই এই আক্রমণ চালানো হয়েছিল। হিন্দুত্ববাদী শক্তি শুধু এই অভিযোগগুলি করেই থেমে যায়নি। অভিযোগের পরিধি আরও বিস্তৃত। হিন্দুত্ববাদের ফেরিওয়ালা গুজরাত রাজ্য সরকার এবং তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হিন্দুত্ব ব্রিগেডের অন্যতম প্রধান সেনাপতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর তরফে এই অভিযোগও করা হয়েছে, করসেবকদের পুড়িয়ে মারার মতো এই জঘন্য ও অমানবিক ঘটনার পেছনে স্পষ্টভাবেই আছে পাকিস্তান ও তার আইএসআই-এর হাত, যাদের কাজই হচ্ছে ভারতের অভ্যন্তরে নানারকম অন্তর্ঘাত চালিয়ে এই দেশের সুস্থিতি নষ্ট করা। সারা দেশের হিন্দুত্ববাদী শক্তি, যাদের গায়ের ও গলার জোর ক্রমশ বেড়েই চলেছে, অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গেই এই অভিযোগগুলি প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নেমে পড়ল। হিন্দুত্ববাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের রমরমার এই বাজারে এই অভিযোগগুলি বিশ্বাস করার ও উৎসাহেব

সঙ্গে প্রচার করার মানুষের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। অবশ্য এই অভিযোগগুলির স্বপক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ এখনো পর্যন্ত উপস্থিত করা হয়নি।

পাকিস্তান এবং তার আইএসআই ভারতের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্র, নাশকতা, অন্তর্ঘাত ইত্যাদি ধরনের কজকর্মে লিপ্ত থাকে না, এমন অবশ্যই নয়। কিন্তু হিন্দুত্ববাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের বর্তমান ককটেলে ভারতের ভেতরে ঘটা বা ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে-কোনো ঘটনার পেছনেই পাকিস্তান ও তার আইএসআই-এর হাত আবিষ্কার করার এক প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং ক্রমশই জোরদার হয়ে উঠছে। পাকিস্তানেও ঠিক একই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। সেখানেও যাবতীয় ঘটনাবলীর পেছনে ভারতের হাত খুঁজে বার করা হয় এবং ভারতকে দায়ী করা হয়। ভারত ও পাকিস্তান– এই দুই দেশের শাসকবর্গই এই খেলাটা খেলে যায়। দুই দেশই যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনার জন্য একে-অন্যকে দোষারোপ করে যায় এবং দুই দেশেরই শাসক শ্রেনী একে অন্যকে দোষারোপের এই খেলায় জনসাধারণকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য যাবতীয় প্রয়াস অবলম্বন করে। আর ঠিকভাবে এই খেলাটা খেলে যেতে পারলে অনেক দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এবং নিজেদের নানারকম জনবিরোধী সিদ্ধান্ত ও দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, গণ অসন্তোষ এইরকম নানা ধরনের ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে অনেকটাই রেহাই পাওয়া যায়। তাই ভারত ও পাকিস্তান– এই দুই দেশেরই শাসক শ্রেণী একে-অন্যকে দোষারোপের এই খেলায় একেবারে জান লড়িয়ে দেয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি-২০০২ গোধরায় ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। এখনও পরিষ্কার নয়, তারা কেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সেদিন সবরমতি এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়েছিল। সেদিনের অগ্নি সংযোগের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ, তাও এখনও পরিষ্কার নয়। হয়তো কোনোদিনই এই বিষয়গুলি পরিষ্কার হয়ে উঠবে না, সেদিনের ঐ নৃশংস ঘটনার প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য এবং তার নেপথ্য কাহিনী হয়তো কোনো দিনই সঠিকভাবে জানা যাবে না। তবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সবরমতি এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারার ঘটনাটিকে দ্ব্যর্থহীন ভাবেই নিন্দা করা দরকার। কোনোরকম রাখঢাক না করেই বলা দরকার, অত্যন্ত জঘন্য, অমানবিক ও পৈশাচিক এই ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছিল, তারা ঘৃণ্য অপরাধী এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলশান্তি হওয়াই প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসমূলক কাজের মাধ্যমে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের কোনো উপকার সাধন তো হবেই না, পরিবর্তে তাদের বিপন্নতাই আরও বাড়িয়ে তোলা হবে এবং তাদের আরও বেশি করে হিন্দুত্ববাদী শক্তির উন্মত্ত আক্রমণের শিকার করে তোলা হবে। বাস্তবেও ঠিক তাই ঘটেছে। এই ধরনের ঘটনা হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া ফ্যাসিস্তদের হাতই আরও শক্ত করে তোলে। সুতরাং এই ঘটনাকে সমর্থন করার কথা বলা বা ভাবা, বা যথেষ্ট নিন্দা না করা, প্রকৃতপক্ষে গেরুয়া ফ্যাসিবাদের হাত ও তার পায়ের তলার জমিকেই আরও শক্ত করে

তোলে। গেরুয়া ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে শক্তিশালী করার জন্যই গোধরার ঘটনাটিকে তীব্র নিন্দা করা দরকার।

কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাটিও স্পষ্টভাবেই বলা দরবার, গোধরার ঘটনাটি নিছকই ক্রিয়া ছিল না, তা ছিল প্রতিক্রিয়া– অত্যন্ত বিপজ্জনক এক নিরন্তর ক্রিয়ার এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়া। বিগত এক দশকের বেশি সময় ধরেই হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহ নানাভাবেই তাদের পেশিশক্তির প্রদর্শন করে চলেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ওপর আক্রমণ তাদের তরফে এক নিয়মিত ঘটনা। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর করসেবক পরিচয়ধারী একদম ধর্মোম্মাদ বর্বর পৈশাচিক উন্মত্ততায় ধূলিসাৎ করেছে প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। এই বর্বরতার পেছনে ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদী শক্তিসমূহের প্রত্যক্ষ উস্কানি ও সমর্থন, এবং এই ধর্মোম্মাদ বর্বরদের অবস্থান ছিল ও সর্বদাই আছে এই শক্তিসমূহের নিরাপদ পক্ষপুটে। ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়া বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ করে অযোধ্যাকে আরও বেশি 'পূতপবিত্র' করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এখন সেখানে করসেবকদের নিত্য উৎসাহী আনাগোনা। এই আসা-যাওয়ার পথে করসেবকরদের তরফ থেকে হিন্দুত্ববাদী স্লোগান, উস্কানি, প্ররোচনা, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কটূক্তি, ছোটখাটো হামলা– এব নিত্য দিনই চলছিল। অবস্থা চরমে উঠেছিল গত ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম গুজরাতের গোধরায়। অযোধ্যা ফেরত এই করসেবক বা 'রামসেবক'দের দল সেদিন নিতান্তই বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। হিন্দুত্ববাদী গলাবাজি, উস্কানি, প্ররোচনা, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নানাভাবে বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রকাশ এ-সব তো ছিলই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'রামভক্তি' সহযোগে গুণ্ডামি। গোধরা স্টেশনে চা-জলখাবার খেয়ে দাম না দিয়ে পরিবর্তে বৃদ্ধ মুসলমান চা-বিক্রেতাকে মারধরও শুরু করেছিল এই 'রামভক্ত' করসেবকদের দল। এক অসমর্থিত সূত্রে প্রকাশ, শুধু এতেই তারা ক্ষান্ত ছিল না; সেই অসমর্থিত সূত্রেই জানা যায় যে, সবরমতি এক্সপ্রেসের এস-৬ নামক সংরক্ষিত কামরায় এই বর্বর করসেবকদের দল বৃদ্ধ মুসলমান চা-বিক্রেতাটির তরুণী কন্যাকে জোর করে তুলে নিয়ে কামরায় দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই ট্রেনটিও চলতে শুরু করেছিল। এমতাবস্থাতেই ঘটেছিল করসেবকদের বিরুদ্ধে গণরোষের বিস্ফোরণ। যেহেতু করসেবকদের হামলার শিকার হয়েছিল সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়, সুতরাং গণরোষের আগুন জ্বলেছিল এই সম্প্রদায়ের তরফ থেকেই। গণরোষের সেই আগুনেই জ্বলেছিল সবরমতি এক্সপ্রেস, পুড়ে মারা গিয়েছিল ৫৮ জন করসেবক। অগ্নি সংযোগের এই ঘটনাটিকে সমর্থনের কোনো প্রশ্নই নেই। এই পৈশাচিক নরমেধের ন্যায্য প্রাপ্য তীব্রতম নিন্দা। করসেবকেরা বর্বর, কিন্তু তাদের পুড়িয়ে মারাও নিষ্ঠুর বর্বরোচিত কাজ। কিন্তু আপাদমস্তক নিকৃষ্ট হিন্দু সাম্প্রদায়িক গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে গোধরার ঘটনাটিকে ক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করে তার পরবর্তী গুজরাত গণহত্যাকে প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালাতে চাইছেন, তা

এক জ্বলজ্যান্ত মিথ্যারই নিদর্শন। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার এক গালগল্প তৈরি করে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চেয়েছিলেন, গুজরাতের গণহত্যার জন্য সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়কেই দায়ভাগী করতে। হিন্দুত্ব ব্রিগেড এই মিথ্যাটি প্রচারের দায়িত্ব সোৎসাহে নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে কাজে নেমে পড়লেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে গল্পটি ঠিকমতো গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় নি। অতীব জঘন্য ও নিন্দনীয় হলেও গোধরায় ট্রেনে অগ্নিসংযোগ ছিল করসেবকদের উস্কানি, প্ররোচনা ও বর্বরতা নামক ক্রিয়াটিরই এক অন্ধ প্রতিক্রিয়া। তার পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। হতে পারে, বিগত কয়েকদিনের উস্কানি, প্ররোচনা ও গুণ্ডামির যে নিদর্শন করসেবকেরা রেখেছিল, তার জন্য প্রতি আক্রমণের প্রস্তুতি সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের এক উগ্রপন্থী অংশের তরফ থেকে সেইদিন নিয়ে রাখা হয়েছিল, অথবা হতে পারে, করসেবকদের সেই দিনের বর্বরতার বিরুদ্ধে তা ছিল প্রতিবাদী অন্ধ ক্রোধের এক তাৎক্ষণিক উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ। (পরবর্তীতে সরকারী অনুসন্ধানে প্রকাশ ট্রেনের আগুনটা ছিল নিছক দুর্ঘটনা। ওরা ট্রেনে রান্নাও করছিল– সংকলক)।

গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেসে আগুন লাগিয়ে ৫৮ জন করসেবক হত্যাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার বদলা হিসাবে এর পর সারা গুজরাত জুড়ে শুরু হয় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর বর্বর হিন্দুবাদী জল্লাদদের একতরফা পৈশাচিক আক্রমণ– সংঘটিত হল গুজরাত গণহত্যা। গোধরা পরবর্তী গুজরাতের ঘটনাবলীকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসাবে অভিহিত করা সমীচীন নয়। এর কারণ হল দাঙ্গায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, হয় আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, হতাহত হয় দুই পক্ষেই, কোনো পক্ষে কম, কোনো পক্ষে বেশি। কিন্তু গুজরাতে দাঙ্গা হয় নি, হয়েছে একতরফা ভাবে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর ফ্যাসিস্ত হিন্দুত্ব ব্রিগেডের নৃশংস আক্রমণ ও গণহত্যা-আম কোতল। অনিবার্যভাবেই গুজরাত আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিগত শতাব্দীর তিরিশ ও চল্লিশের দশকের নাৎসি জার্মানির কথা। হিটলারের নাৎসি শাসন কবলিত জার্মানিতে সেই সময়ে নাৎসি ঝটিকা বাহিনী একতরফা আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করেছিল ইহুদিদের। নাৎসি জার্মানিতে তৎকালীন গণহত্যার উদ্দেশ্যই ছিল জার্মানিকে সম্পূর্ণভাবে ইহুদি মুক্ত করা, ইহুদিদের সমূলে উৎপাটিত করা, যাকে বলা হয় 'এথ্নিক্ ক্লেন্‌জিং' (ethnic cleansing)। গুজরাতের হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোদের তরফে যা ঘটানো হয়েছে তাকে 'এথ্নিক্ ক্লেনজিং' হিসাবে অভিহিত করাই সমীচীন। নাৎসি জার্মানিতে যেমন বেছে বেছে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালানো হত, তাদের হত্যা করা হত, গুজরাতেও গোধরা পরবর্তী দিনগুলিতে ঠিক তা-ই হয়েছে। বিগত কয়েক মাস ধরেই গুজরাতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভোটার তালিকা, বিভিন্ন পৌরসভা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তালিকা এবং অন্যান্য বিভিন্ন সূত্র থেকে বেছে বেছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের চিহ্নিত করে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল এবং আগুনে পুড়িয়ে বা অন্যভাবে নির্বিচার খুন করা হয়েছিল।

সবমতি এক্সপ্রেসের আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল ৫৮ জন করসেবক। আর তার বদলা হিসাবে গুজরাত গণহত্যার হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোদের হাতে প্রাণ হারাতে হল সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত ৭০০-রও বেশি মানুষকে। এটা একেবারেই সরকারি হিসাব, আর আমরা সকলেই জানি যে, সরকারি হিসেবে নিহত-আহতের সংখ্যা সর্বদাই অনেক কমিয়ে দেখানো থাকে। সেই সরকারি হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে ৫৮ জনের হত্যার বদলা নিতে খুন করা হয়েছে ৭০০-রও বেশি মানুষকে, অর্থাৎ বারো গুণেরও বেশি। আর বেসরকারি হিসাবে গুজরাত গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যা ২০০০-এরও বেশি, অর্থাৎ প্রায় ৩৫ গুণ। গণহত্যা তো বটেই 'এথ্নিক ক্লেনিজং' (ethnic cleansing)-ই গুজরাতের ঘটনাবলীর সঠিক অভিধা। গোধরায় ট্রেন পুড়িয়ে করসেবক হত্যার মতো নৃশংস ঘটনার নিঃসন্দেহে প্রাপ্য তীব্রতম নিন্দা, কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপো আক্রমনের মাধ্যমে সংঘটিত গুজরাত গণহত্যাকে ধিক্কার দেওয়ার মতো ও নিন্দা করার মতো সঠিক ভাষা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। ভাষা এখানে মনের ভাব প্রকাশে ব্যর্থ। গুজরাতের গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অন্তরে সঞ্চিত সমস্ত ঘৃণাকে সংহত করে তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করার মতো ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল আমার আয়ত্তের বাইরে। তাই আমার প্রতিনিয়তই মনে হয়, কোনো নাৎসি ঝটিকা বাহিনীর প্রতিরূপ গুজরাতের বর্বর গণহত্যাকারীদের জন্য যথেষ্ট নয়।

Communalism combat পত্রিকার সম্পাদিকা সুপরিচিত সাংবাদিক তিস্তা সেতলবাদ (Teesta Setalvad) গুজরাতে গণহত্যা চলাকালীনই গিয়েছিলেন প্রধানতম বধ্যভূমি আমেদাবাদে। ধর্মীয় অন্ধত্ব, বিদ্বেষ ও হিংসা এবং সম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী তিস্তা সেখানে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এই গণহত্যার ভয়াবহতা। গুজরাতের তাণ্ডবলীলা ও ধ্বংসের বীভৎসতা বোঝাতে আমি তিস্তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

"I will not call this a 'riot', I think the media is wrong about that What I am seeing here is state-sponsored ethnic cleansing and genocide. I don't think that is sensationalising it. The carnage has all the elements of genocide-the brutal taking of life-official estimates of the loss of life was a litttle over 700. data I have received puts it at a staggering 2,000. There has been a tremendous damage to the economy. I am told that at least Rs. 4,500 crore worth of property has been demaged. And of that, at least 80 per. cent is Muslim owned property. Twenty-six dargahs and mosques have been

destroyed in Ahmedabed alone, the total figure for Gujarat will be somewhere between 250 and 300. That is quite an attempt at wiping out religious and cultural identities."

গুজরাত গণহত্যা চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত গুজরাত রাজ্য সরকারের ভূমিকা ছিল চরম ন্যাক্কারজনক। যখন সারা গুজরাত জুড়ে চলছে ধ্বংসের তাণ্ডব এবং অবাধ গণহত্যা, তখন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সবক, নিষ্ক্রিয় দর্শক। অবাধে চলেছে সংখ্যালঘু মুসলমান হত্যা, প্রশাসনের তরফে তা রোধ করার কোনও প্রয়াসই নেই। শুধু তাই নয়, এ কথা লেখা যেতেই পারে যে, গুজরাতের এই সাম্প্রতিক নরমেধের পেছনে ছিল গুজরাত রাজ্য সরকারের সমর্থন ও অনুমোদন– পরোক্ষ, এমনকী প্রত্যক্ষও। পুলিশ গণহত্যা রোধ করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় থেকেছে, এবং এমনকী অনেক ক্ষেত্রেই গণহত্যাকারী হিন্দু ব্রিগেডকে সক্রিয় সাহায্য করেছে। আর এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ হিন্দুত্ববাদী সরকারের পুলিশও তো হিন্দুত্ববাদী। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে আগেও যখন বিভিন্ন অঞ্চলে দাঙ্গা হয়েছে, তখন দেখা গেছে পুলিশ বাহিনী দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে সংখ্যালঘু মুসলমান নিধনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু গুজরাতের পুলিশ বাহিনী এ-ব্যাপারে ভিন্নভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর আগের সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই গুজরাতে নিরপরাধ, অসহায় মানুষের রক্তে শুধু হিন্দুত্ববাদী ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতই রঞ্জিত নয়, পুলিশ পরিচয়ধারী উর্দিপরা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর হাতও রঞ্জিত।

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছেন, গোধরা পরবর্তী গুজরাতের ঘটনাবলী হল গোধরার হত্যাকাণ্ডের 'স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া'। অর্থাৎ এই বিপুল সংখ্যক নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি স্বাভাবিক, এমনটাই তো হওয়ার কথা। আর যেহেতু খুন হওয়া হতভাগ্য মানুষেরা সকলেই ছিলেন সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত, সেহেতু হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের জীবনের দাম তো কানাকড়িও নয়। এহেন সাম্প্রদায়িক আর শুধু সাম্প্রদায়িকই বা বলি কেন, এহেন নিষ্ঠুর ও অমানবিক এক বিবৃতির পরও এই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিটি মুখ্যমন্ত্রীর পদে বহাল তবিয়তেই আসীন আছেন, এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পিঠ চাপড়ানিও পাচ্ছেন, এর থেকে দুঃখের ও লজ্জার আর কিছুই হতে পারে না। নরেন্দ্র মোদীর এই পাষণ্ড রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন আবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক কর্তাব্যক্তি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের প্রতি চরমতম বিদ্বেষ ও ঘৃণাই তো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শিব সেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোদের মূলমন্ত্র, আর ভারতীয় জনতা পার্টি হল এদের রাজনৈতিক মুখোশী মুখোশের আড়ালে মুখটি নিতান্তই কদর্য।

গুজরাতে পলিশের সাম্প্রদায়িক ভূমিকাকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে ও অনুমোদন করে আমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার এক সুচিন্তিত ভাষণ দিয়েছেন 'পুলিশ তো সাধারণ জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।' তিনি বলতে চেয়েছেন, সাধারণ জনসমাজের মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে পুলিশের মধ্যে। এর অর্থ হল, 'সাধারণ জনসমাজ,' আসলে যা হল হিন্দুত্ববাদী ঘাতক বাহিনী, যা করবে, তাদের একনিষ্ঠ সেবকও তাদেরই এক অংশ হিসাবে পুলিশও ঠিক তা-ই করবে। যেহেতু এই হিন্দুত্ববাদী কসাই বাহিনী, যাকে আমোদাবাদের পুলিশ প্রধান 'সাধারণ জনসমাজ' হিসাবে অভিহিত করেছেন, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ চালিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা করেছে, পুলিশও তাই সমমানসিকতারই বশবর্তী হয়ে একই কাজ করেছে। পুলিশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যা করেই থাকে, গুজরাতের আমেদাবাদের পুলিশের সবচেয়ে বড় কর্তা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক লাইনেই তাকে অনুমোদন ও বৈধতা দিয়ে দিলেন। গুজরাতের ঘটনাবলীকে তাই 'State-sponsored ethnic cleansing and genocide' ছাড়া অপর কোনো অভিধাতেই অভিহিত করা সম্ভবপর নয়।

যতই গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নিজের রাজ্যেই অনুষ্ঠিত গণহত্যা বা আম কোতলকে গোধরার ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে চালানোর চেষ্টা করুন না কেন বাস্তব ঘটনা হল, গোধরার হত্যাকাণ্ড না ঘটলেও হয়তো সারা গুজরাত জুড়ে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ও গণহত্যা চলত। এর কারণ হল, যে-পরিমাণ বিদ্বেষ ও ঘৃণা সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীরা লালন করে চলেছিল তা শেষ পর্যন্ত চাপা থাকত না, বিস্ফোরক বহিঃপ্রকাশ তার ঘটতই। গোধরার হত্যাকাণ্ড সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর তাণ্ডব চালানোর জন্য একটা খুব ভাল অজুহাত হিসাবে একেবার হাতের মুঠোয় এসে গেল। তাই তিস্তা সঠিকভাবেই লিখেছেন ঃ

'Somehow seeing all this bestial violence, I believe that even if Godhra hadn't happened, Gujarat would still have happened. So much nurtured hatred cannot remain unexploded."

নির্বিচার গণহত্যা, অর্থাৎ সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্তদের নির্বিচারে হত্যা, এবং ধ্বংসের তাণ্ডব গ্রাস করেছিল আমেদাবাদ, ভদোদরা (আগেকার নাম বরোদা), সুরাট, নারোদা এবং গুজরাতের অন্যান্য শহরকে। এমনকী হিংসার আগুন ছড়িয়েছিল গ্রামেও। প্রধানতম বধ্যভূমি আমেদাবাদ পরিণত হয়েছিল মৃত্যু নগরীতে। আমেদাবাদে এবং অন্যত্র হিংসার আগুন এখনও নেভেনি। বিপুল সংখ্যক মানুষ এখনও গৃহহীন শরণার্থী হয়ে পুনর্বাসনের প্রতীক্ষায়। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ এহ্সান জাফ্রি (Ehsan Jaffrey)-কে তাঁর পরিবারভুক্ত আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিত সমেত মোট কুড়ি জন সহ পুড়িয়ে হত্যা করা

হয়েছিল ঘাতক নগরী আমেদাবাদে। সমগ্র পরিবারসুদ্ধ চরম বিপন্ন অবস্থায় সাহায্যের জন্য বারে বারে আবেদন জানানো সত্ত্বেও কোনো সাহায্যের হাত তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছায়নি, ফলে রাষ্ট্রীয় মদতপ্রাপ্ত গণহত্যার বলি হতে হয়েছিল তাঁকে সপরিবারে। অবশ্য এই ঘটনার জন্যও নরেন্দ্র মোদী জাফ্রির বিরুদ্ধে প্ররোচনার অভিযোগ এনে সপরিবারে তাঁর মৃত্যুর জন্য তাঁকেই দায়ী করেছিলেন। গণহত্যা রোধ করার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী কোনও আগ্রহ তো দেখাননিই, বরং ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনা বাহিনীকে নামানোর কাজে তিনি দেরি করেছিলেন যাতে গণহত্যার স্রোত আপন গতিতে প্রবাহিত হতে পারে। প্রকাশ্যেই মুখ্যমন্ত্রী খুনিদের 'সংযম'কে প্রশংসা করেছেন, এবং তাঁর 'যোগ্যতা'র জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের, এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির, ঢালাও প্রশংসা পেয়েছেন। গুজরাতের পুলিশের বিরুদ্ধে যাবতীয় সমালোচনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে গলা মিলিয়েই লালকৃষ্ণ আদবানি পুলিশের কাজের প্রশংসা করে তাঁদেরও ঢালাও সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এবং বিশেষ করে এই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর কাছে পিঠ চাপড়ানি পেলেও গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তুলোধোনা করার মতো কেউ নেই, এমন তো নয়। ঠিক এই কাজটাই করে দেখিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে এস বর্মা। গণহত্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য গুজরাত সরকারের 'নিষ্ক্রিয়তা' ও 'অপদার্থতা'কে দায়ী করে তিনি তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন নরেন্দ্র মোদীকে। গুজরাতের ঘটনাবলী নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে বর্মা খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, গুজরাতের পরিস্থিতি প্রায় পঁচিশ দিন পরেও এখনও স্বাভাবিক হয় নি। গুজরাত সরকার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এই মিথ্যা দাবিটিকে উড়িয়ে দিয়ে বর্মা বলেছেন, তিন সপ্তাহ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট হলেও তিনি সারা গুজরাতে কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা দেখতে পাননি। নরেন্দ্র মোদীর মিথ্যার বেসাতিকে চুরমার করে বর্মা জানিয়েছেন, গুজরাতের উচ্চপদস্থ অফিসাররা হিংসার শিকার আক্রান্ত ও বিপন্ন মানুষজনের কাছে যাননি, ত্রাণ শিবিরগুলিতেও যাননি, এবং তিনিই প্রথম উচ্চপদস্থ অফিসার, যিনি এই আপদগ্রস্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আক্রান্ত ও বিপন্ন মানুষদের পুনর্বাসনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন বর্মা। একই সঙ্গে গুজরাতের পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক বলেই তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

কিন্তু সবাই তো আর জে এস বর্মা নন যে, সত্যি কথাটা মুখের ওপর স্পষ্ট করেই বলবেন। তাই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এন ডি এ) বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চার আন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শরিক দলের, যারা ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি)-র প্রসাদধন্য হয়ে ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করে চলেছে, হোমরা-চোমরা নেতানেত্রীদের দেখা গেল গুজরাতের গণহত্যার জন্য কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলে, এবং গুজরাত সরকারের খুবই মৃদু, যাতে বড়দাদা বি জে পি বিশেষ ক্ষুব্ধ না হয়, এমন

মৃদু, সমালোচনা করেই নিজেদের দায়িত্ব সমাপন করতে। ভাবের ঘরে চুরি করলে ওরকম করেই করতে হয়। একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, যাঁর 'অগ্নিকন্যা' বলেই বাজারে বিশেষ পরিচিতি। প্রতিদিন নিয়ম করে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের এবং তার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদত্যাগ, অথবা সরকারকে বরখাস্ত, করার দাবি জানালেও 'অগ্নিকন্যা' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একবারের জন্যও গুজরাতের গণহত্যার জন্য সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ চাননি, অথবা কেন্দ্রের এন ডি এ সরকার থেকে দলবল সমেত বেরিয়ে আসার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। অবশ্য তাঁর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক, কারণ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কোনো খোয়াব তো আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেন না।

কেন্দ্রের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। এই দলের প্রধান নেত্রী সোনিয়া গান্ধীও সংসদীয় রাজনীতির খেলায় বেশ দ্রুতই কুশলী খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন। এই খেলার নিয়ম মেনেই তিনি ভালোই বুঝে গেছেন, কোনো ব্যাপারেই অতিরিক্ত বিরোধিতা করে আখেরে বিশেষ লাভ হয় না, আর তাই আখেরে এই লাভের জন্যই টেনে খেলা বা হাতে রেখে খেলা প্রয়োজন। কংগ্রেসও তাই সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে 'হিন্দু কার্ড'টা হাতে রেখেই পুরো খেলাটা খেলল। হিন্দু ভোটের অংকে যাতে কোনো রকম গোলমাল না হয়, তাই গুজরাতের গণহত্যা ও 'এথ্‌নিক্ ক্লেন্‌জিং'এর পরও প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বা গুজরাত সরকারকে বরখাস্ত বরার দাবিতে একবারও সোচ্চার হল না। এই হল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস, যারা আশায় আছে, বি জে পি ও তার এন ডি এ সরকার ক্রমশ বেশি করে বদনাম কুড়োনোয়, তাদের জায়গায় ক্ষমতাসীন হওয়ার। কিন্তু আমরা জানি যে, কেন্দ্রে বা রাজ্যে, যখনই যেখানে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তাদের হাত রঞ্জিত হয়েছিল অসংখ্য মানুষের রক্তে। ভবিষ্যতেও ক্ষমতায় এলে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

গেরুয়া ফ্যাসিবাদের পায়ের আওয়াজ শোনাচ্ছে হিন্দুত্ববাদ। গুজরাত গণহত্যা প্রবল করে তুলেছে তার ভারি বুটের আওয়াজে। একটা রাজ্যেই পুরো শাসনক্ষমতা হাতে থাকলে কি করা যেতে পারে, দেখিয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী শক্তি। সারা ভারতের ক্ষেত্রে একক শাসনক্ষমতা পেলে এরা কি করতে পারে, তা আন্দাজ করতে খুব একটা মাথা খেলানোর দরকার হয় না। গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে আর নিছকই দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো অবকাশ নেই, কঠোর ও নির্মম বাস্তব হিসাবে তার আত্মপ্রকাশ খুব দূরের না-ও হতে পারে।

আমাদের দেশে বর্তমানে হিন্দুত্ববাদ নানাভাবেই তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার উদ্দেশ্যই হল দেশে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা, যে ফ্যাসিবাদের রং গেরুয়া। গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হিন্দুত্ববাদ ক্রমাগতই প্রসারিত করে চলেছে

তার ক্রিয়াকলাপের পরিধি। পুর সমাজকে গৈরিক করে তোলার কাজে সে নিয়োগ করেছে তার সর্বশক্তি। হিন্দুত্ববাদ খুব ভাল করেই জানে যে, পুর সমাজের গৈরিকীকরণই প্রস্তুত করে দেবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ। এই হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই তো হিন্দুত্ববাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য, তার লক্ষ্য, তার স্বপ্ন। এই উদ্দেশ্যে সাধন বা স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যই তো হিন্দুত্ববাদের যাবতীয় সক্রিয়তা। বর্তমানে তাই হিন্দুত্ববাদের সামগ্রিক কর্মসূচি হল পূর সমাজকে গৈরিক করে তোলার কর্মসূচি। এই হিন্দুত্ববাদী কর্মসূচির দুটো অংশ আছে যা একে-অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও একে-অপরের পরিপূরক। তার মধ্যে একটি হল সরাসরি বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রভূত্ব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। এই কর্মসূচির মধ্যে আছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ, তাদের বিরুদ্ধে বর্বর পশুশক্তির প্রয়োগ, এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠায় ও উপাসনা স্থলের ওপর সরাসরি হামলা। এই কর্মসূচির সবচেয়ে মারাত্মক এক নিদর্শন হল সাম্প্রদায়িক গুজরাত গণহত্যা। কর্মসূচির অপরাংশটি হল চেতনার স্তরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠান প্রয়াস, চেতনার ওপর দখলদারি কায়েম করার প্রচেষ্টা। তার জন্যই প্রয়োজন হয় শিক্ষাসংস্কৃতিকে গৈরিক রং-এ রাঙিয়ে দেওয়ার, প্রয়োজন হয় ইতিহাসকে গৈরিক ছাঁচে ঢালাই করার। হিন্দুত্ববাদ আজ তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই কাজটিই করে চলেছে। বর্বর পশুশক্তি প্রয়োগ করে সমস্ত ভিন্ন মত দমনের মাধ্যমে নিজস্ব মত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার সঙ্গেই মানুষের মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এবং তার মগজ ও চেতনাকে দখলদারির প্রয়াসটিকে মিশিয়ে দিয়ে হিন্দুত্ববাদ নিরন্তর রচনা করে চলেছে গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি।

ইউরোপে কিভাবে ফ্যাসিবাদ এবং তারই নিষ্ঠুরতম ও কদর্যতম রূপ নাৎসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে ইতিহাস আমাদের অজানা নয়। ইতিহাস বিস্মৃত হওয়া চরমতম নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খামি। ইতিহাস থেকেই আমাদের প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। আর তাই ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের সচেষ্ট হতে হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার হিন্দুত্ববাদী প্রয়াসটিকে প্রতিহত করার কাজে, আমাদের গড়ে তুলতে হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ।

প্রখ্যাত ইতালিয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও কমিউনিস্ট নেতা অন্তোনিও গ্রামশ্চি (Antonio Gramci)-র তত্ত্ব অনুসরণ করেই আমরা ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটিকে বিশ্লেষণ করতে পারি। গ্রামশ্চির তাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে Hegmony-র ধারণাটি। গ্রামশ্চির ব্যবহার করা Hegemony-র বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা আধিপত্য কথাটিকে ব্যবহার করতে পারি।

জার নিয়ন্ত্রণাধীন রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর নিজের দেশ ইতালির ও ইতালির মতো অন্যান্য দেশের পার্থক্য নিরূপণ করে গ্রামশ্চি লিখেছিলেন, এই দ্বিতীয় ধরনের দেশগুলিতে রাষ্ট্রই

সব নয়, এদের আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ (Civil Society), কারণ এই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ফলে এই শক্তিশালী পুর সমাজ গড়ে উঠেছে। গ্রামশ্চির মতে, ইতালির মতো পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শাসক শ্রেণী শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা প্রভুত্ব (Force)-এর মাধ্যমেই শাসন করে না, শাসন করে আধিপত্য (Hegemony) বিস্তারের মাধ্যমেও। ফলে শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামই যথেষ্ট নয়, ভাঙা দরকার সমাজদেহে তার আধিপত্যকেও, ফলে প্রয়োজন হয় পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের। এই কারণেই গ্রামশ্চির তত্ত্ব অনুযায়ী ইতালির মতো পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিপ্লব হবে পাল্টা অধিপত্র বিস্তারের মাধ্যমে, চরিত্রগতভাবে এ হবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, গ্রামশ্চির ভাষায় যা হল 'অবস্থায়ী সংগ্রাম' ('War of Positition')। অপরদিকে বলশেভিক বিপ্লব তাঁর চোখে ছিল 'চলিষ্ণু সংগ্রাম' ('War of Manoeuvre'), যা রাশিয়ার মতো দেশ, যেখানে রাষ্ট্রই সর্বগ্রাসী, পুর সমাজের পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই, সেখানে প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গেই আমাদের মনে রাখা দরকার, ভারতের ক্ষেত্রে গ্রামশ্চির তত্ত্ব বিশেষভাবেই প্রাসঙ্গিক। এর কারণ হল, নানাবিধ বিকৃতি সত্ত্বেও ভারতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্ব আছে ও তার বিকাশ ঘটেছে, আর তার ফলেই ভারতে রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী নয়, আছে এক শক্তিশালী পুর সমাজ (Civil Society)। শাসক শ্রেণী এখানে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগ বা পশুশক্তি বা প্রভুত্ব (Force)-এর মাধ্যমে শাসন করে না, সমাজদেহে তার অধিপত্য (Hegemony) বিস্তারের মাধ্যমেও শাসন করে। ফলে ভারতে কমিউনিস্টদের লড়া দরকার শাসক শ্রেণীর প্রভুত্ব ও আধিপত্য উভয়ের বিরুদ্ধেই। এখানে তাঁদের চালানো দরকার 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' (War of Position), এবং তার জন্যই সমাজদেহে কমিউনিস্টদের বিস্তার করা দরকার পাল্টা আধিপত্য (Hegemony)। পাল্টা আধিপত্র বিস্তারের মাধ্যমেই কমিউনিস্টদের ভাঙ্গা দরকার সমাজদেহে শাসক শ্রেণীর আধিপত্য। সুতরাং তাঁদের দৃঢ়ভাবে বৈপ্লবিক 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' বা 'অবস্থায়ী সংগ্রাম' (War of Position) চালিয়ে যাওয়া দরকার। একমাত্র এই পথেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি ও সাফল্য সম্ভব।

আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা আজকাল আন্তোনিও গ্রামশ্চিকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসনেই বসান। গ্রামশ্চির তত্ত্ব, তাঁর Hegemony-র ধারণা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক চলছেই, অ্যাকাডেমিক গ্রামশ্চি চর্চার ধারাটিও বেশ জোরদার। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের কমিউনেস্টরা গ্রামশ্চির তত্ত্বের গুরুত্ব কি সত্যিই বুঝেছেন? বাস্তব পরিস্থিতি দেখে এ কথা বলতে তো বিশেষ ভরসা হয় না। গ্রামশ্চিকে শ্রদ্ধা-সম্মানের আসনে বসালেই গ্রামশ্চির তত্ত্বের গুরুত্ব বোঝা সম্পূর্ণ হয় না বা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা হয় না। আসলে আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের বড় অংশই নিজেদের প্রায় সম্পূর্ণভাবেই আবদ্ধ রেখেছেন ভোটের রাজনীতির ঘেরাটোপে। ফলে নির্বাচনে লড়া ও জেতার

ব্যাপারটাই প্রাধান্য পায়, আর সবই গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। নির্বাচনী রাজনীতিতে সাফল্য পেতে গেলে নানারকম সুবিধাবাদকে প্রশ্রয় দিতে হয়, অনিবার্যভাবেই চলে আসে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি। যে খেলার যে নিয়ম। কমিউনিস্টরা সহ বামপন্থী শক্তিও তার বাইরে যেতে পারেন না। ফলে ভোটে জেতা সম্ভবপর হয়, নির্বাচনে আসে তাৎক্ষণিক সাফল্য, কিন্তু করা হয় না সমাজদেহে শাসক শ্রেণীর আধিপত্য ভেঙ্গে পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের কাজটা। চেতনার স্তরে পেনিট্রেট করে পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের কাজটি অবহেলিত হতেই থাকে, বৈপ্লবিক 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' বা 'অবস্থায়ী সংগ্রাম' (War of Position) আর করা হয় না।

এর সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে শাসক শ্রেণী। আমাদের দেশের বর্তমান শাসকদের রং আবার গৈরিক। আমাদের দেশ দেখেছে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের কালো দিন, জরুরী অবস্থা, কংগ্রেসের স্বৈরাচারী তাণ্ডব, ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাসিবাদ। এখন আবার আমাদের দেশে রচিত হয়ে চলেছে নতুন এক ধরনের ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, যে ফাসিবাদের রং গেরুয়া। আমাদের দেশের গৈরিক শক্তি স্বাভাবিকভাবেই গ্রামশ্চি পড়ে নি, কিন্তু গ্রামশ্চি পড়েও কমিউনিস্টরা সঠিক ভাবে যেটি বোঝেন নি, তাদের নিজস্ব ম্যাচিওরিটি দিয়ে গৈরিক শক্তি সেটি সার বুঝেছে। পুর সমাজের দখল নাও, পুর সমাজের সর্বস্তরে বিস্তার করো নিজস্ব আধিপত্য, অর্থাৎ গৈরিক করে তোলো সমগ্র পুর সমাজকে। পুর সমাজের এই গৈরিকীকরণই প্রশস্ত করে দেবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ, প্রতিষ্ঠিত হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ।

আমাদের দেশের গৈরিক শক্তি, যার মধ্যে আছে সমগ্র সংঘ পরিবার ও তার দোসর ফ্যাসিস্ত সংগঠন শিবসেনা খুব ভালো করেই জানে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ করতে গেলে দুটো কাজ একসঙ্গেই করা দরকার। একদিকে বলপ্রয়োগ অর্থাৎ পশুশক্তি প্রয়োগ করে যেমন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা দরকার, অপরদিকে তেমনই দরকার আধিপত্য বিস্তার করা। আর এই আধিপত্য বিস্তার করার জন্যই প্রয়োজন হল মানুষের মনের দখল নেওয়া, তার চেতনার দখল নেওয়া। মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে বাকি কাজগুলি সহজে হয়ে যায়। গৈরিক শক্তি সেই চেষ্টাই চালিয়ে চলেছে– মননের ওপর অধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

কেন্দ্রে যে ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (এনডিএ) বা জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা নামে জোট সরকার ক্ষমতায় আসীন আছে, তার প্রধানতম শরিক দলটিই হল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি– সংঘ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। এই জোট সরকারের শরিক হিসাবে উপস্থিত আছে আমাদের দেশের 'ফুয়েরার' বাল ঠাকুরের ফ্যাসিস্ত সংগঠন শিবসেনা। কেন্দ্রের সরকারি ক্ষমতা অনেকাংশেই হাতে থাকায় পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ করার পালে বাতাস ভালভাবেই লেগেছে। গৈরিক শক্তির তাই এখন বড়ই সুসময়।

—১০

হিন্দুত্ববাদে এখন প্রবল রমরমা। ভলোরকম একটা গ্রহণযোগ্যতাও আছে এই হিন্দুত্ববাদের। এই গ্রহণযোগ্যতার ওপর ভিত্তি করেই হিন্দুত্ববাদ নির্দ্বিধায় আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। বিজেপি-র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকেই (১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসেও আবার লোকসভা নির্বাচনে বিজয়লাভ করে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে এই সরকার) হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহ তাদের আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃততর করে তুলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যত নিষ্ক্রিয়তা, আর বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির পরোক্ষ, এবং এমনকী প্রায় প্রত্যক্ষ সহায়তা উগ্র হিন্দুত্ববাদকে উৎসাহিত করে তুলেছে আরও বেশি করে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করতে। একেবারেই সাম্প্রতিক কালে গুজরাতে গণহত্যায় নিরত উগ্র হিন্দুত্ববাদের ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী রাজ্য সরকারের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা এসেছে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে ও সরাসরি। উগ্র হিন্দুত্ববাদ সাফল্যের সঙ্গেই সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমেই তারা দেশে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার অভিমুখে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে যেতে চায়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহের এই অক্রমণাত্মক কাজকর্ম সমর্থন করার মতো লোকজনও দেশে বিরল নয়। এই সমর্থন যে সর্বদা সরাসরি আসে এমন নয়। অনেক সময়ই এই সমর্থন আসে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, নানা কথার জাল বুনে, নানা অজুহাত সৃষ্টি করে। সুতরাং বলপ্রয়োগ (Force)-এর সঙ্গে হিন্দুত্ববাদ মিশিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে আধিপত্য (Hegemony), সমাজদেহ থেকে সে আদায় করতে সমর্থ হয়েছে এক ধরনের সম্মতি (Consent)। আর তার ফলেই হিন্দুত্ববাদ তার আক্রমণাত্মক কাজকর্মের সমর্থনে সমাজদেহের একাংশ থেকে অর্জন করতে পেরেছে এক ধরনের বৈধতা (Legitimacy)। এইভাবেই দেশে ক্রমশ রচিত হয়ে চলেছে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার পটভূমি, যে ফ্যাসিবাদের রং হল গেরুয়া। বলপ্রয়োগের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে আধিপত্য আর সম্মতি, মিলে যাচ্ছে এক ধরনের প্রয়োজনীয় বৈধতা। এইভাবেই তো আসে ফ্যাসিবাদ। গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকেও এখনও যাঁরা নিছকই দুঃস্বপ্ন বলে উড়িয়ে দেন, হয় তাঁরা নিজেরা সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন, অথবা তাঁরা চিন্তাশক্তিকে বর্জন করেছেন। কঠোর ও নির্মম বাস্তব হিসাবে গেরুয়া ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশ সম্ভবত খুব দূরের ঘটনা নয়, দরজায় শোনা যাচ্ছে তার প্রবল কড়া নাড়া।

ভারতের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় শত্রু হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিসমূহ– হিন্দুত্ববাদ, যা চরিত্রের দিক দিয়ে নির্ভেজাল ফ্যাসিবাদী। এই শক্তিসমূহের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল সমাজে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা, যেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার পথে। আর তার জন্য যে-কোনো পথ অবলম্বন করতে এই শক্তিসমূহ প্রস্তুত। ভারতের রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়ণের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে শুধুমাত্র যে হিন্দু সম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনগুলিরই ভূমিকা আছে, এমন নয়,

মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহও ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়ে সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির কাজে সমান সক্রিয়। চরিত্রগতভাবে তারাও আপাদমস্তক ফ্যাসিবাদী। কিন্তু ভারতের মতো দেশে যেখানে হিন্দুই হল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়, সেখানে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা অনেক বেশি। অবশ্য তার সঙ্গেই এই কথাটি উল্লেখ করা দরকার, যেখানে যেখানে এই মুসলিম সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহের প্রভাব আছে, সেই সব জায়গায় তারা একই রকম বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং প্রভাবের পরিধি বিস্তৃত করতে পারলে তারা হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সংগঠনসমূহের মতো সারা ভারতের ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এই ব্যাপারে চেখ বন্ধ করে থাকার কোনও অর্থই হয় না, এবং তা করার অর্থই হল হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই দুর্বল করে তোলা।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদয়িকতাবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদের থেকে বেশি বিপজ্জনক, এরকম কোনো অতিসরলীকৃত বহু ব্যবহৃত মন্তব্য করা বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। উভয় ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদই প্রায় সমান বিপজ্জনক, তাদের মধ্যে বেশি ফারাক নেই। রাজনীতির সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়নের ক্ষেত্রে এবং আতঙ্ক ও সন্ত্রাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদ প্রায় একইরকম বিপজ্জনক ভূমিকা পালন করে থাকে বা পালন করতে সক্ষম। কিন্তু নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণেই সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদকে জাতীয়তাবাদের নামে চালানোর একটা প্রবণতা দেখা যায়। এক হয়ে যায় সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের নামে সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকাবাদকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এক ধরনের বৈধতা। ভারতের ক্ষেত্রে এই ভূমিকাটি পালন করে থাকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ, কারণ এখানে হিন্দুই হল সংখ্যাগুরুর সম্প্রদায়। আর তাই আমরা দেখতে পাই, ভারতে অনেক সময়ই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্যের নামে চালিয়ে এক ধরনের বৈধতা দেওয়ার একটা প্রয়াস চালানো হয়, এবং এই জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্যের আবরণের অন্তরাল থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ দুর্বৃত্তিমূলক কাজকর্ম তুলনমূলকভাবে সহজেই করে যেতে পারে। ভারতের ক্ষেত্রে এটাই হল সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদ হিসাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের সুবিধে। যেখানে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদ রূপ নেয় বিচ্ছিন্নতাবাদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চোখে ও মানসে প্রতিভাত হয় দেশদ্রোহ হিসাবে, সেখানে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এক দেহে লীন হয়ে গিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ এই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের চোখে ও মানস আবির্ভূত হয় দেশপ্রেম হিসাবে, দেশরক্ষার শপথ হিসাবে। এই পরিস্থিতিতে এর বিরোধিতা তো দেশদ্রোহিতারই শামিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের মোড়কে হিন্দুত্ববাদ তার অভীষ্ট পূরণের পথে সহজেই এগিয়ে চলে।

বর্তমানে গৈরিক শক্তি অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ ক্রমশই প্রসারিত করে চলেছে তার আধিপত্যের পরিধি। গৈরিক শক্তি একদিকে নিয়েছে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাবরি মসজিদ, হুমকি দেওয়া হচ্ছে আরো মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানোর। থেকে থেকেই হুঙ্কার ওঠে– 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে।' রামমন্দির নির্মাণের দাবিতে হিন্দুত্ববাদ গ্রহণ করতে চলেছে আরও উগ্র অবস্থান, সেখানে সে ভিন্ন মতের সঙ্গে কোনোরূপ সহাবস্থানেই প্রস্তুত নয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদের পক্ষ হতে বারে বারেই আক্রমণ নেমে আসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর, তাদের উপাসনা স্থলের ওপর। বিভিন্ন জায়গায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন, যে আগুনে মিশে থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা। তৃতীয় রাইখের নাৎসিদের মতোই আগুন এই হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোদের প্রিয় হাতিয়ার। আর সেই হাতিয়ারই বারে বারে ব্যবহৃত হয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিভিন্ন দাঙ্গায় সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ও সংখ্যালঘু মুসলমান নিধনের কাজে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই হিন্দুত্ববাদী গেস্টাপোরা। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর বোম্বাই (বর্তমান নাম মুম্বই), আমেদাবাদ ও সুরাটে যে দাঙ্গাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির সব কটিতেই সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ ও সংখ্যালঘু নিধনের কাজে বিশেষ পুটত্ব দেখিয়েছিল এই হিন্দুত্ববাদীরা। তৎকালীন বোম্বাই (বর্তমান নাম মুম্বই)-তে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে যে দাঙ্গাগুলি সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলির জন্য প্রধানত দায়ী হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্টে অভিযুক্তও হয়েছে চরম হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ফ্যাসিস্ত ঠ্যাঙাড়ে সংগঠন শিব সেনা এবং তার প্রধান বাল ঠাকুরে। আর গুজরাতের সাম্প্রতিক গণহত্যায় সংঘ পরিবারভুক্ত হিন্দুত্ববাদী ত্রিশক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর এস এস), বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের ভূমিকা সুবিদিত ও বহু সমালোচিত।

সংস্কৃতির যাবতীয় ক্ষেত্রেই চলেছে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবেই গায়ের জোরে বন্ধ করে দেওয়া হয় অপছন্দের চলচ্চিত্র-নাটক-সঙ্গীত, আক্রমণ নেমে আসে অপছন্দের সাহিত্য-শিল্পকলার ওপর। ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক বহুমাত্রিকতা বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদকে (Cultural Pluralism) পরদলিত করে চেষ্টা চালানো হয় এক সংস্কৃতির ছাঁচেই সারা দেশকে ঢালাই করার, আর সেই সংস্কৃতি হল হিন্দু সংস্কৃতি, আবার সেই হিন্দু সংস্কৃতি হল গৈরিক শক্তি অনুমোদিত হিন্দু সংস্কৃতি। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা, চিত্রকলা, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রেই জারি হয়ে চলে হিন্দুত্ববাদী ফতোয়া, চেষ্টা চলে সংঘ পরিবার ও শিবসেনা অনুমোদিত একটিই সংস্কৃতির খাপে সব কিছুকেই পুরে ফেলার।

আর অপরদিকে গৈরিক শক্তি চালিয়ে যাচ্ছে মননের ওপর আধিপত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। কাজটা সূক্ষ্মভাবে করার চেষ্টা করা হলেও তা অনেক সময়ই স্থূল রূপ নিয়ে নিচ্ছে। ইতিহাসকে বিকৃত করে তাকে রাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে গেরুয়া রঙে। ভারতের ইতিহাসকে অনৈতিহাসিক হিন্দু যুগ-মুসলিম যুগ ইত্যাদিতে বিভক্ত করে গেয়ে চলা হচ্ছে হিন্দু যুগের কল্পিত জয়গান, আর মুসলিম যুগ চিত্রিত ও চিহ্নিত হচ্ছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ হিসাবে। মুসলিম শাসকেরা সর্বদাই চিহ্নিত হচ্ছেন অত্যাচারী এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর অক্রমণকারী হিসাবে। অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে বহিরাগত আর্যদের এই দেশেরই মূল অধিবাসী হিসাবে ঘোষণা করার। চেষ্টা চলছে সমগ্র শিক্ষাকেই গেরুয়াকরণ করার, স্কুল শিক্ষাকে গেরুয়াকরণ তারই এক অঙ্গ। এনসিইআরটি-র দখল নিয়ে রচনা করা হচ্ছে গৈরিক বর্ণে রঙ্গিত স্কুল পাঠ্য ইতিহাস-ভূগোল ইত্যাদি, যেগুলি এই সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত হয়ে অনুমোদন লাভ করছে বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে। হিন্দুত্ববাদের পীঠস্থান গুজরাতে এনসিইআরটি এবং গুজরাত রাজ্য শিক্ষা পর্ষৎ (Gujarat State Education Board) অনুমোদিত স্কুলের দশম শ্রেণীতে পাঠ্য ইতিহাস বইয়ে জয়গান করা হয়েছে হিটলার, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের, রচনা করা হয়েছে হিটলারের নেতৃত্বাধিনি নাৎসি জার্মানির গৌরব গাথা। এই হিন্দুত্ববাদীরা হিটলারকেই তাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছে, আর তাই নাৎসি তাণ্ডবের অনুকরণে ও অনুসরণেই চলে হিন্দুত্ববাদী তাণ্ডব। গৈরিক বর্ণে রাঙিয়ে তোলা পাঠ্য পুস্তককে বিভিন্ন স্কুলে অনুমোদনে প্রচলনের মাধ্যমেই দখল নেওয়া হচ্ছে কিশোর মনের; মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা হচ্ছে একেবারে গোড়া থেকেই।

বৈদিক জ্যোতির্বিদ্যা গোছের একটা গালভরা নাম দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র নামক এক সম্পূর্ণ অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের মদতে। গৈরিক শক্তির ইচ্ছায় জ্যোতিষশাস্ত্রকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করে তোলা হচ্ছে, অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে এই আগাপাশতলা অবিজ্ঞান বা অপবিজ্ঞনটিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান নামক বিজ্ঞানেরই একটি শাখার সঙ্গে একাসনে বসানোর।

শিক্ষাকে গেরুয়াকরণের নেশায় মজে গৈরিক শক্তি 'বৈদিক গণিত' নামক একটি হাঁসজারুকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার খেলায় নেমেছে। এতেই শেষ নয়, পৌরোহিত্য বা বৈদিক আচার-আচরণকেও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস গ্রহণ করেছে গৈরিক শক্তির হাতের পুতুল কেন্দ্রীয় সরকার। কর্মকাণ্ড নাম দিয়ে বৈদিক আচার-আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৌরেহিত্য পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত কেন্দ্রীয় সরকার। এইসব সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমাদের দেশকে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে, ঘড়ির কাঁটাকে পেছন দিকে ঘুরিয়ে, মধ্যযুগে পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যাবতীয় কৃতিত্বের দাবিদার নিঃসন্দেহে এই গৈরিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকার।

সংস্কৃত নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত ধ্রুপদী ভাষা। এই ভাষার ঐশ্বর্যরাজি নিয়ে কোনো সংশয় থাকার কথা নয়। ঐচ্ছিক ভাষা হিসাবে সংস্কৃত বর্তমানে প্রচলিত আছে, এবং এ নিয়ে কোনো আপত্তি থাকতেই পারে না। আগ্রহ থাকলে স্ব-ইচ্ছায় যে-কেউই সংস্কৃত নামক এই অত্যন্ত সমৃদ্ধ ধ্রুপদী ভাষাটি শিখতে ও চর্চা করতে পারেন, পারেন অসামান্য সংস্কৃত সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করতে। কিন্তু গৈরিক শক্তির ইচ্ছাটি ভিন্ন। গৈরিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে সংস্কৃতকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার। সংস্কৃত ভাষার প্রতি কোনো আগ্রহ থেকে বা সংস্কৃতকে প্রকৃত মর্যাদা দান করার কোনো অভিপ্রায় থেকে গৈরিক শক্তি সংস্কৃতকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করার প্রয়াস গ্রহণ করেনি। এই প্রয়াসের পিছনে গৈরিক শক্তির একটি চতুর উদ্দেশ্য আছে। হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার বাহন হিসাবেই গৈরিক ব্রিগেড সংস্কৃত ভাষাকে ব্যবহার করতে চায়, এবং সেই উদ্দেশ্যেই তারা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সংস্কৃতে কথোপকথন বা স্পোকেন সংস্কৃতকেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতভাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কাজে নেমে পড়েছে। সংস্কৃত ভাষাকে এইরকম একটি হীন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা চালানোর মাধ্যমে গৈরিক শক্তি প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত ভাষার প্রতি ক্ষমাহীন অপরাধই করেছে।

বর্তামনে গৈরিক শক্তি সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে ইতিহাস চর্চা ও ঐতিহাসিক সমাজের ওপর। বাতিল হয়ে যাচ্ছে অপছন্দের ইতিহাস। আর অপছন্দের ইতিহাস বাতিলের সঙ্গে সঙ্গেই ধামাধরা, পেটোয়া লোকেদের দিয়ে রচনা করা হচ্ছে গৈরিক শক্তির ইচ্ছাপূরক ইতিহাস। গৈরিক শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী : ইতিহাস রচনা তথ্যনির্ভর হওয়া প্রয়োজনীয় নয়, ইতিহাস রচনা হবে অর্ডারমাফিক, ইচ্ছাপূরক। প্রাচীন ভারতের কল্পিত গৌরব গাথায় ও গালগল্পে পরিপূর্ণ গৈরিক শক্তির পছন্দ অনুযায়ী রচিত এই মিথ্যা ইতিহাস। আর অপরদিকে অপছন্দের ঐতিহাসিকরা গৈরিক শক্তির চোখে এখন সবচেয়ে বড় শত্রু। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তরফ হতে দাবি উঠছে, এখনই এইসব ঐতিহাসিকদের গ্রেপ্তার করতে হবে, কারণ তাঁরা 'দেশদ্রোহী'। এই ঐতিহাসিকদের অপরাধ, তাঁরা গৈরিক শক্তির পছন্দসই রচনা করেন না, তাঁরা যে ইতিহাস লেখেন তা বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর। আর যে ঐতিহাসিকদের 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করারদাবি জানাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীর, সেই ঐতিহাসিকেরা ভারতের সর্বাগ্রগণ্য ঐতিহাসিক, যাঁদের ইতিহাসবোধ, মনীষা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাত বিশ্বজোড়া। নির্লজ্জ স্পর্ধার পরিচয় রেখে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী সাম্প্রতিক কালে স্বয়ং বক্তব্য রেখেছেন, এই ঐতিহাসিকেরা (অর্থাৎ তাঁর ও তাঁর অনুগামীদের অপছন্দের ঐতিহাসিকেরা) সকলেই 'বৌদ্ধিক সন্ত্রাসবাদী' (intellectual terrorists), এবং 'তাঁরা সীমান্তের ওপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদের চেয়েও বেশি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।' অপছন্দের কোনো কিছুই বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয় গৈরিক ফ্যাসিবাদ। আর তাই যাঁরা

বুদ্ধিচর্চা করেন, যাঁরা রচনা করেন তথ্যভিত্তিক ইতিহাস, যাঁরা এই গৈরিক ফ্যাসিবাদীদের চোখে সবচেয়ে বড় শত্রু, শত্রু যুক্তিনিষ্ঠা, বস্তুনিষ্ঠা ও তথ্যনির্ভরতা।

সুতরাং প্রভুত্বের সঙ্গেই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমশক্তিশালী গৈরিক ব্রিগেড চালিয়ে যাচ্ছে পুর সমাজকে গৈরিকীকরণের কাজ। গৈরিক শক্তি গ্রাস করতে চলেছে মানুষের চেতনাকে, ঢুকে যেতে চলেছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সহ সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ইতিহাসকে বিকৃত করে গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এবং সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গেরুয়াকরণের প্রচেষ্টা এই গৈরিক কর্মসূচিরই এক প্রধান অঙ্গ। পুর সমাজকে গৈরিকীকরণ করা সম্ভব হলে তখনই সমাজদেহে সম্পূর্ণ মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আর তখন গৈরিক পুর সমাজ থেকেই উঠে আসবে হিন্দু রাষ্ট্রের বৈধতা, গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত পুর সমাজ থেকেই উঠবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি। এইভাবেই প্রশস্ত হবে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ, প্রতিষ্ঠিত হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ।

যে মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রমশক্তিশালী গৈরিক ব্রিগেড আমাদের দেশের পুর সমাজকে গৈরিকীকরণের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, সেই মতাদর্শগত আধিপত্য চরিত্রিক ভাবে একরঙা বা একমাত্রিক নয়, তাতে আছে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ, আছে বহুমাত্রিকতা। বিশ্বায়নের যুগে হিন্দুত্ববাদ অনেক সময়ই বিশ্বায়নের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে, হাত ধরাধরি করে চলে ভোগবাদও পণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে। তাই আজকের হিন্দুত্ববাদ শুধুমাত্র খাকি হাফপ্যান্ট পরেই দেখা দেয় না, তার পরনে টি শার্ট-জিন্‌স্-স্কার্টও থাকে। হিন্দুত্ববাদের ব্যাপকতা তাই আজকে অনেক বেশি। আজকের হিন্দুত্ববাদ বিশ্বায়ন, ভোগবাদ, পণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশেই মতাদর্শগত অধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজে নেমেছে, তাই তার গ্রহণযোগ্যতাও ক্রমশই বেড়ে চলেছে। মূলধারার বলিউডি সিনেমা এবং টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে প্রতিদিন পরিবেশিত বিভিন্ন জনপ্রিয় সিরিয়াল এই হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শগত আধিপত্য প্রচারের খুব জোরালো ধারক ও বাহক, এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার খুব বড় সহায়ক। মূল ধারার বলিউডি সিনেমার মারকাটারি দেশপ্রেম এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের মোড়কে পরিবেশিত হয়ে চলে হিন্দুত্ববাদ, কখনও বেশ সূক্ষ্মভাবে, মাঝে মাঝে কিছুটা স্থূলভাবে। আর টিভি-র বিভিন্ন চ্যানেলের হরেক রকমের জনপ্রিয় সিরিয়ালে নিয়মিতই পরিবেশিত হয় ভোগবাদী পণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আকর্ষণীয় প্যাকেজ। কিন্তু জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বলে আসলে যা পরিবেশিত হয়, তা হল হিন্দুত্ববাদী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠান। আজকের হিন্দুত্ববাদ তাই কোক-পেপসি-ডিস্কোথেকে কালচারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়েই চলে। আর এইভাবেই সে তার গ্রহণযোগ্যতা আরও বাড়িয়ে নেয়। পরিণতি হিসাবে আরও জোরদার হয়ে ওঠে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শগত আধিপত্য, যার পরনে অনেক সময়েই থাকে বিশ্বায়নের পোশাক।

আর এই প্রসঙ্গেই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি। সাম্প্রদায়িকতা অনেক সময়ই সুপ্ত থাকে মানুষের মনের গভীরে, তার চেতনার অভ্যন্তরে। খোঁচা খেলেই বাইরের আধুনিকতা, প্রগতিশীলতা এবং আপাত-অসাম্প্রদায়িকতার আবরণের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে এই সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতা। এইভাবেই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সুপ্ত হিন্দুত্ববাদের। চটকদারি কথাবার্তা, চোখা চোখা প্রশ্ন– এইসব মোড়কের মধ্যে থাকলেও সুপ্ত হিন্দুত্ববাদের আঁচটি ঠিকই টের পাওয়া যায়। আর তার নিজের মতো করেই নির্যাসীকরণ করে চলে এই সুপ্ত হিন্দুত্ববাদ, যেখানে সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সার্বিকভাবেই প্রকাকার হয়ে যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদ, মৌলবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে।

এখনও সময় আছে, যদিও তা বেশ অল্পই। গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে চেতনার স্তরেই, লড়তে হবে পুর সমাজের প্রতিটি অংশে। রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে হিন্দুত্ববাদকে হটানোর প্রয়াস চলুক, কিন্তু সমাজদেহে পাল্টা আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাকে প্রতিহত করার সংগ্রামটাও জরুরী ভিত্তিতেই চালাতে হবে। হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে সমাজদেহে দৃঢ়ভাবে বৈপ্লবিক 'অবস্থায়ী যুদ্ধ' বা 'অবস্থায়ী সংগ্রাম' (War of Position) চালিয়ে যেতে হবে। আন্তোনিও গ্রামশ্চির মতানুযায়ী এই 'War of Position'-এর অর্থ হল দীর্ঘদিন ব্যাপী 'reciprocal siege', যার জন্য প্রয়োজন হল 'unprecedented concentration of hegemony'। মননের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এই প্রয়াসকে রুখতে হবে মননের স্তরেই, চেতনার স্তরেই। চেতনা দিয়ে রুখতে হবে চেতনাকে দখলদারির এই গৈরিক অপপ্রয়াস। যাঁরা সত্যসত্যই গৈরিক ফ্যাসিবাদের আগমনকে রুখতে চান, তাঁদের এখন ঐক্যবদ্ধভাবে এই কাজটিই করতে হবে। সমস্ত আত্মসন্তুষ্টি ও সংকীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সকল বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমেই একমাত্র এই গৈরিক ফ্যাসিবাদ কায়েম করার চেষ্টাকে প্রতিহত করা সম্ভব। সেটাই এখন প্রধান কাজ। এই কাজে কোনোরকম গাফিলতি করা চলবে না। এই কাজে অবহেলার অর্থই হল গৈরিক ফ্যাসিবাদকে জমি ছেড়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। গৈরিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে গড়ে তোলা দরকার প্রতিরোধের ব্যারিকেড। সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিশীল, বামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মানুষকেই হাতে হাত মিলিয়ে, পায়ে পা মিলিয়ে, অংশগ্রহণ করতে হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াসের প্রতিস্পর্ধী ও প্রতিরোধী এই ব্যারিকেড সংগ্রামে।

সমস্ত চরিত্রের সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলেও এই মুহূর্তে প্রধান লড়াইটা চালাতে হবে গৈরিক ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধেই। হিন্দুত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্যের আবরণে গেরুয়া

ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়, এবং তাই এই সময় দাঁড়িয়ে প্রধান লড়াইটা তার বিরুদ্ধেই। যদিও সাধারণভাবে লড়াইটা হল সব রকমের ও সব চরিত্রের সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেই। 'লা পাসিওনারা' নামে পৃথিবী বিখ্যাত স্প্যানিশ কমিউনিস্ট বিপ্লবী ডলোরেস ইবারুরি (Dolores Ibarruri)-র সোচ্চার ঘোষণার প্রতিধ্বনি করেই গৈরিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আমাদের জোর গলায় বলতে হবে ঃ 'No Pasaran' ('They Sall Not Pass')।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. Teesta Setalvad, 'Diary of a Secularist'. The Telegraph. Calcutta. Sunday. 17 March 2002 p.1.

২. Ibid.

৩. Antonio Gramsci, 'State and Civil Society', in Selections from the 'Prison Notebooks' of Antonio Gramsci, Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. International Publishers, New York. 1971, pp. 238-39

'হে রাম' ও হিন্দু মন : অন্য মন তৈরি হোক

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

গুজরাতের এখনকার ঘটনা নিয়ে আমরা একটা ছবি 'হে রাম' দেখেছি। পরিচালক গোপাল মেনন দেখিয়েছেন, মুসলমান মানুষজনের পুড়িয়ে মারা দেহ, আগুন লাগানো ভেঙে ফেলা লুঠ করা ঘরবাড়ি দোকানপাট, আঘাত করা শরীর। শুনিয়েছেন মুসলমান বৃদ্ধা-বৃদ্ধ যুবক-যুবতীদের কথা। তাঁদের আত্মীয়াজন চেনা-পরিচিতদের পুড়িয়ে দেওয়া, মেয়েদের ধর্ষণ করা, শিশুদের মেরে ফেলার কথা। মা বলছেন সন্তান হত্যার কথা, স্ত্রী বলছেন স্বামী খুনের, পুত্র পিতা-মৃত্যুর। কাঁদছেন। চুপ করে আছেন। প্রশ্ন করছেন, কেন এইসব। ছবিতে উত্তর দেওয়া হয়নি। উত্তর তো জানা। আপনারা মুসলমান। আপনাদের একটাই পরিচয়। আপনাদের বৃদ্ধা-বৃদ্ধ, যুবতী-যুবক, কিশোরী-কিশোর, শিশু সবাইকে একটা চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলমান। আর এই চিহ্ন দিলে আর এক দলের যারা নিজেদের পরিচয় দেয় হিন্দু তাদের আপনাদেরকে মারার অধিকার তৈরি হয়ে যায়। ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, প্রশাসনিক অধিকার।

আমাকে একটা পরিচয় দেওয়া হয়, এই পরিচয়ে আমাকে চেনানো হয়, আমি চিনতে অভ্যস্ত হই, মেনে নিই। আমি হিন্দু আমি। আমার এই পরিচয়টাই এমনি কোনো মানে হয় না যদি না এটাকে অন্য একটার বিপরীতে না ভাবা-যায়। এর একটা বিপরীত না থাকলে, একটা অপর না থাকলে, নিজের পরিচয়টা অনুভব করা যায় না। তাই হিন্দুর

একটা অপর চাই। হিন্দুরা সেটা বানিয়ে নিল ঃ মুসলমান। মুসলমান থাকলেই হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখার কথা ওঠে। শুধু মুসলমান থাকলেই হবে না, মুসলমানকে বিপরীতে রাখতে হবে। হিন্দুর বিপরীতে মুসলমান। বিপরীতে রাখলেই হবে না, বিপরীতের সঙ্গে একটা সংঘাত তৈরি করতে হবে। সংঘাত না বানাতে পারলে নিজের বানানো পরিচয় রক্ষার কথা তৈরি হয় না। রক্ষার ধার্মিক, সামাজিক, রাজনীতিক কৈফিয়ত তেরি করতে হয়, হিন্দু মন। এই হিন্দু মন বানিয়ে চলা হচ্ছে অনেক অনেক দিন ধরে, সরবে নীরবে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, পরিকল্পনা মাফিক।

মুসলমানরা আমাদের এখানে বেজায় প্রশ্রয় পায়। গড়িয়াহাটা থেকে হকার তুলে দেওয়া হল, কিন্তু ধর্মতলায় তোলা হল না। এইভাবে হারিয়ে যায় হকার তোলা না তোলার তর্ক। মুসলমানরা বাইরে থেকে টাকা পায়, মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে, মসজিদ ঝকঝকে হচ্চে, খবর নিতে হবে কতটা পাকিস্তান গুপ্তচর সংস্থার টাকা। খোঁজ নেওয়ার দরকার নেই মুসলমান সমাজের ধর্মদান রীতির, যে ধর্মদানে টাকা আসে মমজিদে মাদ্রাসায়। রাজাবাজারের কাছে পকেটমারি হলে তাতে অন্য মাত্রা যোগ হয়ে যায়, গড়িয়াহাটে হলে নয়। সন্ত্রাসবাদীদের নাম যা জানানো হয় তা মুসলমান, সুতরাং সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমান সুতরাং মুসলমানরাই সন্ত্রাসবাদী। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ করতে চাইল মসজিদ মাদ্রাসায়।

নাসিম ছবিতে বৃদ্ধ পিতাকে মধ্যবয়স্ক পুত্র প্রশ্ন করেছিলেন, আমরা পাকিস্তানে চলে যাইনি কেন? পিতা উত্তর দিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ির সামনে একটা খুব সুন্দর গাছ ছিল তোমার মার আর আমার খুব প্রিয়, তাই। কবি সাজ্জাদ জাহির এক সাক্ষাৎকারে একই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, এত ভালো অড়হড় ডাল পাব না বলে। 'হে রাম' ছবিতে আক্রান্ত মানুষরা বলেছেন– আমাদের বলছে পাকিস্তান চলে যেতে, নয়তো মারবে, আমরা কেন যাব, আমরা তো এই দেশেরই। তবুও আপাতত, এই শহর কলকাতায়, মুসলমান বাসিন্দাদের হিন্দু অঞ্চল থেকে আস্তে আস্তে হটিয়ে মুসলমান অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া গেছে। আমার সাংবাদিক বন্ধু মুসলমান নাম ছিল বলে বাড়িভাড়া পাচ্ছিল না অমুসলমান পাড়ায়। আমার পরিচিত জনেরা আমার বলে দেওয়া পরিচারিকা রাখেনি তিনি মুসলমান বলে।

আমাদের দেশ ভারতের শত্রু পাকিস্তান। পাকিস্তান মুসলমানদের দেশ। অতএব আমাদের শত্রু মুসলমান। পাকিস্তান-ভারত মৈত্রী সমিতির সভায় লাহোরে পেশোয়ারে আমার বান্ধবী-বন্ধুরা যারা দিয়েছিল তাদের কাছে শুনেছি চায়ের দোকানদার চা খাইয়ে, অটোওয়ালা অটো চড়িয়ে পয়সা নেননি, ওরা ভারত থেকে গেছে বলে। রেস্টুরেন্টে খেয়ে দাম দিতে গেলে পাশের টেবিলে বসে থাকা একজন মানুষ বেয়ারাকে ডেকে দাম মিটিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ অতিথিদের কাছ থেকে দাম নিতে হয় না। সভায় মৌলভিরা এসে

বলেছিলেন, আপনাদের নিশ্চয়ই ধারণা পাকিস্তানের সবাই ভারত-বিদ্বেষী, আমরা কিন্তু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিবসেনা দিয়ে ভারতের সব মানুষকে বুঝি না। দরিদ্র বাংলাদেশ থেকে কাজের সন্ধানে চলে আসা মুসলমান মানুষজন অনুপ্রবেশকারী, হিন্দু ভারত থেকে কাজের সন্ধানে মুসলমান মধ্যপ্রাচ্যে চলে যওয়া অনুপ্রবেশ নয়। এই ভাবে যুক্তি সাজানো হয়, তথ্য বানানো হয়, ধারণা তৈরি হয়, মত নির্মিত হয়, মন তৈরি হয়। হিন্দু-যুক্তি, মুসলমান-বিরোধী তথ্য, হিন্দু-ধারণা, মুসলমান-বিদ্বেষী মত, হিন্দু-মন। এই যুক্তি, তথ্য, ধারণা, মত আর মন নিয়ে মুসলমানদের অক্রমণ করার অধিকার তৈরি হয়ে যায়।

এর বিপরীতে আমরা, যাদের এখনও এই রকম মন তৈরি হয়নি, তারা কি এই রকম বলব : বিলায়েত খান মুসলমান সেতারি, শাহির লুধিয়ানভি মুসলমান গীতিকার, শাহরুখ খান মুসলমান অভিনেতা, ফিদা হুসেন মুসলমান চিত্রকর, তেমনি মহম্মদ রফি মুসলমান গায়ক, শামসুর রাহমান মুসলমান কবি, শাবানা আজমি মুসলমান অভিনেত্রী, ফিরোজা বেগম মুসলমান গায়িকা, জাহির খান মুসলমান ফাস্ট বোলার, আবুল বাশার মুসলমান গল্পকার...।

আমরা কি বলব, হকারদের পরিচয় যাঁরা বেঁচে থাকার জন্য হকারি করেন, মুসলমান হকার হিন্দু হকার নয়? ডাকাতদের পরিচয় যারা ডাকাতি করে, সন্ত্রাসবাদীদের পরিচয় যারা তাদের উদ্দেশ্যের জন্য সন্ত্রাসবাদের পথ নিয়েছে, হিন্দু সন্ত্রাসবাদী মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়।

আমরা, যাদের এখনও হিন্দু-মন তৈরি হয়নি, তারা এভাবে বলতে থাকি যখন যে-ভাবে যতটুকু পারি। গুজরাতে মুসলমান মারা একদিন থেমে যাবে হয়তো। মিছিল মিটিং ত্রাণে চাঁদা তোলা লেখালেখি একদিন থেমে যাবে হয়তো। হিন্দু হয়ে যাওয়া, মুসলমান-বিদ্বেষী হয়ে থাকা মনের সঙ্গে, মনেদের সঙ্গে আমাদের কথা বলা চলতে থাক, না থেমে না থামিয়ে, প্রতি দিন। এই মনের বদলে অন্য মন হৈরি হোক, হতে থাক, যে মনের কাছে মানুষের পরিচয় মানুষ, মুসলমান মানুষ হিন্দু মানুষ নয়।

গোপাল মেননকে যেন আর এক বার 'হে রাম' বানাতে না হয়।'

গুজরাত ও আমাদের কাণ্ডজ্ঞান

শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

হয় 'আমরা' এবং 'ওরা', নয় 'ওরা' এবং 'আমরা'। যেদিক দিয়ে যাই, যতই না রাগী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমন্ত কথা সাজাই, দেখি, ওই দুই সর্বনাম ঠোঁটের ডগায় ঠিক লেগে। আজকের ভাষা-দুনিয়ায় এই বুঝি রেওয়াজ– উক্তি-প্রত্যুক্তি, উত্তর-প্রত্যুত্তরের যোকাবুঝিতে বাক্যের চুড়ো জুড়ে কর্তৃত্ব করবেই সর্বাত্মক ওই দুই প্রতিনাম। এক দফায়

যদি বাক্যের কর্তা হয় 'আমরা', তবে, ফিরতি-দফায় বাক্যকে সচল-সক্রিয় রাখতে চালক-আসনে বসে 'ওরা'। এমনই গায়ে-গায়ে, অঙ্গাঙ্গী শব্দদুটি যে মনে হয়, 'আমরা'-ই ডেকে আনি, উসকে তুলি 'ওদের', 'ওরা'ই আবার বাঁচিয়ে রাখে, স্থায়িত্ব দেয় 'আমাদের'। দুই পদের মধ্যে রয়েছে যেন গোপন সমঝোতা– একের বিহনে অন্যটি অর্থহীন, তাই স্রেফ অর্থ নিষ্ক্রাশনের খাতিরেই অনিবার একে-অপরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। হোক বাঁধাই-নিপুণ বয়ান, সরকারি বা বেসরকারি, কিংবা ঘরে-পথের আলগা-খোলা গপ্‌পো-আড্ডা, আমরা'-'ওরা'র যুগ্ম-অবতারণা প্রায় অবধারিত এখন। বলতেই পারে কেউ, এ আর কী, কী এমন– কার কতটা আওতা, ভিন্ন কোন্ চিহ্নসীমানার ভেতর অবস্থিত দুই আলাদা পক্ষ, তা জানতেই বহুবাচনিক সর্বনাম দুটি মাঠে নামে– যেমন আকছার তেমনি নির্দোষ তাদের ব্যবহার।

কিন্তু, ব্যাপার যে মোটে সিধেশাদা নয়, কেবল কাগুজে ব্যাকরণের নয়, তার প্রমাণ, জ্বলন্ত প্রমাণই, প্রভাতী-সান্ধ্য দৈনিক কাগজগুলো থেকে প্রত্যহ আসে। বিশ্বমানচিত্রের যে অঞ্চলে আঙুল ছোঁয়াই–বসনিয়া বা প্যালেস্টাইনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফগনিস্তান বা বাংলাদেশ, রাওয়াভা কিংবা দেশান্তর্গত গুজরাট– সেখানেই পাই রণ-রক্ত-সফলতার লোমহর্ষক সমাচার। অথচ আমরা এ-ও তো শুনি, রক্তপাতের ধারাবিবরণীর পাশাপাশিই শুনি, ঢের দিন হল গেছে মধ্যযুগ– বর্বরতার সে জমানা আর নেই, তানাশাহীর স্বেচ্ছাচার আর বরদাস্ত করে না মানুষ, স্থানবিশেষে আধাখেঁচড়া হলেও মেটের ওপর কায়েম এখন সংসদীয় গণতন্ত্র, 'উত্তর-আধুনিকতা'র সেরা যে অবদান সে-ই 'difference' আজ সদরে-অন্দরে সহজেই স্বীকৃত, 'আমরা'-'ওরা'-'এরা'-'তারা' ইত্যাদি হরেক বিষয়ীসত্তা তাদের বিভিন্নতায় নিজ জোরেই গ্রাহ্য-মানিত আজ, আর সে-বাবদ মজবুত হয়েছে, ক্রমাগত হয়েই চলেছে, সহাবস্থান-সহনশীলতা তথা নির্বাচনী স্বধিকারের যুক্তিভিত। সত্যি, বড়ই ধোঁয়াটে এ পরিস্থিতি! কখনো বোধহয়, 'বৈসাদৃশ্য' বা 'diffeence'-এর জয়গাথার চেয়ে মুক্তিদায়ী, বয়ান আর কী আছে, 'পর'কে তার পরত্বে আপন করাই তো মাহনুভবতার লক্ষণ, কোথাও যদি তার খামতি নজরে আসে, তাহলে তা নিশ্চয়ই পূর্বসংস্কারের জের, বিলীয়মান মধ্যআমলের, অসহিষ্ণু অতীতের খণ্ডাবশেষ মাত্র; আর সময়-সময়, কাগজ-টিভি-ইন্টারনেটে, বিভিন্ন জনগণ মাধ্যমে, ছবিতে খবর বা খবরে ছবি পড়ে ভাবি, এই তবে, এইসবই তবে আমাদের দিনরাত্রি, ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করি তখন নিজেকে ঃ 'এ আগুন, এত রক্ত, মধ্যযুগ দেখেছে কখনো?'

ওই প্রশ্ন যত দীর্ঘ করে, যত জানি গুজরাটের কাহিনী, রোজই যত প্রত্যক্ষ করি তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র এক দেশে গণহত্যায় রাষ্ট্রের নিরতিশয় উৎসাহ, উত্তরোত্তর তত সংশয় বাড়েঃ সর্ষের মধ্যই ভূত নেই তো? 'Difference'-এর চলতি ধারণার মধ্যেই নিহিত নেই তো জাতি-রাষ্ট্রিক স্বার্থ-দম্ভ? এই যে পরিচিতির জন্যে 'আমরা'-'ওরা' বাদে আর কোনো পদ বাকি নেই ইদানীং-এর ভুবনে, ব্যবধানের বরাতই কেবল বানানো যায়

পারস্পরিক সম্পর্ক গ্রন্থি, এও যে বাজারলভ্য বর্তমানে আগে-হতে-তৈরি 'identity'-র রসদ-খোরাক, তা কি এই 'difference'-এরই দান-মাশুল নয়? একবার যদি অনন্তর অন্তরের কাঠামোয়, যুগ্ম-বিপরীতের দ্বন্দ্বসমাসে সাজিয়ে নেওয়া যায় দু-পক্ষ, তবে তো চিন্তারই কারণ থাকে না ঃ এতে নিরেট, স্থানু ও স্বসম্পূর্ণ হয় উভয়ের পরিচয়, চিরনির্ধারিত ও ধ্রুব তাদের ভেতরকার ফারাক। এরপর, একটি পক্ষকে যদি জাতি-রাষ্ট্রিয় নাগরিকতায় ভূষিত করি, আধুনিক নাগরিকতার সনদ-অধিকার, চুক্তিবলে গড়ি তার ভাবমূর্তি, তাহলে, অন্যপক্ষের জন্যে 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা-ও স্বয়ংসিদ্ধতা পেয়ে যায়। আর তখন, প্রায় 'স্বাভাবিক' যুক্তিতেই আরাধ্য হয় 'অবাঞ্ছিত' অনুপ্রবেশকারীদের নিশ্চিহ্ন করার প্রবণতা– খোলামেলা যদি না-ও হয়, চেপে চুপে... এ-ব্যবস্থায় অমিলই প্রধান। মিলবিহীনতাই যার ভিতর পাথর, 'আমরা'-'ওরা'র সেই বিভেদমঞ্চে, কোনোরূপ মিলন ঘটানোই দুষ্কর। প্রেম নয়, মৈত্রী নয়, নিপাট ঘৃণার বাড়প্রসারকে তীব্র ত্বরান্বিত করে বিরুদ্ধ-যুগলের, বিমূর্ত বিমূর্তায়নের রাজনীতি। কেবল দ্বিজাতিতত্ত্বের লীলাভূমি ভারতীয় উপমহাদেশে নয়, সর্বত্রই তাই।

যারা স্রেফ 'না-আমরা', তাদের সঙ্গে বস্তুঘন সম্পৃক্তি অনুভব করি না বলেই তো অমন নির্বিচারে শরীরী হামলা চালাতে পারি আমরা– নিছক রাগের চোটে, হঠকারিতার বশে নয়, তিলে তিলে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করি অন্য মানবদেহ। জ্যামিতিক সে-নির্মমতার অন্যতম দৃষ্টান্ত যদি হয় হিটলারের pogrom এবং ইহুদি-শরীর কাটাছাঁটা করার জন্য নাকি কন্সেন্ট্রেশন্ ক্যাম্প-নামক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, তবে তার সাম্প্রতিকতম নমুনা, সনাতন ব্রাহ্মণ্যবাদের নবীন সংস্করণ হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীদের জয়টংকার-সহ 'উদার-গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রের উন্মুক্ত পৃষ্ঠপোষণায় ঘটে-চলা গুজরাতের সংগঠিত গণহত্যা এবং দুর্গতদের দ্রুত সদগতির জন্য প্রস্তুত যত ত্রাণশিবির।

আদিমতম বেদনা, শরীরী সহ-বেদনাই যেখানে অনুপস্থিত, সেখানে কোনো ধরনের কাণ্ডজ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান প্রত্যাশা করা ভুল, অন্যায়ই একরকম। আত্মতেজে বলীয়ানদের হুঁশের অভাব নিয়ে একবার যারপরনাই মস্করা করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ, হেনস্তার একশেষ করে ছেড়েছিলেন একদঙ্গল জত-দাম্ভিক ব্রাহ্মনকে। বুদ্ধের 'নাস্তিক' প্রচারে বিচলিত শ্রাবস্তীর পাঁচশো ব্রাহ্মণ সভা করে ঠিক করেন, রুখতেই হবে এ-আপদ। জাতপাতের ন্যায্যতা মানে না, ঋগ্বেদ-এর দশম মণ্ডল-ভুক্ত নব্বুই-তম সূক্ত অনুসারে সহস্রমস্তক পুরুষের মুখ-নিঃসৃত, ব্রহ্মের প্রকৃত সত্যজাতক যারা, সে-ই ব্রাহ্মণদের উপহাস করে– শিক্ষা দিতেই হবে একে। কিন্তু কে যায় বাগ্মী মুনির সঙ্গে যুঝতে? শ্রুতির শাস্ত্র হাসিল আছে, তর্কবিদ্যায় দখল আছে, এমন বিদ্বান তো সমাজের চাঁইকুলে বিশেষ নেই। অনেক আলোচনার পর স্থির হয় ঃ যদিও বালক কিশোর, তবু ষোলো বছর বয়স্ক অশ্বলায়ন যথেষ্ট জ্ঞানী; সে-ই যাক অতএব, হোক চূড়ামণিদের মুখপাত্র, নামুক তথাগতের সঙ্গে বাক-

দ্বৈরথে। অশ্বলায়ন অবশ্য বারংবার বলে, 'ধর্ম্মবাদী' যারা, অর্থৎ যারা বিশ্বাস করে বিশ্বপ্রপঞ্চ কেবল কতকগুলি নৈসর্গিক নিয়ম-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাদের মত খণ্ডন করা অসাধ্য। তরুণ হলেও, সে যেন গোড়া থেকেই জানে, ভৌতবিজ্ঞানের পাশে অধিবিদ্যা, প্রকৃতি বিষয়ক তত্ত্বের পাশে যাবতীয় 'পুরুষসূক্ত' দাঁড়াতে অপারগ। তবু, প্রবীণদের প্রতাপে অগ্রসর হতেই হয় অশ্বলায়নকে। প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে, শান্ত বিনীত ভঙ্গিতে সে পেশ করে তথাগত সমীপে ব্রাহ্মণবর্গের প্রাধান্যের দাবি।

অশ্বলায়নের এক ও অন্য যুক্তি ঃ ব্রাহ্মণরা ফরসা, বাকিরা কালো, বিপ্রতীপ এই দুই নজির থেকে কি সাফ চাক্ষুষ হয় না, জ্যেষ্ঠবর্ণই শুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ এবং অন্যেরা নিতান্তই অধম? বলা বাহুল্য, এই আদিপ্রত্যয়ে নিহিত যে মূল উপপাদ্য তা হল ছুতাছুৎ সম্পর্কে অন্তবিহীন সতর্কতা, হাজারো আটশাসন একান্ত আবশ্যক, সমাজসংহতির জন্যই প্রয়োজনীয়– বেশি মেলামেশা বা অবিবেচনার জোড়মিতালির ফলে বর্ণসাংকর্যের মতো প্রলয়-তুল্য সর্বনাশও ঘটতে পারে। বিপ্রদের স্বঘোষিত বিশেষত্ব নেহাৎ কষ্টকল্পনা, অর্থাৎ কিনা ব্রাহ্মণ্য স্বার্থবুদ্ধির মূঢ় বিজ্ঞাপন, দুষ্টচক্রের কুযুক্তি মাত্র– এটি খোলসা করতে আদৌ বেগ পান না বুদ্ধ। অশ্বলায়নের উক্তির উত্তরে গৌতম যা বলেন তা সংক্ষেপ এই ঃ শাল-সেগুন-চন্দনের মতো মহার্ঘ কাঠ আর পদ্ম-টদ্ম জড়ো করে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা যদি হোমকুণ্ড বানায়, আর শূদ্রেরা যদি জ্বালানি হিসেবে পায় শুধু খড়কুটো, গছের বাকল, তাতে কি লক্ষ্যগোচর কোনো পার্থক্য উৎপন্ন হবে– আগুনে আলোয় সমাজ জ্যোতির্ময় হবে না কি উঁচ-নিচ দু-তরফেরই উদ্যম? এ-মন্তব্যের সারতাৎপর্য ঃ কার্য-পরিণাম যেখানে এক সেখানে কি বিষয়ীকর্তায় পার্থক্য রচনা হাস্যকর নয়; অতএব, মনগড়া নয় বর্ণগত তারতম্য নিয়ে যত যা সাংসারিক ভাবনা? অপরদের 'ঘেন্না', 'ইতর' জ্ঞান করাটা যদি দ্বিজোত্তমদের অস্থিমজ্জায় মিশে না যেত, প্রয়োগে প্রয়োগে সহজাত, প্রায় প্রবৃত্তিবৎ স্বাভাবিক না হয়ে দাঁড়াত, তাহলে কি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতেন দেবশর্মারা, প্রত্যক্ষ-বিচারে পাওয়া বিষয়সাম্যের বস্তুসাক্ষ্য?

সে-যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন তেমনি এ-যুগেরও; সেকালের ঔপনিবেশিক প্রভুত্ব যেমন তেমনি এ-কালের নয়া-ঔপনিবেশিক দৌরাত্ম্যও। এর ওপর, 'আমরা—'ওরা'য় স্পষ্ট বিভাজিত পৃথিবী বর্তমানে কতকগুলি আত্মতার শিবিরের সমষ্টি– ভাগাভাগির এই পরিচ্ছন্নতার চেয়ে ভয়ংকর আর কী আছে? 'Difference'-এর তত্ত্ব এখন এমন দৃঢ়কায়েম যে প্রত্যেকের 'identity'-ই প্রাকনিষ্পন্ন– যেন তা মানবিক নয়, বদল-সাপেক্ষ নয়, বরং প্রাকৃতিক, ঈশ্বরদত্ত। সার্বভৌম কোনো সমতার প্রস্তাব শুনলেই এখন– এমনকী যদি তা রক্তমাংসময় নশ্বর দেহভাণ্ড সংক্রান্ত-ও হয়– মানীগুণী সুশিক্ষিতদের ভ্রূকুঞ্চন হয়।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস : অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত

দেবু দত্ত গুপ্ত

বাজার অর্থনীতির যুক্তিতে যে-কোনো প্রাকৃতিক কিংবা সামাজিক বিপর্যয়কেও আর্থিক লাভালাভের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সেভাবেই দেখছে দেশ বিক্রির দালাল-বানিয়া বিজেপি সরকার। প্রলয়ঙ্কারী ভূমিকম্পের পর অর্থনীতিবিদ্ বিবেক দেবরায় বলেছিলেন– গুজরাতের ভূমিকম্পে ২০ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হলেও ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

ভূমিকম্পে কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন? সেই অপরিমেয় মানব-সম্পদের ক্ষতিপূরণ হবে কি করে? বাজার অর্থনীতির দালালদের কাছে এই প্রশ্নটা নিতান্তই তুচ্ছ বিবেচিত হয়েছিল। কেননা বাজার অর্থনীতির নিয়মে মানুষের সর্বনাশ মানে– 'net contribuion to the economic output'.

ঠিক এরকমই, ভারতে তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম প্রতিষ্ঠান উইপ্রো-প্রধান, গুজরাত-বংশোদ্ভূত আজিম প্রেমজীর উদ্বেগ মানুষের মৃত্যু কিংবা সব হারানো নিয়ে নয়। তাঁর উদ্বেগের কারণ– এরকম হলে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অনেক কম হবে। এম এন সি-গুলি গুজরাতে আসবে না।

আজিম প্রেমজী গুজরাতের একটানা দেড়মাস সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাটের জন্য সহস্রাধিক মৃত্যু, মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বস্ব হারানোর জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন নন।

যদিও প্রেমজীর গালে থাপ্পড় মেরে গুজরাত চেম্বার অব কমার্সের মতব্বর, হনুমান-ভ্রা চমৎকার জবাব দিয়েছে– 'We the Gujratis need no schooling from Premzi when its comes to dhanda (business). The Gujratis smell money the way animals smell wind.'

বাতাসে গন্ধ শুঁকে স্বাদু মাংসের হদিশ পাওয়া হিংস্র হায়েনার মতোই গন্ধ শুঁকে টাকার খোঁজ পাওয়ার সর্বনাশা বাজার দর্শনের বিরুদ্ধেও ১৬ এপ্রিলের দেশজুড়ে প্রতিবাদ ধর্মঘট। শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-তোষণের স্বার্থে দেশের স্বাধীনতাকে পর্যন্ত দাঁড়িপাল্লায় তোলার এই ভয়ঙ্কর অভিযানের বিরুদ্ধেও ১৬ এপ্রিল ভারতবর্ষের প্রতিবাদ।

এই দুঃসময়, এই অন্ধকার

শুভঙ্কর ঘোষ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে এত বড় দুঃসময় এত ব্যাপক দুর্যোগ আগে কখনও আসেনি। আমরা পেরিয়ে এসেছি চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, পাক-ভারত যুদ্ধগুলি,

৭২-এর সন্ত্রাস ও দুর্বিষহ জরুরি অবস্থা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে যেন কোনো কিছুরই তুলনা হতে পারে না। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে, পতন ঘটেছে পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির। দাপট বেড়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের দুঃসাহসিক স্পর্ধাও লক্ষ্য করা গেছে পেন্টাগন ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার মধ্য দিয়ে। এই সূত্রেই আফগান যুদ্ধ তালিবান সরকারের পতন ও লাদেনসন্ধানী আমেরিকার ও তার মিত্রবাহিনী বর্বরোচিত আক্রমণ ও সন্ত্রাসবিরোধিতার নামে নতুন ধরনের সন্ত্রাসবাদ কায়েম করা। অপরদিকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিশ্বায়নের ফাঁদে মোহবিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি, আমাদের দেশ ভারতবর্ষও। আমাদের দেশ এখন সার্বিকভাবেই বিপন্ন।

পাঁচ হাজার বৎসরের সভ্যতা ও সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়ে আমাদের যে দেশ আজো মহিমান্বিত ও গরিমামণ্ডিত, অজস্র সর্বনাশা সংকটের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আধুনিক পৃথিবীর মাঝখানে আপন অস্তিত্ব ঘোষণায় কুণ্ঠহীন, তাকে আজ মুখোমুখি হতে হচ্ছে এমন এক পরিস্থিতির, যা একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা বলা যেতে পারে। প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে ও উত্তর-স্বাধীন সময়কালে আমাদের দেশে বারে বারে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা হয়েছে, কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের উদ্যোগে ও জোটবদ্ধতায় রক্তাক্ত অবস্থা থেকে কল্যাণময় পরিবেশে উত্তীর্ণ হওয়া গেছে। আসলে সমন্বয়বাদের ও পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ঐতিহ্যই শেষ অবধি জয়যুক্ত হয়েছে। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ দশকে অযোধ্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে সমগ্র ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন জ্বলেছে তা নিভে যাওয়া দূরে থাকুক, একুশ শতকের যাত্রাপথে তার লেলিহান শিখায় পুড়ছে ঘরবাড়ি, ভিন্ন ধর্মের নিরীহ মানুষজন, দোকানপাট, ব্যবসাকেন্দ্র ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের লড়াই, ধর্মীয় সন্ত্রাস ও হত্যালীলা, মৌলবাদী আগ্রাসন ভারতীয় সংস্কৃতিতে, ভারতবর্ষের ঐক্যকে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। সভ্যতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে সভ্য মানুষের যুদ্ধ চলছে। তবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অস্ত্রই যে শেষ কথা বলবে না, তা-ও একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে। গণনৈতিকতার প্রতিরোধও জরুরি হয়ে পড়েছে। একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সমাজ প্রগতির মস্ত অন্তরায়। আর এ-ও সত্য সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থান রাতারাতি ঘটেনি। এর একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস আছে, প্রস্তুতি আছে, পরিকল্পনা আছে।

আমরা-নির্দিষ্টভবে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীও মৌলবাদী বা যে কোনো মৌলবাদী শক্তিকে ধিক্কার জানাতে চাই। কিন্তু আমাদের এখানে বিশেষভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তির সভ্যতাবিরোধী ভূমিকা আমরা চাক্ষুষ করছি। ভারত রাষ্ট্রের সেকুলার চরিত্রটিকে তছনছ করে ধ্বংস করতে উদ্যত হিন্দুত্ববাদী শক্তি। ১৯৯২ সালে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ চূর্ণ করার মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদী শক্তি বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে অন্য ধর্মের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা শ্রদ্ধা নেই। বিজেপিকে একটি অল্পবয়সী

সংগঠন ভাবলে ভুল হবে। হিন্দু ভারত, হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের কনসেপ্টও একদিনের নয়। সঙ্ঘ পরিবারের আদর্শগত উদারতা পরিবর্তে উগ্র অন্ধতাই পুঁজি। এরা মানুষের পক্ষে নয়, মানবতার উদারনৈতিক ধারনার পক্ষে নয়।

বিজেপি সদ্যজাত শিশুশক্তি নয়। ১৯৮০-তে এই দলের জন্ম। কাগজে-কলমে এটি সত্য। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এই হিন্দুত্ববাদী ধর্মান্ধদলের উত্থান। ১৯১৩ সালে সারা ভারত হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা। ১৯২৫-এ রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের জন্ম। ১৯৫১-য় জনসঙ্ঘ, ১৯৬৪তে বিশ্বহিন্দু পরিষদ, ১৯৬৬ তে শিবসেনা এবং ১৯৮০-তে বিজেপির জন্ম। অর্থৎ বিজেপির ভাবনায় বিকাশ ঘটেছে এই ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে। মতাদর্শে একটি অভিন্নতা ক্রমসূত্রে আঁটোসাঁটো রূপ নিয়েছে এই সংগঠনে। সংসদীয় গণতন্ত্রের উপযোগী হয়ে উঠতে এবং আলখাল্লার ভিতরে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নখ-দাঁত-থাবা লুকিয়ে রাখার অনুশীলনে তৎপর এই দল সরকারী কর্তৃত্ব লাভ করেই নিজেকে নগ্ন করেছে অবলীলায়। ১৩ দিন থেকে ১৩ মাস, তারও পর নব কলেবরে ফিরে আসা জোটবদ্ধ হয়ে; এই দলের নেতৃত্বে এইদলের শাসনকালে আমরা যে নির্মম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা সংক্ষেপে এভাবে বলা যায়, বিজেপির প্রথম ও সার্বিক আক্রমণ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর। ক্ষমতায় আসীন হবার আগেই এরা গুঁড়িয়ে দিয়েছিল ৪৬৪ বছরের বাবরি মসজিদ। রামবাদের নামে ফ্যাসিবাদেরই সংকেত বহন করে চলেছে। এদের আসলে ধর্মীয় উদারতা নস্যাৎ হয়েছে। এরা রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করেছে। মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল ধর্মান্ধতায় এরা রামচন্দ্রের পাদুকা পুজোর প্রাসঙ্গিকতা প্রচার করছে। খৃস্টান সংখ্যালঘুদের গীর্জা ও স্কুলের ওপর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ, জন স্টাইনস্ ও তাঁর দুই নাবালক পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বাইবেল পোড়ানো হয়েছে। খৃস্টান সন্ন্যাসিনী লাঞ্ছিতা হয়েছে। এই কাজে লিপ্ত উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপির দোসর সঙ্ঘ পরিবারভুক্ত বজরঙ্গদল, বিশ্ব বিন্দু পরিষদ, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। এরা জোর করে দলিত সম্প্রদায়ের খৃস্টানদের হিন্দুধর্মগ্রহণে বাধ্য করেছ।

এই ধর্মান্ধতা থেকে শিক্ষাসংস্কৃতিও রেহাই পাচ্ছে না। বিজেপির সহযোগী শিবসেনাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, যতীন দাস, পাকিস্তানের সঙ্গীত শিল্পী গুলাম আলি, 'ফায়ার' চলচ্চিত্র এবং চিত্রতারকা দিলীপ কুমার। কার্গিল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তাঁকে নিশান-ই-ইমতিয়াজ্ খেতাব পরিত্যাগ করতে দাবি করা হয়েছিল, সুখের কথা এই শিল্পী আত্মসমর্পণ করেননি। ক্রীড়াক্ষেত্রেও তারা পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ত করে তোলে যুদ্ধের জিগির তুলে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা নির্দেশিত পথে এরা ইতিহাস ভূগোলের পাঠক্রম বদলাবার পদক্ষেপ নিচ্ছে। আইসিএইচ ও আইসিএসএসআর-এর মত ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানীদের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে

নামী শিক্ষাবিদদের সরিয়ে দলীয় মনোভাবাপন্ন অযোগ্য ব্যক্তিদের বসিয়েছে। খুব সুকৌশলে আরএসএসের শিক্ষা শাখা বিদ্যাভারতী ১৯৫৯ থেকে এ পর্যন্ত ১৪ হাজারের বেশি স্কুল খুলেছে, এর মধ্যে ৫ হাজার স্কুল কেন্দ্রীয় বা রাজ্যবোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। সব মিলিয়ে ১৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য ৮০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছে। দেশের ৬৪টি কলেজ এদের নিয়ন্ত্রণে। ২৫টি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র এরা পরিচালনা করছে। এরই সঙ্গে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাব, যা বিজেপি রাজস্থান দিল্লী ও মধ্যপ্রদেশে কার্যকর করার চেষ্টা করেছিল। জাতীয় স্তরে এদের এই প্রয়াস ছিল অব্যাহত যে, প্রাথমিক স্তর থেকে বেদ উপনিষদ পড়াও, তৃতীয় শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত পাঠ বাধ্যতামূলক কর। রাধাকৃষ্ণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯)-এর সমন্বয়বাদী সুপারিশ বাতিল করে হিন্দুবাদী দর্শন ও ধর্মচর্চার ব্যবস্থা কর। জ্ঞানের বিকৃতিসাধনই বিজেপির লক্ষ্য। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে স্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সরস্বতী বন্দনা ও খবরে আগে ভোজনমন্ত্র এবং নাম ডাকলে বন্দেমাতরম্ উচ্চারণ। সার্বিকভাবেই সাম্প্রদায়িকতাবাদী সঙ্ঘ পরিবার ও মৌলবাদী হিন্দুত্ববাদী শক্তিসমূহের দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকায় দেশ জুড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার।

সঙ্ঘ পরিবারের ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী মানসিকতার যে দৃষ্টান্ত অযোধ্যাকাণ্ডে, বাবরি মসজিদ চূর্ণ করার মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় গোধ্‌রায়, সবরমতি এক্সপ্রেসে, ক্রমসূত্রে আমেদাবাদে, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও আগুন জ্বলতে শুরু করে। সবরমতি এক্সপ্রেসে যে হিংসাত্মক সংঘটিত হয়েছে তা অবশ্যই নিন্দনীয়; বিশ্বহিন্দু পরিষদ প্রাথমিকভাবেই মুসলিম মৌলবাদীদের অভিযুক্ত করেছে। ভাদোদারায় (বরোদায়) ঐ ট্রেনেই তিন মুসলিম ছুরিকাঘাতে খুন হয়ে গেল। ভি এইচ পি-আহূত গুজরাত বন্ধের মধ্যে দিয়ে মুসলিম মহল্লা, মুসলিম জনসাধারণ, মুসলিম ব্যবসায়ী ও বেশ কিছু নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল। শত শত হত্যার প্রতিরোধে দাঙ্গাদমনে রাজ্যপ্রশাসন সক্রিয় ভূমিকা নিল না উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হল, বা ভস্মীভূত হল। সর্বস্তরের আক্রান্ত মুসলিমদের পক্ষে এসে দাঁড়াল না নরেন্দ্র মোদী অ্যান্ড কোম্পানি। সংবাদপত্রে যথার্থ ক্যাপশন উঠে এল 'নরেন্দ্র মোদীর শরীর থেকে পোড়া লাশের গন্ধ'। দাঙ্গার আগুনে মহারাষ্ট্র সহ গোটা দেশ নানা প্রতিক্রিয়ায় উত্তপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে তাল্‌দিতে উস্কানিমূলক ঘটনাও অজ্ঞাত নয়। আসমুদ্র হিমাচলে সাম্প্রদায়িক শক্তি, মৌলবাদী শক্তিগুলির উত্থান ও বিকাশে স্বভাবতই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ নাগরিক উদ্বেগ বোধ করছেন। গড়ে উঠেছে অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব, পারস্পরিক বিশ্বাসবোধের অভাব। এ ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষের কাছে, সমস্ত রাজনৈতিক দল ও শক্তি এই গ্যারান্টি দানে সোচ্চার হতে পারবে না কেন যে ধর্ম আর রাজনীতির

ক্ষেত্র আলাদা, রাজনীতির স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করার মতো সাবকালচার আর কিছু নেই। রাম, রামমন্দির, রামায়ণ, হিন্দু সম্প্রসারণবাদ, হিন্দুত্ববাদ– মিলেমিশে একাকার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে সারা দেশে এক অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ধর্মাচারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বহুত্ববাদী সংস্কৃতি– এসবই হিন্দু সাম্প্রদায়িকবাদী যা মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী শক্তির আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না।

লক্ষ্যণীয়, কেন্দ্রের জনস্বার্থ বাজেট আর আলোচ্য বিষয় থাকছে না। চাপা পড়ে যাচ্ছে গোধ্‌রা, আমেদাবাদ, গুজরাত, মহারাষ্ট্রের ভয়াবহ ঘটনায়। এই দাঙ্গার ক্ষতচিহ্নও মুছে দেবার চেষ্টা চলছে অযোধ্যায় করসেবকদের রামমন্দির নির্মাণের ইস্যুটি চাঙ্গা করে তুলে। ১৫ মার্চ অতিক্রান্ত। সুপ্রিম কোর্টের রায় সাম্প্রদায়িক শক্তি ও বিজেপি সরকারকে হতাশ করেছে। তার জোটসঙ্গীরা মেনে নিতে পারছে না বিজেপির আদর্শহীন ধর্মনিরপেক্ষতাশূণ্য ভূমিকায় অথচ রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বার্থে জোট থেকে বেরিয়ে আসছে না। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলবেন, রামমন্দির নির্মাণ ইস্যু একটি 'জাতীয় আবেগ'। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী তুলবেন নিইটনের থার্ড ল-র কথা। অথচ এই সাম্প্রদয়িক শক্তির প্রতিভূরা ভুলে যাবেন, হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যের সুবাদে বাবরি মসজিদ ভাঙা যায়। ধর্মান্ধতার আবেগ উস্কে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রতিরোধ করা যায় না। এঁদের বোঝার ক্ষমতা নেই যে, ধর্মীয় আবেগে রাষ্ট্র, সমাজ, জীবনধারা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি বাঁচানো যয় না। আন্তর্জাতিক বিশ্বের আধুনিকতায় রামশিলা রামমন্দির সর্বস্ব রাজনৈতিকতা এবং যে কোনো মৌলবাদ অপ্রাসঙ্গিক। অথচ এদের উপেক্ষা করে প্রগতিভাবনা নির্বিঘ্নে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না।

এখানেই আপামর জনসাধারণের, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী রাজনৈতিক দল, নানা সামাজিক সংগঠন ও সংস্থার কর্তব্য যথাযথ ভূমিকা নেওয়া। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধানকে আদর্শ ভাবব এবং ক্রমান্বয়ে লঙ্ঘন করে চলব– এও এক দ্বিচারিতা। দেশ হাঁটছে অন্ধকারে মধ্য দিয়ে। এর জন্য একটানা ৪৪ বছর যারা দেশ শাসন করেছে সেই কংগ্রেস তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। ৫৫ বছর যে দেশ স্বাধীনতা পেল, তার আজকের এই অবস্থা ও বিজেপির উত্থানের মূলে কংগ্রেস। ধর্মনিরপক্ষতার পক্ষে সওয়াল করলেও সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে তার নতজানু হওয়ার ইতিহাস আমরা জানি। আত্মকলহে দীর্ণ কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রী হয়ে ওঠার ইতিহাস যেমন অস্বীকার করতে পারে না, তেমিন গণতন্ত্রই যে ভারতবর্ষের এখনো প্রধান অবলম্বন তা-ও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস আজ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি ও ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়ছে, সুখের কথা। দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না, বামপন্থী দলগুলি, কমিউনিষ্টরা প্রগতিপন্থী শক্তিসমূহ। সাম্প্রদায়িক তথা মৌলবাদী

শক্তির উত্থান ও আধিপত্যের মূলে এদের দুর্বল প্রতিরোধমূলক ভূমিকা দায়ী। অশুভশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ ও প্রতিরোধ কেবল নির্বাচনসর্বস্ব রাজনৈতিকভাবে সম্ভব নয়, দর্শনগত ও মতাদর্শগত লড়াই-ও চাই। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় ও বাতাবরণে বামপন্থীরা অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদই নয়, বিজেপির পায়ের তলায় জমি থাকছে কিভাবে তাও ভেবে দেখা উচিত। বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্যও কখনো কখনো দৃষ্টিকটু হয়ে উঠছে। ড্রয়িংরুমবিলাসী মার্কসবাদীদের ভাবা উচিত, খোলা আকাশের নিচে জনজমায়েতে, গণমানুষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, সাধারণ মানুষের নাড়ীর স্পন্দন বুঝে না নিতে পারলে নিছক কেতাবী ঘরানার মার্কসবাদ মানুষকে বিভেদপন্থা থেকে মুক্তির দিশা দেখাতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গেও সম্প্রীতির পরিবেশ দূষিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অতএব তত্ত্ব যদি অবলম্বন করতে হয় তা হওয়া উচিত মানবতত্ত্ব। আবহমান বাংলার সম্প্রীতির গরিমাময় ঐতিহ্যকে করধৃত রাখার জন্য কেবল সম্প্রীতি-মিছিল পরিচালনতেই সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এর জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন জনমত গড়ে তোলা, জনচেতন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। রবীন্দ্রনাথের বেদনামথিত প্রশ্নমুখর হওয়ার দৃষ্টান্ত মনে পড়বে, 'হিন্দুর দেবতা এই কি তোমার বিধান, আমরা শুধু হিন্দুই রহিব, মানুষ হইব না।' কিংবা নজরুলের সেই আবেগকম্পিত বাচনিকতা 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন? কাণ্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার?' এই জীবনবোধ যে আজ বড় জরুরি।

কংগ্রেসের কথা আরো একটু বলা দরকার। এই দল ঐতিহাসিক নিয়মে ভেঙেই চলেছে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির তল্পিবাহক বিজেপির দোসর তৃণমূল মূলত লুম্পেনতন্ত্রের প্রচারক। এই দলের অর্থনৈতিক কোনো ধ্যানধারণাই নেই। কংগ্রেংস ভাঙনের মূলে সুবিধাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান। মর্তাদর্শের কারণে ভাঙন নয়। দুর্নীতিগ্রস্থ বিজেপির বিরুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের লড়াই যে জোরদার হতে পারে না, তা স্বাভাবিক। দেশ বাঁচাতে হলে কংগ্রেসকেও তার জাতীয় চরিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার প্রশ্নেই বাঁচতে হবে।

গুজরাতের দাঙ্গা নিয়ে কংগ্রেস, বামপন্থী-সহ সব সংস্থার কেবল রাজনীতির অঙ্ক নিয়ে হিসাব কষলে চলবে না। দাঙ্গাবিরোধী মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সর্বপ্রকার মনুষ্যবিরোধী শক্তি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লৌহকঠিন প্রতিরোধাত্মক সংকল্প। স্বাধীনতার আগে-পরে অজস্র দাঙ্গা ও জীবনহানি ঘটছে। কিন্তু বিশ শতকের নয়ের দশক ও একুশ শতকের প্রথম দুটি বছরে সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও মৌলবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদী দেশদ্রোহী শক্তির হ্যান্ডসেক সমগ্র দেশের অখণ্ডতা, সংহতি ও

সার্বভৌমত্ব প্রশ্ন চিহ্নিত করে তুলেছে। বিষয়টি শুধু করসেবকদের নিয়ে নয়, ষড়যন্ত্র গভীরতর পর্যায়ে রয়েছে। দেশ জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন চক্রান্তকে অলীক বলা যাচ্ছে না। তদুপরি রাষ্ট্রশক্তি যদি ধর্মকে সর্বব্যাপারে অগ্রাধিকার দিয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জাল বুনে যায় সেক্ষেত্রে, এই দুঃসময়, এই অন্ধকারে, আমাদের সাহসী কণ্ঠস্বরকে মুখর রাখতে হবে, বলতে হবে, ভারতবর্ষ একা হিন্দুর দেশ নয়। রামানন্দ, কবীর, নানক, নামদেব, সুরদাসের কথা বারে বারে তুলতে হবে। একটা জাতির অগ্রগতির ক্ষেত্রে মন্দির-মসজিদ লড়াইটাই যথার্থ লড়াই হতে পারে না। সব দেখে-শুনে আক্ষেপের সঙ্গে বলতে হয় 'This the time's plague, when mad men lead the blind.' সেক্ষেত্রে আজকের আহ্বান ও আশ্বাস উচ্চারিত হোক কবির ভাষায়– এত কারো দুয়ে নিতে সমবে প্রক্ষালন চাই আজ

এস হাত ধর।

কুঠার ভাসিয়ে জলে অবগাহনের শেষে

আত্মজের ঠোঁট স্পর্শ কর,

ভাঙা তো অনেক হল

শিখে নিতে হবে আজ গঠনপ্রণালী

চাপ চাপ কালি ধুয়ে

আকাশে ফিনিক দিক সাতরঙা প্রাণের বর্ণালী।

(অমিতাভ দাশগুপ্ত, শিখে নিতে হবে আজ গঠনপ্রণালী)

গুজরাত যে দায়িত্ব দিয়েছে

সুদর্শন রায়চৌধুরী

'সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন...।' ব্যাপারটা যদি এমন হয় গুজরাট! প্রায় আড়াই মাসের নারকীয় কাণ্ডের পরে আজ কেবল এখানে-ওখানে কালুপুরে বা দানি লিমডায়, ভেজালপুরে, রায়গড়ে বা শাহপুরে ছেঁড়াছেঁড়া কারফিউয়ের ফাঁকে দেশি বোমার বিস্ফোরণ, ইটবৃষ্টি অথবা পথচলতি কোন স্কুটার আরোহীকে থামিয়ে তার পিঠে ছুরি– ব্যস। শান্তি ফিরে আসছে গুজরাতে টলোমলো পায়ে। ক্রমশ সংবাদপত্রের পাতা থেকে, টেলিভিশনের পর্দা থেকে গুজরাত উধাও। আমরাও ফিরে চলছি আমাদের নিজস্ব অভ্যস্ত জীবনে।

কিন্তু এই আপাতত শান্তি কল্যাণের মধ্যেও থাকে শুধু অন্ধকার, নিজেরেদ মুখোমুখি বসে এ-প্রশ্ন তো উঠছেই উঠবেই– সত্যিইকি ফিরে যাওয়া যাবে কোন অনাবিল শান্ত সমৃদ্ধ গুজরাতে? গুজরাতের হিন্দুরা, মুসলিমরা, খ্রীস্টানেরা– সব ধর্মের সবাই পাশাপাশি আবার থাকতে পারবে প্রতিবেশীসুলভ উষ্ণতার পরিবেশে নিঃসংশয়ে?

অথচ আজ থেকে বছর দেড়েক আগে গুজরাতে যখন ভূমিকম্প ঘটলো, সহায়সম্বলহীন লক্ষ লক্ষ মানুষ বিপন্ন। সেদিন পড়েছিলাম খবরের কাগজের পাতায় জাতধর্ম ভুলে সাধারণ মানুষ কিভাবে এগিয়ে এসেছে প্রতিবেশি মানুষের ত্রাণে। মনে পড়ছে আমেদাবাদ শহরের কোন হাসপাতালে আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে চোখের পাতা-এক-করতে-না পারা একশ জন মুসলিম যুবক নিজেদের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে একশ জন জখম হিন্দুকে। আরও রক্ত দিতে তখনও তারা তৈরি। এগিয়ে এসেছিল খ্রীষ্টান যুবকেরাও, হিন্দু তরুণেরাও ভিন্ন ধর্মী আর্ত মানুষের ত্রাণে। এই গুজরাতেই।

আজ দেড় বছর পরে সেই রক্তের ঋণ কি ভিন্ন পথে শোধ হল? বেসরকারী এক সিটিজেনস ট্রাইব্যুনাল তদন্ত করে তাঁদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বলেছেন, গুজরাতে এই গণ-হত্যাকাণ্ডে খুন হয়েছেন ২০০০ মানুষ, এখনও নিখোঁজ ৫০০ জনের মতো। ধর্ষিত এবং নিহত হয়েছেন অন্ত ২৫০ জন মা-বোন। যারা মরল, তারা তো মরলই। কিন্তু যারা বাঁচল, তারা? ওদিকে ছড়ানো ছিটানো শদুয়েক রিলিফ ক্যাম্পে লাখ খানেক মানুষ ন্যূনতমের থেকে যেন ন্যূনতম রিলিফ নিয়ে এই নিদারুণ দাবদাহে দিন কাটাচ্ছে। তাদেরকে 'শান্তির স্বার্থে' ঘরে ফিরতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাধ্য করছে প্রশাসন। সংসদে নেহাত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়েরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, নইলে রাজ্য সরকার তো ফতোয়া জারি করেছিলেন বেশ কিছু ক্যাম্প গুটিয়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু কোন ঘরে ফিরবে তারা? সব কিছু দগ্ধ-ধূলিসাৎ। হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ১৮০০ টাকার মতো ত্রাণ। এই টাকায় কোন বর্তমান, কোন ভবিষ্যতের গুজরান হবে একেকটা গোটা সংসারের? ওদিকে চাপ দেওয়া হচ্ছে এফ আই আর তুলে নিতে হবে। সোজা কথায় যদি হিন্দু না হও তবে সেই হেডগেওয়ার-গোলওয়ালকারের ফরমান মেনে মাথা নিচু করে দ্বিতীয় নাকি তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হবে এই দেশে। নইলে আদবানির রথযাত্রার সেই স্লোগান অনুযায়ী মুসলিমদের জন্যে বরাদ্দ 'পাকিস্তান অথবা কবরস্থান।'

খবরে পড়ি এখন গোটা গুজরাত ভাগ হয়ে যাচ্ছে স্বতন্ত্র দুই আবাস শিবিরে। এদিকে হিন্দু, ওদিকে মুসলিম। সংবিধানের ১৯ নং ধারায় কথিত যে কোনো নাগরিকের গোটা দেশের যে কোনো অঞ্চলে অবাধে চলাফেরার, বসবাসের যে মৌলিক অধিকার আছে,

গুজরাতে তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। একদা বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার কালো চামড়ার লোকেদের বাধ্য করা হত ঘেটোবন্দী হতে। জোহানেসবার্গে, নাটালে, ডারবানের মতো শহরে কালোদের জন্যে আলাদা সব বসতি। এরই বিরুদ্ধে একদিন গান্ধীজী সত্যাগ্রহ করেছিলেন। আজ সই গান্ধীজীর গুজরাটে যেন একই প্রথার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

এবং শুধু আলাদা বসতিতেই মিটবে না। এমন নয় যে আলাদা ঘর, আলাদা হেঁসেল হলেই সংসারে শান্তি নামবে। যে বিভেদের, যে ঘৃণার রাজনীতির সংস্কৃতির চাষ করা হয়েছে বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের বছর-চারেকের নিরঙ্কুশ শাসনে, তার ফসল ফলতে থাকবে নিরবধি। গোধরার ঘটনাকে সূচনাবিন্দু ধরা হচ্ছে, কিন্তু কে ভুলে যাবে '৯৮-'৯৯-এর গুজরাতের কথা। খ্রীষ্টানদের ওপর হামলাবাজির পাশাপাশি সেদিন কেশুভাই প্যাটেলের প্রশাসন শুরু করে দিয়েছিল যাবতীয় সংখ্যালঘুদের কোণঠাসা করার পরিকল্পিত কর্মসূচী। গোটা দেশে, সংসদে এবং শেষ পর্যন্ত আদালতে শোরগোল তুলেছিল গুজরাতি পুলিসের তত্ত্বাবধানে সম্প্রদায়-বিদ্বেষী আদমসুমারি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংগঠনগুলোর নাম-ঠিকানা, তাদের নেতা ও কর্মীদের যাবতীয় খবরাখবরের বিস্তারিত বিবরণ চেয়ে রীতিমতো সার্কুলার পাঠানো হয়েছিল জেলার পুলিসকর্তাদের কাছ থেকে। কে জানে আজ আড়াই বছর পরে সেইসব তালিকাবদ্ধ বিবরণ নিয়েই হয়তো সঙ্ঘ পরিবারের গুণ্ডারা খুঁজে বার করছে মিশ্র মহল্লার ভেতর থেকেও মুসলিম পরিবারগুলিকে।

আর এইসঙ্গে বিজেপি-র শাসনকালে চলছিল গোটা প্রশাসনকে সামপ্রদায়িকীকরণের অভিযান। গুজরাতের সবচেয়ে বড় জেলা কচ্ছ, যা পাকিস্তানসংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও কোনকালেই দাঙ্গাকীর্ণ হয়নি। সেখানেও অন্তত ৬,০০০ হোমগার্ড নেওয়া হয়েছে সঙ্ঘ পরিবারের অনুগত বাহিনী থেকে। সারারাজ্যেই এই প্রক্রিয়া চলেছে অবাধে। উঁচুতলার আমলারা, পুলিস কর্তারা বুঝে গিয়েছিলেন কাদের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। এমনিতেই তাদের একটা বিশাল অংশ সুযোগ-সুবিদাবাদী। এখন তাঁরা খোলাখুলি সঙ্ঘচেতনায় আপ্লুত।

এরই পাশাপাশি স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর ভেতরে-বাইরে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে কিশোরদের, তরুণদের হিন্দুত্বের মন্ত্রে। এমনকি যারা অন্তেবাসী দলিত, তাদেরও বোঝানো হয়েছে যে সংখ্যালঘু মুসলিমরাই তাদের তাবৎ দূরবস্থার জন্যে দায়ী। গুজরাতের মোট সংসংখ্যার ১৭ শতাংশ হল আদিবাসী। তাঁরা থাকেন সুরাট, বদোদরা, সবরকণ্ঠ, বনসকণ্ঠ, পাঁচমহল আর ডাংস জেলায়। তাঁরা প্রায় সবাই গরিবস্য গরিব অভিবাসী মজুর। এমনিতেই তাঁদের খোঁজটুকুও প্রশাসন রাখে না। কিন্তু সঙ্ঘের লোকেরা তাঁদের কাছে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছে উদ্ধারের উপায়– মুসলিমদের হঠাও। মদ গিলিয়ে

আর কাঁচা টাকার তোড়া দিয়ে তাঁদেরই অনেককে এবারের দাঙ্গায় পাঠানো হয়েছে সংখ্যালঘু বস্তিতে আগুন ধরাতে।

আর এই মুহূর্তে রীতিমতো গলা ফাটিয়ে বুক বাজিয়ে অশোক সিংঘাল বলছেন যে, গুজরাতের পরীক্ষা, তার অভিজ্ঞতা আর শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া হবে গোটা ভারতবর্ষে। একটিবারের জন্যেও নরেন্দ্র মোদীর গলায় সামান্যতম অনুতাপ, সামান্যতম নিন্দাবাদ শোনা যায়নি এই আড়াই মাসের গণহত্যাকাণ্ড সম্পর্কে। বরং যে কোন প্রতিবাদের বক্তব্যকে 'গুজরাটি অস্মিতার ওপর আঘাত' বলে এক গণহিস্টিরিয়া জাগিয়ে তুলেছেন রাজ্যের পাঁচ কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে। ঠিক এভাবেই একদা হিটলার জার্মান অস্মিতার নামে জিগির তুলে নাৎসি বর্বরতার সাফাই দিয়েছিল। নাৎসিদের নিন্দা মানে জার্মানদের নিন্দা, দেশদ্রোহিতা।

আর ভয়টা এখানেই। এই পথ ধরেই মৌলবাদের বিষ ধরিয়ে দেওয়া হয় গোটা জনসমাজের মধ্যে। এই বিকৃত প্রচারের সামনে মিথ্যে করে দেওয়া হয় আমেদাবাদের ভূমিকম্প-ধ্বস্ত দিনগুলোর সেই একশ মুসলমান যুবককে যারা রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চেয়েছিল, হিন্দু প্রতিবেশিদের। ভুলিয়ে দেওয়া হয় গীতাবেনের মতো হিন্দু নারীকেও, যিনি তাঁর মুসলিম স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে সঙ্ঘের গুণ্ডাদের হাতে ধর্ষিত এবং নিহত হন। ভূলিয়ে দেওয়া হয় শরণার্থী শিবিরের নির্যাতিত মুসলিম প্রবীণাকে, যিনি প্রশ্ন তোলেন, 'এই দেশ ছেড়ে কেন আমি পাকিস্তানে যাব? এই দেশেই আমি জন্মেছি।' ভুলিয়ে দেওয়া হয় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে-মারা প্রাক্তন সাংসদ এহ্সান জাফরির পরিবারের একমাত্র বেঁচে থাকা সদস্য তাঁর স্ত্রীকে, যিনি এই সব কিছুর পরেও উচ্চারণ করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা! ভুলে যেতে হয় যে, সঙ্ঘের দাঙ্গাবাজদের দেওয়া আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়েছে যে সামান্য শিক্ষকের আজীবন সংগৃহীত সংস্কৃত শাস্ত্র আর পুরাণের সম্ভার, সে এক প্রৌঢ় মুসলিম।

এই পথ ধরেই প্রচার করা হয় ৩৭০ ধারার তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে। একবারও বলা হয় না যে, ঐতিহাসিক কারণেই জম্মু-কাশ্মীরের জন্য যেমন এই বিশেষ ধারার বিধান আছে আমাদের সংবিধানে, তেমন ৩৭১(ক) থেকে ৩৭১(চ) ধারা পর্যন্ত নানান বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়েছে আরও সব রাজ্যের জন্যে। বলা হয় হজ যাত্রীদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা, বলা হয় না মানস সরোবর যাত্রীর জন্যে নেওয়া ব্যবস্থার কথা। বলা হয় না আমাদেরই সংবিধানের এই চাঞ্চল্যকর ২৯০(ক) ধারাটির কথাও যেখানে ফি বছর কেরালা আর তামিলনাড়ু সরকারের সংরক্ষিত তহবিল থেকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মন্দির সেবায় দেবাস্যম্ তহবিলে বাধ্যতামুলক দেয় মোটা চাঁদার বন্দোবস্ত আছে।

নারী যখন দখলের সামগ্রী

বোলান গঙ্গোপাধ্যায়

বিরানব্বই সালে সুরাতের দাঙ্গার সময় দাঙ্গাকারীরা নিজেরাই ধর্ষণের ভিডিও টেপ করে রেখে, অন্য মহল্লায় সেই টেপ দেখিয়ে নিজেদের বীরত্ব জাহির করেছে। মুসলিম মেয়েদের মহল্লার পর মহল্লায় এই টেপ দেখানো হয়েছে। নতুন করে ধর্ষণ করার সময় আবার তার ভিডিও ছবি তুলে রাখা হয়েছে। দাঙ্গা এইভাবে মেয়েদের সামাজিকভাবে হেয় করে। তাদের মানসিক স্থৈর্যটুকুও রাখতে দেয় না।

এইরকম নগ্ন লোলুপতার শিকার আর যদি কেউ হয়, সে শিশু। শিশুর সামনে তার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, মা-মাসীকে ধর্ষণ করার অর্থ বোধহয় ভবিষ্যৎ আরও দাঙ্গাকারী তৈরি করার বীজ বুনে রাখা।

শ্রেণী নির্বিশেষে নারী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হন এই কথা যেমন ঠিক, তেমনি একথাও বলতে হবে, যে মেয়েরা বস্তিতে থাকেন বা ঝুপড়িতে– তাঁদের নিরাপত্তা এতই ঠুনকো যে দাঙ্গার প্রথম হুঙ্কারেই তা ভেঙে পড়ে। সেখানে নারী লুঠ বা ধর্ষণের সামগ্রী হয়ে পড়েন খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু ওপরতলার নারীরও নিরাপত্তা দাঙ্গার সময় আর দৃঢ় থাকে না। দাঙ্গাকারীদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে ব্যবসার হাল যেন অন্যপক্ষের হাতে না থাকে। তাদের ভাতে মারতে চায়। ফলে অভিজাত অঞ্চলও বাদ পড়ে না দাঙ্গার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থেকে। এবারকার আহমেদাবাদের দাঙ্গার সময় অভিজাত অঞ্চলের ভোগ্যপণ্যের দোকান লুঠ হয়েছে যেমন, তেমনি অভিজাত মহল্লার বাড়িও ছাড়া পায়নি। এইসব বাড়ির মেয়েরাও না।

এবারের গুজরাতের গণহত্যারও অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারী ও শিশু। পরিকল্পিত, সরকারি অভিপ্রায় পুষ্ট এই গণহত্যার একটা বড় উদ্দেশ্য মুসলমানদের ভোটাধিকার সহ সমস্ত অধিকার ও সুযোগ হরণ। মার্চের মাঝামাঝি যে লিফলেট বিলি করা হয়, তাতে একথা গোপন করা হয়নি। আজকের শিশু কালকের ভোটার। তাই প্রথমই তাদের নিকেশ করো। এমন ব্যবস্থা কর, যাতে মুসলমান বাচ্চা স্কুলে না যেতে পারে। কারণ তাহলে তারাও হবে রুটি রুজির সমান যোগ্য ভাগীদার।

এবারের গুজরাতের গণহত্যায় যেভাবে মেয়েদের ওপর আক্রমণ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটা ছকের চেহারা ফুটে ওঠে। যেখানে যেখানে আক্রমণ হয়েছে, সেখানে সেখানেই মেয়েদের দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। তারপর ধর্ষিতা নারীকে ত্রিশূল বা তরোয়ালের সাহায্যে হত্যা করা হয়েছে। তারপর দেহ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও নিকটবর্তী কুয়োয় ফেলে দেওয়া হয়েছে বা পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে। ফলে,

কোথাওই প্রায় কোনো সাক্ষীই নেই। একজন-দুজন মেয়ে অসাবধানতা বা অন্য কোনো কারণে বেঁচে গেছেন, তাঁদের সাক্ষ্যই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু এই ধর্ষণ বা হত্যার ঘটনা প্রায়ই কোনো না কোনো লুকিয়ে থাকা নাবালকের চোখের সামনে ঘটেছে। মা, মাসিমা, কাকিমা,, প্রতিবেশি বন্ধুর মা কখনে কখনো বৃদ্ধা দাদিকেও ধর্ষণ করতে দেখেছে তারা। জ্বালিয়ে দিতে দেখেছে। সেই দেখা তাদের ঘুমের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছে। ভয়ে তারা কেঁদে উঠছে।

হত্যার এই ছক দেখলে মনে হয়, নারীর গর্ভের প্রতিই যেন আক্রমকারীদের প্রতিহিংসা। তাদের রাগ। কোনও সম্প্রদায়ের নারীকে দখল করা বা ভোগ করা মানে সেই সম্প্রদায়ের আভ্রন্তরীন শুদ্ধতাকেই দখল করা। কারণ নারীই তো সেই সম্প্রদায়ের শুদ্ধতার ধারক। কিন্তু নারীর গর্ভের প্রতি এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা দেখলে মনে হয়, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো মুসলমান জন্ম না নিতে পারে, তার পাকা ব্যবস্থা করারই প্রচেষ্টা।

যেমনভাবে মিডিয়া'য় প্রচারিত হয়েছে, হঠাৎই ঘটে গেছে গোধরার ঘটনা– আর তার জেরে গোটা গুজরাতে এই ধ্বংসলীলা। আসলে, তার চেয়ে অনেক গভীরে প্রোথিত আছে এর বীজ। কেন ঘটল গোধরার ঘটনা বা কেন কেবলমাত্র মুসলমান মেয়েদেরই এবার ধর্ষিত হতে হয়েছে গুজরাত জুড়ে? এই প্রশ্ন আমাদের সকলকেই কখনো না কখনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবেই।

অনেকদিন ধরে গুজরাতে 'ত্রিশূল দীক্ষা' চলেছে। অনেকদিন ধরে গুজরাতের মুসলমান প্রধান অঞ্চলের মিউনিসিপালিটির প্রাথমিক স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছিল। অনেকদিন ধরে সেখানে কোনো না কোনো অজুহাতে এমনকী, কলেজের ছাত্রকে যখন তখন পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ তলে তলে, একটা গণহত্যার জন্য গুজরাতে প্রস্তুতি চলছিল। আজকের যাঁরা 'সেকুলারিজমে'র জন্য হাহাকার করছেন, সেদিন তাঁরাও ছিলেন চুপ। নীরব দর্শকমাত্র। আর সেই নীরবতার সবচেয়ে চড়া দাম দিতে হয়েছে সংখ্যালঘু মেয়েদের আর শিশুদের।

আমি জানি না, এই মেয়েদের দাঙ্গার 'ভীতি' কোনোদিন কাটে কিনা। কোনোদিন আর সুস্থ জীবনে এবং স্বাভাবিক যৌনতায় ফিরতে পারে কিনা।

এক একটা দাঙ্গা আসে। মিডিয়ার কল্যাণে আমরা মধ্যবিত্ত নিশ্চিন্ত মানুষেরা, একটু নড়েচড়ে বসি–আবার সেই দাঙ্গা মিডিয়ার চড়া আলো থেকে সরে এলে ভুলে যাই। ভুলে যেতে ভালোবাসি। এই আধো জাগরণ আধো নিদ্রা অবস্থার সুযোগ নেয় দাঙ্গাকারীরা। আর একটা দাঙ্গার জন্য তলে তলে প্রস্তুত হয়। আর এরই মধ্যে আমাদের প্রতিবেশি বোনেরা ভীতিতে, শঙ্কায়, আধমরা হয়ে থাকে। আমরা ভুলে যাই, ভুলে যেতে ভালোবাসি।

অশান্তির দূত

সঞ্জীব সিংহ্

প্রশ্ন এখন একটাই, শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে নরক নামিয়ে এনেছে যারা, তাদের কি কোনো বিচারই হবে না? শাস্তি হবে না?

জেনোসাইড বা সম্প্রদায়-সংহারের অভিযোগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী আরিয়েল শ্যারনের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শুনানি শুরু হয়েছে বেলজিয়ামের একটি আদালতে। জানা যাচ্ছে, একটি অভিযোগে ইউরোপের বিভিন্ন আদালতে বিচার হবে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শুধু বেলজিয়াম বা ব্রিটিশ আদালত নয়, প্রবাসী সচেতন সেকুলার গুজরাটিরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন হেগের ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসেও মামলাটি তোলার।

শ্যারন থেকে মোদি। ইজরায়েল থেকে গুজরাট। মুসলমান-বিদ্বেষের দীর্ঘ অগ্নিবলয় একসূত্রে বেঁধেছে দুটি ভিন্ন ভূগোলকে। আর সেই আগুনের কেন্দ্রে দুই খলনায়ক। মুসলমান সম্প্রদায় বিনাশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জারি করার অভিযোগ দুজনেরই বিরুদ্ধে। আর কী আশ্চর্য, অভিযোগ অনুযায়ী দুজনের কর্মপদ্ধতিও মোটামুটি একই রকম! পৃথিবী থেকে মুসলমান সম্প্রদায় মুছে ফেলার জন্য দুজনেই রাষ্ট্রক্ষমতা অপব্যবহার করেছে বা করছে। গুজরাটে জ্যান্ত মানুষকে গুলি করে, কেটে কুচিয়ে পুড়িয়ে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর বুলডোজার চালিয়ে নতুন রাস্তা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে যারা ছিল, তাদের নামধাম সরকারি নথিপত্রে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে একই সঙ্গে, যাতে পরে কেউ এসে দাবি না জানাতে পারে। কখনও না বলতে পারে, ওখানে আমার বাড়িঘর প্রেম ভালবাসা আত্মীয় পরিজন ছিল!

বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের হায়েনা ও নেকড়েদের আদর্শ কি ইজরায়েল? এব্যাপারে শ্যারন তো পথিকৃৎ। শ্যারনের নির্দেশে প্যালেস্টাইনে আরব ভূখণ্ড দখল করেছে সুসজ্জিত ইজরায়েলি সেনাবাহিনী। ট্যাঙ্ক চালিয়ে, মর্টার মেরে, বোম ফেলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে আরবদের বাড়িঘর। সেখানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইহুদি বসতি। প্রতিটি আরবীয় চিহ্ন লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। হচ্ছে। যাতে পরে কোনো আরব এসে না বলতে পারে, ওখানে আমার বাড়ি-ঘর প্রেম-ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজন ছিল।

কিন্তু এভাবে কি ইতিহাসের গলাটিপে মারা যায়? জাগ্রত বিবেকের কণ্ঠরোধ করা যায়?

আপনি গুজরাটের বাতাসে কান পাতুন, পরিষ্কার শুনতে পাবেন হাজার হাজার কচিকণ্ঠ আকুল হয়ে তাদের আব্বা বা আম্মিকে ডাকছে। আপনি যদি পরে কখনো গুজরাট যান, তা

হলে আপনাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে রাস্তায়। কারণ, আপনি জানেন না কোনো রাস্তার তলায় চাপা পড়ে আছে অজস্র মানুষের হতভাগ্য হাড়গোড়, আপনার পায়ের চাপ তা মড়মড়িয়ে ভাঙবে। ঠিক যেরকম প্যালেস্টাইনে নবনির্মিত ইহুদি বসতির দরজায় রাত নামলেই ধাক্কা দেয় অজস্র গৃহহীন আরবের দীর্ঘশ্বাস। কবর থেকে উঠে আসে আরব গেরিলাদের প্রেত! এবং সন্দেহ নেই তারাই বিস্ফোরণ ঘটায় ইজরায়েলের জনবসতিতে, ট্রামে-বাসে, বিনোদন কেন্দ্রে।

শান্ত সুন্দর পৃথিবীতে নরক নামিয়ে এনেছে দুই অশান্তির দূত। কোটি কোটি জীবনপ্রেমী মানুষের ধিক্কার, অভিশাপ আজ ওদের ঘিরে। কাফকার 'দ্য ট্রায়াল' উপন্যাসের মতো এক বিমূর্ত বিচারপদ্ধতি চালু হয়ে গেছে সচেতন, সেকুলার মানুষের মনে। সেই বিচারে ওদের রেহাই নেই। কাফকার নায়ক জানত না কী দোষে তার বিচার চলছে। এরা কিন্তু জানে। এরা খুব ভালো করেই জানে নিজেদের কুৎসিত অপরাধ। একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সহ বিনাশ করার অভিযাগ এদের বিরুদ্ধে। দাঙ্গার আগুন যখন জ্বলছে, সেই মার্চ মাসেই গুজরাট থকে বীভৎস অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে ফিরে আসেন মুসলিম উইমেন্স ফোরামের সঈদা হামিদ, ন্যাশনাল অলিয়ন্স অফ উইমেন সংস্থার রুথ মনোরমা, নিরন্তর সংস্থার মালিনী ঘোষ প্রমুখ। প্রায় ৫ দিন তাঁরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন, আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলেন, শরণার্থী শিবিরগুলো পরিদর্শন করেন। তাঁদের রিপোর্টের মূল কথা, সংঘ পরিবার পরিচালিত খুনে নেকড়েদের লক্ষ্য ছিল মুসলমান শিশু ও মহিলারাও। অজস্র গণধর্ষণ, নারকীয় অত্যাচারের বিবরণে তাঁরা বিমূঢ় হয়ে যান। মহিলাদের প্যানেল পরিষ্কার তাঁদের রিপোর্টে জানায়, গুজরাটে যা হয়েছে তা জেনোসাইড ছাড়া আর কিছু নয়।

হিটলার, শ্যারন ও মোদি

তুরস্ক, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, হলোকাস্ট, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রোয়ান্ডা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুদান, ইজরায়েলের পর সম্প্রদায়-সংহারের তালিকায় যোগ হল গুজরাটের নাম। একটা সম্প্রদায়কে তার নিজস্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি সমেত নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নিষ্ঠুর ও নারকীয় প্রক্রিয়া যুগে যুগে সভ্য মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। সেই কলঙ্ক তালিকায় এবার জ্বলজ্বল করবে গুজরাত। সম্প্রদায়-সংহার বা জেনোসাইড জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থেকেছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে। সেই লজ্জার দায়ভার এবার থেকে আমাদেরও বহন করে চলতে হবে? যতবার গীতাবেনের কথা মনে পড়বে, আমরা কি শুধুই লজ্জায় মুখ ঢাকব? গীতাবেন এক সাহসিনী হিন্দু রমণীর নাম। গীতাবেনকে প্রাণ দিতে হয়েছে বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের নেকড়ে ও হয়েনাদের হাতে। গীতাবেনের অপরাধ? তিনি এক মুসলমান যুবককে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। সংঘ পরিবারের সুশিক্ষিত শিকারি কুকুরেরা খুঁজে খুঁজে বের করে গীতাবেনকে। তাঁকে আঁচড়ে

কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে। বিবস্ত্র করে গীতাবেনকে খুঁচিয়ে মারা হয়। আমরা কি লজ্জায় মুখ ঢাকব? চোখ ফিরিয়ে থাকব? নাকি এই ঘটনা থেকে মৌলবাদ প্রতিরোধের সাহস সঞ্চয় করব? আমাদের ঠিক করতে হবে। এখনই।

গুজরাটের জেনোসাইড আমাদের ইতিহাসের দিকে চোখে ফেরাতে বাধ্য করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, আরও উঠবে, কেন নুরেমবার্গ বিচারের মতো কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে না মোদী ও তার খুনে পৃষ্ঠপোষকদের? ১৯৩৫ সালে নুরেমবার্গ আইন বলবৎ করে হিটলারের ন্যাশনার সোশালিস্ট পার্টি জার্মান ইহুদিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থিক মন্দার ডানায় ভর করে ইহুদিদের বলির পাঁঠা হিসেবে খাড়া করে ক্ষমতার শিখরে উঠে এসেছিল হিটলার। প্রথমে ইহুদিদের জার্মানি ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সংঘ পরিবারের আচরণের সঙ্গে আদর্শগত অনেক মিল পাওয়া যেতে পারে হিটলার জমানার। সংঘ পরিবারও চায় মুসলমানরা ভারত ছেড়ে চলে যাক পাকিস্তান বা অন্য কোথাও। প্রয়োজনে গণবিনিময় হোক। শুধু হিন্দুরা থাকুক এই ভারতবর্ষে।

হিটলারও তাই চেয়েছিল। কিন্তু বিতারণে ইহুদি-সমস্যা মিটবে না বলেই শুরু হয় নির্বিচারে গণহত্যা। একের পর এক কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প গড়ে ওঠে। নাজিদের হাতে মৃত্যু হয় কম করে ৬০ লক্ষ ইহুদির! আরও ৫০ লক্ষ মৃত ও নিখোঁজের মধ্যে রয়েছে কমিউনিস্ট, ভবঘুরে, জিপসি, পোলিশ, সমকামী, মানসিক ও শারীরিক পতিবন্ধীরা। পৃথিবীর সেই বৃহত্তম জেনোসাইডের সঙ্গে নারকীয় নিষ্ঠুরতায় পাল্লা দেবে গুজরাটের মুসলমান-বিদ্বেষ। রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করে এই বিদ্বেষকে আরও উসকে দিয়েছে মোদী সরকার। নরেন্দ্র মোদী নিজে শুনিয়েছে নিউটনের নিয়মের কথা। ক্রিয়ার নাকি প্রতিক্রিয়া থাকেই। গোধরায় যেহেতু হিন্দুরা পুড়েছে অতএব দ্বিগুণ, চারগুণ অথবা একশোগুণ মুসলমান নিধনে সরকারি মদত দেওয়া হবে। নির্লজ্জভাবে সেই মদতকে পরোক্ষ বাহবা দেবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী, 'যেখানে মুসলমানরা থাকে সেখানেই দাঙ্গা বাধে।' আমরা কিন্তু জেনে গেছি অন্য কথা। 'যেখানে বিজেপি সরকার থাকে, সেখানে বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের নেকড়ে হায়নারা ত্রিশূল হাতে ঘোরে, সেখানেই দাঙ্গা বাধে।' আমরা কিন্তু জেনে গেছি অন্য কথা। যেখানে বিজেপি সরকার থাকে, যেখানে বিশ্ব হত্যাকারী পরিষদের নেকড়ে হায়নারা ত্রিশূল হাতে ঘোরে, সেখানেই দাঙ্গা বাধে'। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে। ইতিহাসই সাক্ষী পৃথিবীর বৃহত্তম জেনোসাইডের। ইহুদি নিধনে যেরকম পরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছিল নাজিরা, তার তুলনা মেলা ভার। না, ভুল বলা হল। নারকীয় নিষ্ঠুরতায় গুজরাট তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তবে জার্মানই হচ্ছে প্রথম দেশ, যারা এই সম্প্রদায়-সংহারের অপরাধ পরে স্বীকার করেছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষতিপূরণের। মোদী সরকার নিজেদের অপরাধ বা অক্ষমতা স্বীকার করা তো দূরের কথা, চটজলদি নির্বাচন ডেকে ফের পাঁচ বছরের ক্ষমতাটা সুনিশ্চিত করে নিতে চেয়েছিল। যারা ভোট দেবে, তারা মানসিকভাবে কতটা সুস্থিতি

অর্জন করেছে, তারা ভীত অথবা আতঙ্কিত কিনা, এ-সব দেখার কোনো প্রয়োজনই মনে করেনি। গণতন্ত্রর গলা টিপেধরার পরেও এদের মুখোশ খোলার আর কোনো বকি থাকে?

ঠিক যেরকম পরবর্তীকালে ইজরায়েলে আরব প্রতিবেশীদের সুখ, দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেওয়ার কথা ভাবেনি ইহুদিরা। পৃথিবীর বৃহত্তম জেনোসাইডের শিকার ইহুদিরা যখন একইভাবে আরেকটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার নারকীয় খেলায় মত্ত হয়, তখন কিন্তু আমাদের সন্দেহ তীব্র হয়। মনে হয় অদৃশ্যে আরও বড় কোনো হাত এই পুতুলখেলা নিয়ন্ত্রণ করছে। ইজরায়েলের ইহুদিবাসী ও ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের ভেতর অলিখিত যোগসূত্র হিসেবে অদৃশ্যে রয়েছে কোনো বৃহত্তর স্বার্থ। যার পৃথিবীবাপী ছড়ানো মুসলমান-বিদ্বেষকে নিজেদের আর্থিক স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়।

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের রাষ্ট্রগত সমস্যা আর ভারত-পাকিস্তান রাষ্ট্রগত সমসার বয়স মোটামুটি এক। দুটোরই শিকড় পাঁচ দশকব্যাপী। ভারত-পাকিস্তানের যে-কোনো শহরের মতো বহু প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে জেরুজালেম। মূলত উর্বর মৃত্তিকা যুগে যুগে বহু জাতি ও সম্প্রদায়কে সেখানে টেনে এনেছে। শুরু জেবুসাইতদের দিয়ে। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আদিম কানানাইত্‌দের শাখা জেরুজালেমে সালেম মন্দির স্থাপন করেছিল। সেই পেগান মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। কীভাবে যেন রটে গিয়েছিল জেরুজালেম খুব পবিত্র স্থান। ইহুদিরা সেখানে গড়েছিল সোলোমন মন্দির, খ্রিস্টানরা বানায় সেপুলক্রে গির্জা, আবার মুসলমানেরা তৈরি করে আল আকসা মসজিদ। উর্বর মৃত্তিকার লোভে প্যালেস্টাইনে ছুটে আসে নানা সময় হিব্রু, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক, সিরিয়রা। এই অভিযানে ইহুদিরাও ছিল। যদিও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইহুদিদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না প্যালেস্টাইনে। ওই সময়েই থিয়োডর আর্জল প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, যা ইহুদি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯৪৮, ব্রিটিনের দখলে ছিল আরব প্যালেস্টাইন। অধিকার ছাড়ার আগে ইংরেজরা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়, প্যালেস্টাইহে হবে আলাদা ইহুদি রাষ্ট্র। মনে পড়ে যেতে পারে ভারতের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পরিসি। কিন্তু ইংরেজরা এরকমই।

প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা বাড়িয়ে আরবদের কোণঠাসা করার চক্রান্ত ইংরেজদের দীর্ঘ পরিকল্পনারই অঙ্গ। যে কারণে ইংরেজদের উপস্থিতিতেই আমরা দেখি দু-দুবার ইহুদি-আরব দাঙ্গা হয়ে যায় প্যালেস্টাইনে। একবার ১৯২১ সালে, আরেকবার ১৯২৯ সালে। তিরিশের দশকের প্রথমভাগ থেকে বিশ্বের বৃহত্তম জেনোসাইডের শিকার ইহুদিরা জার্মানি থেকে কার্যত দলে দলেই আসতে থাকেন প্যালেস্টাইনে। ১৯৩০-এর শুরুতে যে সংখ্যাটা ছিল হাজার তিরিশেক, তা ১৯৩৬ সালেই বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪ লক্ষে। এবং যথারীতি ইংরেজদের প্রচ্ছন্ন কূটকৌশলে আবার আরব-ইহুদি দাঙ্গা হয়।

আক্রান্ত মুসলমানদের বাঁচানোর ক্ষেত্রে কোনওরকম নৈতিক দায়বদ্ধতা মোদি সরকার অনুভব করেনি। এমনকী শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারেও তীব্র অনীহা দেখিয়েছে। হাড় হিমকরা আতঙ্ক যে রাজ্যের মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে অনেককে বাধ্য করেছে চাকরিস্থলে বদলির দরখাস্ত পেশ করতে! মুসলমানেরা দলে দলে গুজরাট ছেড়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি জমাচ্ছে, এমন দৃশ্য যে কল্পনাও করা যায় না।

ইজরায়েলের আগ্রসনেও একইভাবে স্বভূমি ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে আরব মুসলমানেরা। যদিও সেখানকার তৈরি-করা মুসলমান-বিদ্বেষের গল্পটা একটু অন্যরকম। মধ্য প্রাচ্যের অফুরন্ত তেলের ভাণ্ডারের দখল নিতে ঘাটি দরকার ছিল আমেরিকার। সেজন্যই ব্রিটেনের দোসর আমেরিকা ১৯৪২ সালে ইহুদি কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠার কথা বলে। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইন ও ইজরায়েল আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয়। ১৯৪৮-এর মে মাসে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হয়। সবার আগে স্বীকৃতি আসে আমেরিকার কাছ থেকে। ভারতের স্বাধীনতা ও ন্যক্কারজনক দেশভাগ সম্পন্ন হয় মোটামুটি একই সময়। তার পরের ৫৫ বছরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা যেমন একাধিকবার ঘটেছে, ঠিক সেরকমই ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনি যুদ্ধও হয়েছে নিয়মমাফিক ভাবে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ইজরায়েলি সেনাবাহিনী আরব ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে দখল কায়েম করেছে। ১৯৬৭ সালে এই যুদ্ধ তীব্র আকার নিয়েছিল। দুদিনের ইজরায়েলি আক্রমনে অন্তত দশ লক্ষ আরব সেই সময় গৃহহীন হয়। মারা যায় হাজার হাজার। এই সংঘাতের তীব্রতা আরও বেড়েছে উন্মাদ শ্যারনের উপস্থিতিতে। রাবিন যেটুকু সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করেছিলেন প্যালেস্টাইনের সঙ্গে, তা নির্মম হাতে ভাঙতে একেবারেই বেশি সময় নেয়নি খুনে শ্যারন। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর মতই শ্যারনও স্বঘোষিত মুসলমান তথা আরব-বিদ্বেষী। শ্যারনের অভিধানে কূটনীতি, আলোচনা ইত্যাদি শব্দের স্থান নেই। কামান বন্দুক ট্যাঙ্ক মর্টার শোভিত শ্যারন আগ্রাসনে বিশ্বাসী। আগে গুলি করো, তার পর কথাবার্তা বলা যাবে, এরকমই শ্যারনের মানসিকতা। জল, বিদ্যুৎ ও ফোনের লাইন কেটে দিয়ে আরাফতকে অবরুদ্ধ করার ভেতরেও সেজন্যই কোনো সৌজন্যের ছোঁয়া ছিল না। হয়ত সেজন্যই আরবদের রক্তপিপাসু শ্যারন শান্তিকামী বিশ্বকে স্তম্ভিত করে বলে দিতে পেরেছিল, "১৯৮২ সালেই আরাফাতকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল। ওটা আমার বড় ভুল। এজন্য এখন আপসোস হয়।' (পরবর্তীতে বিষ দিয়ে আরাফাতকে হত্যা করে ইহুদী নেতারা– সংকলক)।

শ্যারনের কথা শুনে মনে পড়ে যায় নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য। গুজরাটে সংখ্যালঘু নিধনে একটুও দুঃখিত না হয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিচ্ছেন নিউটনের তৃতীয় সূত্রের কথা। আসলে যা জেনোসাইডকে সমর্থনেরই নামান্তর।

জানতে ইচ্ছা করে মোদিও কি শ্যারনের মতো মানুষ মেরে বড় হয়েছে? শ্যারন ১৪ বছর বয়সেই যোগ দিয়েছিল আরব প্রতিরোধবাহিনীতে। পরে বিশেষ ইজরায়েলি কমান্ডো বাহিনির প্রধান হয়ে ওঠে স্রেফ খুনের যোগ্যতায়। ইজরায়েলের লেবানন আগ্রাসনে শ্যারন ছিল পুরোভাগে। শ্যারনের রক্তপিপাসু সৈনিক জীবনের সেরা সময় আসে আর একটু পরে, যখন সাবরা ও শাতিলা শরণার্থী শিবিরে প্রায় হাজার দুয়েক আরব প্যালেস্তিনিকে খুন করা হয়। নেতৃত্বে সেই আরিয়েল শ্যারনই। ইজরায়লের কোর্টে শ্যারনের বিচার হয় নাম-কা-ওয়াস্তে। হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলে সেই শ্যারনই এখন ইজরায়লের রাষ্ট্রনায়ক। একটা খুনির হাতে দেশের ভার পড়লে যা হয়, ঠিক তা-ই এখন ঘটছে ইজরায়েলের ক্ষেত্রে। শ্যারন খুনোখুনিকে এমন স্তরে নিয়ে গেছে যে আমেরিকার ধামাধরা রাষ্ট্রসংঘের কোফি আন্নান পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, 'পরিস্থিতি গত ১০ বছরের মধ্যে সব থেকে খারাপ!' শ্যারন বা মোদির মতো বিদ্বেষপূর্ণ মানুষ যেখানে ক্ষমতায় থাকে, সেখানে পরিস্থিতি খারাপই হয়। এদের অভিধানে যে ভালবাসা শব্দটাই নেই! এরা ইহুদি না হিন্দু, সেটাও বড় কথা নয়, আসল কথা হল এরা মৌলবাদী!

মানব সভ্যতার আদি থেকে এ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছে ও মানুষ মরেছে, তাকে একাই ছাপিয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন জেনোসাইড।

মৃত্যু অবশ্যই জেনোসাইডের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু পাশাপাশি থাকে বিচ্ছিন্নতাও। সংখ্যালঘু নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বেছে নিয়ে তাদের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তও জেনোসাইডের ভেতরেই পড়ে। গুজররাটে আমরা এটাও দেখেছি। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক সংঘ পরিবার প্রচারে নেমেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদের অনেক দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলমানদের বাড়িভাড়া দেওয়া যাবে না। মুসলমানদের দোকান থেকে জিনিস কেনা চলবে না। মুসলমানদের সঙ্গে ব্যবসায়িক বিনিময় নিষিদ্ধ.. ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরন্তর এ-সব প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে চলেছে নিধনযজ্ঞ! এ জেনোসাইড ছাড়া আর কী! আর শুধু তো মুসলমান নয়, হিন্দু মৌলবাদীদের হাতে রক্ত লেগেছে খ্রিস্টানদেরও। এমনকি যারা সেকুলার, ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, তাদেরকেও লক্ষ্যবস্তু হিসেবে স্থির করছে হিন্দু মৌলবাদীরা। ৭ এপ্রিল রবিবারের টাইমস অফ ইন্ডিয়া পত্রিকায় সংঘ পরিবারের মুখপাত্র পাঞ্চজন্য পত্রিকার সম্পাদক তরুণ বিজয় লিখেছেন, 'প্রতিটি প্রজন্মে ওরা (মুসলমানরা) উঠে দাঁড়িয়েছে আমাদের (হিন্দুদের) ধ্বংস করার জন্য। কখনও ওরা এসেছে ঘোরি এবং গজনি হয়ে। কখনও এসেছে সেকুলারিস্ট হয়ে।'

এতো পরিষ্কার সেকুলারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। হিন্দু মৌলবাদীদের অক্রমণের লক্ষ্যবস্তু এখন আর শুধু সংখ্যালঘু মুসলমানেরা নয়, সেকুলারেরাও! কিন্তু তরুণ বিজয়দের জানা দরকার, এদেশে সেকুলারেরা সংখ্যালঘু নন। মেধা পাটেকর নিগ্রহের

ঘটনা বারবার ঘটবে না। পরেরপর ঘটলে সেকুলারেরা তা প্রতিরোধ করবেন, সেই শক্তি সেকুলারদের অছে। সেকুলারেরাই এখনও এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ। থাকবেনও।

সবচেয়ে বড় কথা, মানব সভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কখনও মৌলবাদীরা জয়ী হয়নি। জয়ী হতে পারে না। কারণ, সভ্যতা এগোয় জীবনের হাত ধরে। মৃত্যুর মিছিল কখনও-সখনও তাকে পেছন দিকে টান দেয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক। ইতিবাচক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সভ্যতায় বরাবই অক্সিজেনের কাজ করে।

আক্রান্ত সংখ্যালঘুরা

জেনোসাইডের ইতিহাস ঘাঁটলে আরও একটি ধারণা খুব পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছেন সংখ্যগুরুদের হাতে এবং সেখানে রাষ্ট্রক্ষমতার যথেষ্ট অপব্যবহার ঘটেছে। অশান্তি নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে শক্তিশালীদের ভূমিকা জ্বলজ্বল করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

শান্তিরক্ষা করবে কে? এ প্রশ্ন বাতুলতার নামান্তর। দায়িত্ব অবশ্যই শক্তিশালীদের। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের। ভারতবর্ষে মুসলমানদের শান্তিরক্ষার ভার তো হিন্দুদের হাতেই থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাসের পরিহাসে আজকের পরিস্থিতি তো উল্টেও যেতে পারত! তখন কি এ-লেখার প্রয়োজন হত না? হত। এবং সেটা হত মুসলমান মৌলবাসীদের বিরুদ্ধে।

মুসলামন মৌলবাদীরা এদশেও যথেষ্ট সক্রিয়। কিন্তু তার জন্য কোটি কোটি শান্তিপ্রিয় মুসলমানকে কেন গুনাগার দিতে হবে? অথচ সেটাই হয়েছে। হচ্ছে গুজরাটে। দুঃখজনকভাবে প্রশাসনিক মদতেই হচ্ছে।

ভারতেরই মতো বহু ভাষাভাষী, নানা সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে ইন্দোনেশিয়ার সভ্যতা। ১৩,৭০০ টি দ্বীপ, ২৫০টি ভাষা, কম করে ৩০০টি আঞ্চলিক গোষ্ঠী মিলিয়ে একটি আস্ত ইন্দোনেশিয়া। ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ায় ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেয় ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল পার্টি (পি এন আই) ও ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (পি কে আই)। কমিউস্টিদের আদর্শে আকর্ষিত হয়ে দলে দলে কৃষকেরা যোগ দিতে থাকে পি কে আই-তে। ১৯৬৫ সালে অভ্যুত্থান ঘটে। ক্ষমতায় আসে জেনারেল সুহার্তো। আগের প্রেসিডেন্টকে অন্তরীণ করে রাখা হয় তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। সুহার্তোর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী এবার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনে কমিউনিস্টদের ওপর। প্রায় ৫ লক্ষ কমিউনিস্ট সদস্য-সমর্থক খুন হন। আরও ৫ লক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মানবাধিকার লংঘন হলেই যাতে দেশ-নিরপেক্ষভাবে বিচার শুরু করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বিশেষ করে বসনিয়া এবং

—১২

ক্রোয়েশিয়ার বীভৎস গণহত্যার পর। কিন্তু এখানেও বিচারের বাণী নিভৃতে কেঁদেছে। দেখা গেছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ নিয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইবুনাল ফর যুগোস্লাভিয়া (আই সি টি ওয়াই) রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত। কারণ, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে শুধু প্রাক্তন যুগোস্লাভি প্রধান মিলোসেভিচকে। ছাড় পেয়ে গেছে ন্যাটোর সেই সব কমান্ডাররা, যারা ১৯৯৯ সালে যুগোস্লাভিয়ায় অন্যায়ভাবে যুদ্ধ শুরু করেছিল। ন্যাটোর সেই সব কুখ্যাত সেনাপ্রধানের নির্দেশে কম সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটেনি। তবু আশার কথা, এ বছরের জুলাই মাসের ভেতর ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট (আইসিসি) হয়ত কার্যকর হয়ে উঠবে। যদিও আমরিকা খুবই আপত্তি জানিয়েছিল। কারণ, বিভিন্ন দেশে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির জন্য অভিযুক্ত আমেরিকার সেনা ও প্রশাসকদের সেই আন্তর্জাতিক আদালতে ডাক পড়তে পারে। বিরোধিতা ছিল ভারতেরও। গুজরাটের পর সেই আপত্তির কারণ এখন কিছুটা বোধগম্য হয়। জেনোসাইডে জড়িত থাকার জন্য বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের বিদেশে বিচার হচ্ছে, এমন কাণ্ড কল্পনা করতে বাজপেয়ী সরকারের কষ্ট হতেই পারে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক ভারতের মাটিতেই। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গুজরাট গণহত্যায় সিবিআই তদন্ত চেয়েছে। দাবি জানিয়েছে দোষীদের দ্রুত শাস্তিবিধানের। বাজপেয়ী কী সেই দাবিতে সাড়া দেবেন? সাড়া দেওয়ার মানসিকতা থাকলে কি গোয়ায় মোদিকে ডেকে তিনি পিঠ চাপড়ে দিতেন? প্রশ্নের ভেতরেই তো উত্তর লুকিয়ে আছে! গুজরাটে দাঙ্গায় জড়িতদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকতে কি বিজেপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মোদিকে দ্রুত নির্বাচন আয়োজন করার পরামর্শ দিত? দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে কি আক্রান্ত, ভীত শিশুদের ঘাড় ধরে পরীক্ষায় বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? যে-সব ফুলের মত শিশু তাদের চোখের সামনে বাবা মা ভাই বোনকে খুন হতে দেখেছে, নারকীয় অত্যাচার যাদের মনে দগদগে ক্ষত তৈরি করে দিয়েছে, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্যই বা কী করেছে মোদী অথবা বাজপেয়ী সরকার? এত কাণ্ডের পরেরও সুবিচার? আশা কি আদৌ করা যায়, যখন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গোধরার ঘটনা না ঘটলে গুজরাটের ট্র্যাজেডিও ঘটত না!' এদেশের মাটিতে গুজরাটের গণহত্যার সুবিচারের আশা সুদূর পরাহত মনে হয় অতীতের প্রশাসনিক ব্যর্থতার ইতিহাস দেখে। রাজনৈতিক কারণে গণহত্যা ঘটিয়ে দোষীরা কখনও এদেশের শাস্তি পায়নি। ১৯৮৪ সালের দিল্লির শিখ-নিধনে জড়িতরা, মুম্বইয়ে ১৯৯৩ সলের দাঙ্গাকারীরা এখনও বুক ফুলিয়ে ঘোরে। সে-সব এখনও ধূসর হয়নি স্মৃতিতে।

ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন সংঘাতের মতই জটিল ও বহুমাত্রিক ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। কিন্তু কোথায় যেন অদৃশ্য যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় মুসলমান-বিদ্বেষে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস জারি করার ভেতর। ইজরায়েলের ইহুদিরা চায় না বিতাড়িত আরব মুসলমানেরা স্বভূমিতে ফিরে আসুক।

আবার কাফকাকেই স্মরণ করতে হয়। ইজরায়েলের আরিয়েল শ্যারনের রূপান্তর ঘটেছে নরেন্দ্র মোদীতে। মুসলমান-বিদ্বেষী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে মিল না থাকলে এই মেটামরফসিস সম্ভব হত না।

প্যালেস্টাইনের আরব শরণার্থী শিবির যেন পাল্টে গেছে গুজরাটের ত্রাণ শিবিরে। সেই উদ্বেগ, মৃত্যুভয়, চোখের জল ও অভিসম্পাতে কাঁপছে সেখানকার দিনরাত। এইসব অশান্তির দূতদের জন্য কোনো শাস্তিই যথেষ্ট নন।

গুজরাত দাঙ্গা ঃ পাশবিক হিন্দুত্বের চরমতম প্রদর্শন

আবু রিদা

অহিংসার তত্ত্ব প্রচারের জন্য গান্ধিজীর নাম চর্চিত হয় দুনীয়া জুড়ে। অথচ তাঁরই জন্মস্থান গুজরাতে সম্প্রতি যে বীভৎস হিংসার তাণ্ডব লীলা চলে তার দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল বিশ্বের ইতিহাসের পাতায়। এমনিতেই হিন্দুত্ববাদীদের গোপন এজেণ্ডায় গুজরাতকে বেছে নেওয়া হয় প্রথম মডেল হিন্দু রাজ্য হিসাবে। আর সেই মোতাবিক তাদের পরিকল্পনার বিষয়গুলো বাস্তবায়িত করা হতে থাকে ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে।

সুরাতের বর্বরতা ছাপিয়ে যায় পশুত্বকেও

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শহীদ করার পর হিন্দুত্ববাদীদের এজেণ্ডাভূক্ত তাণ্ডব চরমে ওঠে। তারা সুরাতে যে বীভৎস কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনা করে তার উদাহরণও ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। বরং তা খোদ লজ্জিত করে ইতিহাসের পাতাকেই। হ্যালোজিনের চোখ ধাঁধানো আলোর ফোয়ারায় সারিবদ্ধ অসহায় নগ্ন মুসলিম মহিলাদের হিন্দুত্ববাদী নরপশু কর্তৃক গণধর্ষণ এবং পেছন থেকে তার ভিডিও চিত্র সম্ভবত ইতিহাসের পাতায় নতুন এক সংযোজন। বিংশ শতকের শেষ দশকে গণধর্ষণের এক বিরলতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইউরোপের মুসলিম বসনিয়ায় সার্ব পশুরা। কিন্তু নিঃর্দ্বিধায় বলা যায়, পাশবিকতার দিক থেকে সুরাতের কলঙ্ক আরও গাঢ়। আরও মানবতাহীন।

হিন্দুত্বের ধারাবাহিক প্রোপাগাণ্ডা

প্রথম মডেল হিন্দুরাজ্য নির্মাণের জন্য হিন্দুত্ববাদী যা নিরন্তর কাজ করে যেতে থাকে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যদি ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে গুজরাতে সংঘটিত কেবলমাত্র বড় বড় দাঙ্গার খতিয়ান সাজানো যায় পাশাপাশি।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ শহীদ হওয়ার পর দেশ জুড়ে যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার কলঙ্কজনক অধ্যায় সুরাত, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে আগেই।

দেশব্যাপী এই একতরফা সংখ্যালঘু বিরোধী দাঙ্গায় প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ। সবথেকে ক্ষতিগ্রস্থ রাজ্যগুলোর মধ্যে গুজরাত ছিল অন্যতম।

গুজরাতের বড় শহর আহমাদাবাদ দাঙ্গার আগুনে পুনরায় জ্বলে ওঠে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২। মুসলিমরা ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়। প্রাণ হারান অন্তত ডজনখানেক মানুষ। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পরে ১৯৯২ সালের শুরুতে মুম্বাইয়ে যে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পিত হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গা শুরু করা হয় তার অগ্নিস্ফুলিংগ ছড়িয়ে পড়ে আহমাদাবাদ সহ গুজরাতের বিস্তীর্ণ এলাকায়।

১৯৯৮-৯৯ সালে আর এক সংখ্যালঘু খ্রীষ্টানদের ওপর চলতে থাকে পরিকল্পিত হিন্দুত্ববাদী আক্রমণ। সাধারণভাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিশেষভাবে ডাঙ্গ জেলায় অব্যাহত হামলা চলতে থাকে খ্রীস্টান সম্প্রদায় ও তাদের ধর্মস্থানসমূহে। এই পর্যায়ের হামলাগুলো চলে ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৮ থেকে ৩ জানুয়ারি ১৯৯৯ পর্যন্ত।

১৯৯৯ সালের ২২ জানুয়ারি নতুন উদ্যমে হিন্দুত্বাদীরা আক্রমণ শুরু করে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও তাদের ধর্মস্থানসমূহে। সুরাতে তারা পোড়ায় খ্রীষ্টানদের দুটো প্রার্থনাকক্ষ। ব্যাপক হামলা চালানো হয় খ্রীষ্টানদের সম্পত্তির ওপরও।

১৯৯৯ সালে ২০ জুলাই দরীয়াপুর থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সাহাপুর, সারাসপুর, কালুপুর সহ সে দাঙ্গা বিস্তৃত হয় বিভিন্ন স্থানে। জীবনহানী হয় অন্তঃ ১৮ জনের। আহত হন ২০-রও অধিক মানুষ।

৩১ জুলাই (১৯৯৯) একটি হোটেলে আগুন লাগাতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয় দু'জন বজরঙ্গ দল কর্মী।

২০০১ সালের ৯ মার্চ দিল্লীতে কোরআন শরীফ পোড়ানোর সংবাদ প্রচার হওয়ার পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় গুজরাতের নানান প্রান্তে। আহত হন কমপক্ষে ২০ জন। নিহতের সংখ্যা দুই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সব থেকে বেশি ব্রোচ জেলায়।

এরপর আলোচ্য নযীরহীন বর্বরতা। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২, গোধরা স্টেশনের দুর্ঘটনার পরে পরেই হিন্দুত্ববাদীরা বীভৎস তাণ্ডবে মেতে ওঠে গোটা গুজরাত জুড়ে।

এইসব বড় বড় দাঙ্গার পাশাপাশি চলতে থাকে ছোটখাটো দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ। সর্বদা। আর সংখ্যালঘু নিপীড়ন ও বঞ্চনা তো সেখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি সরাসরি সরকারী নির্দেশনামার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের উৎপীড়ন ও হয়রানির দৃষ্টান্ত গুজরাতে বিরল নয়। ১৯৯৯ সালে মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এমনই দুটি অবমাননা ও উৎপীড়নমূলক নির্দেশনামা জারী করা হয়।

আকস্মিক নয়, ধারাবাহিকতার ক্লাইম্যাক্স

সুতরাং সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে দেখার পর দ্বিধাহীনভাবে একথা বলা যায় ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে গুজরাতে যে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু হয় তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং এটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চরম ফলশ্রুতি। ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে হিন্দুত্ববাদীরা ধাপে ধাপে যে সাম্প্রদায়িক আগুন ছড়িয়ে দিতে থাকে তা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে যায় ২৭ ফেব্রুয়ারির পরে।

গোধরা কেবল অজুহাত

অথবা ২৭ ফেব্রুয়ারির গোধরা স্টেশনের প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধ নয় এই মুসলিম নিধমূলক দাঙ্গা। বরং এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চরম রূপদান করার জন্য অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে গোধরার পাশবিকতাকে। যদি গোধরার পৈশাচিক ঘটনা ঘটানো না যেত বা না ঘটত তাহলে অপেক্ষা করা হত এরকমই যুতসই আর একটি অজুহাতের। আর তারপরেই তারা সংঘটিত করত এই রকমই নারকীয়তা। কিন্তু গোধরার ঘটনা তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়। পৈশাচিক নারকীয়তার অজুহাতের জন্য গোধরার ঘটনা তাদের কাছে যথেষ্টই। গেধরার ঘটনার পরে গুজরাতে হিন্দুত্ববাদীরা যে বর্বরতা ও পাশবিকতার নগ্ন নাচ প্রদর্শন করে সে দৃশ্য দেখে পাথরের অন্তরও শিউরে ওঠে। বাবরী মসজিদ শহীদ করার পরেও এই ধরনের বর্বরতা ও পাশবিকতার প্রদর্শন করে হিন্দুত্ববাদীরা মুম্বাইয়ে। সে দৃশ্যেও মানবতার আত্মা কেঁপে ওঠে। বীভৎসতায় মুম্বাই দাঙ্গাকে ছাড়িয়ে গেলেও বলা যায় ফেব্রুয়ারি-মার্চের গুজরাত হিন্দুত্ববাদীদের দ্বিতীয় মুম্বাই। আরও বলা যায়, ১৯৯২-৯৩ সালের বীভৎস মুম্বাই দাঙ্গার দশ বছর পূর্তি উৎসব পালন করল গুজরাতে হিন্দুত্ববাদীরা আরও বীভৎসতার সঙ্গে।

২৮ ফেব্রুয়ারি আহমদাবাদ এবং এরপর গুজরাতের অন্যান্য শহরে ও গ্রামাঞ্চলে হিংস্রতার যে তাণ্ডব শুরু হয় তা না জানি কতদিন পর্যন্ত লোকের অন্তরে আতঙ্ক ও ত্রাসের ভূত হিসাবে বিচরণ করতে থাকবে। আহমদাবাদ, সুরাত, বরোদা, গোধরা, মহসানা সহ গোটা গুজরাতের হাওয়া-বাতাসে দূর দূর পর্যন্ত জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ মানবশরীরের দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু, যুবক-যুবতী সকলেরই চোখে-মুখে অসহায়তা, নিরাপত্তাহীনতা, আতঙ্ক ও ত্রাসের ছাপ। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবিদার এই ভারতে তাদের জীবন যেন পোলট্রির মুরগীর থেকেও সস্তা।

প্রধানমন্ত্রীর ইঙ্গিত

উত্তর প্রদেশ নির্বাচনের প্রাক্কালে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপায়ী মন্তব্য করেন যে তার পার্টিকে মুসলিমরা ভোট না

দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। মুসলিমদের উচিত তাদের সিদ্ধান্ত পুনঃর্বিবেচনা করা। নতুবা এর পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাদের পরীক্ষা ও পরিণামের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

প্রধামন্ত্রীর এই মন্তব্য শুধু মুসলিমদের প্রতি হুঁশিয়ারী বাক্য নয় বরং সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রতি স্পষ্ট সঙ্কেত যে তাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তাদের যা কিছুই করার স্বাধীনতা রয়েছে।

নতুবা এমনকি কারণ আছে যে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আহমদাবাদ ও গুজরাতের অন্যান্য শহর এবং গ্রামে নিরীহ মুসলিমদের নির্বিচারে খুন করা হতে থাকে। দেদার ঘরবাড়ি পোড়ানো হতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এইসব দাঙ্গাবাজদের কাছে হাতজোড় করে শান্তি বহাল করার আবেদন ছাড়া কোন শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জরুরীভিত্তিক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। অথবা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ বাস্তবতা স্বীকার করার সদিচ্ছা এক মুহূর্তের জন্যও দেখাননি যে সংঘ পরিবারের 'যুবকর্মীরা' রক্তের হোলী খেলতে এবং নরবলী দিতে বিশ্বের অন্যান্য দানবদের থেকে অনেক এগিয়ে।

মুখ্যমন্ত্রীর সাফাই

যখন রাজ্যের তামাম শহর রক্তের স্রোতে ভাসানো হচ্ছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার প্রতিটি বিবৃতিতে এই সাফাই গাচ্ছিলেন যে রাজ্যের ৯০ শতাংশ এলাকায় স্বাভাবিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। কেবল ১০ শতাংশ এলাকা দাঙ্গা কবলিত। তাও সেটা গোধরায় করসেবকদের ট্রেনের মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশোধাত্মক প্রতিক্রিয়া। যেটা নিতান্তই স্বাভাবিক।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে এরকম বিবৃতি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও চরম পরিতাপের। এই বিবৃতি দুষ্কৃতীকারীদের বর্বর অপকর্মের প্রতি অসীম উৎসাহ দান। এটা দুষ্কৃতীকারীদের কতখানি বেপরোয়া করে তুলতে পারে তা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই সংঘ পরিবারের দুষ্কৃতীকারীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে কতটা বেপরওয়া হয়ে উঠতে পারে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত রক্ত-ধোওয়া গুজরাত।

আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মী সমর্থকদের প্রায় যাবতীয় ন্যায়-অন্যায় আচরণ সমর্থন করে। কিন্তু দাঙ্গাবাজদের প্রতি বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নগ্ন সমর্থন সত্যিই গণতন্ত্রকে প্রোথিত করে নোংরা নর্দমার ডুব পানিতে।

এই নগ্ন সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ আমরা পাই যখন আমরা দেখি রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জনগণের রক্ষকদেরকে (পুলিসকে) এই নির্দেশ দেওয়া হয় যে তারা যেন কোনো

ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সংগীভাইদের বিরুদ্ধে। যে রাজ্যে সেনাবাহিনী নামানোর প্রশ্নে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘ বিলম্বিত বিতর্ক চলে। যেখানে পুলিস ও নিরাপত্তা বাহিনীর নির্বিকার চোখের সামনে কলোনীর পর কলোনী জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হয় এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ দলের সেইসব দুষ্কৃতীকারীদের সন্ধান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে থাকে না। সেই সরকার সম্পর্কে এ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রতিটি পদক্ষেপ বাস্তবায়িত করেছে গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে এবং সুপরিকল্পিতভাবে। শুধু তাই নয়। তাদের এই এজেন্ডাও ব্যাপক প্রচার করার প্রচেষ্টা চালায় যে বিরোধীদের এমনভাবে পিষ্ট কর যে তারা যেন ভবিষ্যতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কখনও।

একজন উচ্চ পর্যায়ের পুলিস অফিসারও যে এমন পক্ষপাতদুষ্ট ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে তা আমাদের শিক্ষা নিতে হয় গুজরাতের ঘটনা থেকেই। রাজ্যের সবথেকে বড় পুলিস অফিসার বেশ গাম্ভীর্যের সঙ্গেই টিভি চ্যানেলে মন্তব্য করেন যে, 'পুলিস কর্মীরাও সমাজের একটি অঙ্গ। তাদের রয়েছে আবেগ-অনুভূতি। গোধরার ঘটনার পরে আহত হয় তাদের আবেগও। সুতরাং যেসব ঘটনাবলী ঘটছে সেসবকে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। আর এর কারণে পুলিসের ওপর অভিযোগ আরোপ করার কোনো যুক্তি নেই।'

বিস্ময়ের কথা হল এই যে এই উচ্চ পর্যায়ের অফিসারের বিবৃতি শুনে কর্তৃপক্ষের কেউ তাকে একথা প্রশ্ন করতে প্রস্তুত নয় যে, তুমি দায়িত্বশীল অফিসার হয়েও প্রতিবেশীর আগুনে উত্তপ্ত হয়ে এ কি ধরনের কথা বলছ! তোমার মুখে একথা শোভা পায় না।

মুখ্যমন্ত্রীকে আরো দু'কদম এগিয়ে ওইসব পুলিসকর্মীদের উৎসাহ দিতে দেখা যায়, ৪৮ ঘন্টা ধরে নযীরবিহীন মুসলিম নিধন যজ্ঞের সময় যাদের দেখা পাওয়া যায়নি। যদিও বা কোথাও দেখা যায় তো দাঙ্গাকারীদের সাথে দেখতে পাওয়া যায়। অথবা নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহ দিতে দেখা যায়। গোধরার সবরমতী ট্রেন পোড়ানোর এ প্রতিক্রিয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিশোধের আগুনে যে এভাবে লৌহতপ্ত করে তুলবে তা তো কোনো অ-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও কল্পনা করা যায় না।

২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরে হিন্দুত্ববাদীরা ঘৃণার বিষ ছড়াতে থাকে। সন্ধে হতে হতেই ঘৃণার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় গোটা গুজরাত। রাতের শেষ প্রহরের আগেই দাউ দাউ আগুন জ্বলে ওঠে আহমদাবাদের রাস্তা ও অলিগলিতে। হাওয়া-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে মানবশরীরের পোড়া দুর্গন্ধ।

২৮ তারিখের সকাল আহমদাবাদ ও সংলগ্ন এলাকায় মুসলিমদের জন্য নিয়ে আসে কিয়ামত সম ধ্বংসের পয়গাম। এরপর শুরু হয় পাশবিক বীভৎসতার সেই নগ্ন খেলা যা ছাড়িয়ে যায় বর্বরতার যাবতীয় সীমা-পরিসীমা।

মুসলিম এলাকায় কারফিউ লাগিয়ে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয় তাদের মহল্লায়। আর হিন্দু দাঙ্গাকারীদের খোলা ছুট দেওয়া হয়। তারা যে ধার দিয়েই যাক মুসলিম মহল্লায় ঢুকে তাদের বর্বর কর্মতৎপরতা বাস্তবায়িত করতে পারে। অথবা যেখান থেকেই চায় পাশবিকতা শুরু করতে পারে। সশস্ত্র হাজার হাজার লোকের মিছিল ঘুরে ঘুরে গোটা শহর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করতে থাকে এবং সাথে সাথে লুঠতরাজ চালাতে থাকে। মুসলিমদের ভাসিয়ে দিতে থাকে রক্তসাগরে। জীবন্ত মানুষ অগ্নিচিতায় পুড়তে থাকে।

কিন্তু গোটা রাজ্যে এমন কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দেখা যায়নি যিনি একথা ভাবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন যে যাদেরকে ঘৃণার ও বর্বতার শিকার বানানো হচ্ছে তারা আসেনি কোনো দূর দেশ থেকে। বরং তারা জন্মেছে এই মাটিতেই এবং তারা ওই শহরেরই সাংবিধানিক নাগরিক। তাদের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর রক্ষণাবেক্ষণ এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারেরই দায়িত্ব। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নিরপেক্ষ সংগঠনের তরফ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে এই উন্মত্ততা নিয়ন্ত্রণ করার এবং রাজ্য পুলিসের ব্যর্থতা ও পক্ষপাতিত্বের জন্য সেনাবাহিনী মোতায়েন করার আবেদন করা হতে থাকে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই হিংস্রতা নীরবে দেখতে থাকেন এবং তাদের জওয়ানদের উৎসাহ জোগাতে থাকেন।

২৮ ফেব্রুয়ারির আহমাদাবাদ

ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসের যে কোন জুনিয়ার অফিসারের পক্ষেও একথা অনুমান করা কঠিন ছিল না যে গোধরার ঘটনার পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ যে সর্বাত্মক বন্ধের ডাক দিয়েছে তার পরিণতি কত মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্যের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এবং রাজ্যের পুলিস প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অথবা যাদের ওপর কিয়ামত সম বিপদ এসে পড়ে তাদেরকে রক্ষা করার কোনো প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করেননি।

এর ভয়াবহ পরিণতি স্বরূপ গোটা গুজরাতকে হিন্দুত্ববাদীরা অগ্নিময় নরককুণ্ডে পরিণত করে। কিছু পুলিস অফিসারকে বলতে শোনা যায় যে বর্বরতা ও হিংস্রতার যে বীভৎস প্রদর্শন এবার করা হয় তার কোনো দৃষ্টান্ত ১৯৬৯ সালে আদবানীর রথযাত্রা বন্ধ করে দেওয়ার পরে যে রক্তাক্ত দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে তার সাথেও এর বীভৎসতার তুলনা হতে পারে না। ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল কেবলমাত্র দাঙ্গাকারীদেরই দিন। দাঙ্গাকারীরা অত্যন্ত

পরিকল্পিতভাবে অসহায় মুসলিমদের দোকানপাট ও ঘরবাড়ি তাদের প্রতিশোধের টারগেট বানাতে থাকে। এইসব ঘরবাড়ি ও দোকানপাটকে তারা অবরুদ্ধ করে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

প্রখ্যাত সাংবাদিক হরিশ খরে প্রশ্ন তোলেন হঠাৎ এসব কি করে হল? এর কারণ কি এটাই ছিল যে গুজরাত পুলিসের উচ্চ পদস্থ অফিসাররা দাঙ্গাবাজদের এত বড় জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি? অথবা তাদের কাছে– এত সময় ছিল না যে গোধরা ঘটনার পরে আসন্ন কিয়ামত সম হাঙ্গামার বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? কিন্তু এইসব তামাম প্রশ্নাবলীর যদি কোনো জবাব থাকে তাহলে তা হল রাজ্যের শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওই অর্থবহ নীরবতা যা প্রকৃকপক্ষে দাঙ্গাবাজদের ইঙ্গিত দেয় যে তারা যা চায় তাই করতে পারে। তাদের ভীত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এহ্সান জাফরীর আবেদন

প্রথম দিনেই শুধুমাত্র আহমদাবাদেই নিহত হয় ৮০-র বেশি মানুষ। হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং লুঠতরাজ চালানো হয়। এরমধ্যে ছিল সেই অভাগা গুলবার্গ সোসাইটিও। যেখানে সাবেক কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরী ৬ ঘন্টা ধরে মুখ্যমন্ত্রী থেকে নিয়ে পুলিস অফিসার এবং তার দলের নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করতে থাকেন। কিন্তু কেউ আসেনি কোনো দিক থেকে। কেউ সাড়া দেয়নি তার আবেদনে।

অবশেষে দাঙ্গাকারীরা গুলবার্গের অন্যান্য ঘরবাড়ির মতই এহ্সান জাফরীর বাড়িও চারদিক থেকে ঘিরে ধরে শুধু আগুন লাগিয়েই দেয়নি বরং এমনভাবে অবরুদ্ধ করে রাখে যে এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের ১৮ জন পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে যায় তারই সঙ্গে। এমনকি পুলিসও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি অন্ততঃ দ্বিতীয় দিনেও ওই পোড়া লাশগুলোকে ছাইগাদা থেকে বের করে। তাঁর স্ত্রী কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু গভীর অগ্নিগদ্ধ ও আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যে পর্যন্ত পুলিস কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। কিন্তু সন্ধ্যেয় যখন দাঙ্গাকারীরা পুলিস কমিশনারের অফিস আক্রমণ করে তখন কমিশনার একটু তৎপর হয়ে ওঠেন। কিন্তু সেটা ছিল কেবলমাত্র পুলিস কমিশনার পি সি পাণ্ডের নিজের অফিস বাঁচানোর তাগিদ।

এদিন রাতে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা পুলিসের এই নির্বিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে তার কাছে এছাড়া আর কোনো জবাব ছিল না যে, 'আসলে পুলিসকর্মীরাও তো মানুষ। গোধরা ঘটনার পরে আহত হয় তাদের আবেগ-অনুভূতিও। সুতরাং তাদের কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা করা যায়?'

সংবাদ প্রতিবেদকদের কাছে কোনো পুলিস অফিসার বলেন, 'তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। সরকারের কোনো দায়িত্বশীলই এমন কোনো নির্দেশ দেননি যে দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে মৃদু থেকে মৃদু কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমরা নির্বিকার না থেকে কি করব!'

এরপর এই বীভৎস গৈরিক সন্ত্রাস চলতে থাকে দিনের পর দিন।

গোধরা কাণ্ডের সত্যতা

আহমদাবাদ থেকে ফিরে : রাজবব্বর

পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীঅমর সিংহ, শাবানা আজমী ও সীতারাম ইয়েচুরির সাথে যখন আমি দিল্লি থেকে আহমদাবাদ যাচ্ছিলাম, তখন আমার মনে বারবার এই প্রশ্নই জাগছিল যে, গুজরাতে এত বেশি পরিমাণে মানুষের রক্ত বহানো হচ্ছে কেন এবং গোধরা-ট্রেন-দুর্ঘটনার সত্যতাই বা কী, যেটা এই তামাম খুন-খারাবীর ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যেটাকে সাম্প্রদায়িকদের মাধ্যমে এক পরিকল্পিত চক্রান্ত বলা হয়েছে?

দিল্লি থেকে আহমদাবাদে পৌঁছে শুনসান কিন্তু ভয়ংকর পথে যেতে যেতে অসংখ্য পোড়া গাড়ি ও দোকানপাট দেখে এবং রাত একটাতেও গলির মুখে ও বাড়ির জালিদার গেটের মধ্যে বহু মানুষের ভিড় দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে নয়। যেকোনও জায়গায় যেকোনও মুহূর্তে যেকোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এসব দেখতে দেখতে রাত তিনটে বেজে গেল। শহরের লোকেরা আমাদের আসার খবর পওয়ার সাথে সাথে আমার ও সকল সাথীর মোবাইল ফোনের রিং একটানা বাজতে লাগল। অবিরাম তাঁদের হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা আমাদের অশ্রু ঝরাতে থাকল। চোখে ঘুম নেই। মনেও সেই একই প্রশ্ন। কোনও রকমে রাতটা কাটল। সকালে সূর্য ওঠার আগেই আমরা সিভিল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত ছিলাম যে, গোধরা কাণ্ডের সত্যতা কী? আমার প্রশ্নের উত্তর আমি তখনই পেয়ে গেলাম, যখন সিভিল হাসপাতালের বার্ণ-ওয়ার্ডে নিজের পুড়ে যাওয়া মায়ের সাথে এক তেরো/চোদ্দো বছরের বালককে দেখলাম। তার বাবাও ওই হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি থেকে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে লড়াই করছিলেন। তার এক ভাই নিখোঁজ। সেই নিষ্পাপ বালক জ্ঞানপ্রকাশ আমাকে বলল– আমরা ইলাহাবাদ থেকে (ট্রেনে) আহমদাবাদ যাচ্ছিলাম। আমাদের তিনসিটের রিজার্ভেশন ছিল। কিন্তু অযোধ্যা থেকে করসেবকরা ট্রেনে উঠে আমাদের সিটগুলো দখল করে নিল। আমরা খুব কষ্টে একটা সিটে বসতে বাধ্য হলাম। করসেবকদের হট্টগোল-হাঙ্গামা আর স্লোগানবাজী চালু

ছিল। টিটি এসে ওদের টিকিট চাইলে ওরা তাকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিল। ট্রেনপথে প্রত্যেক স্টেশনে খাবারের দোকান থেকে পয়সা না দিয়ে জিনিসপত্র তুলে নেওয়া, স্লোগানবাজী আর হই-হট্টগোল চলতে থাকল। এর মধ্যে গোধরা স্টেশনে এক চা-ওয়ালার সাথে ওদের ঝামেলা হল, যে তার চায়ের দাম নেওয়ার জন্য জিদ ধরেছিল এবং ওরা তা দিতে তৈরি ছিল না। এই ঘটনাই ট্রেন-দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ঘটনাচক্রে চা-ওয়ালাটি ছিল মুসলমান। বাস করত স্টেশনের কাছে রেলওয়ে কলোনির ঘিঞ্জি বস্তিতে। ওখানে শেকল টেনে ট্রেন থামানো হয় এবং চা-ওয়ালার আওয়াজে বস্তির লোকেরা এসে ট্রেনের ওই কামরাটা ঘিরে ফেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। (পরবর্তীতে সরকারী অনুসন্ধানে জানা গেছে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল দুর্ঘটনায়। আর চা বিক্রেতার উপর জুলুম করার তথ্য ছিল সঠিক– সংকলক)।

আমি আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাই। আসলে এটা ছিল এক দোকানদার ও খরিদ্দাররের পারস্পরিক ঝগড়া। বেশিরভাগ দাঙ্গার মূলে থাকে এরকমই মামুলি ঘটনা। কারোর সাইকেল কোনও পথিককে ধাক্ক মারল, কারোর স্কুটার সাইকেলের সাথে টক্কর খেল, কোথাও কোনও দোকানদারের সাথে কোনও খদ্দেরের কোনও বিষয়ে ঝগড়া হল– দুজনের ধর্ম আলাদা হওয়া, সংশ্লিষ্ট সময়ে দেশ বা শহরের পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়া এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষদের ওরকম ঘটনার সুযোগ সন্ধানে থাকাই তুচ্ছাতি তুচ্ছ বিষয়কে অনেক বড় করে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে গুজরাতের রক্তকাণ্ডের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়।

আসলে করসেবকরা স্লোগানের মাধ্যমে এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ মন্দির নির্মাণের বিষয়ে তাদের ঘোষণার দ্বারা মুসলমানদের উত্যক্ত করে, যা তাঁরা ঘৃণা করেন এবং এটাই দাঙ্গার রূপ নেয়। বেশি আক্ষেপ হয় সেই সময় যখন শাসনক্ষমতার আসনে বসা লোকেরা এমন মর্মান্তিক দাঙ্গার কথা জেনেও এমন বিবৃতি দেয়–'বড় গাছ পড়লে মাটি কেঁপে ওঠে এবং এরকম ঘটনা ঘটে'। ১৯৮৪ সালের দাঙ্গার ইতিহাস আমাদের সামনে রয়েছে, যার দ্বারা শিখ উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বেড়েছে। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর ঘটনা মুসলিম সন্ত্রাসীদের জন্ম দিয়েছে এবং মুম্বইয়ে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এরকমই ঘটেছে গোধরা-ট্রেন দুর্ঘটনার পর, যেটাকে সাম্প্রদায়িক রং চড়ানো হয়েছে এবং পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে গোটা গুজরাতকে ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। এরকমই সুযোগের সন্ধানে থাকা– সাম্প্রদায়িকরা মানুষের রক্ত দিয়ে রক্তহোলি খেলতে লেগেছে। অহিংসার পূজারী 'বাপু'র বাপুনগরই শুধু নয় পুরো গুজরাতকে আহাজারি, আর্তনাদ ও আগুনের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মনুষ্যত্ব শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে চলেছে। হাসি খুশিতে থাকা পরিবারকে জ্যান্ত পোড়াতে আগুনে ঘি ঢেলে তামাশা দেখা হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার ওদিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে এমনভাবে, যেন কিছু ঘটেইনি।

১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর শিখ নিধন দাঙ্গা এবং বোম্বাইয়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও গুজরাতের এই দাঙ্গার কাছে কিছুই নয়। কিছুদিনের মধ্যে তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তদন্ত হবে। অপরাধীদের চিহ্নিত করা হবে। ঘাতকদের পাকড়াও করা হবে। তাদের শাস্তিও দেওয়া হবে হয়তো। (কোন শাস্তি হয় নাই– সংকলক) 'হয়তো' বললাম এজন্য যে, কিছু লোক তাদের রাজনৈতিক মারপ্যাচের দ্বারা আইনের আওতায় আসা থেকে বেঁচেও যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই– খুনি কেবল তারাই নয় যারা খুন করেছে, বরং অপরাধী তারাও যারা খুনের প্ররোচনা দিয়েছে। ভারতের আইনে যেক্ষেত্রে হত্যাকারী শাস্তি পায়, সেক্ষেত্রে হত্যার পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী, প্ররোচনাকারীকেও শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে গণ্য করা হয়। গুজরাতের দাঙ্গায় ভি এইচ পি ও বজরং দলের যেসব কার্যকলাপ সামনে এসেছে, সেসব এখন কারোর কাছে গোপন নেই। 'সিমি'র উপর নিষেধাজ্ঞা লাগানো হয়েছে। ('সিমি' হল মুসলিম ছাত্রসংগঠন ইণ্ডিয়ার– সংকলক)। আই এস আইয়ের সাথে তার সম্পর্কের সন্দেহ ছিল। এব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। এটা সঠিক হোক বা বেঠিক তার ফয়সালা হবে তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। এবং তথ্য-প্রমাণ জোটানো আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের কাজ। কিন্তু গুজরাতের এই মারাত্মক দাঙ্গার পরেও যদি বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করা না হয়, যারা দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং একতা ও ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক, তাহলে এটাকে মর্মান্তিকই বলা হবে।

গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনায় এবং গুজরাতের সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কারা নিহত হয়েছে, তাদের জাত-ধর্ম কী ছিল সেটা বড় কথা নয়, আমার কাছে সবচেয়ে কষ্টকর বিষয় হচ্ছে, তাঁরা সবাই ছিলেন মানুষ এবং তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন গরীব মানুষ। হিন্দু বা মুসলমানের রক্ত বয়নি, রক্ত বয়েছে মানুষের। বড় আক্ষেপের বিষয়, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাকে বলেন– 'রাজভাই, আপনি তো জানেন, অস্ত্রশস্ত্র কারা রাখে।' কথাটা জাতির উপকারার্থে প্রকাশ্যে এনে নরেন্দ্র মোদীকে নিবেদন করছি– তিনি মুম্বাই দাঙ্গার শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট, মীরাটের মালিয়ানা দাঙ্গার জ্ঞানপ্রকাশ কমিটির রিপোর্ট এবং ভাগলপুর দাঙ্গা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেখুন। এখানে আমি হিন্দু মুসলমানের কথা বলছি না, আমার উদ্দেশ্য মানুষ আর মনুষ্যত্ব।

আমি গর্ব করি নিজের দেশের জন্য যে দেশের মানবপ্রেম, শান্তি ও নিরাপত্তার কথা গোটা দুনীয়া অবগত। কিন্তু আমি আজ লজ্জিত দেশের এই পরিস্থিতির জন্য এবং নিজের অসহায়তার জন্য, কেননা আমি চাইলেও কিছু হবে না। উপরওয়ালার ইনসাফের প্রতি আমার ভরসা আছে, তিনি অবশ্যই যালিমদের শাস্তি দেবেন। আমার এই হিম্মত আছে যে, আমি মযলুমদের সুবিচার পাইয়ে দিতে পারব এবং আগামী দিনে এমন দাঙ্গা রোখার জন্য

মানবশক্তিকে একত্রিত করতে পারব, যাতে বহাল থাকে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, ভাতৃত্ব এবং একতাও।

অনুবাদ : মুহাম্মদ হানীউজ্জামান

সংখ্যালঘুদের 'বাহার' করার উদ্দেশ্য সফল হয়নি

আবদুর রাউফ

ভারত স্বাধীন হওয়ার আগের বছর ছেচল্লিশের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজী তাঁর হরিজন পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'অন্যায়কারীর আত্মীয়স্বজন কিংবা তার স্বধর্মালম্বীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা কাপুরুষের কাজ [পৃঃ ৪০৮, ১৭.১.১৯৪৬] বলাই বাহুল্য আজ ছাপান্ন বছর পরেও জাতির জনকের এহেন তিরস্কার আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ কোনও কাজে আসেনি। বিশেষ করে যে কোনও সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে কাপুরুষের ভূমিকা নিতে আমাদের কোনও লজ্জা নেই। লজ্জা থাকলে গুজরাতের সাম্প্রতিক ঘটনা ঘটত না। সবচেয়ে বেদনার কথা, যে মহামানবের মুখ দিয়ে এই তিরস্কারের বাক্য উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর জন্মভূমি এই গুজরাত রাজ্য। তাঁকে নিয়ে গুজরাতবাসীর শ্লাঘাবোধের গভীরতা থাকলে নিধনযজ্ঞ কিছুতেই এতে ব্যাপক, এত মর্মান্তিক কিছুতেই হয়ে উঠতে পারত না। একথাগুলি বলার পর স্বভাবতই পাঠকদের মনে সংশয় জাগতে পারে গুজরাতের সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'কাপুরুষ' হিসাবে কাদের চিহ্নিত করতে চাওয়া হচ্ছে।

আমার বাকি কথাগুলি শোনার আগে যেসব বুদ্ধিমান পাঠক অনিবার্য সিদ্ধান্তটা অনুমান করে নিতে চাইবেন তাঁদের সবিনয়ে বলি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় আমি কিন্তু আপনাদের মত অতটা নিঃসংশয় নই। সাধারণতভাবে গোধরা স্টেশনে যারা করসেবক ভর্তি রেলবগি জ্বালিয়ে ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যারা গুজরাতে সংখ্যালঘুদের ধনে প্রাণে নিধন করার যজ্ঞ মেতে উঠেছিল তাদের সবাইকেই কাপুরুষের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। কিন্তু বিচারধারাকে এতটাই সরলরৈখিক করে তোলা কি সম্ভব? সম্ভব হত যদি করসেবকদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাটিকে নেহাৎই ধর্মীয় বিদ্বেষের গণবিস্ফোরণ বলে চিহ্নিত করা যেত। বিগত কয়েক বছর ধরে এই বিদ্বেষটাকে অবশ্য উসকে দিচ্ছিল সংঘ পরিবারের সদ্যরাই। বিগত শতকে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুজরাত যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য মাত্র সেই ধারণাটাই মুছে ফেলার অপপ্রয়াস চালান হচ্ছিল। এই সময় বরোদার দিক থেকে আহমদাবাদের প্রবেশ পথে একটি বিশাল হোর্ডিং লাগনো হয়েছিল যাতে লেখা ছিল 'ভারতের প্রথম হিন্দুরাজ্যে স্বাগত।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সাল থেকে এই আদর্শ হিন্দু রাজ্যটি বি জে পি'র শাসনাধীনে আসার পর

সরকারি কর্মচারীদের আরএসএস-এ যোগদান নিয়ে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নেওয়া হয়। এই বিপজ্জনক নজির সেই সময় কি পরিমান রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণ হয়েছিল বহু পাঠকের সেকথা স্মরণে থাকতে পারে। এই রাজ্যেই সমস্ত সরকারি এবং অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে সংঘপরিবারের অন্যতম মুখপত্র 'সধানার' গ্রাহক হওয়ার জন্য নিধিসম্মত সরকারি আদেশ জারি করা হয়েছে। তাছাড়া এই রাজ্যেই প্রথম পুলিসকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সর্বত্র অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী মুসলমানদের তালিকা তৈরি করে তাদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য। সাম্প্রতিক গণনিধন যজ্ঞে সেই নথি কাজে লাগানোর বহু প্রমাণ বেশ প্রকট।

গণনিধন যজ্ঞের সূত্রপাত ঘটানোর জন্য যাদের দায়ী করা হয়েছে তাদের প্রকৃত পরিচয় বিচারবিভাগীয় তদন্তের এক্তিয়ারভুক্ত হওয়ায় নিশ্চিত করে এই মুহূর্তে কিছু বলা হয়ত ঠিক নয়। কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে রেলবগিতে আগুন দিয়ে করসেবকদের সঙ্গে নারী ও শিশুদের পুড়িয়ে মেরে কাপুরুষোচিত হিংস্রতা প্রদর্শন করেছিল গোধরার স্থানীয় সংখ্যালঘুরাই। সংখ্যালঘুদের সাধারণ মানুষেরা সবাই মহপুরুষ হবে এমন প্রত্যাশা নিশ্চয়ই কেউই করে না। তাই কোন পরিস্থিতিতে এই কাপুরুষদের হিংস রোষের বিস্ফোরণ ঘটেছিল সেটা অনুসন্ধান না করে উপায় নেই। (পরবর্তী সরকার অনুসন্ধানে জানা যায় রেল কামড়ায় আগুন ছিল দুর্ঘটনা– সংকলক)। এই প্রসঙ্গে আগের অনুচ্ছেদেই উল্লেখ করেছি আদর্শ হিন্দু রাজ্য হিসাবে গুজরাতকে মডেল করে তোলার অত্যুৎসাহে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের কোনঠাসা করে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে প্রক্রিয়ার অন্যতম অঙ্গ ছিল সমৃদ্ধ সংখ্যালঘু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের হতদরিদ্র অংশের মনে বিদ্বেষভাবকে ক্রমেই তীব্রতা দেওয়া। একাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও তাদের আনুকুল্য করেছিল। সর্বত্রই মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা সমালোচনা ও নিন্দার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠায় সংঘ পরিবারের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। এই ইস্যুটাকে তারা চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে গুজরাতের হিন্দুদের মনে সমগ্রিকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া রামজন্মভূমি বাবরীমসজিদ বিবাদের প্রশ্নেও তামাম মুসলিম সম্প্রদায়কে বাবরের আওলাদ বলে চিহ্নিত করে এই ঘৃণার ভাবকে আরও তীব্রতা প্রদান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অযোধ্যার রামজন্মভূমিতে মন্দির বানানোর ব্যাপারে গুজরাতি করসেবকদের অত্যুৎসাহ এবং সংখ্যাধিক্যের মূলেও প্রকৃত রামভক্তির বদলে এই তীব্র ঘৃণা অনেকাংশে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকতে পারে। যে কারণে করসেবকরা রেল যাত্রাকালে স্টেশনে স্টেশনে পোষাক-পরিচ্ছদে মুসলমানদের উপস্থিতি টের পেলেই– 'মন্দির কা নির্মাণ করো, বাবর কি আওলাদ কো বাহার করো'– শ্লোগান দেওয়ার ব্যাপারে তাদের উম্মাদনা ছিল যে কোন শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো। তাছাড়া বিভিন্ন স্টেশনে বিশেষ করে মুসলিম হকারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ঘটনা তো ছিলই। এমনকী যেদিন সবরমতী

এক্সপ্রেসের কামরা জ্বালানো হয় সেদিনও আসল ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল গোধরা স্টেশন থেকে ৭৫ কিমি দূরবর্তী দাহোড় স্টেশন থেকে। সেই স্টেশনে ভোর সাড়ে পাঁচটা/ছ'টার সময় ট্রেনটি পৌঁছালে করসেবকরা সেখানকার একটি স্টলে চা-বিস্কুট খেয়ে দাম দেওয়া নিয়ে স্টলের মুসলিম মালিকের সঙ্গে ঝামেলা করে এবং ওই স্টলটির উপর যথেচ্ছ ভাঙচুর চালায়। স্টল মালিক স্থানীয় থানায় নালিশ নথিভুক্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দেয়। তারপরেই সবরমতি এক্সপ্রেস থামে গোধরা স্টেশনে। সময় তখন সকাল সাতটা থেকে সওয়া সাতটা। করসেবকরা এবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই আর একটি স্টলে চা খেতে গিয়ে সেখানকার টুপি-দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ কর্মচারীর সঙ্গে ঝমেলা বাধায়। কিছুটা কথা কাটাকাটি হওয়ার পরেই করসেবকরা ওই বৃদ্ধির দাড়ি ধরে টান মারে এবং তাকে বেধড়ক পেটাতে শুরু করে। সেইদৃশ্য সহ্য করতে না পরে বৃদ্ধার ষোড়শ বর্ষীয়া কনা পিতাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে এবং করসেবকদের হাতে পায়ে ধরে কাকুতিমিনতি করতে থাকে। করসেবকরা সেই সুযোগে বৃদ্ধকে ছেড়ে ওই তরুণীকে টেনে নিয়ে এম-৬ কামরায় উঠে পড়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু করে। বৃদ্ধ আকুলভাবে ওই কামরার দরজায় করাঘাত করতে করতে তার মেয়েকে ছেড়ে দেওয়ার প্রার্থনা জানাতে জানাতে প্লাটফর্ম দিয়ে দৌড়তে থাকে। এর মধ্যে ট্রেনের শেষ কামরাটি প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে অন্য দু'জন ভেণ্ডার দৌড়ে শেষ কামরায় উঠে চেন টেনে দেয়। কিন্তু ট্রেনটি সম্পূর্ণ থেমে যাওয়ার আগে গোধরা স্টেশন থেকে কিছু কম/বেশি এক কিমি বেরিয়ে যায়। তারপর ওই দু'জন ভেণ্ডার এস-৬ কামরার কছে গিয়ে মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। কিন্তু করসেবকরা তরুণীটিকে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, কামরার জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ওই কামরার চারপাশে স্থানীয় লোক জমা হতে শুরু করে। ঘটনাটি শোনার পর তারা ওই বন্ধ কামরার ওপর ইটপাটকের ছোঁড়া শুরু করে। গণরোষ বাড়তে থাকে। ইতিমধ্যে কিছু দুষ্কৃতীকারীও নিশ্চয়ই জনতার ভিড়ে ছুটে গিয়ে থাকবে। তারা কাছাকাছি সিগনাল ফাঁড়িয়া থেকে চলতি ট্রাক, অটোরিক্শা ইত্যাদি থামিয়ে পেট্রোল ডিজেল সংগ্রহ করে এনে কামরাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। হয়ত এই দুষ্কৃতীকারীরা আগে থেকেই এরকম একটি হিংস্র ঘটনা ঘটানোর ষড়যন্ত্র করে রেখেছিল। তারা করসেবকদের হঠকারিতার ফলে উদ্ভূত মোক্ষম সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে ফেলে। করসেবকদের উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের কথা জনৈক পত্রলেখক স্টেটসম্যান পত্রিকায় গত ৭ মার্চ তারিখে বিস্তারিতভাবে লিখে জানিয়েছেন।

বিচারবিভাগীয় তদন্তে এই পত্রলেখককেও সাক্ষী করে তাঁর বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করা উচিত। তবেই বোঝা যাবে লালকৃষ্ণ আদবানি এবং নরেন্দ্র মোদী কথিত 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটা' আসলে কোথা থেকে শুরু হয়েছিল। তাঁরা উভয়েই দাবি করেছেন এই 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াজনিত' দাঙ্গাটিকে নাকি সবচেয়ে কম সময় অর্থাৎ বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর আগে গুজরাতের কোনও দাঙ্গাই নাকি এত

তাড়াতাড়ি থামেনি। যুক্তি হিসাবে কথাটা হয়ত ঠিকই। কিন্তু একথাও ঠিক, এবার সংখ্যালঘুদের ধন ও প্রাণের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে এমনটি আর কখনও হয়নি। আহমদাবাদের পুলিসকে এতখানি নিষ্ক্রিয় (কোন কোন ক্ষেত্রে দাঙ্গাবাজদের এমন সক্রিয় সহযোগী) আগে আর কখনও দেখা যায়নি। তারচেয়েও বড় কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় প্রতিরোধহীন সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ধরণটি ছিল এতটাই নিখুঁত যে বিশেষ করে তাদের ব্যবসাক্ষেত্রগুলি ধ্বংস করে ফেলত বেশি সময় লাগেনি। এইসব দোকানপাট, ফ্যাক্টরি, বেকারি ইত্যাদি ধ্বংস করার সময় পার্শ্ববর্তী হিন্দুদের সম্পত্তির যাতে ক্ষতি না হয় সে সম্পর্কে পরিকল্পনাও ছিল অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত। সমৃদ্ধ সংখ্যালঘু ব্যবসাদার ও কারখানা মালিকদের সম্পত্তি দ্রুত চিহ্নিত করার ব্যাপারে আগে থেকে থানায় নথিভুক্ত তথ্যের সাহায্য যে পাওয়া গিয়েছিল এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে সংখ্যালঘুদের দেউলিয়া করে ফেলার কাজটা অতি দ্রুত সেরে ফেলা সম্ভব হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় গুলিও চালান হয়েছে। গুলি চালানোর ব্যাপারটা অবশ্য সংখ্যালঘুদের সামান্যতম প্রতিরোধটুকুও গুড়িয়ে দেওয়ার জন্যেই করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যার ফলে নিহতদের মধ্যে নাকি সংখ্যালঘুদের সংখ্যাই বেশি। পুলিস যাদের গ্রেপ্তার করেছে তাদের মধ্যেও আধিক্য রয়েছে নাকি সংখ্যালঘুদের। অন্তত দাঙ্গায় যারা বলি তাদের অভিযোগ সেই রকমই। কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী আদবানিজি এখন অন্যরকম বলছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় ধ্বংসযজ্ঞ যে কেবলমাত্র বিশৃঙ্খল গণরোষের বিস্ফোরণের ব্যাপার হতে পারে না একথাটা তিনি মানতেই চাইছেন না। তিনি কেবল অল্প সময়ে দাঙ্গা থামিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটাই বারবার আউড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গার উদ্দেশ্য যদি এটা হয়– গুজরাতের সংখ্যালঘুদের অর্থনৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া করে দেওয়া এবং তাদের কয়েকশো মানুষকে ক্রমাগত আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে গোটা সম্প্রদায়টাকে আতঙ্কগ্রস্ত করে ফেলা তাহলে অল্প সময় স্থায়ী হলেও সেই উদ্দেশ্য যে ষোল আনাই সফল এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

সংঘ পরিবারের তৃতীয় উদ্দেশ্য হয়ত ছিল দাঙ্গাবিধ্বস্ত, আতঙ্কপীড়িত মুসলমানদের সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তান চলে যেতে বাধ্য করা। গুজরাতের সীমান্তেই রয়েছে পাকিস্তান। সেখানকার সিন্ধি মুসলমানদের সঙ্গে গুজরাতি মুসলমানদের একটা বিরাট অংশের আমাদের এখানকার ও বাংলাদেশের বাঙালিদের মতোই ভাষা ও সংস্কৃতিগত সাযুজ্য রয়েছে গভীরভাবেই। কিন্তু তবুও গুজরাতি মুসলমানরা কখনই পাকিস্তানে যেতে সম্মত হয়নি। দেশভাগের সূচনা পর্বেই ১৯৫০ সালে গুজরাতের আর এস এস ঘোষিত ভাবে দাঙ্গা শুরু করেছিল মুসলমানদের পাকিস্তানে ঠেলে পাঠানোর জন্য। ১৯৫৩ সালেও তারা আহমদাবাদ, পুনে, নাসিক এবং মাংলিতে গণপতি উৎসব ও মহরম উপলক্ষে দাঙ্গা বধিয়েছিল ওই একই ঘোষিত উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কিন্তু এসব দাঙ্গায় হাজার ক্ষয়ক্ষতি

সহ্য করে, শয়ে শয়ে বলিদান দিয়েও গুজরাতি মুসলমানরা স্বদেশভূমি ত্যাগ করে পাকিস্তানে যেতে সম্মত হয়নি। এবার তাদের উপর অত্যাচার আগের সমস্ত দাঙ্গার নজির ছাড়িয়ে গেছে। স্বল্পস্থায়ী হলেও পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গায় অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের যেভাবে সর্বস্বান্ত করা হয়েছে, যেভাবে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে মেরে তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করা হয়েছে তাতে আর কোন ভরসায় তারা হিন্দুস্তানে থাকতে চায় সংঘপরিবারের তরফে সেটা দেখে নেওয়ার একটা জিদ থাকা বিচিত্র নয়। সম্ভবত সেই কারণেই তাঁরা আওয়াজ উঠিয়েছেন 'মন্দির কা নির্মাণ কারো, বাবর কি আওলাদ কো বাহার করো।' কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এতসবের পরেও ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া উন্মূলিত মুসলমানদের কেউ কেউ কাতরকণ্ঠে জানতে চেয়েছেন, 'আমরা সবাই হিন্দুস্তানী, কেন আপনারা আমাদের সঙ্গে এরকম আচরণ করছেন?' এখন পর্যন্ত একজন মুসলমানও পাকিস্তানে চলে যাওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেনি। এরপরেও কি তাদের পাকিস্তানপ্রেমী বদনামটা ঘুচবে না? এই সব নির্দোষ হিন্দুস্তানীকে হত্যা করে, অকাতরে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরে সত্যি সত্যিই কি কাপুরষোচিত কাজ করা হয়নি? যাঁরা একাজ ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনামাফিক করেছেন তাঁরা কতখানি স্বদেশপ্রেমী? জাতির ঘাড়ে এইসব উন্মূলিত দেউলিয়া হিন্দুস্তানীর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন ধরনের স্বদেশপ্রমের পরিচয় দেওয়া হয়েছে? যারা স্বদেশবাসীর সংখ্যাগুরু অংশের মনে সংখ্যালঘু অংশের বিরুদ্ধে কিছু কিছু দুস্কৃতকারীর দুস্কর্মের নজির দেখিয়ে ক্রামগত তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলে সেই প্রক্রিয়ায় আপন হিন্দুস্তানী ভ্রাতাভগ্নীদের ভিটেমাটি থেকে উন্মূলিত করে স্বদেশ ছাড়া করার ষড়যন্ত্র করে, বাপুজির ভাষায় শুধু কাপুরুষ বললেও তাদের পরিচয় কি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়?

সংবাদ প্রতিদিন : ১৪.০৩. ২০০২

দাঙ্গার রাজনীতি : গুজরাত

দেবেশ রায়

গুজরাতের দাঙ্গায় বোধহয় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে দাঙ্গাকে আর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসাবে ভারতের মানুষজন মেনে নিতে পারছেন না। কথাটা সত্য কিনা, তা আর একবার যাচাই হবে ১৫ মার্চ। (নিবন্ধটি লেখা ১৫ মার্চের আগে– সম্পাদক) অযোধ্যায় মন্দির নির্মাণের কর্মসূচী হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, শিবসেনা কীভাবে পালন করে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও বিজেপি নতুন দাঙ্গা এখন চাইছে না। গুজরাতের পর অযোধ্যায় যদি দাঙ্গা হয়, তাহলে বাজপেয়ী সরকার বাঁচবে না। এই প্রথম স্বাধীনোত্তর কালের দাঙ্গার ইতিহাসে এমন কিছু ঘটতে চলেছে যে যারা দাঙ্গা বাধাতে চায় তারা আর একজোট থাকতে পারছে না, তারা টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, আর যাঁরা দাঙ্গা-বিরাধী তাঁরা তাঁদের শক্তি নিয়ে একজোট হয়ে যাচ্ছেন।

গুজরাত-দাঙ্গায় সেই শক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিল মিডিয়া, সংবাদপত্র ও টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে। গুজরাত সরকার চেয়েছিল সমস্ত খবর চেপে দিতে। টিভি-র বিভিন্ন চ্যানেল ও খবরের কাগজ সমস্ত খবর বের করে এনেছে। নরেন্দ্র মোদী স্টার চ্যানেল গুজরাতে নিষিদ্ধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের কাছে বলেছেন– সব কিছু মিডিয়ার ছড়ানো গুজব।

গুজরাতের এই দাঙ্গাকে কোনও কোনও সাংবাদিক বলেছেন, 'হাইটেক রায়ট'। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঝাড়াপিয়া, হিন্দু পরিষদের নেতা জয়দীপভাই, গোধরায় স্থানীয় বিজেপি ও হিন্দু পরিষদের নেতারা গোধরা স্টেশনের কাছে ঘটনাস্থল সিগন্যাল ফালিয়াতে পৌঁছে যান। এক সঙ্গে নয়। আলাদা আলাদা। কিন্তু তাঁরা সিগন্যাল ফালিয়াতে এক সঙ্গেই গিয়েছিলেন। সেখানেই হিন্দু পরিষদের নেতা জয়দীপভাই মুখ্যমন্ত্রী নেন্দ্র মোদীকে বলেন, 'আগামী কাল বন্ধ ডাকা হয়েছে। বিজেপি-র উচিত এই বন্ধকে সমর্থন করা। হিন্দুরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে।' তারপর জয়দীপভাই তাঁর সেলফোনে সর্বত্র নির্দেশ পাঠাতে থাকেন পোড়া কামরার ছবি কাগজে-কাগজে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, মিটিং-মিছিল বের করতে বলে, পরের দিনের ব্‌ন্‌ধের কথা জানিয়ে। বন্‌ধের কথা অবিশ্যি প্রথম বলেন বজরং দলের জাতীয় সহসভপতি হরেশভাই ভাট বেলা একটায় রাজকোটে এক সাংবাদিক সম্মিলনে, আহমদাবাদ রওনা হয়ে যাওয়ার আগে। তার মানে, সেলফোন-সেলফোনে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের নেতাদের মিটিং হয়ে গেছে বেলা বারোটাতেই, রাজ্য বিধানসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির (বেলা ২টা ৩০-এ) আগেই, এমন কি গোধরার ঘটনা পুরোপুরি জানারও আগে। বিজেপি এই বন্‌ধে সমর্থন জানিয়েছে ওই বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। তারপর আবার সেলফোন-সেলফোনে রোমিংয়ের আধুনিক কৃৎকৌশলের সুযোগ নিয়ে দিল্লি-আহমদাবাদ-বরোদা-গান্ধীনগরের মধ্যে মিটিং হয়।

সাংবাদিকেরা, টিভি ও খবরের কাগজের, এই হাইটেকই ব্যবহার করেছেন দাঙ্গার খবর দিতে। তাঁদের সেলফোন, ভিডিয়ো ক্যামেরা, রোমিংয়ের মাধ্যমে জোগাড়-করা খবর সারা ভারতের মানুষ দেখেছে শুনেছে। মিডিয়া দাঙ্গার বিরুদ্ধ মতকে সংগঠিত হওয়ার জায়গা করে দিয়েছে।

ভারতের বিপুল মধ্যশ্রেণী এখন দাঙ্গা চায় না, নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে প্রতিদিনই লাভবান মালিকেরা এখন দাঙ্গা চান না। সংগঠিত শ্রমিকেরা দাঙ্গা চায় না। দাঙ্গা তো লাগায় নেতারা– নেতারা যখন তাঁদের ব্যক্তিগত ও দলগত উদ্দেশ্যকে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত উদ্দেশ্য বলে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখনই সেই সম্প্রদায় দাঙ্গা বাধায়। বাবরী মসজিদ কি ভাঙা হত যদি আদবানি তার আগে তাঁর রথে চড়ে মন্দির নির্মাণকেই রাজনীতির কর্মসূচী করে না তুলতেন? ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গা কি চলত

যদি রাজীব গান্ধী সে দাঙ্গাকে মহীরুহ পতনের পরের ভূমিকম্পের সঙ্গে তুলনা করে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা না দিতেন?

গুজরাত দাঙ্গাও এই এলিট নেতাদের তৈরি। হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল, সংঘ পরিবারের এই কট্টরদের আর আর এস এস ও বিজেপি-র মধ্যে অযোধ্যা নিয়ে চিড় দেখা দিয়েছে। গুজরাতের বিজেপি ভেবে থাকতে পারে– গোধরা সেই সুযোগ এনে দিয়েছে যাতে গুজরাতের হিন্দু ঐক্য অটুট রাখা যায়। এখন সেই হিন্দু ভোটকে এক করে ক্ষমতায় স্থায়ী হওয়ার জন্যে গুজরাত বিধানসভার নির্বাচন এগিয়ে আনার কথাও উঠছে। ২৮ তারিখে হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের ডাকা ভারত বন্‌ধকে বিজেপি যদি সমর্থন না করত, তা হলে গুজরাত দাঙ্গা এমন ছড়িয়ে পড়ত না, এমন গভীরে যেত না। এই সমর্থনেই জানিয়ে দেওয়া হল– ২৮ ফেব্রুয়ারিকে হিন্দু দাঙ্গাবাজরা প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালন করুক।

১৯৯০ সাল থেকেই বিজেপি সারা দেশে দাঙ্গা সংগঠনের এক পদ্ধতি তৈরি করে তুলেছে। যে কেউ দাঙ্গা করতে পারে না–দাঙ্গা এখন স্পেশ্যালিস্টদের কাজ। ১৯৯০-এর আগ্রা দাঙ্গা, ১৯৯২-৯৩-এরে মম্বে দাঙ্গা, সুরাত দাঙ্গা, ১৯৬৯-এর আহমদাবাদ দাঙ্গা– এই সব দাঙ্গাই স্পেশ্যালিস্টদের করা, সব দাঙ্গায় একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে সংগঠিত।

সম্ভবত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে দিন তিন-চার-ষড়যন্ত্র-থিয়োরি গুজরাতে রটানো হয়েছিল। পরে সেটা সাংবাদিক সুজন দত্ত ও অঞ্জলি মোদী ফাঁসিয়ে দিয়েছেন। আদবানিও কয়েক ঘণ্টার আহমদাবাদ সফরে সাংবাদিক সম্মিলনে বলেছিলেন– গোধরা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা। আর দাঙ্গা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার ঘটনা।

মনে হয়, আমেরিকা প্রচারিত ইসলামি সন্ত্রাসবাদের তত্ত্ব ও এই সব সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সম্পর্কে আজগুবি সব গল্প অচেতনে আমাদের ওপর প্রভাবও ফেলছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বা 'মৌলবাদ' বা ধর্মান্ধতা বলে তো হিন্দুদের ধর্মান্ধতা– বোঝানো হচ্ছে? সেটা আমরা মানছি কী করে? হিন্দুত্ববাদী ওই সংঘ পরিবার কি ভারতের সমস্ত হিন্দুর প্রতিনিধিত্ব পেয়ে গেছে? হিন্দুদের মধ্যে তো এমন অনেকে আছেন যাঁরা কেবল বংশক্রমে হিন্দু, ধর্মবিশ্বাসে নন। বংশক্রমে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও অনেকে আছেন যাঁরা পৈতৃক বা মাতৃক এই ধর্মপরিচয় মানেন না। তা হলে, যে 'মৌলবাদ' বা সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মান্ধতা মাত্র কয়েকটি দলের বা গোষ্ঠীর– বিজেপি, সেবক সংঘ, হিন্দু পরিষদ, বজরং দল– তার দায় ভারতের হিন্দুরা বইবে কেন, যাদের নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ বলা হচ্ছে?

সংখ্যলঘুর 'মৌলবাদ' বা ধর্মান্ধতাই বা কী জিনিস? ইসলামি সন্ত্রাসবাদের যে অপ্রমাণিত কাহিনী আমেরিকা রটাচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে তাদের নীতি বলে ঘোষণা ও পুনর্ঘোষণা করছে, তাতে তো এমন কোনও দেশের ঘটনা বলা হয়নি যে দেশে

মুসলমানেরা সংখ্যালঘু। গোধরায় মুসলমান জনসংখ্যা বেশি। সেখানকার অলিগলি তস্যগলিতে সব সময়ই ভিড়– কারণ তাদের ঘরে জায়গা নেই বা ঘরই নেই। যে কোনও সময় যে কোনও ঘটনাতেই হাজারখানেক লোক জড়ো হয়ে যায়। করসেবকেরা গোধরা স্টেশনে দোকানগুলি থেকে খেয়ে পয়সা না দিয়ে ট্রেনে ফিরে গেলে দোকানদারেরাও ট্রেনে উঠে চেন টেনে দেয়। তার পর যা ঘটেছে তা সমাজবিরোধী জঘন্য অপরাধ– পুলিসই সেটা আটকাতে পারত, পুলিসেরই সেটা আটকানো উচিত ছিল। এমন একটি অপরাধকে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা বলা হবে কোন্ যুক্তিতে। একটা তাৎক্ষণিক সমবেত অপরাধকে কেন ধর্মের রং লাগানো হবে?– কারণ ধর্মচিহ্নিত দাঙ্গা সংগঠনই সংঘ পরিবারের প্রধান রাজনৈতিক পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। (ট্রেনের বগীতে আগুন ছিল দুর্ঘটনা, বলেছে সরকারী অনুসন্ধান– সংকলক)।

আজকাল : ১৪.০৩.২০০২

ইমারতে শরীয়াহর ৯.১০ ও ১২ মার্চ গুজরাত সফরের সরেযমীন তদন্ত রিপোর্ট

রিপোর্ট প্রস্তুত : মাওলানা আনীসুর রহমান কাসেমী

২৮ ফেব্রুয়ারী (২০০২ সালে) গুজরাতের দাঙ্গা শুরু হওয়ার পরে শীঘ্রই হযরত আমীরে শরীয়ত মওলানা নিজামুদ্দিন সাহেবের নির্দেশে 'ইমারত শরীয়াহ্ (বিহার, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড) ফুলবাড়ী শরীফ পাটনার তরফ থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে দাঙ্গা রোখার জন্য তৎপরতা শুরু করে দেন। হজরত আমীরে শরীয়ত স্বয়ং অবস্থার অবনতি ও দেশের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি দেখে ১ মার্চে দিল্লী পাড়ী দেন এবং ১৫ দিন যাবৎ এখানে থেকে যেটুকু সম্ভব তিনি করেন। পুনরায় তার নির্দেশে আমীরে শরীয়াহর প্রতিনিধি দল ৯, ১০ ও ১২ মার্চ আহমাদবাদ, সুরাত ও অন্যান্য স্থানে ভ্রমন করেন। এই প্রতিনিধি দলে প্রবন্ধকার (আনীসুর রহমান কাসেমী ছাড়া সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সহ সম্পাদক মুফতী নাসীম আহমাদ সাহেব কাসেমী, মাওলানা রিজওয়ান আহমাদ নাদবী, মাওলানা আখতার হুসেন শামসী, মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব, মাওলানা মসউদ আহমাদ সাহেব এবং মাওলানা কামার আনীস সাহেব প্রমুখ শামিল হন। এই প্রতিনিধিদল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত শহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। ক্যাম্পের শরণার্থীরা মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলোর ধ্বংসাবশেষ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ, ঘরবাড়ি ও দোকানসমূহের পুড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া ইত্যাদির পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন। তারপর রিলিফের কাজ শুরু করে দেন। এই প্রতিনিধিদলের অনুমান যে, ১২ দিনেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত গুজরাতের বিভিন্ন শহর সমূহে এবং গ্রামাঞ্চলে রিলীফ ক্যাম্পে তিন সপ্তাহ থেকে লোক পড়ে আছে যাদের

সংখ্যা প্রায় এক লাখ। সরকারী তরফ থেকে তাদের জন্য জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর কোন ব্যবস্থা নেই। আর কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না তাদের ঘর বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের। এসব লোকেরাও যাদের ঘর-বাড়ি লুঠতরাজ করে আত্মসাৎ করা হয়েছে বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, এখন ঘরে ওই অবস্থায় ফিরে যেতে চায় না। সন্ত্রাস ও ভীতি তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের মধ্যে অনেক লোক এমনও আছে যাদের সামনে তার বংশের লোকেদের কসাইরা হত্যা করে। অথবা জীবন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। এই প্রতিনিধিদলের অনুমান যে এ দাঙ্গা পরিকলিপতভাবে মুসলমানদের নিধনকল্পে এবং ব্যবসা বাণিজ্যকে শেষ করে দেওয়ার জন্য সংগঠিত করা হয়। যাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং আর এস এস এর প্রধান ভূমিকা। আর এর সহযোগিতা করে রাজ্য সরকার। প্রতিনিধি দলের ধারণা যে ভয় ও হতাশার কারণে রাজ্যের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় আমদানী ও রপ্তানী বন্ধ। আবার এ-কারণে গুজরাত বা দেশের অন্যান্য প্রান্তে জাতীয় ও সামাজিক স্তরে আমদানী ও রপ্তানী হচ্ছে না। অথচ সময়ের একান্ত তাগিদ গুজরাতের অত্যাচারীতদের মধ্যে পৌছে তাদের বিধ্বস্ত হৃদয়কে আশার আলো দেখানো। কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের ওপর তাদের সাহায্য ও পূর্ণবাসনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। বিগত ২০০০ সালে যখন ভূমিকম্প হয় তখন দেশ-বিদেশের অনেক রকম সাহায্যকারী সংস্থারা গুজরাতে পৌছে মানবতার খাতিরে বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করেন। কিন্তু সময় যখন গুজরাতের বেশিরভাগ জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এখনও পর্যন্ত সাহায্যকারী সংস্থসমূহের তরফ থেকে কোন অনুদান দেওয়া হচ্ছে না। এখন আমাদের উচিৎ যে, সরকার ভেদাভেদভুলে গিয়ে এই বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্য করা। এই পরিস্থিতিতে যদি দেশ-বিদেশের সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহ সাহায্য না করে তো মনে হয় যে, এইসব সম্বলহীন মানুষ যাদের জ্বালানো হয়েছে এবং ঘরবাড়ি দোকানপাট, কারখানা, হোটেল এবং ব্যবসায়কে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। দারিদ্রতা ও অনাহারে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌছে যাবে। এ-থেকে বিশ্বে এই নঞর্থক সংবাদও পৌছে যাবে যে, আমাদের দেশে সাহায্যের ব্যাপারে না কেবল সরকার ভেদাভেদ করছে বরং মানবতাবাদী সংস্থাগুলোও এতে প্রভাবিত হয়ে যায়। এ-সময় আমাদের উচিৎ যে, ক্যাম্পের শরনার্থীদের জন্য খাওয়াদাওয়ার দ্রব্যসামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, হাড়ি খুন্তি ও অন্যান্য জীবনদারণের বস্তু সামগ্রী সরবরাহ করে তাদের এই সহায়-সম্বলহীনতা দূরীভূত করা। এদের ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হোক। এইজন্য ইমারতে শরীয়াহর প্রতিনিধিগণ না কেবল সরকার এবং মুসলমানের নিকট বরং দেশের তামাম সাহায্যদাতা সংস্থাসমূহ, ব্যাঙ্কসমূহ এবং বিত্তশালী কোম্পানীর নিকট আবেদন করেন যে, তারা যেন সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সাড়া দেয় এবং বিপর্যস্ত মানষের অন্তবর্তী শান্তি ছাড়াও তাদের পূণর্বাসনের ব্যাপারে শীঘ্রই মনোযোগ দেয়। এই (সংশ্লিষ্ট) প্রতিনিধি দলের অনুমান যে, রাজ্য সরকার সুস্পষ্টভাবে দাঙ্গাবাজদের

পৃষ্ঠপোষকতা করছে। না তাদের গ্রেফতার করছে, না সঠিকভাবে অত্যাচারীদের এফআইআর গ্রহণ করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে বদলানোর জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে চটজলদি এগিয়ে আসা উচিৎ। এবং তামাম সেকুলার পার্টির নেতৃবর্গকে সেখানে গিয়ে নিজ নিজ দলের লোকদের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান, হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরের ওপর বিদ্বেষাত্মক মনোভাব দূর করা, তাদের বেড়ে যাওয়া দূরত্বের অবসান ঘটানো এবং বোঝাপড়ার (আপসে) মাধ্যমে মিলমুহব্বত বাড়ানো এবং অত্যাচারীতদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইমারাতে শরীয়াহ আহমদাবাদ, সুরাত, বড়োদাহ, আনন্দ প্রভৃতি স্থানে রিলিফের কাজ শুরু করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ কেবল অন্তবর্তী শান্তির জন্য এককোটিরও বেশি টাকা খরচ হবে। কিন্তু পূনর্বাসনের জন্য আরও বেশি অর্থের প্রয়োজন। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে আবেদন তারা আর্থ সঞ্চয় করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। চেক অথবা ড্রাফটের ওপর কেবল লিখুন ঃ "বাইতুল মাল ইমারাতে শরীয়াহ" ঠিকানা ঃ সম্পাদক, ইমারাতে শরিয়াহ ফুলবাড়ী শরীফ। পাটনা ৮০১৫০৫, আহমদাবাদ রিলিফ ক্যাম্পের ঠিকানা ঃ ইমারতে শরীয়াহ রিলিফ ক্যাম্প, আহমদাবাদ ৩৮০০০১, ফেন ঃ ০৭৯-২১৩১১২১১-২১৩৮১৭৪৪ ফ্যাক্স ২১৬০১৬।

শরীয়াহ প্রতিনিধিদল যেসব বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করেছেন তা আহমদাবাদ ক্যাম্প অফিসের তরফ থেকে প্রচার করা হচ্ছে। আশা রাখি যে, দেশের বাগ্মী ওলামায়ে কেরাম, মসজিদ অফিসের কমিটি, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষক এর ওপর বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন।

দাঙ্গার পূর্বে

গুজরাত রাজ্য হিন্দু ও কট্টরপন্থী সংগঠনের কেন্দ্রস্থল। এখানে হিন্দুত্ববাদী এবং রাজনৈতিক দল বি জে পি সরকার বিগত কিছু বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত। তারা তাদের সরকারে থাকাকালীন এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম পারস্পরিক বিদ্বেষ, একইরকমভাবে খ্রীষ্টান এবং হিন্দু বিদ্বেষ বাড়িয়ে দিয়েছে। আর সংশ্লিষ্ট কারণে এখানকার মুসলিম এবং খ্রীষ্টান সংখ্যালঘুদের বস্তি, কারবার, দোকান, কারখানা, মাদ্রাসা ও মসজিদ, ইস্কুল এবং গির্জার আলাদা আলাদা তালিকা প্রস্তুত করানো হয়। যার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা দু-বছর পূর্বে সরব হয়ে কোর্টের মাধ্যমে এর প্রতিরোধ করে। এখানকার মানুষ অধিক সংখ্যায় ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদের শাহাদাতে নিযুক্ত হয়। এবং অধিক সংখ্যায় তারা মসজিদকে শহীদ করে। পারভীন ভাই তুগড়ীয়ার (জেনারেল সেক্রেটারী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) সম্পর্ক এই রাজ্যের আহমেদাবাদ শহর। দশ বছর পর বাবরী মসজিদের জমির ওপর মন্দির নির্মাণ করার জন্য এখানকার হিন্দু কট্টরপন্থী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শাসক দল বি জে পি-র সহযোগিতায় ১৫ মার্চে শীলাপূজা এবং মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা বানায়। আর সংশ্লিষ্ট কারণে গুজরাত থেকে অধিক সংখ্যায় মানুষকে

ট্রেনে চাপিয়ে অযোধ্যা অভিমুখে রওনা করাতে শুরু করে দেন। এসব লোকেরা বিশেষভাবে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে এবং স্টেশনে নেমে ওখানকার দোকানদারদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য জোরজবরদস্তি ছিনিয়ে নিত। ২৮ ফেব্রুয়ারি সবরমতী এক্সপ্রেসে চেপে অযোধ্যা গামী বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যবৃন্দ জিলা দরীয়াবাদ এবং ফায়জাবাদ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে রুদৌলী এবং বড়াগাঁও স্টেশনে মুসলিম যাত্রীদের ওপর হামলা করে, তাদের দাড়ি ছেড়ে, পর্দাবৃত মহিলাদের নেকাব ছিঁড়ে দেয় এবং অশ্লীল ব্যবহার করে যার কারণে ওই এলাকার মুসলমানরা ট্রেনে ভ্রমণ করা থেকে বিরত হন। এই ঘটনার দ্বিতীয় দিন দৈনিক হিন্দুস্তান সবরমতী এক্সপ্রেসে মুসলিম যাত্রীদের ওপর সংঘটিত হামলার নিন্দনীয় রিপোর্ট প্রচার করেন। কিন্তু মিডিয়ার একাংশ ফায়যাবাদ অযোধ্যার আশপাশের মুসলমানদের ওপর বজরং দলের ত্রিশূলধারী এবং রামসেবকদের অপকীর্তির ওপর সম্পূর্ণ পর্দাবৃত করে রাখে। অবশ্য ফায়যাবাদের দৈনিক জনমোর্চা হিন্দী ভাষার একমাত্র সংবাদপত্র যারা সর্বদা বজরংদল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামসেবকদের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের পর্দা উন্মোচন করতে থাকে। জনমোর্চা-র ২৫ ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় উল্লেখিত আছে যে,

"ট্রেনের মধ্যে করসেবকদের দ্বারা সংঘটিত হিংসা এবং গুজবে ফায়যাবাদ জেলায় উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারী সকালে আহমাদাবাদ থেকে আসা সবরমতী এক্সপ্রেসে কম-বেশি আড়াই হাজার করসেবককে গুজরাত থেকে অযোধ্যা পৌঁছে দেওয়া হয়। ওই করসেবকরা বিহারের মুজাফফারপুর যাওয়ার জন্য ট্রেনে বসে থাকা দাড়িওয়ালা একজন যাত্রীকে ফায়যাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে বগি থেকে বার করে দেয়। এবং পাকিস্তান বিদ্বেষী ও জয় শ্রীরামের শ্লোগান তোলে। মুসলিম যাত্রীরা করসেবকদের এই সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে জি আর পি থানার ইনচার্জ সঞ্জীব শ্রীবাস্তবের কাছে নালিশ জানালে থানা ইনচার্জ তাকে গার্ডের কামরায় উঠিয়ে দেন।" সংবাদপত্র আরো লেখে যে, বাড়াগাঁও রুদৌলী স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুই যুবককে ট্রেন থেকে ফেলে দেওয়া হয়। রুদৌলী মাদ্‌রাসা জামিয়াতুল ইসলামীয়ার ২০ বছরের শিক্ষার্থী তাওহীদকে সবরমতী ট্রেন থেকে এক স্টেশনে ফেলে দেওয়া হয়, এবং অন্যান্য যুবকের পরিণতি কি হয়েছে তা পর্যন্ত জানা যায় নি। ট্রেনের মধ্যে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন এবং সন্ত্রাসকে ঘিরে এক সংঘর্ষের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে যায়। ২৫ ফেব্রুয়ারী হিন্দী "দৈনিক জাগরণে" লেখা হয় যে, রুদৌলী স্টেশনে করসেবক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় যাতে আসার আহমাদের শরীরে ভোজালী ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ডজন ডজন জখম হন। ওই ট্রেনে অগণিত করসেবক অযোধ্যা যাচ্ছিল যারা মুসলিম যাত্রীদের ট্রেনে চড়তে দেয় নি। এবং জয় শ্রী রাম শ্লোগান দিতে থাকে।

রেলওয়ে জেনারেল ম্যানেজারকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয় যে, তিনি যাতে যাত্রী নিরাপত্তা দেন। করসেবকদের ওই আচরণের জন্য অযোধ্যা এবং ফায়যাবাদের

মুসলমানরা সন্ত্রস্ত হয়ে যান। এবং কয়েকদল ওখান থেকে অন্যত্র গমন করতে শুরু করে দেন। দুষ্কৃতকারী করসেবকদের নির্লজ্জ আচরণের কারণে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তেতে উঠেছিল। স্থানে স্থানে উত্তেজক স্লোগান, খাদ্যদ্রব্যের স্টলে জোর করে পুরী-কচুরী খেয়ে নেওয়া, ফায়জাবাদ থেকে গুজরাত এবং রাজস্থান আসা ট্রেনে চাপা মুসলিম যাত্রীদের সাথে টিটকারী করা যেন এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। এ-সিলসিলা প্রায় ২০ দিন যাবৎ জারী ছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারী সবরমতী এক্সপ্রেসে কিছু মুসলমান নিজের পরিবার-পরিজন পুরুষ ও মহিলাদের সাথে ভ্রমণ করেছিল। ওই মুসলিম মহিলাদের ওপর করসেবকরা উৎপীড়ন করতে থাকে এবং অশ্লীল আচরণ শুরু করে দেয়। একজন মুসলিম যাত্রীকে বগি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনা

পরের দিন যখন ২৭ ফেব্রুয়ারী গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেস সকাল ৭টায় পৌঁছায় তখন একটি মুসলিম বালিকা শাহিদা বেগম বড়োদাহ যাওয়ার জন্য ট্রেনে উঠতে গেলে করসেবকরা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। স্টেশনে রহীম চাচার স্টলে চা খেয়ে চলে যাওয়ার সময় তিনি পয়সা চাইলে করসেবকরা তাকে বেদম মারধোর করে। ট্রেন সেটশন ছাড়তে শুরু করায় করসেবকরা দৌড়ঝাপ করে উঠতে থাকে। ট্রেন এগিয়ে চলে। ফলিয়া সিগন্যালের কাছে পৌঁছুতেই কেউ চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দেয় যেখানে মানুষ জড়ো হয়েছিল। তারা পাথর ছুড়তে শুরু করে। তা দেখেই ট্রেনের মধ্যে বসে থাকা মানুষ সব জানালা এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। ভেতরে এদের কাছে কয়েকপ্রকার দ্রব্যাদি ছিল যেমন সোডা, গ্যাস, কেরোসিন তেল এবং কিছু অগ্নি সংযোগে সহায়ক দাহ্য পদার্থ ও অন্যান্য কিছু সাজ সরঞ্জাম। স্থনীয় দর্শকরা বলেন যে, জড়ো হওয়া জনতা অবশ্যই পাথর ছুঁড়েছিল কিন্তু আগুন ভেতর থেকেই লেগেছিল। যাইহোক এ ব্যাপারে উপযুক্ত তদন্ত প্রয়োজন এবং যে গোষ্ঠীই একাজ করুক না কেন তা যথেষ্ট নিন্দনীয়।

গুজরাতে আগুন বিশ্ব হিন্দু পরিষদই লাগায়

গুজরাতে হত্যা যজ্ঞের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আবেদনে আমলকারীরা যে তুফান খাড়া করে রাখে তা তাদের পরিকল্পিত কর্মসূচীর অংশ ছিল। মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে তাদের প্ররোচনা এক নতুন দিকে মোড় নিতে থাকে। অন্যদিকে ইউ.পি. নির্বাচনে বিজেপির পরাজয়ে কেন্দ্রীয় (বিজেপি) সরকার হতাশ হয়ে যায়। এইজন্য তারা বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেতৃবর্গের তরফ থেকে জারী হিংস্র বিবৃতিতে আদালতের ফায়সালা মানবে না বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে সরকার না কেবল কোন তৎপরতা গ্রহণ করে বরং তাদের প্রত্যাশা পূরণ করে। এরই মধ্যে গোধরা ট্রেনের ঘটনা ঘটে যা

নিঃসন্দেহে তীব্র নিন্দনীয়। কিন্তু এই ঘটনাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গুজরাত থেকে মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিধনযজ্ঞের জন্য নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবহার করে। এবং এই কর্মসূচী ধূর্ততার সাথে এত তাড়াতাড়ি তৈরি হয় যে, গুজরাতের সংখ্যালঘু মুসলিমরা এটা বুঝতে পারে নি। গুজরাতের এই দুর্ঘটনায় বিশ্ব হিন্দু-পরিষদ, করসেবকদের নির্লজ্জ অত্যাচার, নির্যাতনমূলক তৎপরতার যথেষ্ট প্রমাণ সংবাদমাধ্যম সংস্থা এবং থানায় দায়ের করা এফ. আই. আর থেকে জানা যায়।

দেশ ব্যাপী বন্‌ধ ঘোষণা

বিশ্বহিন্দু পরিষদ দ্বিতীয় দিনে দেশব্যাপী বন্ধের ডাক দেয় যা পুরোপুরি বিজেপি, বজরং দল ও অন্যান্যরা সমর্থন করে। ২৭ ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের দিকেই মোড় নেয়। পরের দিন গুজরাতের স্থানীয় গুজরাতী ভাষার সংবাদপত্রের এই খবরকে এমনভাবে ফুলিয়ে-ফাপিয়ে ছাপা হয় যে, গোটা গুজরাতে গুজবের বাজার গরম হয়ে যায়। এতে হিন্দু ভাববেগকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত করে। অন্যদিকে হিন্দুত্ববাদীরা নিজ সদস্যদের এইজন্য প্রস্তুত করে, যখন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বন্ধের কারণে তাদের দোকান, কারখানা থেকে দূরে থাকবে তখন সেসব লুঠতরাজ করা যাবে অথবা জ্বালিয়ে দেওয়া যাবে। একসাথে তারা প্রতিশোধ নেওয়ার আওয়াজ উঠিয়ে গোটা গুজরাতের ওইসব মুসলিম মহল্লায় আগুন লাগাতে শুরু করে, যারা তাদের বাসস্থানে ছিল না। এতে ভরপুর সহযোগিতা করে পুলিস, বিজেপি, কিছু রাজনৈতিক সমর্থক এবং সামাজিক ব্যক্তিবর্গ। বন্ধের সথে সাথেই যখন দাঙ্গা শুরু হয় তখন প্রশাসন কারফিউ জারি করে। এবং মুসলমানদের তাদের ঘরে বন্দী থাকতে বাধ্য করা হয়। দাঙ্গাবাজরা নির্বিঘ্নে লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং হত্যা ও ভাঙচুরের বাজার গরম করতে থাকে। কারফিউ মুসলমানদের এলাকায় জারী করা হয়। অথচ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এলাকায় কারফিউ জারীর প্রয়োজন অনুভব করা হয় নি।

সরকারের রীতিনীতির ভূমিকা

এই ঘটনা গুজরাত সরকারও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৎপরতার জন্য ব্যবহার করে। সরকারের দায়িত্ব ছিল যে, শীঘ্রই এই দুর্ঘটনার তদন্ত ঘোষণা করা এবং মৃতদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য অনুদানের ঘোষণা করা এবং গোটা রাজ্যে পুলিস, র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স প্রভৃতি বাহিনী সতর্কতার সাথে মোতায়েন করা এবং সাধারণ মানুষের জানমালের হেফাযতের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ জারী করা। তা না করে তারা দুষ্কৃতীদের উৎসাহ দেয়। এবং কেবল ২৭ ঘন্টায় গুজরাতের শান্তি ও আইন শৃঙ্খলা তছনছ করে দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার গুজরাতের রাজ্য সরকারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেই চলেছে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টে বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেন যে, গুজরাত সরকার কেবল ২৭ ঘন্টার মধ্যে অবস্থা

নিয়ন্ত্রণে আনে। তিনি তাদের এই কার্যকলাপের প্রশংসা করেন এবং তিনি সর্বদা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করতে থাকেন। যখন কিনা স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ও সামাজিক দলসমূহের তরফ থেকে অনবরত বলা হচ্ছিল যে, এ দাঙ্গা রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হচ্ছে। আর অবস্থা এটা প্রমাণ করে যে, ১৮ দিন বিগত হওয়ার পরেও (এই তদন্ত রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত) হিংসা, লুঠতরাজ এবং অগ্নি সংযোগ অব্যাহত। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, প্রধানমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেননি অথবা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি বা তাদের বিরুদ্ধে তৎপরতা গ্রহণ করেননি। বিপরীতপক্ষে তারা গুজরাতের সাম্প্রতিক দাঙ্গাকে ১৯৮৪ এর দাঙ্গার সঙ্গে তুলনা করতে থাকে।

গণহত্যা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, গুজরাতের ২০০২ সালের সাম্প্রতিক দাঙ্গা পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের নিধনযজ্ঞ। এই পরিকল্পনাকে চালাকী ও ধূর্ততার সাথে বাস্তবায়িত করা হয়। ৮ দিন যাবৎ গুজরাতের দশ জেলায় অসংখ্য শহর ও গ্রামে পাশবিক নৃত্য চলতে থাকে, মানবতার বস্ত্র হরণ করা হতে থাকে, নির্দোষ, নিষ্পাপ শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধদের শহীদকরা হতে থাকে। আগুন লাগানো হতে থাকে। অন্যদিকে সরকারী প্রশাসন যন্ত্র নীরব তামাশা দেখতে থাকে। বরং তাদের ইশারায় বেলেল্লাপনা কাজ করতে থাকে। ১৩ মার্চ পর্যন্ত সংবাদ অনুযায়ী এক হাজারেরও বেশি নির্দোষ জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে যখন কিনা গ্রামাঞ্চল থেকে সঠিক খবর তখনো এসে পৌছায়নি। এই দাঙ্গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল নির্মম ও হিংস্রভাবে মানুষের রক্ত ঝরায় এবং বিশেষতই নিষ্পাপ শিশু এবং মহিলাদের রক্তে হোলি খেলে। জ্বলন্ত শিশুদের চীৎকার শুনে পাশবিক কাঠামোর মানুষদের হৃদয় দয়া ও মানবতার আবেগে আপ্লুত হওয়ার পরিবর্তে তাদের পাশবিক হিংস্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তাদের নিদারুণ যন্ত্রণামূলক আর্তিতে অট্টহাসি করতে থাকে। তা থেকে তাদের রামভক্তির প্রকৃত স্বরূপ বাইরে বেরিয়ে আসে। এই দাঙ্গায় ওইসব হিংস্ররা এক নতুন এবং অসাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করে যে, শহীদ মানুষদের জন্য দু-গজ জমিও যেন না দিতে হয়। অথচ এই হিংস্রতার প্রমাণও যেন না পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতে এটা প্রথম দাঙ্গা যাতে অধিক সংখ্যায় পলায়নরত মানুষদের ওপর পেট্রল ছড়িয়ে এবং ঘর-বাড়ির মধ্যে বন্দী অবস্থায় আগুন লাগানো হয়। তাদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় মহিলা এবং শিশু। ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধি দল ভি এস হসপিটালে এমন কয়েকজন আহত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করেন যারা ওই সময় জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে মুহাম্মদ ইয়াসিন জাওয়াহের নগরের কাহিনী শিহরণ জাগানো।এই শিশুর বয়স মাত্র ৮ বছর। শিশুটি তার মায়ের সাথে ২৮ ফেব্রুয়ারী পালাচ্ছিল। দাঙ্গাবাজরা ওই পরিবারের ওপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে

দেয়। যার কারণে ১৮ জন ঘটনাস্থলেই শহীদ হন এবং এ নিষ্পাপ শিশু আগুনে পুরোপুরি ঝলসে যায় এবং তার হাত এবং পা সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যায়। এতে ২৮ বছরের ইমরান ইবনে আব্দুল মাজিদও শামিল। সে এক নব মুসলিম পরিবারের একমাত্র আদরের সন্তান। সে ধুলকা মাদরাসা মানবাউল উলুম শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী। দাঙ্গাবাজরা ২৮ ফেব্রুয়ারীর রাতে হামলা করে এবং তাকে তলোয়ার দিয়ে মেরে আগুনে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে দেন। সবচেয়ে বেশি মর্মবিদায়ী কাহিনী মুহাম্মদ আইয়ুবের স্ত্রী রাজীয়া বানুর।

রাক্ষসরা তার ২০ দিনের নিষ্পাপ শিশু সহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করে। যার কারণে মা ও শিশু উভয়েই গুরুতর আহত হয়ে যান। চামানপুর কালমার্ক সোসাইটিতে ১৫ জনকে, যার মধ্যে বর্ষীয়ান রাজনৈতিক নেতা আহসান জাফরীর পরিবারও শামিল, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নরোদাপাতিয়ায় ২০ জনকে যার মধ্যে ছোট ছোট শিশু এবং মহিলারাও অন্তর্ভূক্ত, জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এ সময় এই পরিবার তাদের নিষ্পাপ শিশুদের সাথে ভি এস হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পঞ্জা লড়ছিল। নরোদার হাজার হাজার মানুষ শহরের বিভিন্ন ক্যাম্পের শরণার্থী। যার মধ্যে অধিক সংখ্যায় হযরৎ শাহ আবিদ দরগাহ ক্যাম্পে। ওইসব মানুষরা বলেন যে, আমাদের বস্তিতে আমাদের পনেরশ ঘর ছিল এবং দশ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা ছিল যদের মধ্যে বেশিরভাগ শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ছিল। মুসলিম মহিলা নাসিমা কওসারী ছিলেন গর্ভবতী। তার পেট চিরে তার গর্ভজাত শিশুকে বের করা হয়। তারপর মা ও সন্তান উভয়কেই একসাথে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। দোঘরা থেকে একঘন্টার দূরত্বে তাফালকা পাণ্ডোরেড়ায় ৭০০-এর মধ্যে ৫০ ঘর সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারমধ্যে একশরও বেশি নির্দোষ মানুষের জীবন বিসর্জন দিতে হয়। আর অবশিষ্টরা ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে আছে। একইভাবে সারা গ্রামে এক মুসলিম পরিবারের ১৭ জন এবং তাদের আড়াই বছরের শিশু সন্তানকেও নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়।

দাঙ্গায় ব্যবহৃত হাতিয়ার

গুজরাত দাঙ্গার সবচেয়ে চিন্তা করার বিষয় এই যে, এটা সংগঠিত এবং পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করা হয়। লুঠতরাজ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণের যে ভয়ানক ঘটনাবলী ঘটে সেসব বেশিরভাগ দিনের আলোয় সংঘটিত হয় এবং এতে বেশিরভাগ স্থানে একশ'র থেকেও বেশি লোক জিপগাড়ী, ট্রাক এবং অন্যান্য বড় গাড়ীতে পেট্রোল, গ্যাস সিলেন্ডার, একপ্রকার এ্যাসিড, ডিনামাইট বোমা জমা করে রাখে। এরপূর্বে গুজরাতের আগের দাঙ্গাগুলোয় দাঙ্গাবাজরা ছোরা, তলোয়ার, পিস্তল ইত্যাদি ব্যবহার করেছিল এবং বেশিরভাগ লুঠতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। দাঙ্গাবাজ কসাইরা ২৮ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১২টার পর গ্যাস সিলেণ্ডারের সাহায্যে গুলমার্ক সোসাইটির প্রাচীর ভাঙে এবং দিনের আলোতে ৫০-এরও বেশি জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারে এবং

পুরো সোসাইটিকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করে ছাড়ে। আহমদাবাদ শহরের সর্বজনবিদিত মুসলিম বসতি আনসারনগরে অবস্থিত মাদরাসা কাসিমুল উলুমের ধ্বংসের দৃশ্যকে ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধিদল স্বচক্ষে দেখেন। সেই ট্রাকটিকেও মাদরাসার পাশে পুড়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়।

মসজিদ ও মাদ্‌রাসাসমূহের ধ্বংস

বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বিজেপি এবং তাদের সহযোগী দলগুলো বিগত কয়েক বছর যাবৎ গোটা হিন্দুস্তানে মসজিদ ও মাদ্‌রাসাসমূহের বিরুদ্ধে হিন্দুভাবাবেগকে উস্কানী দিতে এবং তাদের সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত করার নাপাক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা প্রকাশ পায় গুজরাতের সাম্প্রতিক দাঙ্গায়। দাঙ্গাবাজরা অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। জিনিসপত্র লুঠপাট করে এবং ধুলিসাৎ করে দেয়। শহর গ্রামের ডজন ডজন মসজিদকে রাতারাতি মন্দিরে রূপান্তরিত করে। এবং তাতে মূর্তি স্থাপন করে। সুরাত এলাকার জামি মসজিদ কাওসার-এর সবকিছু লুঠপাট করে নেয়। প্রাচীর ধরাশয়ী করে। শুকর হত্যা করে এর রক্তে মসজিদের চত্বর রঞ্জিত করে। আর তেমনিভাবে আনসার সোসাইটি মহাবীর ফোঙ্গার-এর মসজিদকে শহীদ করা হয়। ১৩ মার্চ পর্যন্ত সংবাদ অনুযায়ী, আহমদাবাদ শহরে ২৬টি মসজিদ এবং দরগাহকে হিন্দু কট্টরপন্থীরা মন্দিরে রূপান্তরিত করে নেয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর আহমদাবাদের অনেকগুলো মসজিদ এবং দরগায় হনুমানের মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং সব এলাকাবাসীদাবী করে যে, তাদের ধ্বংসকৃত মসজিদগুলোর মধ্যে হনুমানজী দর্শন দেবে।

নরোদা পাতিয়ার জামে মসজিদ নূরীর ইমাম মাওলানা আব্দুস সালাম রিজবী ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধি দলকে বলেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রথমে মসজিদের জিনিসপত্র জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয় যার মধ্যে কোরআন করীমের পুস্তক এবং ধর্মীয় পুস্তকাদিও ছিল। তারপর মসজিদের প্রাচীর ভাঙে এবং এরমধ্যে হনুমানের মূর্তি স্থাপন করে দেয়। এমনিভাবে আনসারনগরের মসজিদকেও নিশানা বানানো হয়। এবং মসজিদের জিনিষপত্র এবং কোরআন করীম গ্রন্থসমূহকে দাহ করার পর মসজিদের অন্তবর্তী অংশে গ্যাস সিলেন্ডারের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পরে ঈদদাহ গেটের মসজিদ যা পুলিস স্টেশনের সামনে অবস্থিত, সেটাকেও আগুন লাগানো হয় এবং তৎসহ তার সব দোকানপাটে লুঠতরাজ চালানোর পর অগ্নিসংযোগ করা হয়।

আনসার নগরের মাদরাসা কাসিমুল উলুমের বাড়িটি চারতলা। এর ওপর হাজার হাজার দাঙ্গাবাজ পুলিসের চোখের সামনে হামলা চালায়। তাদের সাথে ছিল একটি ট্রাক যার ওপর ছিল পেট্রোল এবং বিস্ফোরকজাত সরঞ্জাম। দাঙ্গাবাজরা মাদ্‌রাসার সিঁড়ি ভেঙে কামরার মধ্যে ঢুকে জিনিসপত্র, বই-পুস্তক এবং কোরআন করীমের পাণ্ডুলিপিসমূহকে আগুনে দাহ করে। মাদ্‌রাসা ভবনের মধ্যে মদ্যপান করে। অতিকষ্টে মাদ্‌রাসার পরিচালক

মাওলানা মাহবুব সাহেব ছাত্রদেরকে বাইরে বের করে আনেন। গুজরাতের এই দাঙ্গায় ডজন ডজন দরগাহ্ এবং কবরস্তানকেও ভাঙা হয়। এসব চরম উন্মত্ততা। এ কত বড় লজ্জা এবং দুঃখের কথা যে, দাক্ষিণাত্য ওয়ালীর মাযার ধ্বংস করে দেশের এক মহান কবির নিশানা মুছে দেওয়া হয়েছে।

আর্থিক ক্ষতি

গুজরাতের সাম্প্রতিক দাঙ্গা থেকে প্রস্তুত করা ছক অনুযায়ী কট্টরপন্থী সংগঠনসমূহ মুসলমান নিধনযজ্ঞ এবং তাদের কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্যকে তছনছ করার পরিকল্পনা বানায়। তারা মুসলমানদের দোকান, কারখানা, বাণিজ্যকেন্দ্র, হোটেল এবং ঘর বাড়ির সার্ভে করে রাখে। সুতরাং এই সার্ভে অনুযায়ী ২৯ ফেব্রুয়ারী সকাল থেকেই পুরো গুজরাতকে দাঙ্গার আগুনে ঠেলে দেওয়া হয় এবং মুসলমানদের জান ও মালের জবরদস্ত ক্ষতি করা হয়। বিশেষকরে আহমাদাবাদ শহর এবং সুরাট ও বড়োদাহ্ কারবার এবং ব্যবসার কেন্দ্রস্থল এবং জীবনজীবিকায় মুসলমানরা ছিল স্বচ্ছল। এই শহরগুলোকে বিশেষভাবে দাঙ্গাবাজরা টার্গেট বানায় এবং অসংখ্য দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, হোটেল, এবং মুসলমানদের অন্যান্য সম্পত্তি আগুনে দাহ করা হয়। সার্ভে রিপোর্ট অনুযায়ী দশ হাজারেরও বেশি ঘরবাড়ি, মুসলমানদের দোকান এবং ২০০০ ছোট বড় কারখানা ও বাণিজ্যকেন্দ্র ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মফঃস্বল এলাকার সার্ভে ১৩ মার্চ পর্য্যন্ত করা যায়নি। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এই দাঙ্গা মুসলমানদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়া ইন্ড্রাসট্রিজ অনুমান করে যে, এই দাঙ্গার কারণে দৈনিক ৪০০ কোটি টাকা লোকসান হতে থাকে। কেবল দাঙ্গার ১৭ দিন পরেও লুটপাট এবং মুসলমানদের সম্পদ ধ্বংসকরার সিলসিলা অব্যাহত। দাঙ্গায় যেসব দোকান এবং সম্পদ জ্বালানো এবং লুট-পাট করা হয় তার অনুমান করে বলা যায় যে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর থেকে প্রত্যহ ৫০ কোটি টাকার সম্পদ ক্ষতি হয়। দোকান ছাড়া ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ট্রান্সপোর্ট, ব্যাঙ্ক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যহ ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়। কনফেডাশেন এর চিফ্ এক্সকিউটিভ অফিসার সুনীল পরেখ বলেন যে, কেবল শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই প্রত্যহ ৩০০ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এই দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

রিলিফ

গুজরাতের সাম্প্রতিক দাঙ্গায় রাজ্যের দশজেলার অসংখ্য শহর, নগর এবং গ্রামের একলক্ষেরও বেশি মানুষ ছিন্নমূল হয়ে পড়েন। তারা কেবলমাত্র পরনের কাপড়টুকু নিয়ে

নিজ নিজ বস্তি থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে বিভিন্ন স্থানে এবং শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন এবং ওই সময় ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ কেবল আহমদাবাদ শহরের বিভিন্ন ক্যাম্পে শরণার্থী। যখন কিনা বড়োদহ, সুরাত এবং আনন্দ-এর ক্যাম্পেও হাজার হাজার বিপর্যস্ত মানুষ আশ্রিত। এই শরণার্থীদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় ওইসব নির্যাতিত মানুষ রয়েছে যাদের পরিবারের বেশিরভাগ মানুষকে শহীদ করা হয়, এবং তাদের জিনিসপত্র লুঠতরাজ করে তাদের ঘরবাড়ি এবং দোকানপাট পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময় সেই ক্যাম্পে বেচারীরা জীবন অতিবাহিত করছে যেখানে তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীরও সরবরাহ নেই। এবং খোলা আকাশের নীচে প্রখর রৌদ্রের তাপে তারা দিনাতিপাত করছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবার এমন আছে যাদের নয়নাশ্রু শুকিয়ে গেছে।

সরকারের কর্তব্য ছিল যে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং উজাড় হয়ে যাওয়া মানুষের অন্তবর্তী ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের চেষ্টা করা। কিন্তু যে সরকার দাঙ্গার পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার গোটা মেশিনারীকে মুসলমানদের জানমাল ধ্বংস করতে এবং দাঙ্গাকারীদের মদদে ব্যবহার করে সে সরকার রিলিফ এবং অন্তবর্তী শান্তির জন্য কি করতে পারে। যারা মনুষ্য রক্তপিপাসু এবং শবদেহের স্তুপের ওপর ক্ষমতার চেয়ার কব্জা করতে চায়, তাদের কাছ থেকে কল্যাণকর কি আশা করা যেতে পারে।

স্থানীয় মানুষরা তাদের মহল্লায় অসহায় মানুষদের জন্য ক্যাম্প বানিয়ে তাদের জীবন বাঁচানোর কাজ করে। এবং তাদের সমর্থ অনুযায়ী শরণার্থীদের খওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকে। অথচ এক সপ্তাহব্যাপী না মুখ্যমন্ত্রী না তাদের কোন প্রতিনিধি ক্যাম্পে এসে তাদের কষ্টক্লেশ এবং পেরেশানী জানার চেষ্টা করেন। যদি বা এক দু জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েও থাকেন তো তিনি সমবেদনা প্রকাশের পরিবর্তে নির্যাতিত - নিপীড়িতদের ক্ষতস্থানের ওপর নুন ছিটানোর চেষ্টা করেন। এদিকে কিছু দিন থেকে ক্যাম্পে সরকারের তরফ থেকে নির্ধারিত ২০০ গ্রাম আটা, ১০০ গ্রম চাল, ৫০ গ্রামের হিসাবে তেল, ডাল এবং দুধ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এসব দ্রব্যদিও নিম্নমানের। যা ব্যবহারে ক্ষুধা নিবারণের পরিবর্তে রোগগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধি দলকে হযরৎ শাহ আলম ক্যাম্পে, যেখানে আট হাজারেরও বেশি মানুষ শরণার্থী, এখানকার তত্ত্বাবধায়করা বলেন যে, ভাজপা সরকারের তরফ থেকে কোন প্রতিনিধি আসেনি বা উপযুক্ত অনুদান পাওয়া যায়নি। শাহ হামাদ কাম্পের তত্ত্বধায়করা বলেন যে, সরকারের তরফ থেকে যে আটা এসেছিল তা খুব নিম্নমানের এবং ব্যাবহারের অনুপযোগী। আমরা সেগুলো খাওয়ার উপযুক্ত মনে করিনি। দাঙ্গার ১৭শ দিন পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে বিপর্যস্ত পরিবারকে আর্থিকভাবে কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি। আর না শহীদদের বংশধরদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধিদলের অনুমান যে, বিগত বছরে গুজরাতের ভয়ানক ভূমিকম্পে বিপর্যস্তদের অন্তবর্তী ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য দেশ এবং বিদেশের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে পঞ্চাশেরও বেশি সংগঠন এবং মানবসেবী সংগঠনসমূহ বিপর্যস্তদের সাহায্য ও ত্রাণকাজে রত ছিল। কিন্তু এবার জীর্ণ হাল মানুষদের ত্রাণকাজের জন্য তাদের দেখা যাচ্ছেনা। ইমারাতে শরীয়াহ ওই তামাম সংগঠনের কাছে আবেদন করে যে, তারা মানব সেবার পুন্যকর্মে এগিয়ে আসুন এবং অবিলম্বে দাঙ্গায় বিপর্যস্তদের ত্রাণকাজ এবং পুনর্বাসনের দায়িত্ব পালন করুন।

আদালতী তদন্ত

২৮ ফেব্রুয়ারী গোধরা ট্রেন দুর্ঘঠনা অনুষ্ঠিত হয়। তারপরের দিন থেকে গোটা গুজরাতে দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। যদি ওইদিন আদালতী তদন্তের ঘোষণা দেওয়া যেত তো অত্যাচারীতদের মধ্যে বিচারের আশা সঞ্চার হত। এবং দাঙ্গাবাজরা ভয় পেয়ে যেত কিন্তু এমনটা হয় নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করে যে, সুপ্রিমকোর্টের কোন বর্তমান জজের মাধ্যমে আদালতী অনুসন্ধান করা হোক। কিন্তু তাও হয়নি। রাজ্য সরকার তাদের দূরভিসন্ধি প্রকাশ করে কয়েক দিন পরে কেবল গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত প্রাক্তন সেশন জর্জ জাস্টিস শাহের মাধ্যমে করানোর ঘোষণা দেন। তিনি সেই জজ যিনি ৮৫-র দাঙ্গার যে সিদ্ধান্ত দেন তার ওপর সুপ্রিমকোর্ট হস্তক্ষেপ করেছিল। এবং বর্তমানে তিনি ভাজপার ওকালতী প্যানেলের সদস্য। রাজ্য সরকার দাঙ্গার আদালতী অনুসন্ধানের ওপর থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়। যখন কিনা তার এই অপদার্থ ঘোষণার ওপর চারদিক থেকে নিন্দা করা হয় তো কয়েকদিন পার হয়ে যাওয়ার পর এর পরিসীমা বৃদ্ধি করে তামাম গুজরাতব্যাপী ছড়ানো দাঙ্গাকে শামিল করা হয়। কিন্তু বিচারপতি শাহ-এর অতীতের কথা স্মরণ করে মুসলমানরা এবং রাজনৈতিক দলসমূহ তার ওপর পুরো ভরসা করতে পারে না এবং তার পরিবর্তে অন্য কোন জজকে নিযুক্ত করার আবেদন বরাবর অব্যাহত।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা

গুজরাতের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোদী হিন্দু কট্টরপন্থী সংগঠন আর এস এস-এর উৎসাহী এবং কর্মী-সদস্য। তার অবির্ভাব মুসলিম বিরোধীতার পরিবেশে। ১৯৯২-এর অযোধ্যা আন্দোলনে তিনি তার হাজার হাজার সমর্থকদের নিয়ে বাবরী মসজিদের শাহাদাতে শামিল ছিলেন। গুজরাতের দুর্ভাগ্য যে, কেশু ভাই প্যাটেলকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে সরিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে তার মুসলিম বিরোধী মনোভাবের কারণে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিগত ২৬ জানুয়ারী ২০০১ সালের ভূমিকম্পে বিপর্যস্তদের পূনর্বাসন এবং গুজরাতের পূনর্নির্মাণের পরিবর্তে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর গুজরাতের মুসলমান নিধন এবং আর্থিক দিক থেকে তাদের সহায়-সম্বলহীন করে দেওয়ার সক্রিয় পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করেন এবং তারপর এই পরিকল্পনার মাধ্যমে গোটা

গুজরাতে দাঙ্গার আগুন লাগিয়ে দেন। গুজরাতের আলোচ্য দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতার পরিণতি নয় বরং সরকারী সন্ত্রাসবাদের পরিণতি। খোদ মুখ্যমন্ত্রী এই দাঙ্গার পৃষ্ঠপোষকতা এবং নযরদারী করেছিলেন। তিনি প্রথম পর্যায়ে গোধরা ট্রেন দুর্ঘটনার দায় মুসলমানদের দিকে ঘোরাতে এবং দাঙ্গাকে এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘোষণা করার চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, গুজরাতের দাঙ্গা করসেরকদের ওপর হামলার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার পরিণাম। যা ভ্রান্ত বিবৃতি এবং প্রকৃত সত্যকে বিকৃতি করে পেশ করার নামান্তর। প্রকৃত ঘটনাবলী একথা বলে যে, এ-দাঙ্গা পূর্বপরিকল্পিত ও সংগঠিত। যখন ২৮ ফেব্রুয়ারী মুখ্যমন্ত্রীর ইশারায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার সহযোগী দলসমূহ ভারত বন্ধের ঘোষণা দেয় তো মুখ্যমন্ত্রী মোদী নিজখোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। আর তারপর গুজরাতের তামাম রাস্তা এবং বিশেষ করে মুসলিম মহল্লায় পুলিস মোতায়েন করে দেন। ২৮ ফেব্রুয়ারী সকাল ৮টা থেকে দাঙ্গার সূচনা হয় যা উঠোউঠি কয়েকদিন যাবৎ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চলতে থাকে। কয়েক জায়গায় তাদের জোটের মন্ত্রীদেরকে এবং পুলিসকে দাঙগাবাজদের নেতৃত্ব দিতে দেখা যায়। ১৩ মার্চ পর্যন্ত গুজরাতে এক হাজার মুসলমানকে শহীদ করে দেওয়া হয়। অসংখ্য নিষ্পাপ শিশু, মহিলা পুরুষকে জ্যান্ত জ্বালানোর এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্যকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেওয়ার পরও মুখ্যমন্ত্রীর পিপাসা মেটে না। বরং ছিন্নমূল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মুসলমানদের অশ্রুকে শুকাতে এবং তাদের যখন নিরাময় করার পরিবর্তে তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সুতরাং যখন দাঙ্গার দু-দিন পর তিনি কতিপয় মুসলিম এলাকায় পৌছান তো তিনি নিপিড়ীত-নির্যাতিত মানুষদের এটা জিজ্ঞাসা করেন নি যে, এখানে কত মানুষ নিহত হয়েছেন, কত মানুষ আহত হয়েছেন, কতটা ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে এবং পুলিসের ভূমিকা কি ছিল। বরং এর পরিবর্তে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে আর কটা মাদ্রাসা আছে। মুখ্যমন্ত্রী গুজরাত দাঙ্গা আড়াল করতে এবং মানুষের এই দিক থেকে মনোসংযোগ হটানোর জন্য সবরকম সম্ভাব্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। ভারত এবং দুনীয়ার মানুষকে এ বিশ্বাস করানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন যে, গুজরাতে যা কিছু হয়েছে তা গোধরার ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম। এ জন্য তিনি গুলবার্গ সোসাইটি যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। যেখানে এহসান জাফরী ও তার পরিবার সহ ২০ জনকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

এ বাস্তব সত্যকে উড়িয়ে দেওয়ার অবকাশ নেই। ১ মার্চ যখন গুজরাতের মুসলিম বস্তিগুলোতে কেবল ছিল আগুন আর আগুনের দাপাদাপি তখন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, হিংসা কবলিত এলাকাগুলো সৈন্যদের অধীনে দেওয়া হবে না, এবং কখন, কোথায় কত সৈন্য মোতায়েন করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেবে স্থানীয় পুলিস। তার এই ঘোষণা সত্ত্বেও গুজরাতে যে ১৩ কোম্পানী সৈন্য পৌছে যায় কোন জায়গায় তাদের মোতায়েন করা হয় নি।

মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপরাধমূলক গাফিলতি এবং অকর্মণ্যতার কথা স্বীকার করেন সমতা পার্টির নেতা প্রতরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণাভেজ। তিনি বলেন যে, ১৯৬৯ সালেও

ভয়ানক দাঙ্গা সংগঠিত হয়। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও তার অন্যান্য মন্ত্রীগণ আমার সাথে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা পদব্রজে পরিদর্শন করেছিলেন যার প্রভাব কল্যাণকর হয়। কিন্তু এবার আমাকে একলা দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় পরিদর্শন করতে হয়। সাথে সাথে তিনি এও স্বীকার করেন যে গুজরাতে যা কিছু হচ্ছে তা আইন-শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের ব্যার্থতা। প্রকাশ থাকে যে, মুখ্যমন্ত্রী ফৌজের ব্যবহারে সর্বদা বাধার সৃষ্টি করতে থাকেন এবং মোতয়েন করার পরও তাদের নিয়ন্ত্রন প্রশাসনের নিজ হাতে রাখেন। মোদীর আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন গোধরা ট্রেনে দুর্ঘটনায় মৃতদের আত্মীয় স্বজনকে দু'লক্ষ টাকা এবং দাঙ্গায় কসাইদের হাতে শহীদদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করার ঘোষণা দেন যা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে হত্যা, আইনের ১৪ নং ধারার বিরুদ্ধাচরণ এবং সরাসরি অবিচার। যখন চতুর্দিক থেকে এর সমালোচনার ঢেউ বয়ে যেতে শুরু করে তো তিনি পুনরায় মুসলিম বিরোধীতার ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের জন্যেও একলাখ টাকা কমিয়ে দেন যাতে মুসলিম শহীদগণের আত্মীয়স্বজনদের দু-লক্ষ না দিতে হয়। বিগত ১৭ দিন যাবৎ (১৩ মার্চ পর্যন্ত) যা কিছু গুজরাতে ঘটতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং মানবাধিকার কমিশনের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের নিন্দা এবং অকর্মণ্যতার কথা প্রকাশ করা সত্ত্বেও দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা না করা রাজ্য সরকারের সন্ত্রাসবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে। দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দরাও তা স্বীকার করেন।

পুলিসের বর্বরতা

গুজরাতের সাম্প্রতিক দাঙ্গা পুলিসের পুরানো সব রেকর্ড এবং তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়। এবং তাদের মুখ থেকে মানবতার মুখোশ খসে গিয়ে তাদের মুখমণ্ডলের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। তাদের পাশবিকতা, বর্বরতা এবং অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনীসমূহ বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ঘোরে ফেরে। এ দাঙ্গায় তারা না কেবল তামাশা দেখার ভূমিকা পালন করেছে বরং হামলাকারী ও দাঙ্গাবাজদের নেতৃত্ব এবং পৃষ্ঠপোষকতার কাজ করতে থাকে। এদের চোখের সামনে এবং নাকের ডগায় দাঙ্গাবাজরা লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ভাঙচুর করা এবং জীবন্ত মানুষের জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটাতে থাকে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কারখানা, দোকান এবং ফ্যাক্টরীসমূহ অগ্নিসংযোগ করা হতে থাকে আর পুলিস তামাশা দেখতে থাকে। বরং খাকি পোশাকের মর্যাদা এবং তাদের নিজ কর্তব্য ভুলে গিয়ে দাঙ্গাবাজদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ওই কাজে শামিল থাকে। বহু পুলিস স্টেশনের সামনে দাঙ্গাবাজরা মসজিদ এবং দোকানপাট ধুলিস্মাৎ করে দেয়। এবং পুলিস তাদের বাধা প্রদান করার পরিবর্তে উৎসাহ দেওয়ার কাজ করতে থাকে।

ভারতের বহুল প্রচারিত দৈনিক "হিন্দু" তাদের ১৩ মার্চের প্রকাশনায় লেখে যে, নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসন পুলিসকে শুরুতেই নির্দেশ দেয় যে, তারা সংখ্যালঘুর উপর

ধ্বংসাত্মক হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা যেন না নেয়। [ইনকিলাব] ২৮ ফেব্রুয়ারী দাঙ্গার খবর পাওয়া মাত্রই রাজ্য রিজার্ভ পুলিসের জওয়ান কমিশনারের দফতরের বাউন্ডারীর মধ্যে তাদের ডিউটির জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে থাকেন। কিন্তু একজন অফিসার বলেন য, আমরা অপেক্ষায় বসেই থাকি অথচ আমাদের উচ্চপদস্থ অফিসারের তরফ থেকে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় নি। রাপিড অ্যাকশন ফোর্সের একটি কোম্পানীকে বন্দর শহরে এদিকে-ওদিকে খাঁড়া করে দেওয়া হয়। যখন কিনা অধিক স্পর্শকাতর এলাকা বাপুনগর এবং নরোদায় সারাদিন ব্যাপি ভয়ানক দাঙ্গার সিলসিলা জারী থাকে। সন্ত্রাসবাদীরা এলাকায় এলাকায় যেতে থাকে। কিন্তু পুলিস কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। এই দিন আহমাদবাদের চমনপুর এলাকার সোসাইটিকে দাঙ্গাবাজরা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে। এবং গ্যাস সিলেন্ডার ছুঁড়ে প্রাচীর ভেঙে প্রবেশ করে কয়েক ঘন্টা যাবৎ লুটপাট, হত্যা ও ভাঙচুর এবং জীবন্ত মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়ার ভয়ানক সিলসিলা জারী রাখে। সোসাইটির জনপ্রিয় এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন এম.পি এবং প্রবীন লেখক ও নেতা জনাব এহ্সান জাফরী সাহেব মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিস কমশিনার এবং উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে বারবার আবেদন করতে থাকেন এবং তাদের ওপরে পতিত কিয়ামত সম বিপদের কথা উল্লেখ করতে থাকেন। কিন্তু পাশাবিক রাক্ষসের উপস্থিতিতে তার এবং তার অসংখ্য নির্যাতিত-নিপীড়িত সাথীদের ফরীয়াদ শোনার কেউ ছিল না। অবশেষে এই দিন পাশবিক রাক্ষসরা জাফরী এবং তার পরিবারের ১৮ জন সহ সংশ্লিষ্ট সোসাইটির আরো ৭ জন মানুষকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেয়। যতে বেশিরভাগ নিষ্পাপ শিশু, যুবতী এবং মহিলারা শামিল। ১ মার্চ পর্যন্ত তাদের পোড়া শবদেহকে আগুন এবং ধ্বংসস্তুপ থেকে বের করার কেউ ছিল না।

ওই দিনই হৃদয়বিদারক ঘটনা কিশোর সার্কেলে সংঘটিত হয়। ঘন্টার পর ঘন্টা মুসলমানদের বাসস্থান এবং দোকানগুলোতে আগুন লাগানো হতে থাকে এবং আগুনের স্ফুলিঙ্গ আকাশ ছুয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। মারা যাওয়া এবং পুড়িয়ে দেওয়া নিষ্পাপ শিশুদের এবং অন্যান্য মানুষের তারস্বর চীৎকার ও আর্তনাদ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এই বাড়ি থেকে মাত্র ১০০ ফুট দূরত্বে একজন পি এস সি র‍্যাঙ্কের অফিসার পাশের দোকান থেকে চেয়ার নিয়ে পুলিস জওয়ানদের সাথে বসে মৃত্যুপথযাত্রীদের চীৎকার ও আর্তনাদে হাসাহাসি করতে থাকেন। যখন ওই অফিসারকে একটি টেলিভিষন চ্যানেলের রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করেন যে, এসব কিছু আপনার সামনে হচ্ছে আর আপনি হাসছেনতো তার জওয়াব ছিল "আরে ইন লোগোকো কুছ আওর হাঙ্গামা কর লেনেদো। কিউ রোড়ে আটকা রাহে হো, আখের গোধরা মে কোই কম লোগ নেহী মারে গ্যায়ে" অর্থাৎ : এদের আরো কিছু সন্ত্রাস করে নিতে দাও। কেন তাদের মাঝে পড়ছো। কেননা গোধরায় কম লোক মারা যায় নি।

আহমাদাবাদের নরোদাহ পাতীয়ায় সবচেয়ে বেশি জান ও মালের ক্ষতি হয়। এখানে তিনশর বেশি মানুষকে মৃত্যুর ঘাটে পৌছে দেওয়া হয় এবং ১৫০০ বসতির গ্রামকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। এইসব বস্তির বেঁচে-যাওয়া লোকেরা আহমাদাবাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তুদের মত জীবন-যাপন করছে। এরমধ্যে অধিক সংখ্যায় হযরত শাহ আলম ক্যাম্পে অবস্থানরত। এই বাসিন্দাদের যিম্মাদার মুহাম্মদ ইউসুফ সাহাব এবং নুরী জামি মসজিদের ইমাম আব্দুস সালাম রিজবী ইমরাতে শরীয়াহর সহকারী পরিচালক মুফতী নাসীম আহমাদ কাসমীকে বলেন যে, সকাল সাড়ে দশটায় হঠাৎ দশ হাজারেরও বেশি মানুষ আমাদের বসতিতে হামলা করে। তাদের অগ্রভাগে ছিল পুলিস। যারা গুলি চালিয়ে মুসলমানদের নিজনিজ ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য করেছিল এবং এইভাবে পুলিসের সহযোগিতায় দাঙ্গাবাজরা ৫০ জন মানুষকে পুড়িয়ে মারে। এতে ২০ বছর থেকে আট বছরের নিষ্পাপ শিশু এবং মহিলারাও শামিল। মহিলাদের উপর অশ্লীল আচরণও করা হয়। গোটা বস্তিকে তছনছ করে দেওয়া হয়। এই বস্তির খুব নিকটে পুলিস ফাড়ি অবস্থিত। একইরকমভাবে প্রেম দরওয়াজার সংলগ্ন ঈদগাহ গেট মহল্লার জামি মসজিদ এবং পুলিস স্টেটশনের মধ্যে কেবর ফারাক একটি রাস্তার ওপার-ওপার। দাঙ্গার প্রথম দিনেই দাঙ্গাবাজরা পুলিসের চোখের সামনে মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন দোকান ছাড়াও মুসলমানদের ১৪৭টি ঘরবাড়ি ও দোকান জ্বালিয়ে দেয়। এছাড়া গর্ভবতী নাসীমা বিবি (২৫) এবং মুহাম্মদ ইয়াসীন আবদুল্লাহকে শহীদ করে দেয়। আর পুলিস তামাশা দেখতে থাকে।

১ মার্চ সকাল পর্যন্ত দাঙ্গার আগুন আহমাদাবাদ থেকে ছড়িয়ে গুজরাতের ছোট-বড় তামাম শহরসমূহে বিস্তৃত হয়। বড়োদাহ, সুরাত, গোধরা, রাজকোট, গান্ধীনগর, মেহসানা, সান্তারা, বানাস কান্টা এবঙ কয়েকটি ছোট ছোট শহর দাঙ্গার আগুনে জ্বলতে থাকে এবং জীবন্ত মানুষের পুড়িয়ে মারার মানবতাবিরোধী খবর আসছিল। কিন্তু রাজ্যের উচ্চ পদস্ত অফিসার এবং পুলিস মুখে কুলুপ এটে বসে থাকে।

এস এস হাসপাতালে ইমারাতে শরীয়াহর প্রতিনিধিদলকে মুহাম্মদ ফারুক, সুন্দরম নগর, যাকে দাঙ্গাবাজরা গুরুতর যখম করে এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি বলেন যে, আমাদের বাসস্থানে হামলা হয় এবং হামলাকারীদের আগে আগে ছিল পুলিস। আমি প্রাণ বাঁচিয়ে পালাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় পুলিস আমাকে জোর করে ধরে হামলাকারীদের হাতে সমর্পণ করে দেয়।

পুলিসের বর্বরতার আর একটি প্রমাণ এই যে, ৫ মার্চে যে লরী নিষ্পাপ এবং অত্যাচারিত শহরবাসিকে নিয়ে ছোট লোহাপুরের বড়োদাহ যাচ্ছিল। তাতে উল্লেখিত দুষ্কৃতীরা অকস্মাৎ হামলা করে যার কারণে অনেকজন শহীদ হন, অনেকে আহত হন এবং কিছু মানুষ নিজ প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যান। আশ্চর্যের কথা এই যে, পুলিস হামলাকারীদের ওপর গুলি চালায়নি।

রাজনৈতিক দলসমূহ

ভারতকে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ঠেলে দেওয়ার নাপাক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এবং এ আগুনের তেজ গুজরাতে সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতীরা একে হিন্দুরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টায় রত। গুজরাতের এবারের দাঙ্গা এই চেষ্টার অঙ্গীভূত। ২৮ ফেব্রুয়ারী থেকে গুজরাত দাঙ্গার আগুনে জ্বলতে থাকে এবং ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল চুপচাপ তামাশা দেখতে থাকে। সোনীয়া গান্ধী গুজরাতের দাঙ্গা-বিদ্ধস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের বরখাস্ত এবং দাঙ্গাবাজদের গ্রেফতার এবং গুজরাতে দাঙ্গা বিরতির প্রয়াসে তিনি সফলতা পাননি। দাঙ্গার দিন ২৮ ফেব্রুয়ারী রাতে সমাজবাদী দলের এক প্রতিনিধিদল জেনারেল সেক্রেটারী অমর সিংয়ের নেতৃত্বে শাবানা আযামী এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সমিমিলিতভাবে গুজরাতে পৌছান এবং তারা দাঙ্গা বন্ধের জন্য রাজ্য সরকারের ওপর চাপ দেন। যাই হোক কংগ্রেসকে এই রাজ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা উচিৎ। এ কাজ প্রসংশনীয় যে, খোদ সোনীয়া গান্ধী তার দলের সব পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে গুজরাত সফর করেন। অবস্থার পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু যতটা সফলতা পাওয়ার প্রয়োজন ছিল ততটা পাননি।

গুজরাত দুর্ঘটনার ওপর দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিভিন্ন নেতা গুজরাতের দাঙ্গাকে সরকারী সন্ত্রাস বলে আখ্যা দেন। এবং বলেন যে, এই ভাবমূর্তির লোক না দেশের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারে না জাতির। এই ঘটনার পর যেসব নেতৃবৃন্দ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দিল্লী প্রত্যাবর্তন করে সাংবাদিকদের কাছে তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তারা দেশপ্রেমীদের জন্য এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার আমন্ত্রণ জানান। সমাজবাদী পার্টীর জেনারেল সেক্রেটারী অমর সিং বলেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এ বক্তব্য তীব্র নীন্দনীয় যে, গুজরাতের ঘটনা গোধরা হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ২৭ ফেব্রুয়ারীর রাত থেকে গুজরাতে যা কিছু হয়েছে তা সরকারের সহযোগিতায় সংগঠিত গণহত্যা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সাম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ওপর। এই বেদনাদায়ক ব্যাপারে মুসলমান নয় বরং সারা দেশ প্রভাবিত হয়। গোধরা হোক, আর আহমাদাবাদ, সুরাত হোক, ক্ষতি ভারতের হয়েছে। তিনি এও বলেন যে, এ অপরাধ ওইসব লোকেরা করেছে যাদের ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তারা তো কেবল সমাজবিরোধী। তাদের মাফ করা উচিৎ নয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সীতারাম ইয়েচুরী বলেন যে, গুজরাতের দাঙ্গা ৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গার থেকেও বেশি বীভৎস। রাজ্য সরকার তা বন্ধ করতে এবং মুসলমানদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। ওই সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়া উবাইদুল্লা আযমী, শাবানা আযমী, সৈয়দ শাহনাওয়াজ এবং গোলাম মাহমুদ বানাতওয়ালা তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

ভাষান্তর ঃ মুনাওয়ার হোসেন

এই পাশবিকতার উৎস কোথায়?

আলম নাকভী

আর এস এসের প্রধান কে.সি. সুদর্শন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহাভারতের। তা মহাভারতের সূচনা করার জন্যে কোনও বাহানার দরকার তো ছিলই। সেই বাহানা জোটানো হলো গোধরা থেকে। গুজরাত এমনিতেই আর এস এসের পরীক্ষাগার। এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ গোধরা দুর্ঘটনার ঠিক এক সপ্তাহ আগে ২০ ফেব্রুয়ারীতে, হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে, রামমন্দির নির্মাণের পথে যেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তাকে হিন্দুদের প্রতিশোধের শিকার হতে হবে। গুজরাতে এখন সেই হিন্দু ব্যাক-লাশ-ই চলছে। গোধরা দুর্ঘটনা নিঃসন্দেহে মানবতা-বিরোধী এবং শত হাজার নিন্দনীয়। কিন্তু এই পাশবিকতা কোথা থেকে এল? হতে পারে, সবরমতী এক্সপেসকে থামানোর, তাতে পাথর ছোঁড়ার এবং কয়েকটি বগিতে আগুন লাগানোর কাজ যারা করেছে তাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম ছিল মুসলমানদেরই মতো, কিন্তু ইসলামের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। কেননা ইসলাম জোর-জুলুম ও সীমালংঘন না করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। এইসব অপকর্ম সেইজাতীয় ধারাই করিয়েছে, যা ভারতীয় জাতির অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। নামধারী মুসলমানরা মনুষ্যত্ব বিরোধী আচরণ করে থাকলে, ওই জাতীয় ধারার অনুসরণেই তা করে থাকে। (পরবর্তীতে সরকারী অনুসন্ধানে প্রকাশ ট্রেনের কামড়ার আগুন ছিল দুর্ঘটনা – সংকলক)।

১৯৮২ সালে শিখদের গণহত্যাও তো হিন্দু প্রতিশোধ ছিল। পাঞ্জাবে বাস থেকে নামিয়ে নামিয়ে হিন্দুদের হত্যা করার প্রতিশোধ। ওই সমস্ত শিখ উগ্রপন্থী– যারা ১৯৮০-র দশকে পাঞ্জাবের শহরে-গ্রামে হিন্দুদের বাঁচা মুশকিল করে দিয়েছিল– শাস্তি পেয়েছে কিনা আল্লাহ্ই ভালো জানেন কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর ১৯৮৪ সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে তার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল হাজারো নিরাপরাধ শিখকে হত্যা করে, যাদের পাঞ্জাবের উগ্রপন্থার সথে দূরতম সম্পর্কও ছিল না। এটা ছিল জাতীয় ধারার কার্যকলাপ।

১৯৯২-এর ডিসেম্বরে দুই মাথাড়ী ভাগ্যবানের খুন ছিল ইউনিয়ন বিরোধিতার ফলশ্রুতি। ১৯৯৩-র জানুয়ারিতে রাধাবাঈ চালে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও প্রথমে সাম্প্রদায়িক হিংসার ফলশ্রুতি ছিল না। এক মাতব্বরের জমিদখলের লোভ আর জাতীয় ধারার কিছু প্রতিবেশীর লালসা একত্র হয়ে ওই ঘটনার জন্ম দিয়েছিল কিন্তু ওটাকে বানানো হয় হিন্দু প্রতিশোধের বাহানা। তারপর '৯৩-এর জানুয়ারীতে মুম্বাইয়ে যা ঘটেছিল আজ সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটানো হচ্ছে গুজরাতে। হিন্দু ব্যাকলাশ শুধু নিরপরাধদের বিরুদ্ধে হয় না।

ইসলাম প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে, কেবল যালিম ও হত্যাকারীর বিরুদ্ধে, নিরপরাধ-নির্দোষদের বিরুদ্ধে নয়। এবং ইসলামে অত্যাচারিতের জন্যেও অত্যাচারীকে ক্ষমা করা প্রতিশোধ নেওয়ার চাইতে উত্তম বলা হয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে পবিত্র কুরআন খুলে ক্বিসাস (প্রতিশোধ) ও হুদ্দ (দণ্ড) বিষয়ক আয়াত দেখে নিতে পারেন।

কিন্তু ১৯৪২-এ (বিহারের) তিলহাড়ায় যা হয়েছিল, ১৯৪৭ এ বিভক্ত সীমান্তের উভয় দিকে যা ঘটেছিল, যা ঘটেছে ভিওয়ান্ডী, মুম্বাই ও গোধরায় এবং এখন ঘটছে গোটা গুজরাতে, তা পুরোপুরিই যুলুম। সাংবিধানিক, চারিত্রিক বা ধর্মবিধান ভিত্তিক প্রতিশোধের সাথে এসবের কোনও সম্পর্ক নেই। স্মরণ রাখা দরকার, যুলুমের কোল থেকে যুলুম-ই জন্মায়। ১৯৮৪-তে দিল্লি সরকার যেকাজ করেছিল, যেকাজ মুম্বাই প্রশাসন করেছিল ১৯৯৩-য়ে, সেই কাজই আজ ২০০২-য়ে করছে গুজরাত সরকার। এবং এটা কেবল ঘটনাচক্র নয় যে, দিল্লি ও মুম্বাইয়ে সরকার ছিল কংগ্রেসের আর গুজরাতে বিজেপির। সংঘ পরিরবারের প্রতিটি সাফল্য ওই উভয়েরই অনুগ্রহপ্রাপ্ত। সাফল্য ও যুলুম সংঘপরিবারের অভিধানে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ও সমার্থক।

আমাদের বলা হয়েছে, গুজরাতে সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছে। কিন্তু শুক্রবার (১ মার্চ ২০০২) সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানে সামরিক বাহিনীর কোনও চিহ্নই ছিল না। 'দেখা মাত্রই গুলি'র নির্দেশ সংবাদ মাধ্যমের লোকেরা ভালোরকম জানেন। এই নির্দেশ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর হয় কেবল মাত্র কাশ্মীরে। দিল্লিতে তিনদিনের 'খোলাখুলি ছাড়' দেবার পর সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছিল। ওরা সেখানে একটাও গুলি চালায়নি। ১৯৯৩-এ শারদ পাওয়ার মুম্বাইতে সামরিক বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেই বাহিনীকে ফ্লাগ মার্চ করা ছাড়া কোনও কার্যকর পদক্ষেপের বিন্দুমাত্র অনুমতি ছিল না। সেই ফ্লাগ মার্চও ওদের করতে হয়েছিল মুম্বাই পুলিসের পরিচালনায়, যারা ওদেরকে এমন সব জায়গায় নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়েছে, যেখানে ওদের কোনও প্রয়োজনই ছিল না। ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে অযোধ্যায়ও সামরিক বাহিনী নামানো হয়েছিল কিন্তু তারা ফয়জাবাদে আয়েশ-আরাম করে ফিরে গেছে, অযোধ্যায় যাবার অনুমতি তাদের ছিল না। মুরাদাবাদ ও সম্ভলের দাঙ্গার সময়েও মিলিটারি চেয়ে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তাদেরকে মুরাদাবাদ রেলস্টেশনে কয়েকদিন ধরে আটকে রেখেছিল পি এ সি ও স্থানীয় পুলিস প্রশাসন। পি এ সি প্রকাশ্যে বলছিল, আমরা মজা না চাখিয়ে শহরে মিলিটারি ঢুকতে দেব না। প্রায় এক সপ্তাহ পরে মুরাদাবাদের শান্তি-শৃঙ্খলার ভার মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। মুরাদাবাদ ও সম্ভলের দাঙ্গার সময় উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন কল্যাণ সিং নয় বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। ঘাবড়াবেন না, গুজরাতেও সেনা নামে কিন্তু নিরপরাধ মানুষদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলার ও এহসান জাফরীর মতো মানুষদের সপরিবারের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার পর। এহসান জাফরীকে তাঁর পরিবারের উনিশজন সদস্য সমেত পুড়িয়ে মারার কারণ এই নয় যে তিনি

ছিলেন কংগ্রেসী, বরং একমাত্র কারণ তিনি ছিলেন এহ্সান জাফরী। যেভাবে ১৯৯৩-য়ে বহু মুসলিম-শিব সৈনিক ও মুসলমান বিজেপিকে হত্যা করা হয়েছিল। বেনারসের ডাক্তার রয়ীসও শুধু কংগ্রেসীই ছিলেন না, প্রশাসনের পদাধিকারী মানুষ ছিলেন, কিন্তু পি.এ সি'র জওয়ানরা তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল এবং দুদিন পর তাঁর লাশ এসেছিল। নিরপরাধ-নির্দোষদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার সময় কোনও পার্টি তাদের সাহায্য করতে আসেনি। কেউ কেউ চেষ্টা করলেও তা কোনও কাজে লাগেনি। যেমন, এহ্সান জাফরী, সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন এবং সোনিয়া গান্ধী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সাথে সাক্ষাৎ করে এহ্সান জাফরীর কাছে সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন সম্ভবত, কিন্তু পুলিস সেখানে পৌঁছেছিল সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর।

গুজরাতের মুসলিম নিধন যজ্ঞ মিডিয়া যা বলছে তার চাইতেও অনেক বেশি সঙ্গীন। সচ্ছল ব্যবসায়ী মুসলিম এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে টার্গেট করা হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন যে, তিনি পুলিসের ভূমিকায় সন্তুষ্ট। 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' লিখেছে ১৮ ফেব্রুয়ারি (মার্চ?) মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের বিবৃতি থেকে এমন মনে হচ্ছিল যে, গুজরাতে কিছু ঘটেইনি। তিনি বলেছেন, 'গোধরা কাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়াকে পুলিস ও রাজ্য সরকার যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে তাতে তিনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট। গুজরাতের প্রায় সমস্ত মানুষ গোধরা কাণ্ডের দরুন ক্ষিপ্ত হয়েছিল, সরকার সময়মতো ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরও বেশি খারাপ হতে পারত।' গুজরাতের এরিয়ল শ্যারন নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, গোধরা কাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে 'পোটো' প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তিনি বৃহস্পতিবার (২৮.২.২০০২) আহমদাবাদে তিরিশজন মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার এবং মর্মান্তিক হত্যা ও লুঠ পাটের ঘটনাগুলির কোনও নোট্স নেননি এবং ওই 'প্রতিশেধমূলক কার্যকলাপ'-এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রেস কন্ফারেন্সে 'টুঁ' শব্দও করেননি। তিনি বারবার শুধু একথাই বলতে থেকেছেন যে, জনগণের ক্রোধের তুলনায় যা কিছুই ঘটেছে, তা না ঘটারই সমান। তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, 'প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ' যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

১৯৯৩-য়ে মুম্বাইয়ে সরকার ছিল কংগ্রেসের কিন্তু রাজ চলত শিবসেনার। আজ গুজরাতে সরকারেও আছে সেই সংঘ পরিবার। যারা 'দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার জিম্মাদার'। আপনারা হয়তো অবাক হবেন যে, আমি এসব কী লিখছি? কিন্তু ১৯৯৩-য়ে কী হয়েছিল? যখন 'সামনা' (আর এস এসের মুখপত্র) লিখল 'এখন আর সহ্য করা হবে না', তখন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল এবং যখন চার-পাঁচদিন পর 'সামনা'ই লিখল 'ব্যস, অনেক হয়েছে...' তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তাহলে শান্তি-শৃঙ্খলার সমস্যা যারা সৃষ্টি করেছিল তারাই তা বন্ধ করেনি কি? আরতি জয়রথ ও হরেশ গুপ্তা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে লিখেছেন, আর এস এসের এক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে

তাঁদের আশ্বাস দিয়েছে যে, 'তারা শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য নিজেদের ক্যাডারদের উপর কড়া নজর রাখবে।' আর এস এদের জয়েন্ট সেক্রেটারি মদন বালসী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর কামরার বাইরে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা হবে এই যে, আমরা গোটা দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম রাখব।' গুজরাত ফের প্রমাণ করে দিল, এখন দেশের 'ল অ্যান্ড অর্ডার মেশিনারি' আছে আর এস এসেরই হাতে। তাই আমরা বলছি, গোধরার লজ্জাজনক দুর্ঘটনায় প্রকাশ্য হাত যারই থাকুক, আসল কলকাঠি তাদেরই হাতে, যারা প্রতিশোধমূলক পদক্ষপের আড়ালে মহাভারত শুরু করেছে।

করসেবকরা– যারা এখন রাতারাতি 'রামসেবক' বনে গেছে– ট্রেনে রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টের যাত্রীদের জন্য আগেই বিভীষিখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভি এইচ পি ও বজরং দলের দেওয়া 'রামসেবক' ব্যাচ বুকে লাগিয়ে ওরা ভেবেছে, ওটা ওদের টিকিটও বটে এবং ক্রেডিট কার্ডও বটে। সুতরাং ওদের টিকিট কাটারও দরকার নেই এবং খাবার-দাবারের পয়সা দেবারও প্রয়োজন নেই। এসব অনেক আগে থেকেই গোটা দেশে চলছিল। গোধরাতেও হয়েছে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারের গোধরার কিছু 'জাতীয় ধারা' ওয়ালা মুসলমানকে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং জি আর পি এফ, সিটি পুলিস, জেলা প্রশাসন ও লোকাল ইন্টেলিজেন্সকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাবধান যেন নিজেদের চোখ কান বন্ধ রাখেন, যাতে ১১ সেপ্টেম্বরের মতো ২৭ ফেব্রুয়ারিতেও আগামী দিনের প্রতিশোধমূলক অপকর্মের বৈধ অজুহাত করা যেতে পারে। সাঈদ নাকভী তাঁর প্রবন্ধে ঠিকই বলেছেন, 'সরকারকে জবাব দিতেই হবে, কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গোধরায় কী করছিল?

মোদ্দাকথা চিরকালের মতো আজও, মুমিন মুসলমানের কাছে হাতিয়ার আছে দুটি– ধৈর্য-সবর ও দুআ প্রার্থনা। দাঙ্গা ছড়ানো এবং যুলুম-অত্যাচার করা আমাদের কাজ নয়। এর উল্টোটা করার জন্য আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে। আমরা পৃথিবীতে অশান্তি আটকাব, যুলুম বন্ধ করব, বিশৃঙ্খলার বিনাশ ঘটাব এবং ন্যায়-নীতি-প্রতিষ্ঠা করব। কুরআন আমাদের বলেছে যে, আমাদের উচিত সবর ও নামাযের মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করা। নবী করীম স. বলেছেন, 'দুআ হলো মুমিনের হাতিয়ার'। এ কুরআনী হাতিয়ারকে পুরোপুরি ব্যবহার করুন। তা নাহলে, আল্লাহ না করুন, দুআ-প্রার্থনার তাওফীক (সময়-সুযোগ-সামর্থ) হাতছাড়া হবার পর আমাদের উপর শাস্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে। এমনটা হলে আমাদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। আগামী দিন অবশ্যই বিপদসঙ্কুল কিন্তু দাজ্জাল হোক কিংবা শয়তান– সবার বড় আল্লাহ্। 'তারা চক্রান্ত করেছিল, আল্লাহও কৌশল করেছিলেন, আল্লাহ্ই তো শ্রেষ্ঠ কৌশলী।'

[আল্-কুরআন-২ : ৫৪]

বাংলা রূপান্তর : মুহাম্মদ হাদীউজ্জামান

সংখ্যালঘু নির্যাতনের কৌশল আর এস এস পুস্তিকায়!

অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী

তিনি নাকি অধ্যাপক! এবং নাকি গুজরাতের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সাহিত্যিক! নাম কেশবরাম কাঁসিরাম শাস্ত্রী। বয়স ৯৬ বছর। তাঁর আর একটি পরিচয় তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুজরাত শাখার সভাপতিও।

তা এহেন শাস্ত্রীমশাই ইন্টারনেট পত্রিকা রিডিফ ডট কম'কে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, আহমদাবাদ শহরে মুসলিম দোকানদারদের তালিকা ২৮ শে ফেব্রুয়ারি সকালেই তৈরি হয়েছিল।

রিডিফ-এর সাংবাদিক তাঁর এই জবাবে এক রকম ভড়কেই গিয়েছিলেন। ভড়কে যাবারই কথা। কারণ তিনি অভিযোগ করেছিলেন শাস্ত্রীর কাছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আগে থেকেই পরিকল্পনা করে আহমদাবাদে মুসলিমদের দোকানঘর জ্বালিয়েছে, লুঠ করেছে। এই আক্রমণ মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না।

হয়তো তিনি আশা করেছিলেন শাস্ত্রীমশাই তা পুরোপুরি অস্বীকার করবেন। না, তা তিনি করেননি। বরং বলেছেন, "ঐ দিন সকালে আমরা বসেছিলাম এবং তালিকা তৈরি করি। বেশি আগে থেকে তৈরি হইনি।"

কেন তালিকা তৈরি করলেন? এ প্রশ্নের জবাবে শাস্ত্রীর উত্তর, 'করতেই হতো। করতেই হতো। আমরা এসব পছন্দ করিনা, কিন্তু আমরা সাজ্ঘাতিক রেগে গিয়েছিলাম। জানেন তো, রাগে আর লোভে মানুষ অন্ধ হয়।' তিনি বলেছেন, "কিছু প্রশিক্ষিত হিন্দু ছেলেই ছিল দাঙ্গাকারী!" দাঙ্গার সময় আহমদাবাদের পুলিস কেন নিষ্ক্রিয় ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে শাস্ত্রী বলেন, "তারা মৃত্যুভয় পেয়েছিল।" শাস্ত্রীর সোজা উত্তর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল হিন্দু। তারা ভেবেছিল উত্তেজিত জনতা যা করছে তা করুক। শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দাঙ্গা কি আরও বাড়তে পারে? তাঁর উত্তর, "যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ। এত বিষ ছড়ানো হয়েছে যে তা এখন আটকানো কঠিন। অল্পবয়সী ছেলেরা এমন কাজও করেছে যা আমরা পছন্দ করি না। আমরা তা সমর্থন করি না। কিন্তু আমরা তার নিন্দা করতেও পারি না, কারণ ছেলেগুলি তো আমাদের। আমার মেয়ে যদি কিছু করে, আমি কি তা নিন্দা করব? আমরা মনে করি না যে আমাদের ছেলেরা কোনও অন্যায় করেছে। কারণ এ ঘটনা হলো ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তবে এটা মনে করি ওদের এতটা বাড়াবাড়ি করা ঠিক হয়নি। কিন্তু সেটা পরে মনে হচ্ছে। আমাদের তখন কিছু একটা করা দরকার ছিল।" সাক্ষাৎকারে শাস্ত্রী বলেছেন, "বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ৫০ জন উকিলের একটি তালিকা তৈরি করেছে। দাঙ্গার অভিযোগে যদি আমাদের কাউকে ধরা হয় তবে এই উকিলরা তাদের

ছাড়িয়ে আনবে। এজন্য এরা কেউ পয়সা নেবে না। কারণ সকলেই আর এস এস-র মতাদর্শে বিশ্বাসী।"

গুজরাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরঙ দল যে গণহত্যা সংগঠিত করেছে তা স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। বরং তা ছিল সুপরিকল্পিত। দু'বছর আগে (২০০০) আর এস এস একটি কৌশল প্রণালী প্রকাশ করেছিল পুস্তিকার আকারে। দেখা যাচ্ছে সেই নির্দেশ অনুযায়ীই যেন আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে। এ খবর ছাপিয়েছে হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকা। ২৬শে মার্চ তারিখের পত্রিকায় গান্ধীনগর থেকে সাংবাদিক রথীন দাস জানাচ্ছেন, গুজরাতি ভাষায় লেখা, পুস্তিকাটির নাম ছিল "হিন্দুনো বাঁচাও আক্রমণ আনে কায়দো" (হিন্দুদের বাঁচাও আক্রমণ ও আইন)। ১২ পাতার ঐ পুস্তিকায় আছে কিভাবে দেশের আইনের সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ সাজানো যায়।

সেখানে বলা হয়েছে "আমরা যদি অভিযোগ দায়ের করি তবে মিশনের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে এবং সম্ভব হলে বিদেশী মিশনারীদেরও জড়িয়ে নেব। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়তো শেষ পর্যন্ত আদালতে টিকবে না। তবে মাসের পর মাস তাদের আদালতে দৌড়াতে হবে।"

কীভাবে হত্যা করতে হয় তার একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে পুস্তিকাটিতে। উদাহরণ এইরকম : একবার একটি মুসলিম যুবক ও তার হিন্দু প্রেমিকাকে জনতা পিটিয়ে মারে। কিন্তু কাউকেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি, কারণ কয়েক হাজার লোক এরসঙ্গে যুক্ত ছিল। পুস্তিকাটিতে লেখা হচ্ছে 'যেহেতু এখন আমাদের সরকার রয়েছে, তাই যথাযথভাবে এর সুযোগ আমাদের নিতে হবে এবং আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে।'

সুরেন্দ্রনাগর জেলার হালভাদ শহরে একটি ঘটনা ঘটে। উত্তেজিত জনতা একজন বিচারকও বেশ কিছু আদালত কর্মীর সামনে প্রকাশ্যে এক মুসলিম যুবক ও ব্রাহ্মণ যুবতীকে পিটিয়ে মারে। কিন্তু যেহেতু প্রায় হাজার জন সেই কাজে যুক্ত ছিল, তাই একজনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা যায়নি। পুস্তিকায় বলা হয়েছে "হিন্দু সমাজের ইতিহাসে হালবাদের ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের মেয়েদের অপহরণ করলে এই ধরনের প্রতিহিংসারই প্রয়োজন আছে।"

সাংবাদিকটি লিখছেন, অনিচ্ছা, সত্ত্বেও পুলিস কিছু বি জেপি বিধায়ক, তাদের আত্মীয় ও কিছু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু চূড়ান্ত চার্জশিট জোরদার হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে ঐ কৌশল অনুসরণ করেই।

গুজরাতে এখনও (৬ এপ্রিল ২০০২) মুসলিম নিধন চলছে। থামার কোন লক্ষণ নেই। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি যাঁরা কোনমতে প্রাণে বেঁচে আশ্রয় শিবিরে এসেছিলেন তাঁরা কি

ঘরে ফিরতে পারছেন? 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকার ১২ই এপ্রিল সংখ্যায় আহমদাবাদ থেকে সাংবাদিক দিওনি বুনসা একটি মর্মান্তিক ঘটনার কথা শুনিয়েছেন। মুন্নাভাই পাঠান নামে এক যুবক আহমদাবাদের অবধূতনগরের মকরপাড়ায় থাকতেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি আক্রমনের সময় তিনি কোনমতে পালিয়ে চলে আসেন। ওঠেন আশ্রয় শিবিরে। ১৫ দিন তিনি আশ্রয় শিবিরে ছিলেন। নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্থায়ীভাবে থাকার কথা তিনি ভাবনার মধ্যে আনেননি। শুধু ভেবেছিলেন, ঘটিবাটি ঘরে যা পড়ে আছে তা তুলে নিয়ে চলে আসবেন। এজন্য তাঁকে বেশ সাহস সঞ্চয় করতে হয়েছিল। তিনি অবধূতনগর গিয়েছিলেন। সঙ্গে পুলিসও ছিল। জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে মুন্নাভাই ও তাঁর বন্ধুরা যখন আশ্রয় শিবিরে ফেরত আসার জন্য পুলিস ভ্যানে ওঠেন, তখন প্রায় ১০০০ সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁদের আক্রমণ করে। পুলিস কিছুই করতে পারেনি। অন্যেরা আহত হয়েও কোনমতে বেঁচে গেলেও মুন্নাভাই ও তাঁর সঙ্গী ২৫ বছরের নাসিরভাই শেখকে ঐ দুষ্কৃতিরা পিটিয়ে মেরে ফেলে। মুন্নাভাইয়ের পরিবার উদ্বেগে বসেছিলেন আশ্রয় শিবিরে। কিন্তু মুন্নাভাইয়ের আর ফেরা হলো না।

'দি হিন্দু' পত্রিকায় ৩১শে মার্চ সংখ্যায় সাংবাদিক মানস দাশগুপ্ত লিখছেন, গুজরাতের পুলিস প্রশাসনে যে মুষ্টিমেয় পুলিস অফিসার সঙ্ঘ পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন তাঁদেরকে নরেন্দ্র মোদীর সরকার নিলর্জ্জভাবে 'শাস্তি' দিয়েছেন। রাজ্যের ইতিহাসে সম্ভবত এই প্রথম এইরকম গুরুতর আইনশৃঙ্খলার অবনতির সময়ে উচ্চপদস্থ পুলিস অফিসারদের বদলি করা হয়েছে। বদলির ধরণ দেখলেই বোঝা যায়, মোদীর উদ্দেশ্য একটাই ঃ সঙ্ঘ পরিবারের দুষ্কৃতীদের বাঁচানো। যে সব অফিসার স্থানীয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বা বজরঙ দল কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে গণ্ডগোল ছড়াতে দেননি, তাঁদের অগুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। কচ্ছ, বনসাকাস্থা, মেহসানার জেলার পুলিস সুপাররা সাহসের সঙ্গে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বদলির কোপে পড়েছেন।

একজন উচ্চপদস্থ অফিসার আহমদাবাদের নরোদা পাতিয়ায় গণহত্যার ঘটনার তদন্ত করছিলেন। এখানে ৯০ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন বি জে পি বিধায়ক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আহমদাবাদ ইউনিট সভাপতি মায়া কোদনানি। অভিযোগ আছে এছাড়াও ঐ ঘটনায় যুক্ত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জয়দীপ প্যাটেল। কিন্তু তদন্তরত ঐ অফিসারকে বদলি করা হয়েছে অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরে।

যে অফিসার মেহসানা জেলার সর্দারপুরায় ২২ জনকে পুড়িয়ে মারার ঘটনার তদন্ত করছিলেন তাঁকে বদলি করা হয়েছে অবগারি বিভাগে। মোট যে ২৭ জন পুলিস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে তাদের হয় 'পুরস্কৃত' করা হয়েছে নয়তো 'শাস্তি' দেওয়া হয়েছে।

গোধরার পরবর্তীকালের ঘটনায় মোট ৯০০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু এখনও (৬ এপ্রিল ২০০২) পর্যন্ত একজন বি জে পি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল নেতাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যও পুলিস ডেকে পাঠায় নি।

গুজরাতের সাম্প্রদায়িক গণহত্যায় প্রাণহানির পাশাপাশি সম্পত্তি ক্ষতির পরিমাণ কত? এর কোনও সরকারী হিসবে আজও পাওয়া যায়নি। গুজরাত থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ইংরেজী ও গুজরাতি দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকায় ১লা এপ্রিল সাংবাদিক বটুক ভোরা লিখছেন–

* দোকানপাট, বাজার বন্ধ থাকায় ব্যবসা বাণিজ্যে ক্ষতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা।

* সুরাত শহরেই দুটি বস্ত্র মিল ও অন্যান্য হস্তচালিত মিল ধ্বংস হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা।

* হালোল এলাকায় জি এম মোটরস ইউনিট ৬০টি ওপেল আস্ট্রা গাড়ি পুড়িয়ে দেবার ফলে ক্ষতি ১০ কোটি টাকা।

* লাকি ফিল্ম স্টুডিও ভস্মীভূত হওয়ায় ক্ষতি ২ কোটি টাকার বেশি।

* সারখেজ-গান্ধীনগর হাইওয়েতে থালতেজ-এ গাড়ির শোরুম অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় ক্ষতি ৪ কোটি টাকা।

* আহমদাবাদ শহরে হোটল ও রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকায় ক্ষতি ৬০০ কোটি টাকা। এরফলে ২০,০০০ শ্রমিক কর্মহীন। অনেকে নিখোঁজ।

* বিভিন্ন শহরে হোটেল রেস্টুরেন্ট জ্বালিয়ে দেওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। এরমধ্যে ভাবনগরে একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল, আহমদাবাদে ১২০টি রেস্টুরেন্ট ও অসংখ্য ছোটখাটে রেস্টুরেন্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

* একটি প্রথম সারির গুজরাতি দৈনিকের হিসাব অনুযায়ী ২০,০০০ দু'চাকার গাড়ি, ৪০০ গাড়ি শুধু আহমাদাবাদেই পুড়েছে। অন্যত্র তো আরও।

* হালোলে ৫টি শিল্প উইনিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের শাপার ডেরাভাল এলাকায় তিনটি বৃহৎ শিল্পের বড়রকম ক্ষতি হয়েছে। রাজকোটে ৬টি প্লাস্টিক ইউনিট, ভাদোদরা, সুরাত, গোধরা ও ভাবনগরে অসংখ্য কারখানা ধ্বংস হয়েছে।

* লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগের ফলে যে কত হাজার পরিবারের কত কোটি টাকার সম্পত্তি ক্ষতি হয়েছে তা এখনও হিসাব করা যায়নি।

'দি ইউক' পত্রিকা ৭ এপ্রিল সংখ্যায় একটি লিফলেটের ছবি ও তার সম্পূর্ণ বয়ান ছাপিয়েছে। এই লিফলেট গুজরাত জুড়ে বিতরণ করেছে বিশ্ব হিন্দু পুরিষদ ও বজরঙ্গ দল।

যদিও লিফলেটে তাদের নাম নেই। কে মুদ্রক কে প্রকাশক তা-ও লেখা নেই। লিফলেটটির উপরে লেখা 'জয় শ্রীরাম'। নিচে লেখা আসুন আমরা শপথ নিই : (১) এখন থেকে আমি কোনও মুসলিম দোকানদারের থেকে কোন জিনিস কিনব না। (২) এইসব জাতীয়তাবিরোধীদের কোনও হোটেল বা গ্যারেজ ব্যবহার করব না। (৩) আমার দোকান থেকে আমি এদের কোন জিনিস বিক্রি করব না। (৪) আমি আমার গাড়ি শুধু হিন্দু গারেজে রাখব। সুচ থেকে সোনা কোনকিছুই মুসলিমদের থেকে কিনব না, আমাদের তৈরি কোনকিছু তাদের বিক্রি করব না। (৫) মুসলিম হিরো-হিরোইন অভিনয় করেছ এমন সিনেমা বয়কট করব। এইসব জাতীয়তাবিরোধীদের তৈরি সিনেমা ছুড়ে ফেলে দিন। (৬) কখনও কোনও মুসলিম অফিসে চাকরি করব না। (৭) আমাদের কোন ব্যবসায়িক এলাকায় মুসলিমদের অফিস কিনতে দেবেন না। হাউসিং সোসাইটি, কলোনি অথবা কমিউনিটিতে মুসলিমদের বাড়ি কিনতে দেবেন না, ভাড়া দেবেন না। (৮) অমি অবশ্যইভোট দেব, কিন্তু একমাত্র তাকেই দেব যে হিন্দু জাতিকে রক্ষা করবে। (৯) আমি সজাগ থাকব যাতে আমাদের ভাইবোনেরা স্কুলে-কলেজে-কর্মক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রেমে না পড়ে। (১০) আমি কোনও মুসলিম শিক্ষকের কাছে শিক্ষা নেব না।

কিছুদিন আগে আমাদের চারপাশে কিছু মানুষকে বলতে শোনা যেত, বি জে পি'কে ভোট দিয়ে দেখাই যাক না। ক্ষমতায় এলে ওরা দায়িত্বশীল হবে। সাম্প্রদায়িক এই বদনাম যাতে না হয় তারজন্য ওরাই দাঙ্গা ঠেকাবে। আর অটলবিহারী বাজপেয়ী উদার মনের মানুষ। উনি প্রধানমন্ত্রী থাকতে এসব হবে না।

যাঁরা এইসব যুক্তি দিতেন, তাঁরা এখন কী বলবেন? আজ তো কেবল দাঙ্গাই নয়, গুজরাতে বি জে পি সরকারের প্রত্যক্ষ পদতে সঙ্ঘ পরিবারের বাহিনী মুসলিম জনসাধারণকে গণহারে হত্যা করার অভিযান চালাচ্ছে। গুজরাত থেকে মুসলিমদের চিরতরে বিতাড়িত করাই ওদের উদ্দেশ্য। কি করছেন 'উদার' মনের অটলবিহারী? তিনিই তো এই সেদিন আমেরিকায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'সঙ্ঘ পরিবার আমার আত্মা।' আমরা কি বলব? আত্মা? প্রেতাত্মা?

সৌজন্যে ঃ গণশক্তি

অযোধ্যা থেকে গুজরাত : দেশ ১৬ বছরের কৈফিয়ত চায়? তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে

কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়

গুজরাতের আগে মহারাষ্ট্রের বুকে সেই ১৯৯২ সাল থেকেই যারা এথনিক ক্লিনজিং-এর পথ নিয়েছে তারা যে কেবল দাঙ্গাই করেছে? ওরা দিলীপ কুমারের মত ব্যক্তিত্বকে

(সরকারের অনুমতিতে নেওয়া) 'নিশানএ ইমতিয়াজ' ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে, * শাবানা-হাশ্মীদের সিনেমা পুড়িয়ে দিয়েছে * মকবুল ফিদা হুসেনের যামিনী রায়ের শিল্পকর্ম ধ্বংশ করেছে ওদের বয়কটের ফতোয়া দিয়েছে * ভারতের মুসলমান নাগরিকদের নিতম্বে পদাঘাত করে তাড়াবার হুমকি দিয়েছে * খেলার মাঠকে সাম্প্রদায়িকতায় টেনে এনে– পাকিস্তানের খেলা চলতে দেব না বলেছে * মাঠের পিচ খুঁড়ে দিয়েছে * মুম্বাইতে ভরতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অফিস তছনছ করেছে * মুম্বাইতে ('৯২-৯৩) দাঙ্গা করে ৯০০-র বেশি মানুষ হত্যা করেছে; বলেছে বাবরী মসজিদ ভাঙায় শিবসেনার ভূমিকায় বাল ঠাকরে প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি গর্বিত।

সমগ্র ১৯৯৮ সাল ধরে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত জুড়ে এবং দিল্লি ও ওড়িশার কোনও কোনও স্থানে একটি নাটক প্রদর্শিত হয়েছিল আর এস এস-শিবসেনা-বি জে পি-র পৃষ্ঠপোষকতায়। যার নাম মিঃ নাথুরাম গডসে বোলতোয়ে। জাতির জনক গান্ধীজী হত্যাকারীর ভ্রাতা গোপাল গডসের ঐ নাটকের বিষয় বস্তু হল নাথুরাম গডসের নাকি কিছু বলার আছে। তাও আবার রাষ্ট্রনেতাকে হত্যা করার ব্যাপারে। এবং তাকে মহিমান্বিত করার ব্যাপারে। আজীবন রামধূন গায়ক গান্ধীজীর কাছ থেকে আর এস এস হয়তো হিন্দুরাষ্ট্র অনুযায়ী সংবিধানের অনুমোদন পাবে এমন আশা করছিল স্বাধীনতার সময়। কিন্তু তা ব্যর্থ হওয়ায় মনের ঝাল মেটাতে ঐ হত্যা– একথা ছাড়া আর কি বলার থাকতে পারে? আবার গণবিক্ষোভে সরকার সেই নাটক বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলে আর এস এস-শিবসেনা তাকে 'মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত' বলে শোরগোল তোলে। এই যে জাতির পিতাকে হত্যা করাকে মহিম্বান্বিত করা আর মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা– এ যদি ফ্যাসিস্ট তত্ত্ব না হয় তবে আর হবে কিসে?

ঠিক তেমনিভাবেই গুজরাত দাঙ্গাকারীরাও অগ্রসর হয়েছে একেবারে রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে পুলিস প্রশাসন ও সংগঠক রাজনৈতিক শক্তির সুকৌশল যোগসাজশে। কিন্তু, হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভেঙে ফেলেছে এমন একটি উদাহরণ মেঘানিনগর পুলিস স্টেশনের এফ আই আর। যাতে নরোদা গণহত্যায় বি জে পি এবং ভি এইচ পি-র বেশ কিছু কর্মীর নাম আছে। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিষণ কুরানি। এমন ঘটনা তো একটা নয়। ফলে সেগুলি ধামাচাপা দেবারও কম চেষ্টা হয়নি। যেমন মাহরাষ্ট্রেও চেষ্টা করেছিল শিবসেনা– বি জে পি সরকার (১৯৯৩-র শেষ থেকে ২০০০-এর আগে পর্যন্ত) শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট খারিজ করার মাধ্যমে। কিন্তু কথায় বলে না 'তোমারে বধিবে যে গোকূলে বাড়িছে সে।' শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রায় প্রকাশ্যে আসর পর জানা গেল যে কমিশন বলেছে :

'নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শিবসেনা ও শিব সৈনিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তির ওপর আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের পার্টি লিডারদের নির্দেশে।

'শিবসেনা প্রমুখ বাল ঠাকরে অভিজ্ঞ সেনাধক্ষের মত তাঁর অনুগামী শিব সৈনিকদের আদেশ করেছে প্রতিশোধ স্বরূপ মুসলিমদের ওপর সংগঠিত আক্রমণের জন্য। শিবসেনারা যে সাম্প্রদায়িক খুনো-খুনি ও দাঙ্গা শুরু করে, পরে সেটা এলাকার সমাজবিরোধীরা লুফে নিয়েছিল, কারণ তার মধ্যে তারা নিজেদের লাভের সুযোগ পেল। দাঙ্গা রুখতে সৈন্য নামাবেন কি না এটা ভাবতে ভাবতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুধাকররাও নায়েক চারদিন বহুমূল্য সময় নষ্ট করলেন। আর শহরের পুলিসও দায়ী ঠিক সময় দাঙ্গা প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে। গোল্লায় যাওয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব, রাজনৈতিক কারণে, কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। তারা পুলিস কমিশনারকে এমন সব পরস্পর বিরোধী হুকুম জারি করলেন যে তার জন্য পুলিসের সর্বস্তরে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হল। নিম্নতম পুলিস কর্মচারীরা গুলি চালাবে কি চালাবে না, এই উভয় সঙ্কটে পড়ল। সেই সময় বাল ঠাকরে সামনা পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লিখলেন, 'হিন্দুদের এবার আক্রমণাত্মক হতে হবে'। 'নবকাল' ও 'সামনা' পত্রিকায় উনি উগ্র, উসকানিমূলক লেখা প্রকাশ করলেন। টাইম ম্যাগাজিনে রিপোর্টার অনিতা প্রতাপকে দেওয়া ইন্টারভিউতে ঠাকরে বললেন, 'কিক দেম আউট– নো কমপ্রোমাইস উইথ মুসলিমস।'

ঠাকরের উগ্র বিষোদগার, জ্বালাময়ী লিখন, ভাষণ ও আদেশ সেদিন শিরোধার্য্য করেছিলে মধুকর সরপোতদার (লোকসভার এম পি ও শিবসেনা লিডার), মনোহর যোশী (মুখ্যমন্ত্রী, মহারাষ্ট্র), গজানন কীর্তিকার (মন্ত্রী মহারাষ্ট্র), পুলিসের আর ডি ত্যাগী (বর্তমানে পুলিস কমিশনার, মুম্বাই), বিনায়ক পাতিল, মিলিন্দ বৈদ্য (প্রাক্তন মেয়র, মুম্বাই), ইত্যাদি আরও অনেকে। এদের মধ্যে মিলিন্দ বৈদ্য, বিনায়ক পাতিল ও গজানন কীর্তিকার প্রমূক ঠাকরের আদেশ মেনে দাঙ্গায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুলিস অফিসার ত্যাগী ও অন্যান্যরা দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঙ্গা চলতে দিয়েছেন। এদের সবাইর বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করেছেন বিচারপতি তাঁর রায়ে। আরও ৩১ জনের বিরুদ্ধে উনি কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেছেন। কেবল শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রায়েই সামপ্রদায়িক দাঙ্গায় শিবসেনা বি জে পি দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাই নয়। দেশের অন্যান্য দাঙ্গার তদন্ত কমিশনগুলি কি বলেছে দেখা যাক। ১৯৬৯ থেকে ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত যেসব দাঙ্গা ঘটেছে তার সবগুলিতে কমিশনের রায় হল ঃ আর এস এস জনসংঘ (বি জে পি-র আগের নাম), শিবসেনা এবং বি জে পি নিজে ঐ দাঙ্গাগুলি ঘটিয়েছে।

১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদ দাঙ্গা। বিচারপতি জগমোহন রেড্ডি কমিশন রায়ে বলা হয়েছে 'বিশেষত আর এস এস, জনসংঘের বেশ কিছু নেতার সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটেছে ঐ দাঙ্গা... ।'

১৯৭০ সালের ভিওয়ান্দি, জলগাঁও এবং মহাড়-এর দাঙ্গা। বিচারপতি ডি পি মদনের নেতৃত্বে কমিশনের রায়ে বলা হয় : 'ভিওয়ান্দিতে রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডলের দ্বারা সাম্প্রদায়িক

উত্তেজনা ছড়ায়। ঐ রাষ্ট্রীয় উৎসব মণ্ডলের অধিকাশই জনসংঘ লোক, বাকিরা জনসংঘপন্থী এবং শিবসেনার।'

১৯৭১ সালের তেল্লিচেরি দাঙ্গা। তদন্ত কমিশন হয় বিচারপতি জোশেফি ভিথ্যাথিলকে দিয়ে। কমিশন বরেছে : 'তেল্লিচেরিতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সৌভ্রাতৃত্বের সঙ্গে শতাব্দীকাল ধরে বাস করে। কিন্তু, আর এস এস জনসংঘ সেখানে শাখা খুলে মুসলিম বিরোধী প্রচার প্রপাগাণ্ডা শুরু করলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম লিগও সক্রিয় হয়। সেই উত্তেজনাই সমস্ত গোলযোগের উৎস।'

১৯৭৯ সালের জামশেদপুর দাঙ্গা। তদন্ত কমিশন তার রায়ে বলেছে : 'পরিক্রমার পথ নিয়ে বিরোধ আছে এমন শোভাযাত্রা থেকে আর এস এসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগঠন সংযুক্ত বজরঙ্গ বলি আখড়া সমিতি উত্তেজনাকর হিন্দু লিফলেট ছড়ায়, প্রশাসনের নির্দেশিত পথ অমান্য করে মুসলিমবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে নিষেধ করা এলাকায় যায়। হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে এমন ভান করে প্ররোচনা সৃষ্টি করে...। উপস্থিত সমস্ত পুলিস, হাবিলদার, হোমগার্ড সকলেই তাদেরই (হিন্দু, সাম্প্রদায়িকতাবাদী সংগঠনকে) সাহায্য করে।...'

১৮৯২ সালের কন্যাকুমারীর হিন্দু-খ্রিস্টান দাঙ্গা। গঠিত হয় বিচারপতি বেনুগোপাল তদন্ত কমিশন। কমিশন বলেছে : 'আর এস এস যেভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষকে প্ররোচিত করেছে তা হল এ রকম ক) খ্রিস্টানা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বিশ্বস্ত নয়, খ) সংখ্যাগুরু অংশের মানুষের মধ্যে চতুরভাবে প্রচার করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে যে সংখ্যালঘুদের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং সংখ্যাগুরুদের সংখ্যা কমছে, গ) প্রশাসন এবং পুলিসে লোক ঢুকিয়ে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বৃদ্ধি করা, ঘ) যুবকদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হয়, ঙ) যে কোনও স্পর্শকাতর বিষয় ধরেই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো হয় এবং বিরোধ বৃদ্ধি করা হয়...।'

১৯৮৯ সালের ভাগলপুর দাঙ্গার রিপোর্টও সকলের জানা। ১৯৯২-৯৩ সালে অযোধ্যা কাণ্ডের পর গুজরাত দাঙ্গার রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। আর প্রকাশিত হয়নি উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন সময়ের দাঙ্গার রিপোর্টগুলি।

কাজেই দেশের বুকে দাঙ্গাগুলি কারা ঘটায় তার প্রমাণ কোনও নতুন ঘটনা নয়। যে কমিশনের রায়ের ভিত্তিতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হচেছ। যার ফলশ্রুতিতে বাল ঠাকরেকে ২০০০ সালের ২৫ জুলাই মুম্বাই সুবার্বান মেট্রোপলিটন আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। যে রায়ের ভিত্তিতে মুম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার আর ডি ত্যাগীর সাজা হয়েছে। যে তদন্তের পথ ধরে নির্বাচন কমিশন (১৯৯৫ সাল থেকে) ৬ বছর বাল ঠাকরেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে নিষিদ্ধ করেছিল।

বাঘে-গরুতে এক ঘাটের জল খাওয়ানো দোর্দণ্ড প্রতাপের বাল ঠাকরে যার নির্দেশই নাকি মহারাষ্ট্রের আইন– তারও যখন এই অবস্থা করা সম্ভব তখন কেন দেশের মানুষ এই আস্থা রাখবে না যে এ দেশের সমাজ জীবনের মধ্যেই দৃঢ়মূল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতন্ত্রের বীজ রয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণ কমিশনকে কাজ করতে দাও, তাকে পুনর্বহাল করে তার নথি রক্ষা করো, সর্বোপরি সেই রিপোর্টের সুপারিশ রূপায়ণ করো– এতগুলি ধাপে যেভাবে মহারাষ্ট্রের সমস্ত পেশার মানুষ নিজেদের ঐক্য গড়ে গণজাগরণ গড়ে তুলেছিলেন সেটিই ভারতের আসল শক্তি। আর সেখানেই আমাদের প্রকৃত অনুপ্রেরণা। ভারতীয় সমাজের সেই অন্তরাত্মাই তো এই দাবিগুলিরও সাফল্যের চালিকা শক্তি। অভিযুক্ত আদবানী, যোশী, উমাদের মত অপরাধীদের স্থান কেন্দ্রীয় মসনদ নয়, বিচারালয় ও বন্দীশালা। মহারাষ্ট্র পারলে গুজরাতও পারে সম্প্রদায় খতমের বদলে সম্প্রীতির নির্মলতা ফিরিয়ে আনতে। ঠাকরে চিহ্নিত হলে মোদীকেও চিহ্নিত হতে হয়... ইত্যাদি। আজ আর ভ্রাতৃঘাতির মারণযজ্ঞের করসেবা নয়। নিনাদ উঠুক... আর অযোধ্যা নয়, আর গুজরাত নয়। সেই সমুদ্র মন্থনপর্বের জন্য এ সমাজ জাগরিত হোক।

কালান্তর ঃ ১৬.০৩.২০০২

প্যালেস্তাইন ও গুজরাতের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?

মৃদুল দে

এই মুহূর্তে দু'টি বিপজ্জনক ঘটনায় আমরা সকলেই স্তম্ভিত– প্যালেস্তাইন এবং গুজরাত। এ দু'য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটা সাদৃশ্য হয়তো আছে। প্রতিশ্রুত প্যালেস্তাইন সার্বভৌম রাষ্ট্র না পেয়ে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে প্যালেস্তিনীয়রা আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট ইজরায়েলের হাতে পাঁচ দশক ধরে লাঞ্ছিত, নিজেদের দেশে নিজেরাই উদ্বাস্তু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী অ্যারিয়েল শারন প্যালেস্তিনীদের উপর নৃশংস বর্বরতা চালিয়ে যাবার হুঙ্কার দিয়ে চলেছেন, কার্যকর করছেন প্রকাশ্যেই। মধ্য প্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিধর ইজরায়েলের টানা আক্রমণের প্রতিরোধে কার্যত রাষ্ট্রহীন প্যালেস্তিনীয়দের কিছু গোষ্ঠী আত্মঘাতী বোমার পথ নেয়। এটাকে অজুহাত করে গোটা প্যালেস্তাইন আজ ছিন্নভিন্ন, হাজার হাজার মানুষ হতাহত, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু, প্যালেস্তাইনের সদর দপ্তরে অবরুদ্ধ হন প্যালেস্তাইনী নেতা আরাফত। আমেরিকা ইজরায়েলকে সমর্থন করে চলেছে, এটা আত্মরক্ষা। শারন নির্মূল করতে চায় প্যালেস্তিনীয়দের, কিংবা চায় বংশবদ রাখতে। ইজরায়েল রাষ্ট্রই সংঘটিত করছে বর্বরতম সন্ত্রাস।

গুজরাতের ঘটনার সংঘ পরিবারের মুখে শারনের দম্ভোক্তিই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী এবং আর এস এস-র মূল পাণ্ডাদের অন্যতম নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ব্যবহার করছে সংখ্যালঘু নিধনের জন্য, বুশ প্রশাসনের জায়গায় অটল প্রশাসন

মৌন সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে নরেন্দ্র মোদীর প্রতি। অজুহাত করা হচ্ছে ২৭শে ফেব্রুয়ারির গোধরার ঘটনাকে। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, গোধরার ঘটনার আগে করসেবকরদের উসকানিমূলক হুমকি এব অসদাচরণের কথা। গোধরার নৃশংস ঘটনাকে অজুহাত করে মাসখানেকের বেশি সময় ধরে চলছে সংখ্যালঘু নিরীহ মুসলিমদের উপর অত্যাচার। ১০০ টি ত্রাণ শিবিরে লক্ষাধিক লোক আশ্রিত। নিজেদের দেশেই তাঁরা পরবাসী হয়ে গেলেন। শারন বা বুশ যা বলছেন এবং করছেন, তাতে ফ্যাসিস্তরাও যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ফ্যাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ কোনদিন প্রতিবাদ করেনি, বরং হিটলারের প্রশস্তিই তখন শোনা যায় তাদের মুখে। ১৯৩৯ সালে আর এস এস প্রধান গোলওয়ালকার হিন্দু ধর্মকে সম্মান জানাতে হিন্দু সংস্কৃতি-ভাষা গ্রহণ করতে এবং এছাড়া অন্য কোনো ভাবধারাকে প্রশ্রয় না দিতে মুসলিমদের প্রতি ডাক দিয়েছিলেন। আজকের সংঘ পরিবার একই স্লোগানে অনড়, প্রচ্ছন্ন সমর্থন বাজপেয়ী-আদবানিদের আছে একই ভাবধারার প্রচারক সংগঠক হিসেবে। এখন শুধু তা স্লোগানে সীমাবদ্ধ নেই, হিন্দুরাষ্ট্রের পরীক্ষাগার হিসেবে গুজরাতকে বেছে নিয়েছে ধর্মীয়-ফ্যাসিবাদী বর্বরতা চালানোর জন্য।

দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহুকালের। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত পড়লেই বিরোধ সংঘর্ষের রূপ নিয়েছে। মুঘল সাম্রাজ্যের সময়ও হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রাজনৈতিক রঙ নেয় যখন ব্রিটিশ নিজেদের স্বার্থে তা ব্যবহার করার চেষ্টা করে। ফলে দাঙ্গার সংখ্যা তখন থেকেই চেড়ে চলেছে। ১৭৩০ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে অর্থাৎ প্রায় দু'শো বছরে ৩৯টি দাঙ্গ হয়েছে, মুলত ২৮টি উত্তর ভারতের শহরেই। কিন্তু ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে অর্থাৎ দু'বছরে ১০১টি দাঙ্গা হয়েছে। নোয়াখালি এবং কলকাতায় ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয় ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে। আর এস এস যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তুঙ্গে তুলেছিল, তাতেই উন্মত্ত হয়ে এক আর এস এস অনুগামী গান্ধীজীকে হত্যা করেছিল। এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে ভারতবাসীদের মনোভাবের বিরাট পরিবর্তনঘটিয়ে দেয়। এ কারণে ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় ছিল। কিন্তু কংগ্রেস জনবিচ্ছিন্ন হয়ে যতই সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করতে শুরু করে, ততই সংঘ পরিবার তার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে, মুসলিম মৌলবাদী শক্তিও উঠে-পড়ে লাগে। ১৯৬৯ সালে প্রথম বড় দাঙ্গা হয় জব্বলপুরে, প্রধানত দুই সম্প্রদায়ের বিড়ি মালিকদের স্বার্থের সংঘাত। ১৯৬৩ সালে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদের ঘটনায় দাঙ্গার ব্যাপ্তি ঘটে ওপার বাংলায়ও। এর পর সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতেই থাকে। ১৭৩০ সালে প্রথম দাঙ্গা সংঘটিত হয় আজকের আহমদাবাদেই।

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে ৬৩০ টি দাঙ্গা হয়েছে, বছরে গড়ে ৩৮টি। ১৯৬৯ সালের ৫১৯ টি, ১৯৭০ সালে ৫২১ টি, ১৯৮০ সালে ৪২৭টি, ১৯৮২ সালে

৪৭৪টি, ১৯৮৬ সালে ৭৬৪, ১৯৮৮ সালে ৬১১টি দাঙ্গা হয়েছে। প্রতি বছরেই চারশোর বেশি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে চলেছে। ১৯৯০র দশকে দাঙ্গার ব্যাপকতা বেড়েছে, বিশেষত বাবরী মসজিদ ভাঙার পর থেকে। বর্তমানে কেন্দ্রেও কার্যত বিজেপি এবং গুজরাতেও বি জে পি সরকার। বি জে পি সরকারই বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংগঠক। আগে কখনও এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

২৭ শে ফেব্রুয়ারি গোধরায় ঘটনার পর গুজরাতের সর্বত্র সরকারী উদ্যোগে দাঙ্গা যে সংঘটিত হয়, তা এতদিন ছিল সংবাদপত্র, প্রত্যক্ষদর্শী ও সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সরাসরি গুজরাতের নরেন্দ্র মোদী সরকারকে দাঙ্গার জন্য অভিযুক্ত করেছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গুজরাত শাখার সভাপতি ৯৬ বছর বয়স্ক কেশবরাম কাশীরাম শাস্ত্রী স্বীকারই করেছেন মুসলিমদের দোকান ও বাড়িগুলির তালিকা আগেই তৈরি হয়েছিল। আহমদাবাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিচালিত ৭০০ হোটেল ও রেস্তোরাঁ ধ্বংস হয়েছে পুলিসের সামনে। বেছে বছে মুসলিম পরিবার ও বাড়িগুলির উপর আক্রমন করা হয়েছে। ১০০টি মসজিদ ও দরগা ধ্বংস হয়েছে। আর এস এস-এর মুখপাত্র এম এস বৈদ্য এবং সংঘ পরিবারের অন্যান্যরা এক সুরে বলতে থাকেন যে, এটা গোধরার ঘটনার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। এটা যে সংঘ পরিবার এবং গুজরাত সরকারের পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত দাঙ্গা, তা সংঘ পরিবারের মুখেই শোনা যায়। মানবাধিকার কমিশন এই সত্যকে আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বাধীন ভারতে যত দাঙ্গা হয়েছে, তার শিকার যারা হয়েছে তার মধ্যে ৮০ ভাগই মুসলিম সম্প্রদায়ের।

গুজরাতের বি জে পি মুখ্যমন্ত্রী গোড়া থেকেই দাবি করে আসছেন যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক। মানবাধিকার কমিশন গুজরাত সরকারকে অভিযুক্ত করার পরদিনই বি জে পি সভাপতি জনা কৃষ্ণমূর্তি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশংসাপত্র দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বারাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতি কেন্দ্রের অবিচল আস্থার কথা সহর্ষে ব্যক্ত করেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতা এখন বিশেষ বিপন্ন

ভবানী সেনগুপ্ত

গত সপ্তাহে (মার্চের প্রথম সপ্তাহে– সম্পাদক) আমরা গুজরাতে বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে আলোচনা করেছি। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ধর্মের ভিত্তিতে গৃহযুদ্ধ বলে মনে করা উচিত। ভারতের জনসংখ্যা ২০০১ সালের সেন্সর অনুসারে ১০০ কোটি ২৭ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ২৮ শতাংশ শহরবাসী ও ৫৩ কোটির বেশি পুরুষ। ৬৫ শতাংশ সাক্ষর, যার মধ্যে ৭৬ শতাংশ পুরুষ। প্রায় ১০ কোটিরও বেশি মুসলমান। ১ কোটি ৬ লক্ষের ওপরে

শিখ। শিখদের থেকে ক্রিশ্চানদের সংখ্যা কিছুটা বেশি। প্রায় ৭০ কোটি মানুষ হিন্দু। যারা খেটে খায় তাদের সংখ্যা ৩০ কোটির ওপর এবং এর মধ্যে ২৪ কোটিরও বেশি গ্রামীন, প্রায় সড়ে ছ'কোটি শহরবাসী। পি. আর. রাজগোপাল প্রণীত কম্যুনাল ভয়োলেন্স ইন ইন্ডিয়া (১৯৮৭) পুস্তকে দেখতে পাই ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত একটা বছরও যায়নি যখন ভারতে একাধিক রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অথবা ধর্মভিত্তিক গৃহযুদ্ধ ঘটেনি। এই পুরো ৪১ বছরে ৮৪৫৬ দাঙ্গা ঘটেছে, সবচেয়ে বেশি ১৯৬৪ সালে (১৮৭০) এবং সবচেয়ে কম ১৯৫৮ সালে (৮০)। এছাড়া দাঙ্গা ঘটেছে ১৯৬৫ সালে (৫২৫), ১৯৮৩ সালে (৫০০), ১৯৮৪ সালে (৪৭৬), ১৯৮০ সালে (৪২১) এবং এক দশক পিছিয়ে গিয়ে ১৯৬৯ সালে (৫১৯), ১৯৭০ সালে (৫২৮), ১৯৭১ সালে (৩২১), ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে ২০০ ছাড়িয়ে। ১৯৭০ সালে বেড়েছে একদিকে যেমন দাঙ্গার সংখ্যা তেমনি তার কয়েকটি ভয়ানক বৈশিষ্ট্য। ১৯৯০ থেকে কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং একটি প্রধান রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধে সাঙ্গাঙ্গভাবে জড়িত। ১৯৯২ সালে মুম্বাইয়ের ভয়াবহ ব্যাপক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় দেখতে পাই এই ধর্মীয় গৃহযুদ্ধের সঙ্গে মিলেছে বড় বড় দুষ্কৃতীর দল যাদের বলা যেতে পারে মাফিয়া এবং যাদের ব্যাপকতা আন্তর্জাতিক। ১৯৯০ সালে দেখেছি তার চেয়ে ভয়াবহ সামাজিক ঘটনা, দেশের অসংখ্য স্বল্পশিক্ষিত শহর ও গ্রামবাসী যুবকদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক গৃহদ্ধের সক্রিয় সংযোগ। অর্থাৎ যাকে আমরা সাম্প্রদায়িক সংঘাত বলে উড়িয়ে দিই এবং ভাবি ভারতভাগ্যবিধাতা কোনও না কোনও সময় তার অদৃশ্য বাহুবলে দেশ থেকে এই প্রচণ্ড মহামারী উৎখাত করবেন তা আসলে ক্রমশ প্রচণ্ডতর গৃহযুদ্ধে পরিণত হচ্ছে, এবং যদিও এই গৃহযুদ্ধের শিরোনাম 'সাম্প্রদায়িক', অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান দুই ধর্মীয় মানুষের লড়াই। আসলে এই গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন রাজ্যে, শহর থেকে গ্রামে, এবং তার আগুনে টেনে নিচ্ছে বিরাট থেকে বিরাটতর জনসংখ্যা।

ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষী দেশ বলে এবং এক ভাষাভাষী রাজ্য অন্যগুলির থেকে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন বলে আমরা এই দাঙ্গাগুলিকে একত্র করে সর্বদেশীয় দৃষ্টিতে এর সর্বনাশা চেহারা দেখতে চাই না। এ গৃহযুদ্ধ যে ক্রমশ প্রত্যেক নির্বাচনের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত ভয়ানকভাবে আমাদের রাজনৈতিক জীবনকে আক্রমণ করে বসেছে এ বিষয়েও আমরা এখনও প্রধানত উদাসীন। সারা দেশে ছ'টি রাজ্য বিশেষ করে গৃহযুদ্ধপ্রধান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৩০ বছর আগে একটি পরিসংখ্যানে দেখিয়েছিল যে অধিকাংশ দাঙ্গাই এখন আর ধর্ম সম্পর্কিত নয়, আমাদের সেকুলার রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কিত। যে ছ'টি রাজ্য দাঙ্গাপ্রধান তা হল উত্তরপ্রদেশ, এরমধ্য উত্তর প্রদেশে প্রয় ১৬ শতাংশ, বিহারে প্রায় ১৫ মতাংশ, মহারাষ্ট্রে প্রায় অন্যূন ১০ শতাংশ, গুজরাত ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রায় ৯ শতাশ এবং রাজস্থানে ৮ শতাংশের কাছাকাছি।

এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে কোনও রাজ্যেই মুসলমানের সংখ্যা এত বেশি নয় যে তারা বড় রকমের গৃহযুদ্ধ বাধাতে পারে। যদিও উল্লিখিত ছ'টি রাজ্যে মুসলমানরা এখন রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। ইন্দোনেশিয়াতে ভারতের চেয়ে মুসলমানের বাস বেশি কিন্তু তারা ভারতের মত রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে নেই। আমাদের দেশে একমাত্র কাশ্মীর ছাড়া কোনও রাজ্যেই মুসলমান প্রধান নয় এবং জনসংখ্যার যেসব পরিসখ্যান এ পর্যন্ত উল্লিখিত হল তাতে কাশ্মীর অনুপস্থিত। দুই প্রধান বুদ্ধিজীবী, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক বিপান চন্দ্র এবং মুম্বাইয়ের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম বিখ্যাত নেতা, আসগার আলি ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে যাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা হয় তার পেছনে আছে র্ধম ইডিওলজি, শ্রেণীস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ, রাজনৈতিক দলগুলির সবাই এব লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জীবিক অন্বেষী সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুবক, যারা কোনও উত্তেজনার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি এবং ঝাঁপিয়ে পড়েও।

তার ওপরে এখন তৈরি হয়েছে আ. এস.এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি কয়েকটি মৌলবাদী সংস্থার হাতে তৈরি বিপুল এক হিন্দুবাহিনী। এদের কখনও বলা হয় করসেবক, যদিও হিন্দু মন্দিরগুলিতে করসেবার প্রচলন নেই, আছে কেবল শিখদের গুরুদ্বারায়। শিবসেনার করসেবকরা দস্তুর মত জঙ্গি। বজরং দলের হাতে তৈরি এক বিরাট যুববাহিনীও তাই। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি হিন্দু মৌলবাদ দেশে এখন তৈরি করেছে বিরাট আকারের এক দল জঙ্গি যারা শুধু তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নয়, নির্বাচন ও অন্যান্য প্রয়োজনেও হিন্দু স্বার্থ রক্ষী রাজনৈতিক দলগুলির জন্যে যুদ্ধে প্রস্তুত। গুজরাতের শহরে ও গ্রামে হাজার হাজার মুসলমানদের আক্রমণ করে সরকারি গুণতিতে ছ'শরও বেশি মানুষকে হত্যা করার জন্যে দায়ী এরাই। অতএব যাকে আমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে ভারত রাষ্ট্রের ওপর প্রচণ্ড আঘাতের ভয় এতদিন করিনি, এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে ছ'টি জনবহুল রজ্যে এব উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রাজ্যগুলিতে যা পতি বছর ঘটে চলেছে তা সাম্প্রদায়িক কাজিয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুতর। দিল্লির ভূতপূর্ব পুলিস কমিশনার এবং এখন মণিপুরের রাজ্যপাল বেদ রারোয়া এদের ও মৌলবাদী মুসলমানদের কার্যকলাপের নাম দিয়েছেন 'আনসিভিল ওয়ার।' আর একটু এগিয়ে গিয়ে 'সিভিল হওয়ার' বলাই এখন বাস্তব পরিস্থিতির মুকুর। এই দুর্বৃত্ত শক্তিকে এখনও শাসনে আনা যায় যদি সারা দেশের প্রশাসন ও তার ভারপ্রাপ্ত রাজনৈতিক সাধারণ নেতারা দেশের ধর্মনিরপেক্ষ তন্ত্রকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন। জনসাধারণকে সামাজিক শান্তি ও সংহতি রক্ষার জন্যে তৈরি করা খুব বড় শক্ত কাজ নয়। যা পশ্চিমবঙ্গে হতে পরেছে তা অন্যান্য রাজ্যেও নিশ্চয় হতে পারে।

একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর বর্ণনা

দেবাশিষ চক্রবর্তী

আরও এক ধাপ এগিয়ে এই দাঙ্গাকারীদের সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীর সলাপরামর্শ চলছে। প্রসঙ্গঃ অযোধ্যার জমি। মানুষ মেরে বিনিময়ে জমি চাইছে ভি এইচ পি। অন্যথায় আরও হিংস্রতার হুমকি দিচ্ছে। হাঁটু গেড়ে আত্মসমর্পণ করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।

কেবল কি অসংখ্য সংখ্যালঘু পরিবারেরই মৃত্যু হলো গুজরাতে? আর কারোর হলো না? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের মৃত্যুর ধ্বনিও কি নিহিত হয়ে রইলো না এই মারণ-বসন্তে?

এমনই তো হবার কথা ছিলো। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ থেকে ধার করে বলা যায় ঃ 'ক্রনিকল অব এ ডেথ ফোরটোল্ড'। একটি পূর্বঘোষিত মৃত্যুর বর্ণনা।

গণশক্তি ঃ ১০.০৩. ২০০২

গুজরাত জ্বলছে

কমলেন্দু চক্রবর্তী

মধ্যযুগের অন্ধকারে আকর্ষণ করে যে অভিকর্ষ তাকে বলে কালের অন্তর্জলী যাত্রা। বর্তমান আধুনিককাল থেকে নিরন্ধ্র অতীতে অধঃপতনের চমৎকার জঘন্য– এক সুড়ঙ্গ পথ। তখন, কোনও এক ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০২, মধ্যরাত্রির পর আর ২৭ তারিখ আসে না। তাই জেগে উঠে হঠাৎ দেখি দেশটা আবার কদর্য সেই ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এর এসে ঠেকেছে। তারপর একটা সপ্তাহই উবে যায় একবিংশ শতক থেকে।

সংবাদপত্রে, টেলিভিশনে তখন জ্বলন্ত গুজরাত। জ্বলন্ত পূণ্যসলিলা সবরমতীর নামে উৎসর্গীকৃত এক্সপ্রেস। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে, আপনার নাকে ঝলসে ওঠা মানুষের চামড়া পোড়া গন্ধ। পাতায় পাতায় নির্মম ছবি। বন্ধঘর। জীর্ণ জানালা। ধসে পড়া দেওয়াল। বুকের কাছে, হাত দুটো জোড়া। জানে না কিছুই, বলছে বাঁচাও। অশ্রুসজল অপাপবিদ্ধ কিশোর মুখ। অন্ধকার পেছনে, আরও জরাজীর্ণ খোদাই বলীরেখাময় মুখের ন্যুজদেহী একসারি। চোখ তাদের শুকনো। যেন জীবনের দেখা বহু অভিজ্ঞতায় মরে যাওয়া নদী। বাইরে কারা? কারা?

১৯৯০ থেকে কুশলী হাতে হাতে তৈরি হচ্ছে খণ্ড বিখণ্ড রাম জন্মভূমি সৌধ। রাজস্থানী মরুর পাথর। খরচ হয়েছে ১৫ কোটি। সংস্থান রাখা ৫০০ কোটি। এক যুগ ধরে একটু একটু নিজের গড়ে তোলা এক ভিন্ন প্রতীক্ষা। গর্ভগৃহে জন্ম নেওয়া সুদূর

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রতিটি পরতে, ছেনির আগাতের মুখে ছুঁয়ে যায় উন্মাদনা। জল্লাদের নিখুঁত পরিকল্পনা।

২০ ফেব্রুয়ারি সর্বনাশের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে, বেনারসের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর ঘোষণা, উত্তর প্রদেশ নির্বাচনে বিজেপি শুধু জিতবেই তাই নয়, মুসলিমদের সমর্থন ছাড়াই জিতবে। কখনও কবি কল্পনা এক চৌকস রাজনীতিকের অথবা মৃত্যুর ফেরিওয়ালার? বিশ্ব হিন্দু পরিষদওয়ালারা যখন গোটা দেশটাকে জ্বলন্ত নরককুণ্ডে পরিণত করতে দ্বিধাহীন। তৎপর। যখন ১৪ মার্চকে টার্গেট ডেটলাইন ধরে সারা দেশ থেকে জড়ো করা হচ্ছে করসেবকদের বেনামে লেঠেল আর খুনে বাহিনীকে।

ইনিই তো, ২০০০ সালে স্টেটেন আইল্যান্ডের ভাষণে সন্তপরিবৃত অবস্থায় বলেছিলেন, আমি একজন স্বয়ং সেবক। প্রধান মন্ত্রিত্ব তো দু'দিনের।

'সত্যটা হল অযোধ্যায় রামজন্মভূমি আন্দোলনকে এত কাল বৈধতা দিয়ে এসেছেন তাঁরাই। ১৯৮৫ সালে পালামপুরু অধিবেশনে বিজেপি এই আন্দোলনকে তাদের এজেন্ডায় স্থান দেবার আগে পর্যন্ত, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্দোলনের দিকে কেউ ফিরেও তাকায়নি। তার চেয়েও বড় কথা, ১৯৮৪ সালে ভারতের রাজনীতি থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া বিজেপি যে তার দেড় দশকের মধ্যে লোকসভায় সর্ববৃহৎ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে তা একমাত্র ওই রামজন্মভূমি আন্দোলনের জন্যই।' [আনন্দকবাজার, ৬ মার্চ]

বাবরী মসজিদ ধ্বংস করার অভিযোগে অভিযুক্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানি ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যখন চার্জশিট পেলেন, সংসদে ওদের পদত্যাগের দাবিতে জোরাল আওয়াজ, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, রামবন্দির নির্মাণ 'জাতীয় ভাবাবেগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, গোটা দেশ সংসদের ভেতরে বাইরে নিন্দায় মুখর। বাজপেয়ী সুর নরম করে বললেন, অযোধ্যা সমস্যার সমাধান, হয় আদালতের রায়ের ভিত্তিতে হবে, বা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। তাতেও দেশ সন্তুষ্ট নয় বুঝে, কেরালার কুমারাকোমের বিশ্রাম আবাসে লিখিত বিবৃতি দিলেন, অতীতের ভুল আধুনিক সময়ে আরেকটা একই ধরনের ভুল দিয়ে সংশোধন করা যায় না। অবশ্যই প্রশ্ন জাগে, কোনটা প্রধানমন্ত্রীর মুখ, কোনটা মুখোস?

পুঁজি বিনিয়োগের শীর্ষরাজ্য এই গুজরাতেই সযত্নে মধ্যযুগীয় সুড়ঙ্গ খোঁজার এক কলঙ্কজনক অধ্যায় শুরু হয়েছিল। আদবানির নেতৃত্বে সোমনাথ থেকে রথযাত্রা ছিল সংঘ পরিবারের সম্মিলিত সেই প্রকৌশলের পথিকৃৎ। যাত্রাপথের দু'দিকে সংঘ পরিবারের ভৈরববাহিনীর উগ্র সমাবেশ। ঘোষিত লক্ষ্য, জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করতেই শুরু হচ্ছে এই রথ যাত্রা। অচিরেই দাঁত ও নখ বেরিয়ে এলো। ২৫ সেপ্টেম্বর যাত্রা শুরু করেই ভৈরব বাহিনী মেতে ওঠে তাণ্ডবে। রথযাত্রা পর্বে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক হিংসার

বলি হয়েছেন ৫৬৪ জন নিরপরাধ মানুষ। যাঁদের পরিচয় ভারতীয়। আহত কয়েক হাজার, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অভূতপূর্ব। চরম নির্লজ্জের মত সে দিন আদবানি তাঁর দলের নির্বাচনী প্রতীক পদ্মফুলকে ব্যবহার করেছিলেন রথের গায়।

১৯৯১ সালে সংবাদ সংস্থা ইউ এন আই-এর তথ্য, রামজন্মভূমি বিতর্কের শুরু থেকে চার বছরে দেশে ৪০টি বিভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। লিবারহান কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের আন্দোলনের জন্য গর্ব প্রকাশ করেছেন। বার বার বলেছেন, রাম আন্দোলনের একজন কর্মী হিসাবে, নিজেকে গর্বিত মনে করেন। স্বঘোষিত হিন্দুত্বের প্রতিনিধির কাছে প্রশ্ন; তাঁর নেতৃত্বে রথযাত্রায় পিষ্ট নিরপরাধ ৫৬৪ জন ভারতীয়, ৪০টি হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ওড়িশায় খ্রিস্টান মিশনারী স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশু পুত্রকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারা, গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যে ঘটে যাওয়া খ্রিস্টান ও মুসলিম সংখ্যালঘু উৎপীড়ন, মুম্বাইতে সংঘটিত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা– প্রতিক্ষেত্রে অত্যুতসাহী তাঁর প্রিয় তথাকথিত রাম আন্দোলনকারীদের বর্বরতম হিংসা। তিনি নিশ্চয় তার জন্যও গর্বিত? এ প্রশ্নের জবাব তাঁকেই তো দিতে হবে।

*** উন্মত্ত হাওয়ার আগেই কিভাবে দাঙ্গা ছড়াল**

'এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুবই সুপরিকল্পিতভাবে, ইচ্ছে করেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেনা বাহিনীর সাহায্য চেয়েছেন দেরিতে। বর্তমান মুখ্যমনত্রী শুধুই প্ররোচনা জুগিয়ে গিয়েছেন একেবারের প্রকাশ্যেই। রাজ্যে কেন দাঙ্গা হচ্ছে জানতে চাইলে বরফের মতো ঠাণ্ডা গলায় সাংবাদিকদের নিউটনের 'থার্ড ল' স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি– 'এভরি অ্যাকশন হ্যাজ অ্যান ইকোয়াল অ্যান্ড অপোজিট রি অ্যাকশন।' অর্থাৎ ঢিল মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে।'

... বুধবার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ঝলমলে সকাল, তন্দ্রা জড়িত যাত্রীরা একে একে জেগে উঠেছে। এখন ৭টা বেজে কুড়ি, আহমদাবাদগামী সবরমতী এক্সপ্রেস গোধরা স্টেশনের প্লাটফর্ম ছুঁয়েছে। জয় শ্রীরাম স্লোগানে কামরাগুলি সরগরম। এ গাড়ি উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ থেকে বেশ ভাল সংখ্যক করসেবক নিয়ে যাত্রা করেছে, যাদের মনে এখন ঘরে ফেলার তাদিগ। যাত্রীরা চা, মুখরোচক ভাজার সন্ধান করছে। চারপাশের পরিবেশে অস্বাভাবিক কিছু নেই, অন্য স্টেশনগুলোর ত একই ছবি এখানেও। এমনকি অন্যান্য জয়গায় যা চোখে পড়েছে সে দৃশ্য এখানেও চোখে পড়ছে। দুই ভেণ্ডারের সাথে কিছু যাত্রীর সামান্য কোন কিছু নিয়ে বচসা চলছে।

সম্ভবত গাড়ি মাত্র এক কিলোমিটার পথ ছুটেছে। হঠাৎ গাড়ি থমকে গেল। হয়ত ভেতর থেকে কেউ চেন টেনেছে, যাত্রীরা বিরক্ত, অযথা দেরি। গাড়ি আগে থেকেই সময়সূচী থেকে অনেক পিছিয়ে। কিন্তু কোন যাত্রীর মনে এ সময়ও কোন ধারণাই নেই

কি ঘটতে চলেছে। হঠাৎ ইট পাথরের প্রবল বর্ষণ শুরু হল। লক্ষ্যস্থল 'এস-ছয়' কামরার জানালার পাল্লা, এখানে ভি এইচ পি'র করসেবকরা আছে।

তৎক্ষণাৎ, কামরা এস-ছয় ও অন্যান্য কামরার ভীত যাত্রীরা জানালার পাল্লা এবং দরজার ছিটকিনী বন্ধ করে ফেলে। সেকেন্ড ক্লাস স্লিপার কোচ ভাঙ্গা তোবড়ানো জানালা দিয়ে, এরই ফাঁকে জ্বলন্ত কাপড় চোপড়, এ্যাসিড বাল্ব এবং ছুঁড়ে দেওয়া হতে থাকে পেট্রল। মুহূর্তের ব্যবধানে, কামরাটা জ্বলতে শুরু করে। আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের কামরাগুলিতেও। অসহায় বন্দী যাত্রী যারা ওই কামরায় ছিলেন, আগুনের লেলিহান শিখা তাদের গ্রাস করে। দগ্ধ মৃত ৫৮ জনের ২৬ জন ছিলেন মহিলা, ১৬টি ছোট্ট ছেলেমেয়ে। ৪৩ জন জখম, যাদের ৯ জন মহিলা, ৩ কাচ্চাবাচ্চা। ওদের মধ্যে কুড়ি জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। (পরবর্তীতে সরকারী অনুসন্ধানে জানা যায় যে রেল কামড়ার আগুন ভিতরের দুর্ঘটনা ছিল- সংকলক)।

সংবাদ বাতাসের আগে ছোটে, গোটা গুজরাত দাবানলের মতোই জ্বলতে শুরু করে। উন্মত্ত পরিস্থিতি আরও কদর্য হয়ে পড়ে যখন গুজব রটে যায় সবরমতি এক্সপ্রেসে হিন্দু রমনীদের ছিনিয়ে নিয়ে যথেচ্ছ ধর্ষণ করা হয়েছে। পরদিন পত্রিকাগুলিতে ঘটনার অতিরঞ্জনের বিরোধিতা, সরকারীভাবে বসে সংবাদের সত্যতা অস্বীকার, কোন কিছু শেষ রক্ষা করতে পারে না। চূড়ান্ত ক্ষতি ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।

এবার একটু অন্য দিকে তাকাই। গোধরার দিকে। ওখানে কি ধরনের গুজব ছিল আকাশে-বাতাসে। তার একটি হচ্ছে, মর্মান্তিক ঘটনার আগে সংগোপনে কানাঘুষা আসছিল মুসলিম মহল্লায়, সবরমতী এক্সপ্রেসের কর সেবকরা নাকি 'দাহুদ'-এ মুসলিম উপাসনালয় ধ্বংস করে দিয়েছে। গুজব সকলকে ক্ষিপ্ত করে রাখে। পুলিসের অনুমান, জঘন্য ঘটনা ঘটাতে একদল দুষ্কতির প্ররোচনা ইন্ধন জুগিয়েছে।- এখন এটা স্পষ্ট দু'দিকে ঠিক বিপরীত ইন্ধন জুগিয়ে পরিকল্পনা মাফিক গোটা গুজরাতকে নরককুণ্ডে পরিণত করা হয়েছে। গুজরারেত ২৬টি শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গার লেলিহান শিখা জ্বালানো হয়েছে। শান্তিপূর্ণ অঞ্চল গান্ধীনগর, সৌরাষ্ট্রে বা শহরে অভিজাতদের বাসস্থান, কিছুই সেই উন্মত্ততার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি।

পাঠক, আমি গোধরা প্রসঙ্গে আজকাল পত্রিকার সাংবাদিক দেবারুন রায়ের প্রতিবেদনটা আপনাদের কাছে হুবহু তুলে ধরছি, 'দিল্লি ২ মার্চ। যে গোধরার ট্রেন দাঙ্গা নিয়ে-গুজরাতে আগুন জ্বলল, তার নেপথ্যে কি ছিল, আজ গুজরাত ঘুরে আসা ৪ নেতা ও সাংসদ জানালেন সে কথা। বলছিলেন রাজ বব্বর, শাবানা আজমী, অমর সিং ও সীতারাম ইয়েচুরি। এলাহাবাদ থেকে ওই অভিশপ্ত সবরমতী এক্সপ্রেসে উঠেছিল বছর বারোর ছেলে জ্ঞানপ্রকাশ চৌবাসিয়া। এখন সে আহমদাবাদ হাসপাতালে। চোখের সামনে ওর মাকে জ্বলতে দেখেছে আক্রমণকারীদের আগুনে, বাবাকেও। বাবার প্রাণ এখনও ধুক ধুক

করছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ... জ্ঞানপ্রকাশ ও তার বাবা-মা করসেবক নয়। সংরক্ষিত তিনটি শায়িকা আসন নিয়ে ওরা ওই ট্রেনে যাত্রী হওয়া থেকে একের পর এক ঘটনার সাক্ষী হতে থাকে। করসেবক নাম ধারী একদল লোক, যাদের মাথায় গেরুয়া ফেট্টি বাঁধা, হাতে লাঠি ঘোঁটা, তারা ট্রেনে উঠেই ওদের একটা বার্থ দখল করে নিয়ে বলে, 'তিনজন আছিস, দুটোই যথেষ্ট। আমরা রামসেবক। আমাদের কেনও টিকিটের দরকার হয় না।' টিকিট চেকার আসেন। গালমন্দ করে ফিরিয়ে দেয় রেলবগির বর্গিরা। জোর যার মুল্লুক তার– এখানে সবে শুরু। একের পর এক স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াচ্ছে আর ওরা সব নেমে দোকানী পসারীদের খাবার নিয়ে খাচ্ছে। পয়সা আবার কী? 'জয় শ্রী রাম, হো গয়া কাম।' বলেই ফের ট্রেন কামরায়। জ্ঞানপ্রকাশ বলে চলেছে, নারেবাজিতে (স্লোগান) সারা দিন রাত আমরা বসতে শুতে পারিনি। খেতেও পারিনি পুরোপুরি। প্রত্যেক স্টেশন এলেই আসছে নতুন নতুন আতঙ্ক। শেষ পর্যন্ত এলো গোধরা। একটা চা-ওয়ালা ছেলে ট্রেনের কামরায় আসতেই নারেবাজরা লুটে নিল তার চা। ছেলেটা এল পয়সা চাইতে। জবাব এল; পয়সা আবার কীরে? আমরা করসেবক। আহমাদের সব 'ফিরি (ফ্রি)।' ছেলেটা মানতে নারাজ। ওর চায়ের কলসি পুরো উজাড় করে খালি হাতে ফিরবে? নাছোড় ছেলেটাকে চ্যাংদালা করে ওরা ফেলে দিল ট্রেন থেকে। তারপর থেকেই পরিস্থিতি অন্য মোড় নিল।'

এরপর বিভিন্ন সংবাদসূত্র থেকে সংগ্রহ করুন– গ্রামের কাছে কেউ গাড়ি থামাল চেন টেনে। এমন কেউ যে জানে ওটা মুসলিম প্রধান গ্রাম। ওখানে বেশ কিছু অপরাধজগতের কারবারিও আছে। চুঁইয়ে আসা ক'দিনের গুজবও আছে। গাঁয়ের হাজার দেড়েক লোক এসে পড়ল লাইনের ওপর। খাবারের দাম না দিলে অবরোধ করে রাখব। এর পরই ঘটল আসল ছকের খেলা। অন্ধকারের জীবেরা বেরিয়ে এল। পাশেই ছিল দুটো পেট্রোল পাম্প। প্রশ্ন, যারা এতক্ষণ ট্রেনে মারামারি, লুটপাট করেছে তারা কি সত্যিই বসেছিল না সরে পড়েছিল! সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক, মারা পড়েছে নিরীহ মানুষ। তাঁরা কে হিন্দু কে মুসলমান– কে তা বলবে?

গোটা নরককুণ্ডটা গুজরাত জুড়ে সাজানোই ছিল। শুধু দরকার ছিল দেশলাই কাঠির। পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি। ওই দিন বন্‌ধ ডেকেছে ভি এইচ পি, সরাসরি মদত দিয়েছে বিজেপি। রাজ্যব্যাপী বন্‌ধের দিন গুজরাতের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে অন্ধকারের ভয়ঙ্কর জীবরা বেরিয়ে এলো। আহমদাবাদ-সহ সবকটি শহরে বল্গাহীন হত্যাকাণ্ডের বন্যা বয়ে গেল। এক নাদীর– শাহী কবর থেকে উঠে এসেছে। পুলিস-প্রশাসন জড়ভরত। অন্ধ। মনে রাখতে হবে, দাঙ্গাবাজরা ততক্ষণে রক্ত পিপাসা মিটিয়েছে অবাধে।

যথারীতি দাঙ্গাবাজদের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর, সম্পত্তি, জীবন। হামলাগুলো সব আছড়ে পড়েছে মুসলিম বসতিগুলোর ওপর। সরকারীভাবে যখন বলা হচ্ছে মৃত ৮০ জন, তখন ২০০ মানুষ খুন হয়ে গেছে। তথ্যের ফারাকটা এমনই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কত দ্রুত, কতদূর দাউ দাউ জ্বলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মাত্র কয়েকটি পরিসংখ্যান থেকে। আহমদাবাদ, বরোদা, রাজকোট এবং সুরাত সমেত ২৬টা শহর দাঙ্গায় জ্বলেছে। সম্পূর্ণভাবে কারফিউ কবলিত। উপরন্তু, এবার বিপদজনক প্রবণতা, দাঙ্গাবাজরা সাফল্যের সাথে হিংসাকে ছোট শহর, গ্রাম-গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছে। সৌরাষ্ট্র অঞ্চল, সুনাম ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে অতীতে বিরত থেকেছে, এবার সব গর্ব ভেঙে গেছে সেখানে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ হাইওয়েগুলি যেখানে সর্বদা কড়া নিরাপত্তা থাকে, অবাধে মুসলিমদের ট্রাক বেছে বেছে আগুন দেওয়া হয়েছে, লুঠ হয়েছে ইচ্ছেমত।

সম্ভবত সবচেয়ে কদর্যভাবে দাঙ্গাক্রান্ত হয়েছে আহমদাবাদ। একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ছিল মুসলমান ও তাদের সমুদয় সম্পত্তি, দাঙ্গাবাজরা বেপরোয়াভাবে, সংগঠিত আকারে মুসলমানদের দোকান, অফিস, এমনকি পানের দোকান ভেঙ্গে লুট করে নিয়েছে সর্বত্র। শহরের যে কোন হাইরাইজে উঠলে চোখে পড়েছে সর্বত্র লেলিহান আগুনের শিখা– আহমদাবাদ শহরটাকেই বুঝি আগুন গ্রাস করবে। তাণ্ডবের প্রশ্নে কোন বাছবিচার ছিল না। সব একাকার, মজুর শ্রেণী অধ্যুষিত দরিয়াপুর, বাপুনগর, মেগানিনগর বলুন। অথবা, যেখানে অভিজাত সপিং কমপ্লেক্স সারি সারি সেই সি জি রোড, কিংবা, পশ্চিম শহরতলীর অংশগুলি সর্বত্র হামলা ঘটেছে অবাধে।

বিস্ময়কর, গুজবে থিক থিক রাজধানী গান্ধীনগরের কদর্যতা সব মাত্রা ছাড়িয়েছে। এ শহর শুধু রাজধানী নয়, তার গর্ব ছিল অতীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তার বুক কলুসিত হয়নি। এবার দাঙ্গায় ছেয়ে গেছে। সরকারি দপ্তর যা পুরাতন সচিবালয় বলে পরিচিত, হাট করে খোলা, দুবৃত্ত দাঙ্গাবাজদের দখলে। প্রথমে দাঙ্গাবাজরা কর্মচারীদের দপ্তর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে আদেশ দেয়। পরে ভেতরে অবস্থিত 'ওয়াকফ বোর্ডের অফিসে লুটতরাজ অগ্নিসংযোগ ঘটায়। সংলগ্ন অফিস 'মাইনরিটিস্ ফিনান্স কর্পোরেশন' তার অফিস বাড়ির অদৃষ্টেও ঐ একই ঘটনা ঘটে। অভিজাত অফিস কমপ্লেক্স উদ্যোগ ভবন, এখানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অফিস রয়েছে, সরকারী গাড়ি জ্বলেছে, গোটা ভবন যথেচ্ছভাবে আক্রান্ত হয়েছে দাঙ্গাবাজদের হাতে।

মার্চ ১১ সংখ্যায়, আউটলুক পত্রিকা লিখেছে, যে কাহিনীগুলি দিনের শেষে কানে আসত সবই আতঙ্কজনক। তবে কোনও ঘটনাই এত কদর্যতা প্রত্যক্ষ করেনি। যা প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল কংগ্রেসি প্রাক্তন সাংসদ এহ্সান জাফরীকে। যিনি সপরিবারের খুন হয়েছেন তাঁর বাসভবনে, আহমদাবাদে গুলমার্গ হাউজিং মজুর শ্রেণী অধ্যুষিত চমনপুরায়। দাঙ্গাবাজরা ঘরে ঢুকে খুন করেছে সকলকে। হাউজিং-এ মোটে ৩৭ জন মানুষ খুন হয়েছে নির্দয়ভাবে পুলিস সূত্র এখন স্বীকার করছে, সে দিন সকাল ৯টা থেকে নিহত সাংসদ জাফরী পাগলের মতো যোগাযোগ করেছেন চারদিকে। এমনকি, সাহায্য ভিক্ষা চেয়েছেন পুলিস কন্ট্রোল রুমে।

তবু কোন পুলিসি সাহায্য মেলেনি। শেষ পর্যন্ত, উন্মত্ত দাঙ্গাবাজরা চারদিক থেকে তাঁর বাড়ি ঘিরে ধরে। শেষ চেষ্টা হিসেবে জাফরী তাঁর ব্যক্তিগত রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ে আত্মরক্ষার চেষ্ট করেন। উন্মাদ আক্রমণকারীদের কাছে এ বালির বাঁধ ব্যর্থ হয়। সংবাদ হচ্ছে, একটা পুলিস পিকেট, যার নেতৃত্বে একজন ইন্সপেক্টর, সাথে চারজন কনস্টেবল তারা যথারীতি নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে গোটা ঘটনারয়।

* ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা– এঙ্গেলস

আউটলুকের প্রতিবেদক কাইফি পরশুরাম, লিখেছেন, '১৯৯৩-এর বম্বে দাঙ্গার পুনরাভিনয় ঘটল। স্টেট রিজার্ভ পুলিস অলসভাবে বসে, নির্দেশের প্রতীক্ষায়। সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে, কম করে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিস বাহিনী। উচ্চ পদস্থ পুলিস অফিসাররা 'বিশেষ অঞ্চলে' 'দাঙ্গার খবর পেলে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।'

একদিন, জর্জ বানার্ড শ' স্বভাব সুলভ তির্যক ভঙ্গিমায় বলেছিলেন, ইতিহাস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, ইতিহাসের শিক্ষা আমরা পাই না, আর পেলেও তা নিইনা।– কথাটা কত বড় অনিবার্যসত্য, রক্ত, কান্না, ঘাম, মৃত্যু দিয়ে গুজরাতের ৮০০ মানুষ আমার প্রমাণ দিতে বাধ্য হলেন। পাগলা মেহের আলির মত তবু ওরা বলছে, 'সব ঠিক হ্যায়'। অথচ, গুজরাত জ্বলন্ত জতুগৃহ।

দুটো ছবি গত কয়েক দিনে আমার গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে। বার বার চোখে পড়েছে সকলের। একট ছবি, শান দেওয়া ধারালো তরোয়ালের মিছিল। উন্মত্ত হুঙ্কাররত যুবক। বুকে একটা বিশেষ দেশের নাম খোদাই। চোখে জ্বলছে হিংসার কদর্য আগুন।

বিপরীতে অন্য ছবি। দাঙ্গাবাজদের মুখে পড়া, বিধ্বস্ত মুখের সুঠাম যুবক। দুটো হাতে করুণ মিনতি। দু'চোখে নিদারুণ আর্তি। বাঁচতে চাই। বাঁচাও। প্রাজ্ঞ প্রবীণ অশোক মিত্রের ধারালো চাবুক ছিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ এক প্রাক্তন সাংসদ আপন্ন, প্রধানমন্ত্রীকে জানানো সত্ত্বেও তিনি আড়মোড়া ভাঙেননি। পাঠাননি তাৎক্ষণিক নির্দেশ।

সমগ্র গুজরাত জ্বলছে। কবি বাজপেয়ী তখন কি করছেন...। প্রাধনমন্ত্রী নিষ্ক্রিয়। মুখ্যমন্ত্রী পরম নিশ্চিন্ত। দুই সরকার কালান্তক পক্ষাঘাতে শায়িত। দাঙ্গা থামানোর রাজনৈতিক সংকল্পটিই অনুপস্থিত। হাড়ে মজ্জায় সংঘ পরিবারের দাসত্ব। ক্লীবতা।

ইতিহাস এক নিষ্ঠুর দেবতা। কথাটা বার বার এসে যায়। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী আউড়েছেন নিউটনের থার্ডল। ওটা কিন্তু থেমে থাকে না।

সৌজন্য ঃ সংগ্রামী হাতিয়ার

তবু জগে মানবতা

মহাশ্বেতা দেবী

হাহাকার, ধ্বংসের আগুন ইত্যাদির মধ্যেও যে মানবকতা জাগে, হর্ষ তা দেখেছিলেন। সেটাই এই চরম দুঃখের দিনে তাঁকে গর্ব ও আশার কয়েকটি মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। আগেই বলেছি, আবারও বলছি, গুজরাটে মুসলিমরাই এগিয়েছেন শরণার্তকে সাহায্য করতে। সংবিধান বলে, দেশের যে নাগরিকরা করুণাপ্রার্থী, তাদের রক্ষা করা, ত্রাণ করার প্রাথমিক দায়িত্ব রাজ্যের– সে দায়িত্ব পালনের কোনও চিহ্ন কোনও শরণ-শিবিরে দেখা যায়নি। রাজ্য সরকার ওই বিপন্ন শরণার্থীদের নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা করেনি। হাজার হাজার নরনারী ও শিশু, যারা নিরাপত্তার খোঁজে শরণার্থী শিবিরে এসেছে, তাদের আহার্যটুকুও জোগাবার ব্যবস্থা করেনি।

(আমি না বলে পারছি না, গুজরাটের আসল মুখটা হয়ত এমন ছিল না, আজ আসল চেহারাটা দেখা যাচ্ছে। অন্তত তিন দশক ধরে নাজিবাদধর্মী বিষ এ রাজ্যে কাজ করেছে।– সংবেদক)

গর্ব ও আশার কয়েকটি বিরল মুহূর্ত হর্ষকে কারা উপহার দিলেন? মুজিদ আহমেদের মত তরুণ, রোশান বহেনের মত বয়স্কা মহিলা। চারদিকে মানবতার ধ্বংস আর ধ্বংস। মানবতাবোধ এঁদের থাকতে দিচ্ছে না। অক্লান্ত জেদে এঁরা কাজ করে চলেছেন।

আমনচক শিবিরে নারীরা আশীর্বাদ করছেন তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের। ওরা কাজে লেগে যায় ভোর চারটেয়। রাত বারোটার পর অবধি ওরা কাজ করে চলে। প্রতিটি শিশু দুধ ও খাবার পেয়েছে। আহত, জখমি প্রতিটি মানুষকে ক্ষত পরিস্কার করে মলমপট্টি বাঁধা হয়েছে, তা জেনে ওদের সেদিনের কাজ ফুরোয়।

(মানবতা জাগে, জেগে থাকে। মনে করুন জোয়ালারাম ট্রাস্টির বৃদ্ধ সেবককে, যিনি নিষ্পাপ হেসে বলেছেন, রামের নামে অন্নদান, সে কাজে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ তো নেই! নিরন্নের কোনও জাতি বা ধর্ম, সাদা চামড়া বা কালো চামড়া থাকে না। পরিচয় একটাই, ওরা নিরন্ন।– সংবেদক)

হর্ষ বলেছেন, তরুণ স্বেচ্ছাসেবীদের নেতা মুজিদ আহমেদ এক স্নাতক। তাঁর রাসায়নিক রঙের ছোটখাট কারখানাটিও জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। তা নিয়ে হাহাকার করবার সময় নেই তাঁর। ওই শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন পাঁচ হাজার শরণার্থী। প্রতিদিন মুজিদকে তাঁদের জন্য ষোলশো (১৬০০) কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য জোগাড় করতে হচ্ছে।

রোশান বহেনের বয়স ষাট। তাঁর পক্ষে এ কাজ আরও কঠিন। জুয়াপাড়া শিবিরের শরণার্থীদের কাছে পৈশাচিক সন্ত্রাস, হত্যা ও পৈশুন্যের কথা যত শোনেন, ততবার চোখ মোছেন।

রোশন বহেনের আজ শোক করার বা ক্রুদ্ধ হওয়ার বিলাসের সময় নেই। ঘুমোতে খুব কমই সময় পান। প্রায় নিদ্রাহীন তাঁর স্বেচ্ছাসেবীরাও। ওই ত্রাণশিবিরের চারপাশে ওঁদের বস্তি। সকলেই খেটে-খাওয়া মুসলিম নারী ও পুরুষ।

নির্দয় ঘাতক-জনতার রুদ্র হিংসা এড়াতে শত শত শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। স্বেচ্ছাসেবী নরনারী তাদের নিয়ে যাচ্ছেন শৌচালয়ে। আহার জোগাচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

(ভূমিকম্পের সময়ে ছিলাম বরোদায়। বরোদা ও আমেদাবাদে দেখেছি ত্রাণকার্যে আহার্য এবং অন্যান্য বস্তু পৌঁছতে ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের ভিড়। এবারকার উত্তর-গোধরা পর্ব যুদ্ধের, যা প্রত্যহ চলছে, তার সঙ্গে হর্ষ-র রিপোর্টকে মেলাতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তবে মেলাতে পারছি। ছকটা এখন নগ্নভাবে পরিষ্কার।– সংবেদক)

ত্রাণশিবির থেকে শিবিরে চলতে চলতে হর্ষের মনে হচ্ছিল, এমত পরিস্থিতিতে গান্ধী কী করতেন! কলকাতার দাঙ্গার কথা বলেছেন তিনি, গান্ধী যখন শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনশন করছেন। একটি হিন্দু আসে তাঁর কাছে। তার কিশোর ছেলেকে মেরেছে মুসলিম দাঙ্গাবাজরা। তার ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার ইচ্ছা– দুটোই সুতীব্র। শোনা যায়, গান্ধী বলেন, তোমার ছেলের বয়সী যে মুসলিম কিশোরের মা-বাবাকে হিন্দুরা মেরেছে, তেমন একটি ছেলেকে পুত্রস্নেহে লালনপালন করো। তবে তার স্বধর্মে, ইসলামে আস্থা রেখেই সে যাতে বড় হয় সেটি দেখো। এ কাজ করতে পারলে দেখবে জয় করেছে তোমার বেদনা, ক্রোধ ও প্রতিহিংসার ইচ্ছাকে।

হর্ষ বলছেন, তেমন কোনও কণ্ঠস্বর আজ শোনা যাবে না। নির্দোষকে হত্যা করার সাফাই হিসেবে নিউটনের ফিজিক্স নিয়ে আলোচনা শোনা যাবে। তেমন কণ্ঠস্বরে আমাদের হৃদয়ই আমাদের বলুক, ন্যায়, ভালবাসা ও সহিষ্ণুতার ওপর আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আজ বড় প্রয়োজন।

উনি আরও বলেছেন, গুজরাটের খুনি জনতা ওঁর অনক কিছু কেড়ে নিয়েছে। লুট হয়ে গেল একটি গানও, যা বড় বিশ্বাসে,বড় গর্বে গাইতেন! সে গান হল, 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা।'

এ গান তিনি আর কখনও গাইতে পারবেন না।

(পাঠক! গুজরাটে কিন্তু যুদ্ধনিয়ন্ত্রারা সংঘর্ষ জারি রেখেছে। গুজরাটে মেয়েরাও যে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে মেতেছে, এটার প্রকৃত ব্যাখ্যা আমার কাছে এইরকম গুজরাট ছিল নির্বাচিত পরীক্ষাগার। সংঘ পরিবার খুব কৌশলী ছকে সামরিক প্রস্তুতিতে এই গণসন্ত্রাস, গণহত্যা চালিয়েছে। এই পরিকল্পনায় প্রথমবার আক্রমণ করল পুরুষরা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মেয়েরা নামল এই কাজে, যাতে প্রতিষ্ঠা করা যায় যে মুসলিম নিধন ও বিতাড়ন হচ্ছে একমাত্র ধর্মীয় কাজ। মেয়েরাও এ কাজ এ জন্যই করছে, যে তাদের বিবেক থেকে তারা এই কাজ করার সমর্থন পাচ্ছে। কাদের মাথায় এই চিন্তার বিষয়

ঢোকানো হয়েছে? তিরিশ অবধি। তিরিশের ওপরের বয়স অবধি এই সংঘীয় নাজিবাদের বিষ বহুদিন ধরে ঢোকানো হয়েছে। এ হেন কাজ ওরা করতই, এবং বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে এখন এ হেন কাজের প্রতি সমর্থন তৈরি হয়ে গেছে। নাজিবাদের নতুন সংস্করণ এটা। আরও যে কত কৌশল আছে। কেন আদিবাসীদের জড়ানো? শেষ বিশ্লেষণে বলছি এটিও যে জাতি ও শ্রেণী নির্যাতন, তা জোর দিয়ে বলব। খবর আসছে, আরও খবর পেলেই লিখব। লিখব এই আশায় যে, ঠাণ্ডা মাথায় বিশ্লেষণ করবেন পাঠকরা। আপাতত বলব, পাঁচটি দাবি প্রচার হোক, এটাই চাই আমি ও সহসাথীরা। প্রতি শান্তিকামী, মৌলবাদ বিরোধী মানুষই সহসাথী। দাবিগুলি জানাব ভারতের রাষ্ট্রপতিকে। যেমন–

১। গুজরাট রাজ্য সরকার নিযুক্ত কমিশন নয় সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত কোনও বিচারক এ-সব ঘটনার তদন্ত কমিশন চালান। নইলে ওই রাজ্যের সরকারের ও প্রশাসনের সত্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে না।

২। ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের ও ব্যক্তির তাদের নিজভূমে, স্বস্থানে, পূর্ণ পুনর্বাসন করতে হবে। তাদের উচ্ছেদ করে জমি-ফাটকাবাজদের পুরাতন ও পরিচিত খেলা এবারও যেন না হয় তা দেখা হোক।

৩। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী এক সরকারি অফিসারকে রামশিলার ব্যাপারে পাঠালেন। এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পক্ষপাতদুষ্ট। এদের কোনও প্রশাসনিক সদিচ্ছা নেই। এদের প্রতি ধিক্কার জানাক গোটা দেশ।

৪। গুজরাটে হিংসাত্মক ঘটনার ভিত্তিতে যে-সব ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে, তার তদন্তের ভার সি বি আইকে দেওয়া হোক। সি বি আই তদন্তে যে-ই দোষী সাব্যস্ত হবে, তাকে দেওয়া হোক কঠোরতম শাস্তি।

৫। গুজরাটে যা হয়ে গেল, যা হচ্ছে, তার পুনরাবৃত্তি ভারতে কোথাও না ঘটে, তা বিনিশ্চিত করতে হবে। সংঘ পরিবার থেকে শুরু করে ধর্মীয়, হিংস্র, মৌলবাদী প্রত্যেকটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হোক।

এই মর্মে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ভারতের মানুষ জানাক, ক্রমাগত জানাতে থাকুক।

বিধ্বস্ত গুজরাটেও এখনও মানবতা জেগে আছে। ব্যথিত গুজরাট খবর পাঠালেই সে খবর নিয়ে আপনাদের পৌঁছে দেব।– সংবেদক।)

কর্ণাবতী শহরে এবং

মহাশ্বেতা দেবী

আমেদাবাদের বিমানবন্দরে নেমেই আমরা একটা অদ্ভুত মানসিক অবস্থা অনুভব করলাম। 'নবজাগরণ'-এর পঞ্চপাণ্ডব এবং নবজাগরণের সদস্য হয়ে যাওয়া আমি, (সদস্য অবশ্যই, তবে আপাতত আমি 'টেম্পিরারি' না 'পার্মানেন্টট' তা জানা হয়নি) এবং ট্রেনে

আগত মনসুর আহমেদ, সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার ও তাঁর ভিডিও টিম– সবাই কয়েকটা দিন একই সূত্রে বাঁধা ছিলাম। যদি ভারতবাসী হই তাহলে গুজরাটও আমার স্বদেশ, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আমরা গেলাম রক্তাক্ত গুজরাটে এই কথা বলতে যে, পশ্চিমবঙ্গ এসেছে। এ রাজ্যের তরফে এইভাবে যাওয়াটা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, গত ১০ দিন ধরে ৪২ ডিগ্রি-৪৪ ডিগ্রি গরমে ও রোদে ঘুরতে ঘুরতে সেটা নিঃশেষে বুঝেছি। শাহ আলম-সহ অনেক রিলিফ সেন্টারে মানুষদের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা এইরকম– ওঁরা প্রাণপণে চান গুজরাটের বাইরের মানুষ আসুন, ওঁদের বেদনা-বঞ্চনা-মূঢ় করে দেওয়া পৈশুন্য, সবই তো বাকি জীবনভর সঙ্গে থাকবে। আমন-এর কথা বলুন সবাই। সেটা একটা শিশুর আনন্দের মত ভরসা। অমুসলিম-মুসলিম, ভিন রাজ্যের অধিবাসীরা এসে 'আমরা আছি সঙ্গে আছি' এটুকু বললেই ওঁদের সব পাওয়া প্রায় হয়ে যাবে।

যা বলার মানুষ এখন খুব কম। এঁদের স্বস্থানে বা অন্যত্র ফিরে যাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা বিশ্বাসের অভাব, ঘাতকদের সমাজ ওঁদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।

'হিন্দু রাষ্ট্র নুঁ কর্ণাবতী শহের

আপনুঁ হার্দিক স্বাগত করেছে (কোরেছে নয়)

VHP_GUJARAT

কর্ণাবতী অর্থাৎ আমেদাবাদ। যদিও আম্‌দাবাদীরা 'কর্ণাবতী' নামটি পছন্দ করছেন না। উদ্ধৃত প্ল্যাকার্ডে এই ঘোষণা বরোদায়, আমেদাবাদের পথে নাদিয়াদ, খেড়া, আনন্দ-এ। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী ত্রাণকর্মী অজমল রাও চৌহান বললেন, 'আনন্দ', বটেই তো। শহরে সরকারি গাড়িতে দিব্যি উড়ছে গৈরিক পতাকা।

আমার বাবা লিখেছিলেন, 'যা ইচ্ছে, তাই করো, স্বাধীন মুলুক। যে-যার নিজের ক্ষেতে পটল তুলুক।'

এ-ও তো হয়েছে। খেড়াতে নিজেদের শস্যক্ষেত্রে ওরা মরেছে। ওদের দেহের ছাই মিশে আছে ক্ষেতের মাটিতে।

'হিন্দু রাষ্ট্র নুঁ' দেখে চমকে উঠি। সঙ্গীরা বললেন, 'এ তো এখন গুজরাটে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে।' অর্থাৎ এ রকমটা যে চলতে পারে না, তা বলারও কোনও জায়গা নেই।

তার কারণও আছে। গুজরাট স্বৈরাচারের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে। যা ইচ্ছা তা-ই করে বেরিয়ে যাচ্ছে, এখন থেকে এ রকমই হবে।

আমি দেখেছি যত, শুনেছি তার চেয়েও বেশি। আর নিজেকে চাবকে চাবকে দৌড় করিয়েছি।

এ পর্যন্ত বেঁচে থেকে অনেক দুঃখ প্রত্যক্ষ করেছি নিশ্চয়, কিন্তু রাজ্য ও রাষ্ট্রের মিলিত সন্ত্রাসের এই চেহারা কখনও দেখিনি। না ঘটলে তো দেখা যায় না।

আজ বলব, ফেরার সময়ে প্লেনে বাংলা কাগজে যে দেখলাম, আসাম সাহিত্যের স্রষ্টারা দল বেঁধে গুজরাটে যাচ্ছেন, দেখে বুক ভরে গেল। যাঁরা গুজরাটের জন্য টাকা তুলে যাচ্ছেন, তুলুন। সে টাকা কোথায় পাঠাবেন, কী জন্য পাঠাবেন, তাও জানাতে চেষ্টা করব। এই মুহূর্তে টাকা অসম্ভব দরকার। একই রকম প্রয়োজন ওখানে যাওয়া।

গোটা গুজরাট যেন একটা বাড়ি। তার প্রতি জানলা-দরজা বন্ধ। ভিতরে চলেছে একতরফা নৃশংস হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি। এটা চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। দোসর কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে নির্লজ্জ মদত। কেন দিচ্ছে, কাদের স্বার্থে, তা আপনারা জানেন। ভাজপা সদস্যরা প্রত্যক্ষ এবং তাঁদের মদতদার সেখোরা পরোক্ষ মদত দিয়ে চলেছেন। যদি ভাবেন প্রধানমন্ত্রী গুজরাট যাওয়ার সময় পেয়েছিলেন এক মাস বাদে, পরে বললেন, বহির্বিশ্বে মুখ দেখাতে তিনি লজ্জা (!) পাচ্ছেন– তারপরই গোয়া গিয়ে যে বিষ ওগরালেন, তাতে গুজরাটে দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আগুন জ্বলল– যদি ভাবেন এই সেদিন ফার্নান্ডেজ গিয়ে বাণী দিলেন, গুজরাটে প্রথম করণীয় হচ্ছে ধর্মীয় সংগঠনগুলির কী যেন একটা হওয়া, এর সঙ্গে যদি জোড়েন এবারকার বাজেট, তাহলেই বুঝবেন, এ সরকারকে সমর্থন করবে যারা, তাদেরও অবিলম্বে বিদায় করা দরকার।

যা বলছিলাম– গুজরাটের মুখোশ খুলে দেওয়ার, গুজরাট সরকারকে ভয় দেখানোর চেষ্টা একটা উপায়েই করা সম্ভব। গুজরাটের বাইরের অন্যান্য রাজ্য থেকে সচেতন মানুষরা ওখানে বার বার যান। গিয়ে সরাসরি দেখুন ত্রাণশিবিরগুলি। ওই নরনারী, শিশু ও বালক-বালিকাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। ওদের জানতে দিন ওরা একলা নয়। অন্যরাও ওদের সঙ্গে আছেন। দেখুন, আর লিখুন। প্রিয়জন-সহ সবাইকে জানিয়ে দিন কী দেখেছেন। পশ্চিমবঙ্গকে, কলকাতাকে এ কথাই জোর দিয়ে বলব। বলতে পারি, লিখতে পারি, এই বয়সে এটুকুই আমার সাধ্যসীমায় আছে। এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশের রাজনৈতিক দলগুলিও আমাদের বড়ই নিরাশ করেছে। শুধু গিয়ে চলে আসা ও প্রেস মিটিং করলে হবে না। যেতে হবে ত্রাণশিবিরে। স্বচক্ষে দেখতে হবে, জানতে হবে। যখন দেখবে এবং জানবে যে তাদের কীর্তি দ্রুত ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, তখনই গুজরাট সরকার ভয় পাবে। শোনা গেল, গোধরার মত ট্রেন জ্বালানো নাকি আরও হতে পারে। যদি হয়, তবে তা জ্বালাবে তারাই, যারা গুজরাটে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত আগুন জ্বালিয়েছে। এখনও জ্বালাচ্ছে। যখন আমি এই লেখা লিখছি, এখন অবধি ইতিবাচক ব্যাপার শুধু একটাই, তা হল, সংঘ পরিবারের আশা পূর্ণ হয়নি। দীর্ঘ দু'মাসের বেশি সময় কাটল। তবু অবশিষ্ট ভারতে রক্তোৎসব হয়নি। কিন্তু কতদিন থাকবে এই স্থিতাবস্থা?

বরোদাতে সক্রিয়, অথচ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ উভয় সম্প্রদায়েই কিছু আছেন। সংখ্যায় একশো জন হবেন বলে জানা গেল। তাঁদের অনুরোধে লেখক শিল্পীদের কিছু বলতে হল। 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে জানিয়ে-শুনিয়ে এই ধরনের মিটিংয়ে আসতে হিম্মত লাগে

ওখানে। পঞ্চাশ জন ছিলেন, সবাই চিহ্নিত। তবে PUCL-এর সক্রিয় কর্মী কিরীট ভাই, যশবন্ত চৌহান বা মনজুর সালেরিকে আক্রমণ করারও ঝক্কি আছে। বেশ কিছু তরুণ-তরুণী ছিলেন, যাঁরা PUCL-এর সঙ্গে যুক্ত। তরুণ প্রজন্মের এটুকু জড়িয়ে পড়া দেখে ভাল লেগেছে।

মনজুর সালেরি, মুঘলওয়াড়া, সালেরি বাজার, বরোদা শহর ও শহরতলির উনিশটি রিলিফ ক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত। নিয়ত চক্রমণ। বরহানপুরার দগ্ধ, পরিত্যক্ত, বিষণ্ন বাড়িগুলি দেখেছিলাম সেদিন, আর ২৭ এপ্রিল ছিল হনুমান জয়ন্তী। সূর্যোদয়ের আগেই বরোদার পুব দিক থেকে দশ হাজার গৈরিক সেনা ঢোকে। আগের দিনই দেখলাম, বরোদায় আঠারোটি উদ্ধত বহুতলের ওপর গৈরিক শামিয়ানা। আর সেদিনই বরহানপুরার পরিত্যক্ত মসজিদে ঢুকল হনুমানের মূর্তি। তারপর, মুঘলওয়াড়ার যে শরণার্থী শিবির 'নবজাগরণ' দেখেছিল, সে পর্যন্ত পৌঁছে গেল হনুমান ভক্তরা।

'তান্‌জাল্‌দা' হর বাসনা সোসাইটির পিছনে এক আদিগন্ত মাঠ। ওটি কুরেশি সোসাইটির। ওখানে যে-সব বাড়ি উঠেছে, সেগুলিই ২০০–৫০০ বিপন্ন মানুষের ভরসা। ওখানে ওঁরা জোগাড়ে বা হেলপার হিসেবে খাটছেন। ওঁদের বসতি মাঠে, মাথার ওপর সামান্য আচ্ছাদন। সবচেয়ে শেষে যে ২৫০-র মত মানুষ এসেছেন, তাঁরা ঠিক সময়ে আসেননি।

'সময়' শব্দটি লক্ষ্য করুন।

বরোদায় ক্যাম্প পরিচালকরা চেষ্টা করছেন, এঁদের ঠেলা-রিকশ ব ওঁদের ভাষায় 'লারি' দিয়ে স্বনির্ভর করতে, মেয়েদের দিচ্ছেন সেলাই কল। মনজুরের এই রকম 'লারি'-দান কর্মসূচিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বরহানপুরা তখন যুদ্ধক্ষেত্র।

এই শরণার্থীরা তান্‌দাল্‌জাতে এলেন ভুল সময়ে। এখন সরকারি কর্মসূচি হল অন্যরকম। সরকারি লোকজন ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরছে। বাড়ি পুড়েছে? তো পনেরো হাজার টাকা। দোকান জ্বলেছে? তো পঞ্চাশ হাজার দেবে। এফ আই আর (যা অধিকাংশই করানো যায়নি পুলিসি নিষ্ক্রিয়তায়) দেখে দেখে এই 'পাকেজ' দেওয়া হচ্ছে। আর আসছে তাড়না, অবিরাম হুমকি– ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাও।

২৭ মে সকালে তান্‌জাল্‌দাতে জানা গেল, এক সপ্তাহে ২২৫ জনকে কোনওরকমে আহার্য জোগাতে পনেরো হাজার টাকা দরকার। আজ লিখতে পারছি, জনৈকা অধ্যাপিকা এই টাকাটা দিয়েছেন। এ টাকায় তেসরা মে অবধি চলবে। এখানেও আছেন ধর্ষিতা রমণী। পিতৃহারা শিশু। শাহ আলম আমেদাবাদেরই অপু অংশ। দুঃখের, যন্ত্রণার দিন-রাত্রি ও মাসের ৩ তারিখের পরেও আসতে থাকবে। অতএব ত্রাণের জন্য টাকা চাই। অবিলম্বে পাঠাতে হবে।

আজকের অনুরোধ। তানূজালদা। উল্লেখ করে PUCL, 'সহজ', 'শিশুমিলাপ', ওলাখ-এর মিলিত সংস্থার পরিচালক–

মনজুর সালেরি, মুঘলওয়াড়া, সালেরি বাজার, বরোদা ৩৯০১৭– এখানে পাঠান। নয়ত চলে যান গুজরাট। আজ এই পর্যন্ত।

লজ্জা ও কলঙ্কের ইস্তাহার

মহাশ্বেতা দেবী

নরেন মোদির সরকার কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রভূত সমর্থন পেয়েই গুজরাটের মুসলিমদের নিঃশেষ করার যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছে, নইলে প্রত্যহ ইস্তাহার বিলি হত না। অতি সম্প্রতি সর্বভারতীয় মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের আহ্বানে মহাজাতি সদন সংলগ্ন ছোট হলে গিয়েছিলাম। দেখে ভাল লাগল, মুসলিম মহিলারাও অনেকে এসেছিলেন। বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ই ছিলেন। এরকমটাই প্রত্যাশিত এ রাজ্যে, যদিও আমাদের রাজ্যের রাজধানী অনেক দিন ধরেই উৎসব-নগরী হয়ে আছে। উৎসব, বিরাম ও ছেদহীন উৎসব এখন এ রাজ্যে, রাজ্যবাসীর কাছে যেন এই সবই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এত উৎসবের খরচের ৯০ ভাগ তো রাজ্য সরকারই দেয়। কেন দেয়? করণীয় কাজ যা-কিছু সব কি করা হয়ে গেছে, তাই আমরা উৎসব করছি?

দাঙ্গা নয়, মানবসৃষ্ট মন্বন্তর হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। সেদিন ভারতের প্রতি প্রদেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, নৃত্যশিল্পী কীভাবে সাড়া দিয়েছিলেন ষাটোর্ধ মানুষদের মনে থাকবে।

গুজরাটে কোনও দাঙ্গা হয়নি। রামমন্দিরকে ইস্যু করে নির্বিচারে মুসলিম-হত্যা হয়েছে। গুজরাট-প্রত্যাগত অথচ মুম্বইয়ে কর্মরতা এক বাঙালি মেয়ের কথা বলছি। সে বলছে, এটা ভূকম্প নয়। সেদিন স্বদেশ ও বিদেশ গুজরাটে দৌড়ে গিয়েছিল, ত্রাণসামগ্রীরও প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। আজ গুজরাটে কোনও ত্রাণশিবিরে সরকারি ত্রাণ পৌঁছয়নি। আর বিদেশের তো এই মৃত্যুকাণ্ডে কোনও মাথাব্যথা নেই। বিশ্ব রেডক্রস এলেই পারে, আসছে না। আমার প্রশ্ন, আরেকটু অন্যরকম। ত্রাণসামগ্রী, অর্থ, বস্ত্র, খাদ্য, ওষুধ জোগাড় করলেই বা দেবে কাকে?

দেশের প্রত্যেকটি রাজনীতিক দল এই সঙ্কট মোকাবিলায় ভয়াবহভাবে ব্যর্থ। তারা কেন যাচ্ছে না, কেন দেশবাসীকে হাত বাড়িয়ে বলতে পারছে না– চলো আমাদের সঙ্গে, বক্তৃতা নয়, চলো, হাতে-কলমে কাজ করবে।

গুজরাটকে বাঁচাতে পারে বাংলা

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন সবার আগে থাকত বাংলা। আজ বাংলা যা ভাবত, কাল সারা ভারতকে ভাবতে হত তা-ই। ভারতের মনীষা বাংলার এই অগ্রণী ভূমিকা মেনে নিতে দ্বিধা করত না। বাংলা ছিল ভারতের অহঙ্কার। মহামতি গোখলে সেই স্বীকৃতিকেই ভাষা দিয়েছিলেন আপন উদারতায়। লিখেছিলেন, 'হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টুডে, ইন্ডিয়া থিংকস টুমরো..'।

আন্দামানের সেলুলার জেল এখন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহান স্মারক। সেখানে যাঁদের নির্বাসিত করেছিল ব্রিটিশরা এবং সেখানেই যাঁরা প্রয়াত হন, তাঁদের তালিকায় একমাত্র একবার চোখ বোলালেই অহঙ্কারের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। তালিকার শতকরা নব্বইজনই বাঙালি।

ক্ষুদিরামের সাহস, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ যা শুরু করেছিল, তাই ছড়িয়ে পড়েছিল দেশের প্রান্তে-প্রান্তে। ভারতের যৌবন জ্বলে উঠেছিল। বাংলার ভাষাতেই গেয়ে উঠেছিল, 'জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য'। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল কে কার আগে প্রাণ দান করবে।

১৯৩৪ সালে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে বিহার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ মারা যান। বিপুল সম্পত্তির ক্ষতি হয়। হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা, অসহায়। মহাত্মা গান্ধী দেশবাসীকে ডাক দেন বিহারের পাশে দাঁড়াতে (দেশের স্বাধীনতা বা বিহারের দুর্গতদের কথা সেদিনকার আর এস এস-কে স্পর্শও করতে পারেনি। সে বছরই তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে বড় মাপের আক্রমণ সংগঠিত করতে, বাবরি মসজিদের ওপর।)। যাঁরা সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বিহারের মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও আপনতার টানে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও অগ্রণী ছিল বাংলার মানুষ। তখনও বাংলা ভারতের অহঙ্কার।

বছর দুয়েক আগে বাংলা ভেসে গেল বন্যায়। গৃহহীন, অসহায় হয়ে পড়ল কয়েক লক্ষ মানুষ। বাংলার মানুষ ছাড়া প্রায় কেউই এসে দাঁড়ায়নি তাঁদের পাশে। বাংলারই সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যে সেদিন তাঁরা প্রাণ রক্ষা করেন।

প্রায় একই সময়ে গুজরাটে ঘটে যায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। বিপুল সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়। বহু মানুষের প্রাণ যায়। ত্রাণশিবির ভরে ওঠে আর্ত মানুষে। বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে, ডুবতে ডুবতেও বাংলা তার চরিত্র হারায়নি। বাংলার সরকার, বহু বেসরকারি সংস্থা, ডাক্তারদের সংগঠন ত্রাণ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল গুজরাটে। গুজরাটের সেই কঠিন দিনে নিজের দুর্দশা সত্ত্বেও বাংলা তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যথাসাধ্য সামর্থ্য নিয়ে। পুরনো সেই অহঙ্কারের কিছু ছায়া যেন দেখা গিয়েছিল ভারতের দর্পণে।

গুজরাট আরও একবার বিপন্ন আজ। প্রকৃতির খেয়ালে নয়, এবার তার বিপন্নতা এসেছে মানুষেরই হাত থেকে। এসেছে ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে। হিন্দু মৌলবাদে উজ্জীবিত লুটেরা, ধর্ষক আর হত্যাকারীর হাতে বিপন্ন গুজরাটের মানুষ, ধর্মে যারা মুসলমান।

গোধরা-কলঙ্কের পরেই গুজরাটে যা ঘটেছে, তা দাঙ্গা নয়। একতরফা আক্রমণ ঘটেছে মুসলামনদের ওপর। প্রতি-আক্রমণ তো দূরের কথা, আত্মরক্ষাও করতে পারেননি তাঁরা। এ দেশের ইতিহাসে এই প্রথম রাজধানীর শুধু গরিব বস্তি নয়, অভিজাত এলাকাও আক্রান্ত হল। লুট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ ও হত্যা ঘটে গেল সেখানেও। প্রাক্তন এক কংগ্রেসি এম পি এবং তাঁর পরিবারের আঠারোজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনা তারই এক দৃষ্টান্ত মাত্র।

গুজরাটেই প্রথম প্রত্যক্ষ সরকারি মদতে ধর্মের নামে এই ধ্বংস ও হত্যালীলা সংঘটিত হল। পুলিস বহু জায়গায় গুলি চালাল আক্রমণকারীর বদলে আক্রান্তদের ওপর। 'ওপরের' সমর্থন না থাকলে এমন কাণ্ড করার সাহস পেতে পারে না কোনও পুলিসই। সমর্থন যে ছিল তার আরও এক প্রমাণ, হাতের কাছে মিলিটারি থাকা সত্ত্বেও তাদের ডাকতে সরকার সময় নিল আটচল্লিশ ঘণ্টা। তবু, আজও থামেনি, লুট, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ বা হত্যা। শুরুর এক মাস পরেও থামেনি।

'রামমন্দির' নিয়ে জঙ্গি আন্দোলন উত্তরপ্রদেশে জেতাতে পারেনি বি জে পি-কে। ক্ষমতার আসন থেকে নামতে নামতে নেমে গেছে তৃতীয় স্থানে, বি এস পি-রও তলায়। গুজরাটের কলঙ্ক দিল্লির মত বি জে পি-প্রভাবিত শহরেও ভরাডুবি ঘটিয়ে দিল পুরসভা নির্বাচনে (কংগ্রেস ১০৮, বি জে পি ১৪)। প্রমাদ গুনেছেন বাজপেয়ী। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ছাড়া ওঁদের এখন হারানোর আর কিছুই নেই। আর ক্ষমতা হারাতে চায় বিশ্বের কোন ক্ষমতাসীন? বাজপয়ী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কুখ্যাত-হয়ে-ওঠা নরেন্দ্র মোদিকে ডেকে হুকুম দিয়েছেন, 'সংখ্যালঘুর শঙ্কা দূর করুন।'

তিনি শঙ্কা দূর করবেন কীভাবে? গুজরাটের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে নরকের জীনব যাপন করছেন হাজার হাজার বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী। ক্ষুধা ও আতঙ্ক তাঁদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। তাঁদের হাল দেখতেও যাননি কোনও রাজপুরুষ। মুখ্যমন্ত্রী দূরস্থান, ত্রাণমন্ত্রীও যাননি। সেখানে কী ত্রাণ যাচ্ছে, কোথা থেকে যাচ্ছে, তা চোখের দেখা দেখতেও যাননি।

ওঁরা তো যাবেনই না। ধ্বংসে, ধর্ষণে হত্যায় অহিন্দুদের আতঙ্কগ্রস্ত করে, ভীত, ত্রস্ত, অসহায় করে তাদের হীনমন করে তোলাই ওঁদের মতাদর্শ, ওঁদের লক্ষ্য। তাতেই অহিন্দুরা আপনিই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাবে। ঠিক তাই ছিল আর এস এস নেতা ও তাত্ত্বিক গোলওয়ালকারের স্বপ্ন। আজও আর এস এস সেই স্বপ্ন রূপায়ণে কাজ করে যাচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে।

দল আকালির এক নেতা কথাটা বুঝেছেন ঠিকই। তাই বলেছেন, 'আজ ওরা মুসলমানদের ধমকাচ্ছে, কাল ওরা তাক করবে শিখদের।'

ফৈয়াজ খাঁর সমাধির পর

পাচুরায়

.... এর পর চলে আসুন ফিরোজ শাহর দুর্গ ফিরোজশাহ কোটলায়। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন। তার পাশেই আছে খুনি দরওয়াজা। যেখানে ইংরেজরা ভারতের শেষ বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরের দুই ছেলের কাটা মুণ্ডু ঝুলিয়ে রেখেছিল। এই খুনি দরওয়জা, আজমেঢ় গেট– সব শেষ করে দিন। এবং অবশেষে ধ্বজাধারীদের আসতে হবে লালকেল্লায়। রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেখানে শাহজাহান, জাহাঙ্গির, নূরজাহান, ঔরঙ্গজবের পদচিহ্ন। ওই সব মুসলমান শাসকের স্মৃতিমেদুর লালকেল্লাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ধ্বজাধারীদের, বলা যেতে পারে, পিতৃপুরুষের দায়। কিন্তু আকবর বাদ যাবেন কেন? এই ভদ্রলোক বালক বয়সে ভারতের সিংহাসনে বসে অতঃপর সেই সময় সেকুলারিজমের মত ন্যক্কারজনক বিষয় নিয়ে চর্চা করেছিলেন– দীন ইলাহিতে তার কিছু স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ওঁর সমাধি সেকেন্দ্রাবাদ। আকবর-নির্মিত দুর্গ ফতেপুর সিক্রি, সেখানে সেলিম চিস্তির দরগা, বুলন্দ দরওয়াজা– সব মুসলমান শাসকের সাম্য বহন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আজও। এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষ গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে ওই পথে যায়। এবং আরও দুর্ভাগ্যের ও লজ্জার হুল, এই দর্শনার্থীদের মধ্যে অন্তত শতকরা নব্বই ভাগ হিন্দু। সেলিম চিস্তির দরগায় যাঁরা বছর বছর ধরে সূতো বেঁধে আসছেন, লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, এখনও ওঁদের সিংহভাগই হিন্দু। কিন্তু সে যা-ই হোক, একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে ফতেপুর সিক্রি। দরকার পড়লে (পড়বেই), ফতেপুর সিক্রিতে একটা হনুমান মন্দির গড়া যেতে পারে। দেশে হনুমানের তো অভাব নেই। ল্যাজ-সহ এবং ল্যাজবিহীন। বজরং দলই তো আছে। ওদের সদর কার্যালয় হোক ফতেপুর সিক্রি। রামচন্দ্রের এই খেতাবহীন সেনাপতিই প্রথম শহরে (থুড়ি, রাজধানীতে) কী করে দ্রুত আগুন লাগাতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। এই 'আগুন-গুরু'র পদ্ধতিই তো উৎসাহ জোগাচ্ছে। উৎসাহে কী না-হয়। অযোধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফতেপুর সিক্রির চূর্ণ প্রাসাদের জায়গাতেই হোক পবিত্র পবননন্দন মন্দির।

কিন্তু শেষ মারটা মারতে হবে আগ্রায়। আগ্রা ফোর্ট মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। কোথায় শাহজাহান আর জাহানারা বন্দি ছিলেন, তা নিয়ে আজ মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। ওটাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে পরমহংস রামদাস বাবাজির আখড়া বানানো যেতে পারে। আর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসটি কোথায় হবে? তার জন্য যথাযথ স্থান একটাই– তাজমহলকে গুঁড়িয়ে দিয়ে, সেই সাদা পাথরের গুঁড়ো দিয়ে শক্ত ভিত তৈরি

করে ওখানেই নির্মিত হবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদর কার্যালয়। এক সাহেব তো সেই কবে লিখে গেছেন তাজমহল ছিল হিন্দু মন্দির, অতএব গুঁড়িয়ে দেওয়া তাজমহলের ওপর পরিষদের ইমারত খুব একটা বেমানান হবে না। সকলে তো সব ইতিহাস (!) জানে না। রামচন্দ্র সুগ্রীবের পবিত্র বালী-বধ পরিকল্পনা তাজমহলের ভূমিখণ্ডের ওপরেই করেছিলেন। দিন চারেক ধরে অবিরাম লাফানোর পরই সুগ্রীব ওখানে পৌঁছেছিলেন। কুমার অঙ্গদের ব্যক্তিগত ডায়েরিতে সবই লেখা আছে। তা হলে বি জে পি-র সদর কার্যালয় কোথায় হবে? এই প্রশ্নটা যেমন সহজ, উত্তরও তেমন জানা। লালকেল্লা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার পর ওই জমির মালিক বি জে পি ছাড়া আর কে হতে পারে!

তবে এত সব কাজ করার আগে দুটি কাজ সহজেই আপনারা করে ফেলতে পারেন এক লহমায়। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের কাছে এ কাজ নস্যের চেয়েও হালকা। প্রথমটি মহীশূরে। সেখানে রাস্তার ধারে একটা মাইল-ফলকের মত পাথরের গায়ে লেখা আছে : এখানে টিপু সুলতানের মরদেহ পাওয়া গিয়েছিল। ইংরেজরা মেরে টিপুকে রাস্তার ধারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওই পাথরটা নিয়ে গিয়ে আর-একটা রামশিলা আরামেই বানাতে পারেন ধ্বজাধারীরা। একটি অক্ষয় কীর্তি হবে তা হলে।

আর দ্বিতীয় কাজটি মুর্শিদাবাদে। সিরাজের কবর এবং হাজারদুয়ারি। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। রায়দুর্লভ, উর্মিচাঁদ, জগৎ শেঠরা খুশি হবেন, মিরজাফররা হাততালি দেবেন। আর ওঁদের প্রেতাত্মা, বিশেষ করে মিরজাফরের প্রেতাত্মা খুশিতে ডগমগ হয়ে বলবেন, হিন্দুদের মধ্যে এখনও আমার এত বন্ধু আছে, বুঝতে তো পারিনি! মিরজাফর যুগ যুগ জিও! আসল কথা হল, যুগে যুগে নতুন ইতিহাস তৈরি করার বীরপুরুষরা যথাসময়ে আবির্ভূত হন। পামর দেশবাসী মূর্খ বলে এঁদের যথাসময়ে যথাযোগ্য সমাদরে ব্যর্থ হয়। গুজরাটের নাম বদলে অবিলম্বে 'মোদিয় প্রদেশ' রাখা হোক, যাতে ভবিষ্যতের ইতিহাস রচয়িতাদের কিছুটা সুবিধা হয়।

শিল্পপতিরা দাঙ্গাপীড়িতদের...

নাফিসা আলি

আমি চোখের সামনে রাখতে চাই না এই ত্রাসের ছবি।

সেদিন, ১৬ এপ্রিল, দিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় মহিলা বক্তারা একে একে তুলে ধরছিলেন গুজরাটের ছবি, গণহত্যার দৃশ্যপটে মুসলিম মহিলাদের ছবি। সাক্ষ্য, প্রমাণসহ তাঁরা বিবৃত করছিলেন এক নিদারুণ বিকারগ্রস্ত হিংসার কথা। সে সব কথা আবার সবিস্তারে নতুন করে আমি শোনাব না। কারণ তা প্ররোচনার মত শোনাতে পারে। তা ছাড়া, এটা তো আজ প্রমানিত, গুজরাটে যা হয়েছে, তা সুপরিকল্পিত এবং নিখুঁতভাবে রূপায়িত গণহত্যা। সত্যি বলতে কী, আমি বড় দিশেহারাই বোধ করছি। আমি জানি না, কোথায় যাব, কার কাছে যাব। শুধু জানি, ওই বিধ্বস্ত মানুষদের কাছে পৌছতে হবে। যে

করেই হোক, পৌঁছনো দরকার। সেখানে ৯০ শতাশ মুসলিমের ঘরদোর আজ ভষ্মীভূত, বিনষ্ট। দেড় লাখ মানুষের ঠিকানা হল ত্রাণ শিবির। ঘরই নেই, ফিরবে কোথায় ওরা? গুজরাট সরকার বলছে, মৃত ৮০০ মানুষ। আদতে ২০০০ মানুষের খোঁজই নেই। খোঁজ মিলবে কদাপি? কাকে দায়ী করব? আর, দায়ী করার খেলাতেই কি ব্যস্ত থাকব? অথবা কিছুতেই কিছু নয় যে বিপুল জনতার, তারই অংশ হয়ে বসে থাকব? বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে, তবু বলছি, শিল্পপতিরা আজ গুজরাটের দাঙ্গাপীড়িতদের জন্য হাতের মুঠো আলগা করতে প্রস্তুত নন। তাঁদের আশঙ্কা, সরকার বিরক্ত হবে।

তের-চৌদ্দ মাস আগে ভূমিকম্পবিধ্বস্ত কচ্ছ অঞ্চলে গিয়েছিলাম একদল স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে। কেউ আমার কাছে জানতে চায়নি, আমার ধর্ম কী। আজ আমি যদি একই ভাবে ছুটে যাই, আমি খুন হয়ে যাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন– এভাবে আমি নিজের সম্পর্কে ভাবি না। আমার প্রথম পরিচয় আমি ভারতীয়, এই পরিচয়েই আমার গৌরব। আমার এই দেশকে আপনি কেন খাটো করছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী? কেন হিন্দুত্বকে কলঙ্কিত করছে আপনার বি জে পি? কেন দুই ধারায় মুসলমানের পুরনো কচকচি নতুন করে ঘাঁটাঘাঁটি করে উত্তেজনা তৈরি করেন? আমরা সবাই জানি, ধর্মান্ধ মুসলিমরা আছে, অছে জেহাদে বিশ্বাসী সন্ত্রাসবাদীও। কিন্তু, অন্য যে ধর্মপ্রাণ নিরীহ মুসলিমদের অস্তিত্ব আপনি স্বীকার করেন গুজরাটে তো মরছে তারাই। কী করছে সেখানে আপনাদের সরকার? জিগ্যেস করুন, এরই নাম সুশাসন? আর সত্যিই যদি অপনার 'রাজধর্ম' নিয়ে মাথাব্যথা থাকে, তবে গুজরাটের মানুষকে বলুন, ভারতে আজ হিন্দুদেরও দুটি ভাগ আছে। গরিষ্ঠ হিন্দুই সৎ, ধর্মপ্রাণ। দেশের মুখে চুনকালি মাখছে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। চুনকালি মাখাচ্ছে তারা আপনার মুখেও। আমাদের সামনে রয়েছে আজ রাম এবং রাবণ। ভাল হিন্দু এবং মৌলবাদী হিন্দুত্বশক্তি। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয়রা আজ আমাদের পুরাণ, মহাকাব্য থেকে মানবতার শত্রুদের নির্মূল করার পথ খুঁজব, নাকি গান্ধীর রাজ্যে গডসের শাসনই মেনে নেব?

এর উত্তর আমদের হৃদয়েই আছে।

আমরা জানি, জীবন বড় ছোট। নানান ভুলে ভরা। তবু নিজের মুখ দেখার মত একটি আয়না তো সবারই আছে। চাই একটু নিজের আত্মার দিকে তাকানো। দরকার বিভেদের ক্ষত সারিয়ে তোলা, ক্ষমা করা, ভুলতে জানা। তারও আগে দরকার সঠিক দিশায় একটি পথ দেখা। প্রধানমন্ত্রী, গরিষ্ঠ, সৎ ভারতবাসীর কথা শুনুন। এই ত্রাসের শাসন থেকে অব্যাহতি দিন নরেন্দ্র মোদিকে।

বিষণ্ন সময়?

মৃণালিনী দাশগুপ্ত

সময় কখনও বিষণ্ন হয় না। 'সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়'– এ তো সেই শৈশবের কবিতা– তা হলে? বিষণ্ন সময় বলতে কী বোঝা যায়? সে কথাটাই আজ নতুন

বছরের শুরুতে বারবার মনে হচ্ছে। কেন? মনে হয় চারদিকের ঘটনাবলি এত করুণ, এত অবাঞ্ছিত এবং এতই কল্পনাতীত যে, চিন্তাশীল যুক্তিবাদী মানুষদের মনকে বিষাদগ্রস্ত করে ফেলছে। সারা ভারতে বিচ্ছিন্নভাবেই যে-সব ঘটনা ঘটে চলেছে তা মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করায় বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। যেমন গুজরাটের গোধরা এলাকার ঘটনা, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙা, আফগানিস্তানের ঘটে-যাওয়া ঘটনাবলি, আসামের বড়োদের আক্রমণ, বিহারে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা নতুন রাজ্য– সব মিলিয়ে সময়টাই বিষাদগ্রস্ত মনে হয়। মনে হয় বিচ্ছিন্নতাবাদের অদৃশ্য, অশুভ ছায়া সারা দেশকে বুঝি আগ্রাসনের খেলায় নামিয়ে দিচ্ছে। এই তাণ্ডবলীলার মাঝে পশ্চিমবঙ্গ একটি রাজ্য সেখানে এখনও নববর্ষকে বরণ করা হচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নতুন জামাকাপড় পরা চঞ্চল ছোটরা, বাড়িতে বাড়িতে নীলের পুজো এবং সবাই পূজোর প্রসাদ পাচ্ছে, গৃহবধূরা সারিবদ্ধভাবে শিবালয়ে শিবঠকুরের মাথায় জল ঢালছেন– সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ শান্তির পরিবেশ।

তবুও মন কেন ভারাক্রান্ত? মনের মাঝে উঁকি মারে গুজরাটের মায়েদের সন্তানহারা, স্বামীহারা ব্যথায় ভেঙে পড়া হৃদয়ের করুণ আবেগময় কথাগুলি। নববর্ষের সকল আনন্দকে করে তোলে বিষাদময়। সব চেয়ে দুঃখের কথা, এখন আর মানুষ মানুষের বেদনা বোঝে না। একদল মানুষ আর একদলের ওপর বৃথা আক্রোশে ফেটে পড়ে, অপরের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে। প্ররোচনার জোগান আসে কিন্তু অপর শ্রেণী থেকে অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণীর ওপরই অত্যাচার চলে নানা ছুতোয়। দেখা যায়, দুই ধর্মেরই উচ্চশ্রেণীর মানুষরা নির্দ্বিধায় ও নির্বিবাদে খানাপিনা করছেন এবং সেই বিলাসের মধ্যেই মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি দিচ্ছেন আর কৌশলে অত্যাচারও চালিয়ে যাচ্ছেন।

একটু গভীরভাবে ভাবনাচিন্তা করলে দেখা যাবে, এই অত্যাচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনীর কেশাগ্র স্পর্শ করছে না। এই ভাবনাচিন্তাই বুঝিয়ে দেবে গুজরাটে যা ঘটে চলেছে সেটি সেখানকার ধনী গোষ্ঠীর দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে। পৃথিবীর বুকে দুটিই জাতি বিদ্যমান, এক দল লোভী এবং অপর দল সম্বলহীন অভাবী। ইংরেজি ভাষাতে নোয়াম চমস্কি, আমেরিকার এক বামপন্থী প্রৌঢ় দার্শনিক, Greedy ও needy– এই দুই নামেই অভিহিত করেছেন পৃথিবীর সমাজকে। এটিই যথার্থ বলে মনে হয়। প্রথম যুগের মানুষেরা, যারা পরস্পরের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাটি কেটেছে, শস্য ফলিয়েছে, মাটি খুঁড়ে জল পেয়েছে বা বনেজঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে স্রোতস্বিনীর সন্ধান পেয়েছে– সবাই সেদিন দল বেঁধে বাস করেছে। ধীরে ধীরে কিছু চালাক লোভী গোষ্ঠী দেখল এবং বুঝল যে, জমিই হল আসল জায়গা, জমিতে ফসল ফলালে অতিরিক্ত ফসল (Surplus) রেখে দেওয়া যাবে সঞ্চয় করে। তখন ফসলই তাদের নিকট স্বর্ণ, ফসলই অর্থ– সেই ফসল জমানো যাবে, প্রয়োজনে কম বুদ্ধির মানুষদের ধার দেওয়া যাবে। ফলে সৃষ্টি হল শ্রেণী। এক দলের স্বার্থবিচার তাদের লোভী করে তুলল, অপর দল হল কম বুদ্ধির, অভাবী দল। এভাবেই শ্রেণী, শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি।

চারিদিক থেকে অক্রমণ চলেছে মনুষ্যত্বের ওপর। সময় তাই দীর্ঘশ্বাসে ভারি। তবে ঠিক এই বিপন্ন সময় শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের বিষণ্ন করে ফেলতে পারবে না। শুভ নববর্ষ সবার জন্য শুভ হোক। রাম, রহিম, সীতা, রোকেয়া কেউই যেন বঞ্চিত না হয়। যে-কোনও অবস্থার সঙ্গেই আমরা লড়াই করেছি– পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে কীভাবে দুর্জয় ঘাঁটি গড়তে হয়। এ দেশ রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, হালিমের দেশ– সবার সকল চেষ্টায় বাঙালি এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে যাবেও। পশ্চিমবঙ্গ অন্য চরিত্রের মানুষদের বাসভূমি, অন্য জাতের মানুষ এখানের বাসিন্দা। নতুন বছরকে আমরা বরণ করে নেব। বিপদ আসুক, ঝঞ্ঝা আসুক, আমরা বলব 'আমরা ভয় পাইনি। আমাদের কাজেই সময়কে জানিয়ে দেব আমরা বিপন্নও নই, বিষণ্নও নই।'

শস্তি চাই? তা হলে বলুন : শাস্তি চাই

রাজদীপ সারদেশাই

এই মৃত্যু-মিছিলের শেষ কোথায়? কবে? হত্যা যেখানে দৈনন্দিনের খতিয়ান, সেখানে এ প্রশ্নের উত্তর, সত্যি বলতে কি, বড়ই কঠিন হয়ে উঠেছে আজ। কেউ নিশ্চিত নন, ঠিক কবে থেকে আমেদাবাদ বা ভাদোদরার রাস্তায় আর রক্ত ঝরবে না। ইতিহাসের ছুতো খুঁজছে গুজরাট সরকার। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে ওরা বলেছে, ১৯৬৯ সালে দাঙ্গা চলেছিল ৪৫ দিন। ১৯৮৫ সালে সেনা তুলে নিতে সময় লেগেছিল ৬০ দিন। কেউ এখন বলতেই পারেন, এবার দেখছি ৬০ দিনের রেকর্ডও ভেঙে দিলেন। অবশ্য নরেন্দ্র মোদির সরকারের দাবি ছিল, তিন দিনেই আমরা দাঙ্গা সামলে নিয়েছি। কী নিষ্ঠুর রসিকতা!

তবে হ্যাঁ, গোধরা-পরবর্তী প্রথম পর্যায়ের হিংস্রতার সঙ্গে গত পক্ষকালের দাঙ্গার একটা ফারাক রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে যা ঘটেছে, তা হল সগঠিত গণহত্যা। আক্রমণের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সংখ্যালঘুদের জীবন ও জীবিকা। এবং আক্রমণের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সুব্যবস্থিত। রাষ্ট্রযন্ত্র সেখানে হয় সহযোগিতা করেছে, নয়ত চোখ বুঝে থেকেছে। গত দু-আড়াই সপ্তাহ ধরে বরং দেখা যাচ্ছে প্রথাগত দাঙ্গার ছবি। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই এবার রাস্তায় নামছে। আমেদাবাদের মুসলিম-প্রধান এলাকায় আক্রান্ত হচ্ছে হিন্দুরাও, হামলা হচ্ছে তাদের দোকানপাটের ওপরও। সন্দেহ নেই, এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির সিংহভাগটাই সংখ্যালঘুদের ওপর দিয়ে গেছে। কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে হলেও পাল্লা দেওয়ার এমন একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতের পক্ষে যা অশনি-সঙ্কেত।

যত দিন যাচ্ছে, গভীর হচ্ছে বিভেদরেখা। গোড়ায় হয়ত আক্রমণটা সংগঠিত করার জন্য দরকার ছিল নির্মম গোধরা-কাণ্ডের। এখন সামান্য গুজব বা অজুহাতই যথেষ্ট।

ধরুন, অটোরিকশর সঙ্গে ধাক্কা লাগল সাইকেলের। জানা গেল, যান দুটির চালক ভিন্ন সম্প্রদায়ের। ব্যস্, শুরু হয়ে গেল হাঙ্গামা।

মনস্তাত্ত্বিক বিভাজন আজ আক্ষরিক অর্থেই ভাগ করে দিয়েছে আমেদাবাদ শহরটাকে। এই অঞ্চলটা এই সম্প্রদায়ের, ওটা অন্য সম্প্রদায়ের, এই রাস্তাটা এদের, ওটা ওদের, ওই জায়গাটা 'সীমান্ত এলাকা'– এই সব ভাগাভাগি এখন স্পষ্ট। মিশ্র বসত এলাকা থেকে লোক সরে যাচ্ছে নিজ সম্প্রদায়ের এলাকায়। অন্তরে-বাহিরে এই যে মেরুকরণ, তা টলিয়ে দিয়েছে আমেদাবাদের নাগরিক সামজের ভিত। ব্যক্তির স্বাধীন চলাচল যে-শহরে রুদ্ধ, নেই আন্তঃসম্প্রদায় সংযোগ, সে-শহরের ভবিষ্যৎ কী?

দুঃখের কথা, দুই সম্প্রদায়ের নেতাদেরও আজ সেতুবন্ধনের ক্ষমতা নেই, কিংবা আগ্রহই নেই। শাসক দল এই বিভাজনকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবেই দেখছে। তাই ত্রাণশিবির পরিদর্শনে আসার দায়টুকুও অনুভব করেন না মোদি সরকারের মন্ত্রীরা। বরং ত্রাণশিবির তুলে দেওয়ার দাবি তোলেন বড় মাপের কোনও মন্ত্রী। অর্থনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুদের বয়কট করার ডাক দেওয়া হচ্ছে, ছড়ানো হচ্ছে প্রচারপত্র। কোনও চেষ্টাই নেই এ-সব ঠেকানোর। বরং নির্বিকার চিত্তে এখনও বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতারা। এর উল্টো দিকে স্থানীয় কিছু মুসলিম নেতাও যেন আজ সংঘাতের পথটাই বেছে নিচ্ছেন। তাঁরা জেদ করে রইলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাবে না মুসলিম ছেলেমেয়েরা। হ্যাঁ নিরাপত্তার প্রশ্নটা সঙ্গত। তবু এ সমস্যা কি আলোচনার মাধ্যমে মেটানো অসম্ভব ছিল? এটা ঘটনা, মুসলিম নেতাদের অনেকেই এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত। এক দিকে পরীক্ষায় হাজিরার ব্যাপারটাকে সরকার যখন মর্যাদার ইস্যু করে তুলছে, প্রচারের বিষয় করে তুলছে, তখন অন্য দিকে এই নেতাদের ভূমিকাতেও কেউ রাজনৈতিক অভিসন্ধি খুঁজতেই পারেন।

রাজনীতির কাজিয়ায় আর কাজ হবে না। নাগরিকদের রক্ষা করার ন্যূণতম দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করেনি বলে বহু মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে গুজরাটে। এটা মনে রেখেই আজ আমেদাবাদ এবং গোটা রাজ্যের ব্যক্তি ও নাগরিক গোষ্ঠীগুলির উচিত নিজেদের রাজনৈতিক মতপার্থক্যকে সরিয়ে রাখা। এক সঙ্গে কাজে নামা। সত্যি বলতে কি, এই হিংসার বিরুদ্ধে গুজরাটের নাগরিক সমাজ কতটুকুই-বা আওয়াজ তুলেছে! কেন এই নীরবতা? ভয়? অসহায়তার বোধ? উদাসীনতা? কারণ যা-ই হোক না কেন, রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে এই নীরবতার একটিই মানে– সমর্থন। যাঁরা কথা বলতে প্রস্তুত, তাঁদের প্রথম দাবি হওয়া উচিত : বিচার চাই। (মোদির ইস্তফার দাবি? এখন এটা রাজনীতির বিষয় হয়ে গেছে। ভোটদাতারাই হয়ত শেষকথা বলবেন।) ন্যায়বিচাররই এ মুহূর্তের দাবি! শান্তি ফেরাতে হলে আক্রান্ত মানুষের মনে আজ এই ভরসাটুকু অন্তত জাগানো দরকার, যারা তাঁদের ঘরের লোকেদের খুন করেছে, ঘর পুড়িয়েছে, জীবিকার উপায় ধ্বংস করেছে, তাদের শাস্তি

হবে। ভাবুন তো দেখি, আমেদাবাদের নারোদা-পটিয়া শহরতলি এলাকায় ৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিকেশ হয়ে গেল ৬০ দিনেরও বেশি সময় চলে গেল, একজনও গ্রেপ্তার হল না। এই যদি হাল হয়, ন্যায়বিচারের আশা কেউ করবে কী করে! দোষীদের শাস্তি হবে, এই ন্যূনতম ভরসা না জাগলে গুজরাটে শান্তি দূর অস্ত্।

ভিন্ন প্রেক্ষিত– অভিন্ন লক্ষ্য

জয়ন্ত বিশ্বাস

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণহত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, বর্বরতার ঘটনা সভ্য সমাজের লজ্জা। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পুড়ছে মানুষ, পুড়ছে মনুষ্যত্ব। সরকারি মদতপুষ্ট দাঙ্গা দীর্ঘায়িত হচ্ছে। এই দাঙ্গা পরিকল্পিত, সংগঠিত। রাজ্য সরকারের কার্যকলাপে ওই অভিযোগ সুস্পষ্ট। হাজার হাজার ঘরবাড়ি সম্পত্তি লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত। রাজ্যের মানুষ স্বভূমে শরণার্থী। সংখ্যালঘু জনগণের বাঁচার অধিকার, নিরাপত্তা বিপন্ন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মুখ্য দল এবং তার দোসরদের মুখোশ খুলে পড়ছে। অন্ধ্রের হাইটেক মুখ্যমন্ত্রীর দোলাচলচিত্ততা কার্যত সুবিধাবাদ। মমতার দ্বিচারিতা সর্বজনবিদিত। এবং তাঁর রাজনীতির খেলোয়াড়রা এই মুহূর্তে নির্বাক। বিপন্ন মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। ক্ষমতার রুটির বখরা পেতে ব্যস্ত। সুলতান মামুদ থেকে বাহাদুর শা এবং দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এর থেকে ঘৃণ্য নারকীয় অধ্যায় আছে কি না তার অনুসন্ধান ইতিহাসবেত্তাদের কাজ। চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শা-র হত্যা, লুণ্ঠন, নির্মমতা বা জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখনও আমরা ক্ষুব্ধ। ব্রিটিশ বর্বরতাকে আজও ভারতবর্ষের মানুষ ক্ষমা করতে পারে না।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা, মহান হিন্দু সভ্যতার (!) ধ্বজাধারীদের ঘাতক বাহিনীর হাতে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই আক্রান্ত। মহামান্য প্রধানমন্ত্রী বলছেন, ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ট্রেনের ভিতরে গণহত্যাকে আমরা লঘু করে দেখছি না। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ আমাদের অজানা নয়। স্মর্তব্য, কাশ্মীরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান জনগণও সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার, জুলুমে ত্রস্ত। কিন্তু গুজরাটে চলছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, সংগঠিত ষড়যন্ত্র। আমাদের দেশের সমস্ত বড় দাঙ্গায় শাসকশ্রেণী অথবা মৌলবাদী সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। মুসলমান-শাসন, ব্রিটিশ যুগেরও দাঙ্গা ঘটেছে শাসক-গোষ্ঠীর (শ্রেণী) প্রয়োজনে। সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ স্থানীয়ভাবে এবং পাড়া মহল্লার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। রাজনৈতিক প্রয়োজনে সংগঠিত দাঙ্গার ব্যাপকতা, হিংস্রতা অনেক বেশি।

তবুও পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্র ছিল ভিন্নতর।

বৈদেশিক আক্রমণে আক্রান্ত রাজারাজড়া। অত্যাচার, লুণ্ঠন ইত্যাদির লক্ষ্য ছিল অভিজাত শ্রেণী। বৃহত্তর হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ ছিল অর্থনৈতিক। সাধারণ

মানুষের ওপর ছির দুর্বহ করভার। কিন্তু ধর্মীয় নিপীড়ন ছিল না। নিপীড়ন ছিল অন্যত্র। মর্যাদাহীন, অপমানিত শূদ্র জনগণ ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত হয়েছে বাঁচার তগিদে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রান্ত। দেশজুড়ে জাতপাতের সংঘর্ষ, বিদ্বেষ, ঘৃণা তারই ভগ্নাবশেষ। তথাপি ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মূলত ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ় করার প্রয়োজনেই সংঘটিত হয়েছে।

স্বাধীন ভারতবর্ষে ধনিক শ্রেণী কায়েমি স্বার্থরক্ষায় ধর্মকে ব্যবহার করছে। ধর্ম, মন্দির, মসজিদ রাজনীতির রাস্তা ধরেই ভাজপা সিংহাসনে। শ্রেণীভিত্তিক দাবির পরিবর্তে ধর্মভিত্তিক দাবি উচ্চারিত হচ্ছে। অথচ হিন্দুস্বার্থ, মুসলমানস্বার্থ, শিখস্বার্থ প্রভৃতি শ্লোগান অর্থহীন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থরক্ষাই আসল কথা। ধর্মনিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িকতা এক বস্তু নয়।

হিন্দু, হিন্দি, হিন্দুস্থানের তত্ত্বও অর্বাচীন, অবৈজ্ঞানিক, দিবাস্বপ্ন। ধর্মের ভিত্তিতে পৃথিবীর কোনও দেশের রাষ্ট্র গড়ে উঠেনি। ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি রাষ্ট্র গঠনের উপাদান। নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার বাধ্যবাধকতায় ইরান, ইরাক, কুয়েতের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে। মোগল আমলে বড় বড় যুদ্ধই মুসলমান সম্রাট-বাদশাদের ক্ষমতা দখলের লড়াই। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তদনীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর আক্রমণ, জুলুম চালাতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলনা।

অন্যপক্ষে আসামের 'বাঙাল-খেদা' আন্দোলন। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত উভয়পক্ষই হিন্দু। আর এস এস, বি জে পি, শিবসেনার নেতত্বে দিল্লি, মুম্বই থেকে বাঙালি বিতাড়ন সাম্প্রতিক ঘটনা। বিতাড়িত অধিকাংশই হিন্দু।

শোষণভিত্তিক সমাজের শোষণপ্রক্রিয়া শ্রেণীভিত্তিক। ধর্ম কোনও দিন শ্রেণীভিত্তিক সমাজ ভাঙার চেষ্টা করেনি।

গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধনিক-বণিক শ্রেণী, হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষমতা দখল এবং রক্ষার রাজনীতি, ষড়যন্ত্র। রাজ্যে রাজ্যে এই ষড়যন্ত্র ছড়িয়ে দেওয়ার আস্ফালন চলছে প্রকাশ্যেই। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস রচনা এবং নান্দনিক ক্ষেত্রে আমরা স্বনির্ভর নই। শিক্ষা, সংস্কৃতিতে অগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিচরণভূমি সাম্রাজ্যিক শিক্ষা সংস্কৃতির বৃত্তের ভেতরেই। গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমরা দিস্তা দিস্তা লিখছি, বিবৃতি দিচ্ছি। ত্রাণ-সাহায্যের ডাক দিচ্ছি। কিন্তু সক্রিয় প্রতিবাদ আন্দোলন কোথায়? বি জে পি, আর এস এস-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ঘেরাও, ধিক্কার কোথায়? 'দাঙ্গার বিরুদ্ধে বলব কিন্তু বি জে পি জোট ছাড়ব না'– তৃণমূলি টগর-বোষ্টমীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ক্রোধ সংগঠিত করতে বাধা কোথায়? মহাশ্বেতাদিরা ব্যতিক্রম। সক্রিয়ভাবে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। ওই রাস্তাই জনগণের রাস্তা।

গণআদালতে বিচার চাই ঠাক্‌রের

গৌতমরায়

জাতিসঙ্ঘ দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন কনভেনশনে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার নিশ্চিত করার ওপরে জোর দিয়ে আসছে। ঐতিহাসিক নুরেনবার্গ ও টোকিও ট্রায়ালের ভিত্তিও হল মানবতাবিরোধী অপরাধ। মুম্বইতে ৯২-৯৩-এর দাঙ্গা-বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরেকে আজ মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত করা যায়। কমিশন এই দাঙ্গায় নেতৃত্বদানের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে ঠাকরেকে। এই পরিস্থিতিতে জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবতাবিরোধীদল বাল ঠাক্‌রের বিচার চাই।

প্রাদেশিকতার জিগির মহারাষ্ট্রে হারাতে বসার আশঙ্কা শিবসেনার মনে জাগতে শুরু করে আশির দশকের সূচনাপর্ব থেকেই। ৮৪ সালে মুম্বইয়ের ভিওয়ান্দেতে যে দাঙ্গা হয়, তার থেকেই প্রাদেশিকতার মুখোশটাকে উহ্য রেখে হিন্দুত্বের মঞ্চে শিবসেনা প্রবলভাব অবতীর্ণ হতে শুরু করে। এই সময় থেকেই মহারাষ্ট্রে নিজেদের ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যে বি জে পি-কে ছাপিয়ে সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করে শিবসেনা। কংগ্রেসি মুখ্যমনত্রীরা এই সময় থেকেই বাল ঠাকরেকে স্পর্শ করা তো দূরের কথা কার্যত তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন। ৯২-এর ৭ ডিসেম্বর বি বি সি-র সংবাদ সম্প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নুলবাজার ভিন্তিবাজারে দাঙ্গা শুরু হয়। সকাল থেকে দাঙ্গা শুরু হলেও এই এলাকায় পুলিশ রাস্তায় নামে প্রায় বেলা ১২টার পর। এরপর দাঙ্গা থামানোর পরিবর্তে মূলত হত্যার উদ্দেশ্য নিয়েই পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল বাইশ বছরের নাসিম বানু, তার হৃদপিণ্ড ফুঁড়ে চলে যায় বন্দুকের গরম সীসে। মায়ের কোলেমারা যায় মুতাতার আহমদ। ১৭ বছরের জাহিদ হুসেন খাঁ খানদিয়া স্ট্রিটে প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। কামাতিপুরার দিক থেকে হিন্দুরা ছুঁড়তে থাকে পাথর, বোতল, পাল্টা দেয় মুসলমানেরা। অথচ পুলিশ গুলি চালায় কেবল মুসলমানদের ওপর। এই এলাকায় পুলিশের গুলিতে সাতজনের মৃত্যু হয়। পুলিশের এই পক্ষপাতিত্বের মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার জেন্দে, মুম্বইয়ের ডোংরি এলাকার মানুষদের কাছে তাঁর নিরপেক্ষ সাহসী ভূমিকার কথা অনেক শুনেছি।

মুম্বইয়ের পুরনো হিন্দু মন্দির গোলদেওলের কাছে নুলবাজারে ৫১২টি দোকানের মধ্যে মাত্র ১০টি ছিল হিন্দুদের। ফলে হিন্দু দুর্বৃত্তরা এই বাজারটিকে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে দেয়। গোলদেওলের পেছনের অধিকাশ বাসিন্দাই হিন্দু। নুলবাজার যখন পুড়ছে, সেই সময় এই এলাকার শিবসৈনিকরা উত্তেজিতভাবে ছোটাছুটি করছিল— এই ঘটনার বহু সাক্ষ্য রয়েছে। গোলদেওলের পেছনে মুসলমান দোকানিদের মালপত্র এইসব

শিবসৈনিকরা লুঠ করে। ১১টি মুসলমানের দোকান লুঠ হয়।. পুলিশের গুলিতে ১০ জন প্রাণ হারায়।

মুম্বাইয়ের সব থেকে বড় অঞ্চল হল গোওয়ান্দি। এটি চেম্বুরের কাছাকাছি। এই অঞ্চলে বহু মুসলমান বাস করেন বস্তির। অধিবাসীরা খুবই গরিব। এখানেও পুলিশি শিকার মূলত মুসলমানেরাই। গোওয়ান্দির বায়নগানওয়াড়ির সঞ্চয়নগরের নুর-ই-ইলাহি মসজিদে শিবসৈনিকরা পুলিশ নিয়ে ঢুকে পড়ে, ৮ ডিসেম্বর সকাল ৭টা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। পুলিশ মুসলমানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়– নবি নামক এক কিশোর এই গুলিতে আহত হয়। সঞ্জয়নগরে ২৫ বছর বয়সী রহিমুল্লাহ প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। রণোন্মত্ত পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় সৈয়দ কাজিম আলি, শামিম এবং ১৮ বছরের কিশোর নাসিম। নুর-ই-ইলাহি মসজিদের ভেতরে পুলিস এলোপাতাড়িভাবে গুলি চালায়। ৬ জন পুলিশ যখন মসজিদে ঢোকে, তখন সেখনে ইমাম মওলানা হান্নান আসরফি ছাড়া আরও তিনজন ছিলেন। মসজিদের বাসিন্দাদের রাইফেলের কুঁদো দিয়ে মেরে এক লাইনে দাঁড়াতে পুলিশ বাধ্য করে। মসজিদের বাসিন্দারা পুড়তে থাকা মসজিদের আগুন নেভাতে চাইলে শুনতে পায় পুলিশের সদম্ভ উক্তি– মসজিদ জ্বলছে। জ্বলুক। এরপরও আগুন নেভানোর কাতর আহ্বান মসজিদের বাসিন্দারা পুলিশকে জানালে, বিনিময়ে তাদের জোটে গুলি। তাতে মসজিদের ট্রাস্টি আবদুল গফফুর নিহত হয়, আহত হয় মোহাম্মদ ইয়াকুব। হাফিজ কাফিকে মারতে মারতে পুলিশ নিয়ে যায়, পরে জানা যায়, সে মৃত। মসজিদের ইমামও পুলিশের রাইফেলের কুঁদোর আঘাত থেকে নিস্তার পাননি। হাজি বায়তুল্লাহের কাঠের দোকানে পুলিশই আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশের নৃশংসতা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছি, গুলি চালানোর সময়ে মাঝে মাঝেই তাদের মধ্যে থেকে 'জয় শ্রীরাম' আওয়াজ দেওয়া হচ্ছিল। গোওয়ান্দির কমলারমন নগরের আবর্জনা ফেলার মাঠের কাছে ৪৪ ঘর মুসলমন ও ২ ঘর হিন্দু থাকে। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে, ৮ ডিসেম্বর দুপুরে পুলিশ ও শিবসৈনিকরা যুগ্মভাবে হামলা চালায়। এই অঞ্চলের লাগোয়া মহারাষ্ট্রীয়দের যেখানে বাস অশ্চর্যজনক ঘটনা হল, সেখানে একজনের ওপরেও হামলা হয়নি। শিবাজিনগরের আমির বানুর কাছে জেনেছি (প্লট নং ৬, ফ্ল্যাট এক ৬) ২-৩০ নাগাদ পলিশ ও উন্মত্ত জনতা তরোয়াল, গুপ্তি, লোহার রড নিয়ে এই এলাকায় হামলা চালায়।

বেহরাম বাগ যোগেশ্বরী পশ্চিম এলাকায় দাঙ্গার জেরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায় মোহাম্মাদ মকসুদ (২৬), মোহাম্মাদ আসলাম (২৫), মোহাম্মাদ আনিস (২১),মোহাম্মাদ নাফিস (১৯)। আহত হয় মোহাম্মাদ কামিল (২৪), মোহাম্মাদ ইশরত আলি (২৩)। পেশায় এরা সকলেই কাঠের মিস্ত্রি। এই এলাকায় পুলিশই কিছু গাড়িতে আগুন ধরিয়ে

দিয়ে সেগুলির ছবি তুলে রাখে। প্রশাসনিক ব্যর্থতার চরম দিক হল, এই এলাকায় কার্ফু জারি হয় ৯ ডিসেম্বর দুপুর ২ টায়। পুলিশ দাঙ্গা বিষয়ে যে ২১ জনকে তখন গ্রেপ্তার করে তার মধ্যে ১৯ জনই ছিল মুসলমান, বাকি মাত্র ২ জন হিন্দু। হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা পবানওয়াড়ি, ইসলামপুরা অঞ্চলে দাঙ্গা করে। লমননগরে মসজিদ আক্রমণ করে, চাঁদ-মিঞা নামক এক ব্যক্তিকে ছুরি মারে। মুম্বই পুলিশের এই অঞ্চলের তৎকালীন সাব ইনস্পেক্টর ছিলেন মিঃ নাদফ। তিনি দাঙ্গাবাজ হিন্দু জনতা ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করায় শিবসেনার নেতৃত্বে প্রায় ৮০০ জন সশস্ত্র হিন্দু এই অফিসারের বদলির দাবিতে পুলিশ ফাঁড়ির দিকে মিছিল করেছিল। ভরতনগরে ৭০% মুসলমানের বাস। সেই সময়ে এই অঞ্চলের বিধায়ক ছিলেন মধুকর সবপোতদার। শিবসেনার এই বিধায়ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং মুসলিমবিরোধী অবস্থানের জন্য কুখ্যাত। সংশ্লিষ্ট এলাকায় মুসলিম নিধনে তিনি নেতৃত্ব দেন। ধারাভিতে ৭ তারিখ দুপুরবেলায় রিপাবলিকান পার্টির পুরপিতা সিন্ধের নেতৃত্বে শখানেক সশস্ত্র হিন্দু খাদ্দা এলাকায় মুসলমানদের জানমালের ওপর চড়াও হয়।

এই সমস্ত কুকর্ম সংগঠনে নেতৃত্বদানের অভিযোগ এতদিন ছিল বাল ঠাকরের বিরুদ্ধে। শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর সেই অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে গেছে। বাল ঠাকরে মানবতার একটি মূর্তিমান শত্রু। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তাঁর বিচার হওয়া প্রয়োজন। অথচ ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী শক্তি এই মানবাধিকার ভঙ্গকারী দুরাত্মাকে সব ধরনের রক্ষাকবচ দিতে প্রস্তুত। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মহারাষ্ট্র সরকার শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্টটি বাতিল করেছে। ফলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই নরাধমটির বিচারের কোনও সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না। বিশ্ববিবেক জানুক ধর্মান্ধ ফ্যাসিবাদী বি জে পি তার সহযোগী দলগুলির নগ্ন বীভৎস রূপ। মুম্বইতে শিল্পপতি, চিত্রতারকা, খেলোয়াড়, ধনী ব্যবসায়ীসহ দেশের অনেক বিখ্যাত নাগরিকরা থাকেন, কিন্তু নিজেদের স্বার্থে শিবসেনা ও বাল ঠাকরের ধর্মান্ধতা ও নির্লজ্জ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও কোনও প্রতিবাদ শোনা যায় না। ফলে সেখানকার কোনও বেসরকারি প্রতিবাদের চাপও ঠাকরের ওপর নেই। মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের ভূমিকা ঠাকুরের ব্যক্তিগত বাজার-সরকারের মত। মুম্বই যদি গোটা দেশেরই একটা অংশ হয়, তা হলে অন্য কোনও অঞ্চল থেকেও প্রতিবাদ সংগঠিত হবে না কেন? কেন অন্য অঞ্চলের রাজনৈতিক নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না?

পরিশেষে একটা কথা, মুম্বই দাঙ্গায় পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্যে শোনা গেল– ১৯৬৯ সালে আহমেদাবাদের বিধ্বংসী দাঙ্গার পর গঠিত জগন্মোহন রেড্ডি কমিশনের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি, হিন্দু অফিসাররা যেহেতু হিন্দু, মুসলমান-বিদ্বেষী মনোভাব তাদের ভেতরই রয়েছে, হিন্দু-মুসলমান অফিসাররা তাদের ধর্মবুদ্ধি ব্যতিরেকেও সরকারকে খুশি করার তাগিদে মুসলিমবিরোধী ভূমিকা নেন।

হিন্দুরাই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকৃত স্রষ্টা

গৌতমরায়

ফরাসিতে একটা রসিকতা খুবই প্রচলিতঃ এই জন্তুটা খুব পাজি, আক্রমন করলে আত্মরক্ষা করে। দীর্ঘদিনব্যাপী শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক আক্রমণে জর্জরিত মুসলমান সমাজ যখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে 'পাকিস্তান' নামক পৃথক অস্তিত্বের দিকে ঝুঁকল, তখনই নন্দ ঘাষের মত যত দোষের ভাগিদারও তারা হয়ে গেল। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জিন্না, কবি ইকবাল, স্যার সৈয়দ আহমদ প্রমুখকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেশভাগের যাবতীয় দায়িত্ব মুসলমান সমাজের ওপর চাপিয়ে দিতে চান।

একটি ঘটনা দ্বারা ইকবালের মত ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে ধর্মীয় বিচারবোধের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যদি ইতিহাস পুরুষদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানতে থাকি, তা হলে অচিরেই আমরা কুয়োর ব্যাঙে রূপান্তরিত হব।

১৯৩৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর মুসলিম লিগের বাৎসরিক অধিবেশনে ইকবাল্-প্রদত্ত বক্তৃতায় ভারত বিভাগের চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করে বলে শ্যামলবাবু যে অভিযোগ করেছেন, তা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। ইকবাল ওই বক্তৃতায় দেশভাগের পরিকল্পনার কথা আদৌ বলেননি। তিনি ভারত সাম্রাজ্যের ভিতর বা বাইরে স্বায়ত্তশায়িত এটি সম্মিলিত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠনের কথা বলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির মধ্যে দেশভাগের পরিকল্পনা দেখা তো তুলোর বস্তায় পিন খোঁজার মত ঘটনা। কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া তো দূরের কথা, ইকবালের এই বক্তৃতায় সংশ্লিষ্ট সম্মেলনটির ধারাবিবরণীতেও তা লিপিবদ্ধ হয়নি। এমনকি প্রস্তাব পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। ইকবালের এই বক্তৃতার অনেক আগে ১৯০৮ সালে লালা লাজপত রায় সম্পাদিত 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় হিন্দুদের কীভাবে দেশ গড়তে হবে তার পরিকল্পনা বলা হয় ঃ This can only be actived by asserting hereby Hindu interest and not by an Indian propaganda. এই সময়ে পাঞ্জাবের বণিক সম্প্রদায় ধর্মকে কীভাবে বাজারের পণ্য বানিয়ে মুসলিম মানসকে আহত করেছিল, তার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ আমরা পাই Kenneth James-এর 'Arya Dharama : Hindu consciousness in 19th Century Panjab' থেকে। কেনেথের দেওয়া সব থেকে বড় তথ্য হল, লালা লাজপত রায়ই ১৯২৪ সালে প্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রস্তাব করেন, 'পাঞ্জাবী' পত্রিকায় দিনের পর দিন যে ধরনের প্ররোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়, তা ওই অঞ্চলের মুসলিম মানসে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা জাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেই বিচ্ছিন্নতার শিক্ষা পরবর্তী সময়ে খালিস্থানপন্থী শিখেরাও গ্রহণ করেছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতে

পাকিস্তানের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রকৃত নির্মাতা কোনও মুসলমান নেতা নন। এই অঞ্চলে পাকিস্তান এবং পরবর্তী সময়ে খালিস্থানের তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রকৃত নির্মাতা হলেন সাম্প্রদায়িক স্বদেশিকতার নিরিখে হিন্দু মহাসভার অন্যতম জন্মদাতা ব্যবসায়ী লালা লালচাঁদ।

মুসলিম লিগের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার দায়ে ইকবালকে অভিযুক্ত করার সময়ে কি শ্যামলবাবুর মনে ছিল এই ইকবালই সাইমন কমিশনে (কংগ্রেস ও লিগ এই কমিশনকে বয়কট করে) তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'ব্রিটিশের বন্দুকের তলায় হিন্দুরা মুসলমানদের শোষণ করছে।' হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা তাদের পূর্ব পুরুষদের অপরাধকে ঢেকে রাখতে আজ ইকবালকে দেশভাগের পরিকল্পনাকারী হিসেবে দেখাতে চায়।

ইকবাল কর্তৃক জওহরলালের নিরীশ্বরবাদী সমাজতন্ত্রের যোগ্য উত্তর দেওয়ার পরিকল্পনার কথা শ্যামলবাবু বলেছেন। শ্যমলবাবু কি জানেন মৃত্যুর কয়েকমাস আগে ইকবাল জাতীয় কংগ্রেসের তৎকালীন সভাপতি জওহরলালের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নীতি সম্পর্কে সমাজতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? ইকবাল জীবনসায়াহ্নে সোবিয়েতের উন্নতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন বলে নেহরু তাঁর "The Discovery of India"তে মন্তব্য করেছেন। আবদুল্লাহ আনোয়ার বেগের "The Poet of the East"-ও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে।

জিন্নার ওপর ইকবাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন– এ কথা সত্য। কিন্তু সেই প্রভাবের ভিত্তি ও স্বরূপ কী ছিল তা দেখা দরকার। জিন্নার জীবনীকার বসিয়ো হেক্টরের মতে, জিন্না ইকবালের কাছে নতিস্বীকার করেননি। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যে সাধারণ মুসলমানদের ভাগ্যের উন্নতির কোনও সম্ভাবনা দেখাতে পারে না বলে জিন্নাকে লেখা শেষ চিঠিটিতে ইকবাল মন্তব্য করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমেদের কথা শ্যামলবাবু উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের সেই সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করা বিশেষ জরুরি। সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের বয়সসীমা নিয়ে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে আন্দোলন করেন, স্যার সৈয়দ আহমদ তার একজন সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌতে এবং ১৮৮৯ সালের ১৮ মার্চ মিরাটে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি একবারের জন্যও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করেননি। মওলানা জামালুদ্দিন আফগানি প্রস্তাবিত 'প্যান ইসলামিক' আন্দোলনে অংশ নিতেও তিনি অস্বীকার করেন।

আক্রমণ করেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচি ও চিন্তাধারাকে। কেউ যদি স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতির কথা ভাবেন, নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের কথা ভাবেন–

অবশ্যই অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ না করে তা হলে কি তাকে সাম্প্রদায়িক বলা যায়? স্যার সৈয়দ আহমদকে থিয়োডর বেক কোন্ পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন,তা তো আজ সবার জানা। আলিগড় কলেজের জন্য ইংল্যান্ড থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত প্রচারপত্র তৈরির প্রস্তাব ১৮৭৩ সালের ২০ এপ্রিল জনমুরে কেনেডি একটি চিঠির মাধ্যমে স্যার সৈয়দ আহমদকে করেন। মিঃ কেনেডি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির কারণে মুসলমান সমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজ কীভাবে সহমত পোষণ করছে না, সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রচারপত্রটি তৈরি করতে। তাঁর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে স্যার সৈয়দ আহমদ তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। ধর্মান্ধ মুসলমানদের বহু মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করার জন্য মোল্লাবাহিনীর তাঁকে বিধর্মী আখ্যা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোপণে হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল। ধর্মান্ধ মোল্লাবাহিনী কী 'দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রচারক'– এর সঙ্গে এইরকম আচরণ করবে? শ্যামলবাবু কী বলেন? পাকিস্তান-ভাবনা জিন্নার মাথায় পাকাপাকিভাবে আসন নেওয়ার পেছনে কেমব্রিজ গোষ্ঠীয় অবদানকে শ্যামলবাবু স্মরণ করেছেন। কেমব্রিজ গোষ্ঠীর পরিকল্পনাকে ১৯৩৩ সালে Joint Committee on Constitutional Reform-এর বিবরণীতে মুসলিম নেতারাই ছাত্রদের স্বপ্ন, উদ্ভট এবং অবাস্তব বলে বর্ণনা করেন।

১৯৩৪ সালে মাধব শ্রীহরি আনে এব মদনমোহন মালব্যের উদ্যোগে কংগ্রেসের ভেতর থেকেই সাম্প্রদায়িকতার সমর্থকদের একত্রিত করে কংগ্রেস ন্যাশনালিস্ট পার্টি গঠিত হয়। এই বছরই হিন্দু জাতীয়তাবাদী চক্র পুনে শহরে গান্ধীজিকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়ে বোমা নিক্ষেপ করে। এই ঘটনাক্রমই জিন্নাকে এই সিদ্ধান্তের দিকে ঠেলে দেয় যে, কংগ্রেস গান্ধীযুগ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কংগ্রেসের মধ্যে উগ্র যুক্তিহীন জাতীয়তাবাদী হিন্দুত্ব যে ভাবে শক্তি সঞ্চয় করছিল, তাতে জিন্না ও জওহরলাল দু'জনেই চিন্তিত ছিলেন। কংগ্রেসের ভেতরের হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের আচরণ দেখে জিন্না ক্রমশ নিশ্চিত হন যে, কংগ্রেসে গান্ধীযুগের অবসানের পর ভারতের মুসলমানদের হিন্দুদের দয়ার ওপর বাস করতে হবে। এ সবেরই ফলশ্রুতি হিসাবে জিন্না বাধ্য হন দ্বিজাতিতত্ত্বের কোণে গিয়ে আশ্রয় নিতে। হিন্দু জাতিতত্ত্বের প্রবক্তারাই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকৃত স্রষ্টা। প্রথমে কিন্তু বাংলা ভাগের চিন্তা জিন্নার মাথায় তেমনভাবে ঠাঁই পায়নি। ১৯০৫-এর বাঙালির প্রতিরোধ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। কিন্তু মন্বন্তরে বাঙালি হিন্দুর (অভিজাত) অবস্থা বাঙালি মুসলমানকে দাঁড় করিয়ে দেয় আগ্নেয়গিরির প্রান্তসীমায়। এইচ দত্ত কোম্পানিকে চালের বরাত পাইয়ে দিয়ে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ তৈরিতে সাহায্য করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৪৬-এর দাঙ্গার আগেই বেঙ্গল পার্টিশন লিগ গঠিত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা 'গ্যালপ পোল' করে দেখাতে চায় ৯৮.৬% বাঙালি দেশভাগের পক্ষে। শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখতে ৩৮ সাল থেকেই বিড়লারা যে কাজ শুরু করে বাংলায়,

এই সময়ে সেই স্বার্থরক্ষার জন্যই টাকা ঢালতে শুরু করে মারোয়ারি ব্যবসায়ীরা, ঈশ্বর দাস জালান, বিড়লা, গোয়েঙ্কারা। জি ডি বিড়লা ৩৮ সালেই হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশভাগ চেয়েছিলেন। ৪২ সালে তিনি আবার দেশভাগ চান হিন্দু স্বার্থরক্ষায়। এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর হাতের পুতুলে পরিণত হন শ্যামাপ্রসাদ, বিধান রায়, এন.সি. চ্যাটার্জি, নলিনী সরকাররা। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে গৃহযুদ্ধকেই তখন কাম্য মনে করেছিলেন। বাংলা ভাগ চেয়ে পুস্তিকা লিখলেন অতুল্য ঘোষ। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেঘনাদ সাহা পশ্চিমবঙ্গের পৃথক প্রদেশ চেয়ে ভারত সচিবের কাছে তারবার্তা পাঠালেন। এই পরিস্থিতিতে একা শরৎ বসু কী করবেন? সোহরওয়ার্দি কী করবেন? আবুল কাশেম কী করবেন? অন্নদাশঙ্কর একা বুড়ো খোকাদের সাবধান করে কী করবেন? মন্বন্তর হিন্দু অভিজাতদের কাছে লক্ষ্মীলাভ ঘটাল, তার প্রমাণ তো বিজন, মানিক, তারাশঙ্করই রেখে গেছেন। কমিউন্স্টি পার্টি এই পরিপ্রেক্ষিতে বলল, 'ভারত বিভাগ ও বঙ্গভঙ্গ ধ্বনি স্বাধীনতার ধ্বনি নয়। ইহা হতাশা, বিক্ষোভ ও মৃত্যু আলিঙ্গন।'

সিপাহি বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে শ্যামলবাবু দেবেশ রায়ের কাছে কলকাতার কোন্ কোন্ পাড়ায় লেঠেল বাহিনী বানিয়ে হিন্দু অভিজাতরা সিপাহীদের বিরুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করেছিল, তার তালিকা জানতে চেয়েছেন। কলকাতা শহরের তালিকা সে ভাবে প্রস্তুত করতে না পারলেও চট্টগ্রামের মদনদাস রায়, সিলেটের রামকৃষ্ণ মজুমদার, কুমিল্লার আবদুল খান, ঢাকা কালেক্টরেটের নাজির জগবন্ধু সেন, সেখানকার অভিজাত কর্মচারী আগা গোলাম আহমেদ খান, মৌলবী আবদুল আলি, নোয়াখালির ভূলুয়া পরগনার জমিদারের নায়েব যশোদাকুমার পাইন, ভাওয়াল পরগনার কালীনারায়ণ রায়চৌধুরি, ঢাকার খাজা আবদুল গণি, চট্টগ্রামের কালিন্দী রানী, যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায়, রংপুরের রানী স্বর্ণময়ী, পাবনায় বিজয় গোবিন্দ চৌধুরী, সৈয়দ আমির আলি, গৌরচন্দ্র রায়, খোদাবক্স শাহ্, খেদমত শাহ ফকির, ইয়াসিন শাহ ফকির প্রমুখ যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে শ্যামলবাবু আর একটু খোঁজ-খবর নিলে ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করা হবে।

সংবিধান পর্যালোচনা কার স্বার্থে?

গৌতমরায়

ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তি এ দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতির উপর হামলা চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। আশির দশকের শেষের দিক থেকে এই হামলা ক্রমশ তার বিষাক্ত নখদন্তের সুতীক্ষ্ণ থাবায় আঘাত হানছে মানবতার উপর। স্বাধীনতার আগে থেকেই হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে প্রবল উৎসাহে, যার পরিণতিতে জন্ম নেয় মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা– এসবেরই বেদনাময় পরিসমাপ্তি দেশভাগ।

এরপর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মৌলবাদী শক্তি পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই চালাতে থাকে তাদের আগ্রাসন। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে সংখ্যাগুরু মৌলবাদীদের প্রথম আক্রমণ নেমে আসে মহাত্মা গান্ধীর উপর। এরপর তাদের আগ্রাসন ক্রমেই তীব্র হতে থাকে। কংগ্রেসের মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী, সাম্প্রদায়িক শক্তির সাহায্যও তারা পেয়ে যায় পরোক্ষভাবে। চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা, ভারত-পাক যুদ্ধ এসব ক্ষেত্রগুলিতেই দেশপ্রেমের নামে উগ্রতার আমদানি ঘটিয়ে সংখ্যাগুরু সামপ্রদায়িক শক্তি তাদের মৌলবাদী আগ্রাসনকে ক্রমেই চরম রূপ দিতে থাকে, একই সঙ্গে চলতে থাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত মানুষদের উপর সামাজিক, শারীরিক, অর্থনৈতিক আগ্রাসন। জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিরা গান্ধী অ্যান্ড কোম্পানির আধা ফ্যাসিস্ট তাণ্ডব এদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘকে একটা তথাকথিত সামাজিক অগ্রাধিকার দেয়। ১৯৭৫ সালের মে মাসে কালিকটে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, 'বিচার আন্দোলন এবং আর এস এস-এর কাজকর্ম মূলত অভিন্ন, এঁদের উভয়েরই লক্ষ্য হল সমাজের আমূল পরিবর্তন। সারা দেশের উন্নতির জন্য চিন্তাভাবনার বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একসঙ্গে কাজ করেই এই পরিবর্তন আসবে'। তাঁর মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দেওয়া এই শংসাপত্র বিগত তিন দশক ধরে সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি আর এস এস সহ সংঘ পরিবারের অন্যান্য সদস্য সংগঠন এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন জনসংঘ তথা বি জে পি-র রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের অন্যতম মূল উপাদান।

বি জে পি-জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই এই সংখ্যাগুরু মৌলবাদী আগ্রাসন বল্গাহীন মাত্রা লাভ করেছে। মৌলবাদের জন্মভূমি মার্কিন মুলুকের ক্রীড়নক হিসাবে এদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি দেশের মৌলিক পরিকাঠামোর উপরেই নগ্ন আক্রমণ চালাতে শুরু করে দিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশে হিন্দুবাদী শক্তি এদেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বই কার্যত বিকিয়ে দিয়েছে হোয়াইট হাউসের কাছে।

রাজস্থানে মসজিদ ধ্বংস বর্বর আর এস এস-এর গোপন কর্মসূচীর অঙ্গ

গৌতম রায়

উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে শুরু করেছেন বি জে পি-র শীর্ষ নেতৃত্ব। বর্বর আর এস এস তাদের পুরনো খেলা ভালোভাবেই খেলে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক বারি মসজিদ ধ্বংসকারী আর এস এস সহ সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য শাখা

সংগঠন এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বি জে পি-র প্রত্যক্ষ মদতে রাজস্থানের ঐতিহ্যশালী প্রাচীন সেওয়াই ভোজ মসজিদ ধ্বংস করে কয়েকঘন্টার মধ্যেই সেখানে তৈরি করা হয়েছে হনুমান মন্দির। এই রাজ্যের ভীলওয়াড়া জেলার আসিন্দ শহরে সঙ্ঘ পরিবারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দস্যুরা চরম অত্যাচার চালাচ্ছে সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত মানুষদের উপরে। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদে বি জে পি সরকার এবং সঙ্ঘ পরিবারের যৌথ আক্রমণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ আজ এক ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে সঙ্ঘ পরিবারের দস্যুদের হাতে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদ শহরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়জাত দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে সংসদের দু'টি কক্ষ উত্তাল হলেও কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা উত্তরপ্রদেশ সরকারের কুম্ভকর্ণের নিদ্রার তাতে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি।

সম্রাট আকবরের সময়কালে নির্মিত একটি ঐতিহাসিক মসজিদ যারা ভাঙে আর এই অসভ্যতায় যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত জোগায়, তারা 'মানুষ' নামের যোগ্য নয়। কাবেরী নদীর তীরে মন্দির সংলগ্ন বাদিয়া দরগায় ২৬শে জুলাই ধর্মীয় উৎসবকে বন্ধ করে দেওয়ার অসদুদ্দেশ্যে হিন্দু মৌলবাদী দস্যুরা এই ধর্মীয় স্থানে যাওয়ার পথ, যেটি সেওয়ই ভোজ মন্দিরের চত্বর দিয়েই ছিল, হাজার হাজার বছর ধরে যে পথ বেয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানুষ যাতায়াত করতো, সেই পথ মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষদের জন্যে রুদ্ধ করে দেয়। মুসলমান সম্প্রদায়জাত মানুষেরা ঘোরা পথে ঐ দরগায় যায়। এরপর হিন্দু গুণ্ডারা দরগায় প্রার্থনা সঙ্গীত বন্ধ করে দিতে বলে, প্রার্থনা সঙ্গীতের তাঁবুতে সশস্ত্র আক্রমণ করে, প্রায় ৩০০ জন উন্মত্ত দস্যু এই কাজ করে, এই দস্যুদের আক্রমণে অচিরেই মাটির সঙ্গে মিশে যায় প্রাচীন ভালান্দারি স্থাপত্যে নির্মিত এই ছাদবিহীন মসজিদটা। সেই স্থানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্থাপন করা হয় মার্বেল পাথরে তৈরি মন্দিরের কাঠামো, স্থাপন করা হয় বজরং দলের উপাস্য বাঁদরের মূর্তি, নাম দেওয়া হয় 'পীর পাছাড় হনমানজী মন্দির'। আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনুমান করে আসছি যে, বর্বর সঙ্ঘ পরিবার দেশের বেশ কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যশালী মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে হিন্দু মন্দির তৈরি করবার গভীর ষড়যন্ত্র করছে, সেওয়াই ভোজ মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা আমাদের সেই অনুমান যে কতোটা সঠিক তা প্রমান করলো। কারণ, পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে কী করে মসজিদ ধ্বংসের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মার্বেল পাথরে তৈরি একটি মন্দিরের কাঠামো সেই জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব? মাত্র কয়েক ঘন্টায়। তা একটা মন্দিরের মার্বেল পাথরের কাঠামো নির্মাণে বিশ্বকর্মারও অসাধ্য কাজ, মূর্তিই বা এলো কোথা থেকে? বর্বর আর এস এস দেশের ২৩টি প্রাচীন মসজিদ ধ্বংসের এক গোপন ষড়যন্ত্র করেছে, সেওয়াই ভোজ মসজিদ ধ্বসের ঘটনা তাদের সেই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। আর এস এস-এর শাখা সংগঠনগুলি, যেমন, ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়ন, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, ভারতীয় সাধু সমাজ, স্বদেশী সংগ্রাম মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল ইত্যাদি দেশকে এক বেদনাময় গৃহযুদ্ধের দিকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে। আর এস এস-এর রাজনৈতিক সংগঠন তাদের সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে নির্লজ্জের মতো কাজে

লাগাচ্ছে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থাকে। প্রশাসনের মধ্যেও ব্যাপকহারে গৈরিকীকরণের ষড়যন্ত্র চলছে। এ-এক চরম দুঃসময়। রাজস্থানের কংগ্রেস (ই) সরকারও সংখ্যালগু সম্প্রদায়জাত মানুষদের ধর্মস্থান রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রোম পুড়ছে নিরো বেহালা বাজাচ্ছে, গোটা দেশ ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলছে, উগ্র হিন্দুত্বের তাণ্ডবে দেশের মানবাধিকার চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত আর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগের নাটক করছেন।

দেশের অর্থনীতি যখন প্রবল সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, ইউ টি আই-সহ একের পর এক আর্থিক কেলেঙ্কারির ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যখন সাধারণ মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে বসেছে, বাজার অর্থনীতির মোহিনী মায়ায় যখন আর মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে পারা যাচ্ছে না, তখনই যেন-তেন প্রকারেণ ক্ষমতা আঁকড়ে থেকে, বিবদমান সমর্থক শরিকদের ভয় দেখাতে, দলের মধ্যে ওঠা নানা প্রশ্নকে ধামাচাপা দিতে বিশেষকরে তার নিজের দপ্তর এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্পর্কে সেই তেহেলকা কাণ্ড থেকেই ক্রমশ সামনে চলে-আসা নানা প্রশ্নকে ধামা চাপা দিতে নিজস্ব দলের সংসদীয় দলের সভায় পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী।

অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করা প্রধানমন্ত্রী এমন একটি 'সুবর্ণ' সময় উপহার দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যখন তাঁরই দলের বর্বরদের হাতে দেশের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার কাঠামোটিই একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুলিশ– উর্দিপরা অপরাধীর দল

'কম্যুনালিজম কমব্যাট' (মার্চ-এপ্রিল ২০০২ সংখ্যা)

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মাঝমাঝি সময় জুড়ে সমগ্র গুজরাট ব্যাপী খুন-ধর্ষণ-লুটপাঠ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে যেভাবে সরকারি মদতে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে এবং তার মোকাবিলায় গুজরাট পুলিশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থতার বিবরণ সংবাদ মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারীরকা সংকীর্ণ ও ঘৃণ্য রাজনীতির দ্বারা সরাসরি প্রণোদিত হয়ে যে ভাবে সংবিধান ও আইনের শাসনের প্রতি স্বেচ্ছাচারী ভূমিকায় নিজেদের অবতীর্ণ করেছেন ২০০২-এর রক্তাক্ত গুজরাট তার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির এই সময়ে নিকৃষ্টতম এই বর্বরতা মোকাবিলায় গুজরাট প্রশাসনের অসামান্য পঙ্গুত্ব এবং ব্যর্থতার কথা আজ সবার জানা। উগ্র হিন্দু-মৌলবাদীদের হত্যালীলার উদ্দাম সুর পঙ্গু করে রেখেছিল পুলিস প্রশাসন সেই সাথে অ-সামরিক বাহিনীকেও। একদিকে এইদারুণ প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং স্থবিরতা আর অন্য দিকে কিশোর-যুব বয়সীদের নির্বিচারে হত্যাকরার বর্বর অভিযানে দাঙ্গাবাজদের সাথে প্রশাসনের ঘৃণ্য যোগসাজশ– এটাই আজকের গুজরাটের প্রতিদিনের চিত্র।

গত বছর বা তার কিছু আগে প্রতিবেশীর রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রচেষ্টা চলেছিল কারণ তারা নিজেদের অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছিল এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার ঘটাচ্ছিল। ঘৃণা সৃষ্টির মতাদর্শ গত তাত্ত্বিকের সংগঠিত পরিকল্পনা মাফিক রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা শিবির চালু করেছে সমস্ত রকম সাংবিধানিক রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে। বর্তমান পরিস্থিতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। গুজরাট যে উগ্র-হিন্দুত্ববাদের গবেষণাগারে পরিণত হচ্ছে, গত চার বছর আগে বি জে পি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল বারে বারে।

পুলিশের অমার্জনীয় আচরণ

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আগ পর্যন্ত গুজরাট থেকে যাতায়াতকারী শিবসেনা করসেবকদের উন্মত্ত আস্ফালনের ফলে ভাদোদরার কাছে 'পালেজও রেল স্টেশনে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটে।

১৪ ফেব্রুয়ারি বাবরি মসজিদ ধ্বংসের অব্যবহৃতি পরে– গোধরার কাছে দাহোদ থেকেও অনুরূপ ঘটনা সংবাদে আসে। পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর তাৎক্ষণিক তৎপরতার ফলে উত্তেজনা অঞ্চলের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। আশংকাজনক পরিস্থিতির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও– করসেবকদের আগমন এবং নিষ্ক্রমণ বিষয়ে পুলিশের কঠোর তৎপরতা ও নজরদারি– বিশেষতঃ সমগ্র দেশে যখন এক চরম উত্তেজনার বিস্ফোরক পরিস্থিতি বিদ্যমান– একান্তভাবেই প্রত্যাশিত ছিল। এই পরিস্থিতি গত অভিজ্ঞতার প্রতি চরম প্রশাসনিক-উদাসিন্য যে কোনো শান্তি প্রচেষ্টার মূলে ধ্বংসাত্মক কুঠারাঘাত।

গোধরার সিনগাল ফালিয়া অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা ও করসেবকদের মধ্যে প্রবাহমান উত্তেজনার কথা পুলিশের অজানা ছিল না। ২৭ ফেব্রুয়ারি দেউলিয়াপনাকেই প্রমাণ করে। উত্তেজনার খবর থাকা সত্ত্বেও করসেবকরা ঐ ট্রেনে ফিরছে কি না পুলিশও তা অনুসন্ধান করে দেখেনি। নাম জানাতে অনিচ্ছুক কিছু পুলিশকর্মী জানান যে তাদের কাছে আগে খবর পৌছুলে পরিস্থিতির মোকাবিলায় উপযুক্ত সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা যেত। তারা আরো বলেন যে, পুলিশের কাছে খবর ছিল করসেবকরা ফিরবে ১ মার্চ থেকে। তার আগে নয়। তাই তারা সম্পূর্ণ অ-প্রস্তুত ছিল। গোধরার ঘটনার দুই দিন আগেই অর্থাৎ ২৫ মার্চের উত্তর-প্রদেশের ফৈজাবাদ থেকে প্রকাশিত হিন্দি দৈনিক 'জনমোর্চা' তার সংকলনে করসেবকদের ট্রেনের অভ্যন্তরে ভীতিপ্রদর্শন ও দাঙ্গা বাধানোর যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্বলিত উত্তেজক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছে। স্থানীয় মুসলিম 'ঘাঞ্চি' সম্প্রদায়ের ট্রেন হকারদের সাথে করসেবকদের চিরাচরিত বিবাদের কথা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। তাই দাঙ্গা যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের আরো সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ছিল।

এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে যে কোনো মানুষের মনে এই প্রশ্ন আসতেই পারে যে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের এই ব্যর্থতা কী শুধুমাত্র গাফিলতি নাকি ইচ্ছাকৃত দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ধারাবাহিক সুচারু প্রক্রিয়া?

গোধরার ঘটনার পর দাঙ্গা যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য কোনো সতর্কতামূলক গ্রেপ্তারও পুলিশ করেনি। ২৭ ফেব্রুয়ারি মহঃ ইসমাইল জালালউদ্দিন এবং ফতে মহম্মদ নামে শুধু দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল উত্তেজক স্লোগান দেওয়ার অপরাধে। গোধরার ঘটনা মুসলিমদের ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি, এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়েই বিশ্বহিন্দু পরিষদ ২৮ ফেব্রুয়ারি গুজরাট বন্‌ধ-এর ডাক দিয়েছিল এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনার সাথে যুক্ত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সরকারকে চরমপত্র দিয়েছিল।

যদিও ২০০০ সালের ১ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বি জে পি-র ডাকা বন্‌ধে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস ও লুঠ হলেও পুলিশ ঐ ঘটনায় যুক্ত কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ধর্মরক্ষা সমিতি, বজরং দল ইত্যাদি একাধিক হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনের নামে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে খুন, জখম, ধর্ষণ ও অত্যাচার করার নির্দেশ সম্বলিত প্রচার পত্র প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে বিতরণ করা হয়েছে। এই উস্কানিমূলক প্রচারপত্র দ্রুত দাঙ্গা ছড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে জেনেও কোনোরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশাসন আশ্চর্যজনক ভাবে উদাসীন থেকেছে। গুজরাটে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখ্য সংগঠক কে কে, শাস্ত্রী reliff.com ইন্টারনেটে ১২ মার্চ এক সাক্ষাতকারে বলেছেন যে ২৮ ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে সংখ্যলঘুদের বিরুদ্ধে করণীয় কাজের একটা তালিকা তারা তৈরি করেছেন। সেগুলি দেওয়াল লিখনেও প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সব জেনেও বালিতে মুখ ঢেকে রাখা উটের মতো পুলিশও চোখ বন্ধ করে ছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সবরকন্থ জেলার লুনাভাদা গ্রামের কোনো এক ব্যক্তির বাড়িতে এক গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছিল। বিকেলে ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টায় টেলিফোন মারফৎ অনেককেই এই সভার খবর জানান হয়। গোধরার ডঃ যোগেশ রামালাল পাণ্ডের বাড়ি থেকে হত্যালীলার গোপন বৈঠকের প্রথম খবর পান ডঃ অনিল প্যাটেল, গুজরাট ডক্টর সেলের একজন সদস্য। কালোলের পুলিশ হাউসিং কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যান ডঃ চন্দ্রকান্ত পাণ্ডেকেও ফোনে ঐ বৈঠকে থাকার জন্য জানান হয়। গুজরাটের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অশোক ভাট গোধরার কালেক্টরেটে বসে এই সভার খবর পান। লুনাভাদা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রী প্রভাত সিং চৌহান এবং জনৈক এ. পি. পাণ্ডে নামে এক ব্যক্তিকেও উপস্থিত থাকতে বলা হয়। বিজেপি, আর. এস.এস. বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রায় ৫০ জনকে ফোনে এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়।

পেট্রোল, কেরেসিন সহকারে কিভাবে সংখ্যালঘুদের পুড়িয়ে মারা হবে তার ছক তৈরি করা হয়েছিল ঐ বৈঠকে। রাজ্যের গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে এই বৈঠকের কোন খবরই নাকি ছিল না। এই চূড়ান্ত ব্যর্থতা কি ইঙ্গিত বহন করে? এই ধরনের বৈঠকের C.B.I. তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত।

অবশেষে ২৭ ফেব্রুয়ারি রাত্রে কয়েক কোম্পানি রাজ্য রিজার্ভ পুলিশ পুলিশ নামানো হয়। ঐ বাহিনীর নরোদার III নং গ্রুপের এক ব্যাটেলিয়ানকে পাঠান হয়েছিল গোধরায় এবং অপর এক ব্যাটেলিয়ান পাঠান হয়েছিল আমেদাবাদের গ্রামীণ এলাকায়। পরদিন অর্থাৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে গোধাসার থেকে আরো কয়েক ব্যাটেলিয়ান আমেদেবাদের বিভিন্ন অংশে পাঠান হয়। কিন্তু একেকটা গ্রুপে পুলিশের সংখ্যা ছিল। ৪-৫জন। বিশাল খুনে বাহিনীর ব্যাপক লুঠপাঠের মুখে ছোট ছোট গ্রুপের এই পুলিশ বাহিনী কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। হয়তো বা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারার জন্যই সু-পরিকল্পিত এই অবাস্তবচিত পুলিশি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কয়েকজন সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসার এই কম সখ্যক পুলিশ নিয়েও দাঙ্গা প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের তৎপর হলেও অধিকাশ ক্ষেত্রে পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দাঙ্গাকারীদের সহায়তা করেছে।

গুজরাটে পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল (D.G.P) কে চক্রবর্তী ২৭ দূরদর্শনের সংবাদে বলেছেন, "উত্তেজনা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকায় জেলা কর্তৃপক্ষ শহর ও শহরতলী অঞ্চলে কার্ফু বলবৎ করেছিল, বিশেষত যে অঞ্চলগুলি ট্রেন রুটের মধ্যে পড়ে। রাজ্যের সম্পূর্ণ পুলিশ ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত সতর্ক করা হয়েছে এবং রাজ্যের রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে উত্তেজনাপ্রবণ বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠান হয়েছে। পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারদের অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপে যুক্ত সকল বক্তির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে" বলেও তিনি জানান। তিনি আরো বলেছেন যে, গোধরার ঘটনা অতর্কিতে ঘটে যাওয়া তার তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ সম্ভব হয়নি। কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হল এই যে– গোধরার ঘটনা আদৌ কোনো অতর্কিত ঘটনা নয়–এটা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিস এই সংখ্যা-লঘু নিধন যজ্ঞে সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করেছে। ফলে, পুলিসের উচ্চপদাধিকারীর ঐ বক্তব্য অবাস্তব এবং হাস্যকর।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ একদিকে যেমন ভৈরব বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, পাশাপাশি দাঙ্গা প্রতিহত করার নামে পুলিসও তাদেরকেই গুলি করে মেরেছে। যেমন– আমেদাবাদ শহর ২৮ ফেব্রুয়ারি পুলিসের গুলিতে ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছে, এর মধ্যে ৩৬ জনই সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের। নাবালকেরা পুলিশের মারণগুলি থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু কেন এই নৃশংসতা।

আমেদাবাদের পুলিস কমিশনার পি. সি. পাণ্ডে ২৮ ফেব্রুয়ারি ষ্টার নিউজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "গোধরার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের অধিকাংশের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব হয়েছিল নিচুতলার পুলিশ কর্মীরাও অনেক ক্ষেত্রে সেই মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে"। পুলিশ কমিশনারের এই বক্তব্য পুলিশ কর্মীদের আইনের শাসন কঠোরভাবে বলবৎ করার পরিবর্তে উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করার ছাড়পত্র হিসেবে কাজ করেছে।

২ মার্চ পুলিশ কমিশনার ষ্টার নিউজে বলেছেন, "পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসছে, আমরা আশাকরি পরবর্তী ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ অবস্থান ফিরে আসবে।" তার এই বক্তব্য কতটা অন্তঃসারশূন্য আমেদাবাদের মানুষ তা মরমে মরমে উপলব্ধি করেছেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি সমগ্র গুজরাটের ৩০টি বিভিন্ন অঞ্চলে সযত্নে পরিকল্পিত এই গণহত্যা শুরু হয়। দুজন প্রবীণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী পুলিশের কন্ট্রোলরুমে বসে পুলিশকে যথাযথ দায়িত্ব পালন না করার জন্য প্রভাব খাটিয়েছেন।

১৯৮৫ সালের ২২ এপ্রিল আমেদাবাদের ঘাদিয়ার জেলার হেড কনেস্টবল দেশাইকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত অশোক ভাট, ঘটনাচক্রে তিনিই বর্তমান স্বাস্থ্য মন্ত্রী। তিনি শাহিবাগে আমেদাবাদ পুলিশ কমিশনের অফিসে ঐ ২৮ ফেব্রুয়ারি উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘ ৩-৪ ঘন্টা এবং নরেন্দ্র মোদীর ডান হাত হিসেবে পরিচিত গুজরাটের গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী আই.কে. জাদেজা সকাল ১১টার পর থেকে গান্ধীনগরে রাজ্য পুলিশের কন্ট্রোলরুমে উপস্থিত থেকে এই নৃশংসতাকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

এই রকম সংকটকালীন পরিস্থিতিতে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যে ভাবে পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন– এমনতর ঘটনা এর আগে কোনোদিন ঘটেনি। গুজরাটের ২৪টি জেলার মধ্যে ১৬টি জেলার পুলিশ সুপার দাঙ্গা প্রতিরোধে নিস্ক্রীয় ছিল শুধু তাই না দাঙ্গাকারীদের সহায়তা করেছে। আমেদাবাদ, বরোদা, রাজকোট, মেহসানা প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশ কমিশনাররাও এই অপরাধে অপরাধী।

বিজেপির নেতৃত্বে সমগ্র গুজরাট জুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের তাণ্ডব চলছে তখন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দৃষ্টি না দিয়ে পুলিশ-প্রশাসন যদি শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের নির্দেশ পালনের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তবে তা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর তো বটেই, দণ্ডনীয় অপরাধও।

সশস্ত্র দাঙ্গাবাজেরা যাতে অবাধে এই মারণ যজ্ঞে যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং আক্রান্তরা যাতে অভিযোগ দায়ের করতে না পারে ও কোনো রকম

শুশ্রুষার সুযোগ না পায় তার জন্য যথাসম্ভব কম ফোন কল গ্রহণ করার নির্দেশ ছিল পুলিসের কাছে।

এই প্রতিবেদক দাঙ্গায় আক্রান্ত বহু মানুষের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছে যে, এই বর্বরতার প্রকোপ থেকে নিস্তার পাওয়ার আশায় অসহায় মানুষেরা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের মোবাইলে ফোন করে পায়নি। কারণ তাদের মোবাইল ঐ জ্বলন্ত মুহূর্তে বন্ধ ছিল।

ভূতপূর্ব কংগ্রেস সাংসদ এহসান জাফরি গুলবার্গ সোসাইটিতে তার নিজ ভবনে ২০-২২ হাজার ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নিরাপত্তার আশায় তিন মুখ্য-সচিব থেকে শুরু করে উচ্চ-পদস্থ সব পুলিস আধিকারিককেই ফোন করেছেন। কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায়নি। পুলিসের তিনটি মোবাইল ভ্যান জাফরির বাড়ির আশেপাশে থাকলেও কোনো সহায়তায় আসেনি। কোনো রকম সরকারি সহায়তা না পেয়ে মরিয়া জাফরি আত্মরক্ষার্থে শূন্যে গুলি চালায়। কিন্তু তার শেষ চেষ্টাও অনিবার্য ভাবে ব্যর্থ হয়। জহ্লাদ বাহিনী জাফরির সামনেই মেয়েদের বিবস্ত্র করে ধর্ষণ করে। পরে আত্মীয় পরিজন সহ একই সাথে ৬৫ জনকে পুড়িয়ে মারে।

নরোদা থানার পুলিশ ইনসপেক্টার কে.কে. মাটসোরিওয়ালা ২ মার্চ আজতক T.V. চ্যানেলে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা/৮টা পর্যন্ত ভরপুর দাঙ্গা হয়েছে। ১৫-২০ হাজার লোক এই দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করেছে। পুলিশ সেখানে ছিল, কাঁদানে গ্যাস ও গুলিও ছুড়েছে। কিন্তু দাঙ্গাকারীরা এত বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিল যে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়েছে।

ঐ একই সময়ে নারোদা-পাতিয়ায় ধ্বংসলীলা শুরু হয়। এই তাণ্ডবের কবল থেকে কোনোক্রমে যারা নিজেদের শুধুমাত্র শারিরীক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন এমন প্রায় চব্বিশ জন সর্বশ্রান্ত মানুষ অভিযোগ করেছেন যে তারা পাণ্ডেকে শতাধিকবার ফোন করেছেন। কিন্তু তার মোবাইল স্থায়ীভাবে বন্ধ ছিল।

আমেদাবাদ-মোদাসা এবং বরোদা-গোধরা হাইওয়েব্র উপর অবস্থিত ২৫টি বড় কারখানা এবং খামার বাড়ি দিনের বেলায় পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় গেরুয়া ভৈরব বাহিনী। উপস্থিত পুলিশ যথারীতি নীরব দর্শক। সংগঠিত এই ঠাঙারে বাহিনীর মধ্যে মোবাইল ফোন সহ মোটরসাইকেল চালক ছিল যারা বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ রক্ষা করেছে। পৈশাচিকতার দাবানল থেকে প্রাণে বাঁচতে স্থানীয় মানুষ যখন পালাচ্ছে তখন সেই ভীত সন্ত্রস্থ মানুষের উপর, বিশেষত মহিলাদের উপর হিংস্র পাশবিকতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে গেরুয়া ঠ্যাঙারে বাহিনী। কোনোরূপ পুলিস পেট্রোলিং-এর ব্যবস্থ ঐ হাইওয়েতে ছিল না।

বরোদার 'বেষ্ট' বেকারীর সামনে জড়ো হওয়া ঠ্যাঙারে বাহিনী বেকারীতে আগুন লাগিয়ে ১৪ জনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। পুলিস ভ্যান পাশ দিয়ে যাতায়াত করলেও কোনো ভূমিকা পালন করেনি। বারোদার পুলিশ কমিনারকে যখন পাওয়া গেল তখন উত্তেজিত জনতা পুলিশের এই নিষ্ক্রীয়তার কারণ জানতে চায়। উত্তরে কমিশনার বলেন, "আপনার চাকর কার কাজ করবে" অর্থাৎ শাসক দলের চাকর হিসেবে পুলিস তাদেরই নির্দেশ পালন করবে।

পাঁচ মহলের পুলিশ গ্রামবাসীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ও খুন করার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়। পান্ধারওয়াদা গ্রামের পুলিশও হত্যালীলা প্রতিরোধে কোনো ভূমিকা নেয়নি।

আমেদাবাদ পুলিশ কন্ট্রোলরুমে মন্ত্রী অশোক ভাট যখন স্বয়ং উপস্থিত থেকে পরিকল্পিত এই বর্বরতাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, সেই সময় এক চাঞ্চল্যকর খবর পৌছায় ঐ কন্ট্রোলরুমে। ঐ মন্ত্রীর পুত্র তথা B. J. P'র স্থানীয় কাউন্সিলার 'ভূষণ' গায়েকোদা হভেলি অঞ্চলে দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত। ছেলেকে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি পুলিশকে দ্রুত ঘটনা স্থলে পৌছানোর নির্দেশ দেন। কন্ট্রোলরুমে বসে এটাই ছিল তার দেওয়া প্রথম নির্দেশ।

১৯৯৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে সংখ্যালঘুদের উপর উৎপীড়নে উৎসাহ ব্যঞ্জক প্রচারপত্র সমগ্র গুজরাট জুড়ে ব্যাপক ভাবে প্রচার করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যম এই ঘৃণ্য উস্কানিমূলক প্রচারপত্র সম্পর্কে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন কি গোধরার ঘটনার আগেও ক্যাডারদের উৎসাহিত করতে মুসলিমদের আর্থিক ভাবে বয়কট করার নির্দেশ সম্বলিত প্রচার পত্রও বিলি করা হয়েছে। আসলে এই ঘৃণ্য কার্যকলাপগুলি ধারাবাহিক ভাবে করার মধ্য দিয়ে বি জে পি ও তার দুষ্ট দোসরেরা সামাজিক পরিমণ্ডলকে সংখ্যালঘু মুসলীম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী চিন্তাভাবনার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়ে ছিল। এই সীমাহীন ঘৃণার কাজে লিপ্ত ঐ কুচক্রীদের বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারী মোকদ্দমা না করে গুজরাট পুলিশ নিজেকেই অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

বর্তমান কিছু মন্ত্রী ও এম.এল. এ-র সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের বিধানসভা এলাকা এই ব্যাপক গণহত্যার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। আমেদাবাদে বাপুনগর এবং পালাত সেই রকম দুটি বিধ্বস্ত এলাকা। বাপুনগর থেকে নির্বাচিত হয়ে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী হয়েছিল গোরধন জাদাফিয়া এবং পালাত থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ভূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান রাজস্বমন্ত্রী হলেন পাণ্ডা। মেহেসেনা জেলা থেকে নির্বাচিত দুই মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র পূর্ণ মন্ত্রী নিতীন প্যাটেল এবং অপর এক ক্যাবিটে মন্ত্রী নরভ লালু প্যাটেল

মহিলাদের উপর যৌন নির্যতন সহ সমস্ত রকম অপরাধমূলক কুকর্মে প্রকাশ্যে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী এলাকার মানুষও এই রকম ভয়াভয় পৈশাচিকতা এর আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে গুজব চিরকালই অক্সিজেনের কাজ করে। গুজরাটের প্রশাসন দাঙ্গা দমনে গুজব প্রতিহত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সমস্ত আইন কানুন ও সংবিধানের তোয়াক্কা না করে ৩১ মার্চ পর্যন্ত ত্রিশূল, তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র বিতরণ করে দাঙ্গার রসদ যোগান হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে। সংগঠিত গণহত্যার পরে অর্থাৎ এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রশাসন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ত্র উদ্ধার শুরু করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক জয়দীপ প্যাটেল জন সমক্ষে বলেছেন, "ত্রিশূল ও তলোয়ার আমরা ১৯৮৫ সাল থেকেই বিতরণ করছি। কেউ এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি এমন কি পুলিশও না।"

দাঙ্গায় আক্রান্ত সর্বশান্ত মানুষেরা দাঙ্গা-কারীদের চিহ্নিত করে F.I.R করতে চাইলেও পুলিশ তা গ্রহণ করছে না উল্টে অভিযোগকারীদের ভয় দেখিয়ে নিরস্ত্র করতে চাইছে।

গুজরাটে বি জে পি এবং পুলিশ

১৯৯৮ সালে কেশুভাই প্যাটেল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পরিকল্পিত ভাবে মুসলিম নিধনের কার্যক্রম চালু হয়। রাজ্যের ১৪১ জন I.P.S অফিসারের মধ্যে মাত্র ৮জন মুসলিম, যাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা থেকে বেপরোয়া ভাবে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সরকারের এই অসাংবিধানিক কাজের ফলে '৯২, '৯৩ ব্যাচে পাশ করা নবীন মুসলিম I.P.S-রা তাদের প্রশাসনিক কার্য-নির্বাহী দক্ষতা পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ভারতবর্ষে গুজরাটই একমাত্র রাজ্য যেখানে কোন মুসলিম I.P.S অফিসার কখনোই Dy. S.P. পদে নিয়োজিত হয়নি।

১৯৯৯ সালে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেন ত্রিবেদী এক পুলিশী অনুষ্ঠানে জন সমক্ষে বলেছেন যে, "নীতি নির্ধারক কোনো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আমরা মুসলিমদের চাই না। সমগ্র গুজরাটে ডেপুটি পুলিশ সুপার ও ইন্‌সপেক্টর পর্য্যায়ের ৬৫ জন মুসলিম ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন যিনি কোনো এক মন্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠ তাকে বাদে বাকি ৬৪ জনকেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন বিভিন্ন জায়গায়।

গুজরাট পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পঞ্চায়েত সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড এবং গ্রাম সেবা সমিতি– এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা সরকারি নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্ত। সেখানে একজনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নেই। সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরেও একজনও সংখ্যালঘু কর্মী নেই।

প্রকাশ্য প্রভেদের কিছু দৃষ্টান্ত

১৯৯৯-এর শেষে রাজকোটে যখন জনৈক প্যাটেল নিহত হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী সরজেমিনে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পর একটি ঘটনায় ৮-১০ জন মুসলিম নিহত হলেও কোনো মন্ত্রী সেখানে যায়নি।

স্থানান্তর এবং শাস্তিমূলক বদলি গুজরাটে খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ৫ জন V.H.P (বিশ্ব হিন্দু পরিষদ) কর্মীকে গ্রেপ্তার করার অপরাধে পুলিশের ডেপুটি সুপার পারমারকে রাতারাতি বদলি করা হয়। ভালোকে শাস্তি দেওয়া ও অপরাধীকে পুরস্কৃত করাই মোদী সরকারের নীতি।

কিছু কিছু সৎ পুলিশ অফিসার উচ্চ-পদস্থ নেতা-মন্ত্রী ও তাদের অনুগত আমলাদের অনৈতিক নির্দেশ অমান্য করে আইনের শাসনকে বলবৎ রাখার চেষ্টা করেছেন। এটা যেন তাদের অপরাধ। এই ধরনের সৎ পুলিশ অফিসারদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

গুজরাটের চারদিক যখন হিংসার আগুনে জ্বলছে সেই রকম মুহূর্তে কচ্ছ অঞ্চলে স্বাভাবিক ছিল S.P. বিবেক শ্রীবাস্তবের সক্রিয় তৎপরতায়। তার নির্দেশেই নাকতারান তালুকার V.H.P সভাপতি বসন্ত প্যাটেল ও হোমগার্ড কম্যানড্যান্ট অক্ষয় থাক্কার কে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ হোমগার্ড কম্যানড্যান্টের সরকারি পোশাকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ব্যাচ লাগান ছিল এবং সে খুনে বাহিনীকে সাহায্য করছিল কিছু সংখ্যালঘু মানুষকে একটি দরগায় আটকে রাখতে। ওদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী অনেক মন্ত্রী এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকেও শ্রীবাস্তবের উপর ফোনে বহুবার চাপ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু কোনো চাপের কাছে নতী স্বীকার না করে শ্রীবাস্ত স্পষ্ট জানিয়েছেন, "আমি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে একজন দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের যা যা করণীয় আমি তা করেছি এবং করব।" এই সৎ অফিসারকেও শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছিল।

এই ব্যাপক বদলির পেছনে মোদী সরকারের অন্য দুটি উদ্দেশ্যও ছিল।

(i) যদি নির্বাচন হয় তবে তার আগেই নিজের পছন্দমতো পুলিশ অফিসারদের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রভাব সৃষ্টি করা যায়।

(ii) রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলেও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ যাতে গেরুয়া বাহিনীর হাতেই থাকে।

ভাবনগরের পুলিশ সুপার রাহুল শর্মা দায়িত্ব নেওয়ার ২৫ দিনর মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। গেরুয়া বাহিনী যখন একটি 'মাদ্রাসা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করছে তখন গুলি চালিয়ে নেতৃত্ব দানকারী সকলকে জেলে ঢুকিয়ে সেই প্রক্রিয়া তিনি বানচাল করে দেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে প্রায় চারশো জন ছাত্র-ছাত্রী প্রাণে বেঁচে যায়। ১ মার্চ

রাহুল শর্মা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শিবসেনার অবাঞ্ছিত ও উত্তেজক পদযাত্রা আটকে দেয় এবং শিবসেনা নেতা এস. এস. ভাটকে উত্তেজক বক্তব্য রাখার অপরাধে গ্রেপ্তার করে। বিজেপির স্থানীয় বিধায়ক সুনীল ওঝা তাকে এই সৎ প্রচেষ্টার জন্য শাসিয়েছে এবং শর্মাকে অকর্মণ্য প্রমাণ করার জন্য নতুন করে পরিকল্পিত দাঙ্গা তৈরি করেছে। সঠিক দায়িত্ব পালনের অপরাধে তাকেও স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকার পুলিশ বিভাগকে সু-পরিকল্পিত ভাবে অপব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক করায়ত্ব করেছে উগ্র-হিন্দ মৌলবাদী রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে। গত পাঁচ বছর ১২০০০ হিন্দু পরিষদ ক্যাডারকে হোমগার্ডে ঢোকান হয়েছে। ২৫টি জেলার হোমগার্ড প্রধানদের মধ্যে দুই একজন বাদে সকলেই হিন্দু পরিষদ বা বজরং দলের সক্রিয় সদস্য। এই ভাবে ক্রমাগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে হোমগার্ড বাহনীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এনে গণহত্যায় সহায়ক শক্তি হিসেব কাজে লাগিয়েছে।

গ্রামীণ গুজরাটে অপরাধ নথীভুক্ত করণের সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কতগুলি প্রচলন ছিল–

(i) দেশ বিভাগের সময় তার বাসস্থান কোথা ছিল?

(ii) তিনি কি গান্ধীবাদী হিসেবে পরিচিত?

(iii) পাকিস্তানের প্রতি তার মনোভাব কি?

সংখ্যালঘু মুসলিমদের নিরাপত্তাহীনতা এমন স্তরে পৌছেছিল যে মুসলিম পুলিশ অফিসারেরাও তাদের পোশাকে নাম ব্যবহার করতে ভয় পেত এবং নাম লেখা ব্যাচ যাতে পরতে না হয় তার জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে বাধ্য হয়েছে।

গুজরাটে বিজেপি ক্ষমতায় বসার শুরু থেকেই পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল পদগুলিতে অতি সুচারু ভাবে গেরুয়া রাজনীতিকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সখ্যালঘু নিধন যজ্ঞের অন্যতম পাণ্ডা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ডার নির্দেশে পুলিশ কমিশনার ও পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলকে সম্পূর্ণ অন্ধকার রেখে সম্পূর্ণ অ-গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমেদাবাদ ও ভাদেরার পুলিশের ইন্সপেক্টর ও সাব-ইনসপেক্টরদের বিভিন্ন জায়গায় স্থান্তারিত করা হয় সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থে।

পুলিশের গুলিতে নাবালক মৃত

ভদোদরা ঃ দুধাইয়া গ্রামের ১১ বছরের বালিকা পুলিশের গুলিতে মাথায় আঘাত পেয়ে এস.এস.জি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিষাণবাদী গ্রামের ১৪ বছরের এক বালক তার বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে। হালোলের একটি

একতলা বাড়ির বারান্দার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা গুলিতে ২.৫ বছরের এক শিশু মারাত্মক জখম হয়।

পুলিশের মুখ্য আধিকারিক বেপাত্তা যখন গুজরাট জ্বলছে।

রাজকোট ঃ গৈরিক বাহিনী রাজকোটে যখন পৈশাচিক নৃত্য করছে এবং ১৭ বছর পর সেখানে প্রথম কার্ফু জারী করা হয়েছে সেই সময় মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ করে পুলিশ কমিশনার উপেন্দ্র সিং বেপাত্তা হয়ে যান। কোথাও তার টিকি পাওয়া যায়নি। চরম মুহূর্তে তার অনুপস্থিতি পুলিশের অপদার্থতাকে আরো বাড়িয়ে তোলে এবং সেই সুযোগে নির্দিষ্ট লক্ষের প্রতি আক্রমণের ধার বেড়ে যায় খুনে গৈরিক বাহিনীর।

আমরা যখন আক্রান্ত, পুলিশ তখন স্বাক্ষী গোপাল

ভাদোদরা ঃ মেমন কলোনীর এক বাসিন্দা বলেছেন তারা চারিদিকে পুলিশের ভ্যানে আবৃত থাকা অবস্থায় খুনে বাহিনী অনবরত তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ছে কিন্তু পুলিশ ঐ পাথর ছোঁড়া বন্ধ করতে কোনোরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি উল্টে আমরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারি তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়েছে ঐ খুনে বাহিনীকে।

সুরাটে অভিযুক্ত র‍্যাফ

সুরাট ঃ র‍্যাপিড অ্যাকসন ফোর্সের জওয়ানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মৌলবী সহ মহিলাদের সাথে কুরুচীকর ব্যবহার ও মারধোর করেছেন। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শহরতলী অঞ্চলের বসিন্দারা যে দিন রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ন এবং সোনিয়া গান্ধীর কাছে গেরুয়া বাহিনীর তাণ্ডব থেকে রক্ষা করার আবেদন জানান ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ৩ মার্চ তারা আরো শতগুণ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী মহল্লার সমস্ত অধিবাসীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী নিরাপদ স্থানে যাওয়ার আগেই বেশ কয়েকজনকে খুন করা হয়েছিল। দাঙ্গার আগুনে স্ত্রীকে হারানো ইরফান আলি শেখের বক্তব্য অনুযায়ী নারী এবং শিশুরা ছিল বিশেষভাবে আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু। গলায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের খুন করা হয়েছে। খুনের প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে ধ্বজাধারী পুলিশ স্বজন হারানো মানুষগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করেছে যাতে শবদেহগুলি অতি দ্রুত কবর দেওয়া হয়।

আমেদাবাদ ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সুপরিচিত সমাজ সেবক এবং পিপিলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লির্বাটিজ'-এর সহঃ সভাপতি জে. এস বন্দুকওয়ালা বরোদার সামা অঞ্চলে তার নিজের বাড়িতে আক্রান্ত হন। বেশ কয়েকবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। এর আগেও বন্দুকওয়ালা কয়েকবার আক্রান্ত হয়েছেন।

সবরকস্থ ঃ সবরকস্থের ১৩৭ জন অধিবাসী গুজরাট হাইকোর্ট তাদের বক্তব্য পেশের সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানায়। তাদের বক্তব্য পুলিশ তাদের কোনো ব্যক্তিগত F.I.R গ্রহণ করেনি। সবরকস্থের পুলিশী ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক চলেছে লোকসভা থেকে গান্ধীনগরের পুলিশ ভবন পর্যন্ত। সবরকস্থ জেলার পুলিশের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়নি এবং প্রত্যেক গেরুয়া ধ্বজাধারী ঘাতকের বিরুদ্ধে F.I.R না করার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

একজন সংখ্যালঘু M.L.A যেই সময় বিধানসভার অধিবেশনে গুজরাটের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আলোচনা করছেন, পুলিশ তার নামে F.I.R করে অভিযোগ করেছে যে ঠিক সেই সময় তিনি হিন্দুদের উপর আক্রমণের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্ররোচনামূলক কাজ করেছেন। এই হাস্যকর ঘটনা সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে শাসক বিজেপি দল ও পুলিশের যৌথ ষড়যন্ত্রের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

ভাষান্তর ঃ দেবাশিস চক্রবর্তী

বিবেকের কাছে আর্জি

মার্চ এপ্রিল ২০০২

(লখনৌয়ের ডি আই জি-ভারতীয় পুলিশ সেবার (IPS) প্রধান আধিকারিক বিভূতি নারায়ণ রাই মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে সমস্ত ভারতীয় পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের কাছে তাঁর লেখা চিঠির বয়ানটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। তিনি কিছু সমর্থনসূচক সাড়া পেয়েছেন কিন্তু পুলিশবাহিনীর মধ্যে বিবেকবোধের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জনস্বার্থে এই চিঠিটিকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন।)

প্রিয় সহকর্মী,

একজন ভারতীয় পুলিশ সেবা আধিকারিক হিসাবে এবং গভীর যন্ত্রণাবোধ নিয়ে এক কঠিন সময়ে আমি আপনাদের কাছে লিখছি। গুজরাটে সাম্প্রদায়িক ধ্বংসাবলী-সংক্রান্ত ঘটনাবলী দেশের কাছে বিরাট উদ্বেগের বিষয় এবং আমাদের মতো ভারতীয় পুলিশ সেবা (IPS) আধিকারিকদের গভীর অনুধাবনের জন্য এই ঘটনাবলী উজ্জীবিত করে। গোধরায় ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যালীলা এই ব্যাপারে ছিল একটি পূর্ব সতর্কীকরণ যে, রাজ্যজুড়ে পরদিন সাম্প্রদায়িক ধ্বংসের বড় ঘটনাবলী ঘটতে পারত এবং দক্ষ্য পুলিশ বাহিনীর কাছে এটাও আশার ছিল যে, সমস্ত ধরনের হিংসা ও প্রতিহিসার এ বিরোধিতায় যতটুকু শক্তি ছিল তা দিয়েই মোকাবিলা করবে। পরবর্তী কয়েকদিনের হিংসাদমনে পুলিশ যে শুধু ব্যর্থ ছিল তাই নয়, বহু ক্ষেত্রে এটা মনে হয়েছিল যে, পুলিশের লোকেরা বহু জায়গায় দাঙ্গাবাজদের সক্রিয়ভাবে উৎসাহ জুগিয়ে গেছে। পুলিশের এই ব্যর্থতাকে শুধু নিম্ন

পদাধিকারিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াউচিত নয় বরং এটিকে নেতৃত্বের ব্যর্থতা ভারতীয় পুলিশ সেবাবাহিনীর (IPS) ব্যর্থতা– বলে দেখা উচিত।

গোধরায় পাশবিক ঘটনার পর যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তা আমার মতো একটি লোককে বিস্ময়াপন্ন করেনি কেন না আমি কেবল একজন পুলিশ অফিসারই নই, সমাজ-আচরণের এক উৎসাহী ছাত্রও বটে। রাজধানী আমেদাবাদ থেকে গ্রামীণ এলাকা পর্যন্ত সর্বত্র সেই একই পুরানো কাহিনী বারবার ঘটে আসছিল। ১৯৬০ থেকে প্রায় সব দাঙ্গায় একই ছবি একই রঙে রাঙানো হয়েছে– সে ছবি হল সম্বলহীন এবং প্রায়শই কার্যত–অকার্যকর পুলিশ বাহিনী যারা দুর্দশাগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজেদের উপস্থিতিতে লুট হতে ও খুন হতে সাহায্য করেছিল এবং এই পুলিশেরাই তাদের সদস্যদের কয়েকজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার নীরব সাক্ষী রয়ে গিয়েছিল।

একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে, আধিকারিক হিসাবে যাই উদ্বেগ থাকুক না কেন, পুলিশ বাহিনীর পেশাদার চরিত্র বজায় থাকবে কিনা এ বিষয়ে উদ্বেগ ছিল সবচেয়ে বেশি। এক অসংবেদনশীল মুখ্যমন্ত্রী তার অযোগ্য পুলিশ বাহিনীর পিঠ চাপড়াতে পারে এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ নেতৃত্ব পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমালোচনার জন্য 'বিপথচালিত সংবাদমাধ্যম' ও 'জাতীয়তা বিরোধী সংখ্যালঘুদের দোষ দিতে পারে কিন্তু এটাই সত্যি যে, প্রতিটি দাঙ্গার পর পুলিশকে নিয়ে একই সমালোচনা হয় তা হল সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় তারা শুধু ব্যর্থ নয়, তারা হিন্দু দাঙ্গাবাজদের পক্ষে ছিল এব তাদেরকে উৎসাহও দিয়েছিল। সাম্প্রতিক দাঙ্গার পরও গুজরাট পুলিশের বিরুদ্ধে একই সমালোচনা তোলা হচ্ছে।

গুজরাটে যা ঘটেছে তা কিছু নতুন নয়। এই ঘটনা আরও একবার দিক নির্দেশ করছে যে পুলিশের উচ্চ নেতৃত্বকে বসতে হবে এবং ভাবতে হবে কেন তাদের অযোগ্যতা, অক্ষমতা এবং অপরাধমূলক তাচ্ছিল্য নিয়ে একই কাহিনী বারবার তোলা হবে। যতক্ষণ না আমরা এটা মানছি যে, আমাদের নিজেদের বাড়িতে সবকিছু টিকঠাক নেই ততক্ষণ কিছুই ঠিক হবে না।

প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধিতা শুরু হয় পুলিশের উদ্যোগে। এটি নানা পর্যায়ে শুরু হয়। হিংসা ঘটার আগে তথ্য সংগ্রহ, উত্তেজনা বৃদ্ধির সময়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ, হিংসা দমনে শক্তি প্রয়োগ এবং শান্তি ফিরে আসার পর অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা শুরু করা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলায় পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার কয়েকটি হল এগুলি। কিন্তু আমরা যদি সাম্প্রদায়িক ঝোঁকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই, এই ব্যবস্থাগুলির কোনটিই কার্যকরী হবে না।

একজন সাধারণ (average) পুলিশ কর্মীর কাছে তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ থাকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে খবর জোগাড় করার মধ্যে। তাকে

বোঝানো সহজ নয় যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপও জাতীয়তাবিরোধী হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং সেজন্য তাদের কার্যকলাপের ওপরও নজর রাখা জরুরী। এটি একটি ঘটনা যে, সাম্প্রদায়িক হিন্দু সংগঠনের কার্যকলাপ নিয়ে কোনো রসদ নেই এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ে পুলিশ রেকর্ডে প্রায় কিছুই নেই।

একইভাবে, প্রতিরোধমূলক গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যাদের যদিও দাঙ্গা পরিস্থিতিতে মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ। এমনকি যেক্ষেত্রে মুসলিমরা আক্রান্ত এবং পুলিশ গুলি চালনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাদের লক্ষ্য বিন্দু হচ্ছে মুসলিমরা। এই একই ঝোঁক কাজ করেছে বাড়ি তল্লাশী ও ধরপাকড়ের ক্ষেত্রে।

গুজরাটে যা ঘটেছে তা শুধু উপরোক্ত ঘটনাবলীর পূর্ণসংঘটনই ছিল না, যা ঘটেছিল তার মাত্রা ছিল অভূতপূর্ব এবং হিংসা ও ধ্বংসের ব্যাপকতা ছিল তুলনাহীন ও একতরফা। অন্য যে প্রভেদটি এই ছিল যে, এই প্রথম পুলিশের অক্ষমতা, চোখ বুঁজে প্রশ্রয় দেওয়া এবং বিশেষ প্রবণতা প্রত্যেক ভারতীয়ের (এমনকি বিদেশী) দূরদর্শনের পর্দায় দেখানো হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের তথাকথিত অতিরঞ্জনের যে কথা বলা হচ্ছিল তা এখন ডুমুরের ফুলের মতো হারিয়ে গিয়েছে।

এটি এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, বিভিন্ন সময়ে যখন নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে দক্ষ পেশাদারিত্ব ও সাম্প্রদায়িক প্রবণতা মুক্ত হয়ে, একই পুলিশবাহিনী সমাজের বিভিন্ন বিভাগের আস্থা অর্জন করেছে এবং নিজেদের কাছে তাদের সংগঠনটি হয়ে উঠেছে গর্বের। পুরানো প্রবাদটি মনে করিয়ে দেয়, সেনাপ্রধানরা ব্যর্থ হয়, সেনারা নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ কার্যকরভাবে দমন করার অক্ষমতার জন্য প্রায় আধিকারিকরা তাদের দলের নিচের পদাধিকারিদের উপর দোষ চাপিয়ে দেয়। কিন্তু সম্প্রতিক গুজরাটের ঘটনায় আমরা দেখেছি যে ব্যর্থতার মাঝে কিছু সফল কাহিনীও আছে যেখানে দায়িত্বশীল আই পি এস আধিকারিকেরা সম্মুখভাগে তাঁদের লোকেদের নিয়ে গিয়েছিল এবং নিশ্চিত করেছেন যে তাঁদের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় কোনো জীবন ও সম্পত্তি হানি হয়নি।

এটি খুব দুঃখজনক ঘটনা যে, যেসব পুলিশ আধিকারিকরা কেবল দাঙ্গা পরিস্থিতি দমনে ব্যর্থ হয়েছেন তাই নয়, যাঁরা কার্যতঃ দাঙ্গায় সরাসরি সাহায্য করেছেন তাঁদের শাস্তি দেওয়ার একটি উদাহরণও নেই। ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গা যা ঘটেছিল সর্বোৎকৃষ্ট পুলিশ-বেষ্টিত নগরীর একটি রাজধানী দিল্লিতে। পুলিশ যদি সক্রিয়ভাবে চোখ বন্ধ না করে থাকত বা প্রশ্রয় না দিত তাহলে হাজার হাজার শিখ হত্যা ঘটতে পারত না। সংবাদমাধ্যম ও বেশ কিছু তদন্তকারী কমিশনের দ্বারা অভিযুক্ত হলেও শ্রী পদ্মা রোশার মতো বিশিষ্ট আই পি এস আধিকারিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং তাদের চাকুরী জীবনও কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ম্যাডন (Madon) কমিশন ও শ্রীকৃষ্ণ কমিশনও একই ফলাফলে দুষ্ট।

এটি খুব স্পষ্ট যে, কোনো বাইরের সংস্থা আমাদের পরিমার্জিত করতে পারে না। এই কাজ আমাদের নিজেদেরকে করতে হবে। আমরা যে কাজের সঙ্গে যুক্ত যার একটা গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে এবং দেশের মধ্যে মহান মর্যাদা লাভ করেছে– এই রকম একটি সেবামূলক কাজে যদি আমাদের গর্ববোধ থাকে, তাহলে সময় এসেছে সঠিক আন্তরিকতায় এই কাজ সম্পাদন করা। কেন্দ্রীয় আই পি এস এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা যেন অমরা ডাকি এবং সরকারের কাছে দাবী জানাই যে, গুজরাটের আধিকারিকরা যারা আইন শৃঙ্খলার মতো প্রাথমিক কর্তব্য পালনে এবং উন্মত্ততা দমনে ব্যর্থ তাঁদের বিরুদ্ধে এবং ১৯৮৪ সাল থেকে অনুরূপ পরিস্থিতিতে ব্যর্থ পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমরা যেন আমাদের সমিতিকে একটি ট্রেড ইউনিয়ন মনে না করি যারা অধিক বেতন ও উন্নত চাকুরীর-শর্তাবলী নিয়ে আন্দোলন করে। আমরা যেন আমাদের পরিষেবাকে একটি মাধ্যম (medium) বলে মনে করি এবং একে উন্নত করার চেষ্টা করি। যদি সরকার কোনো ব্যবস্থা না নেয়, ন্যূনতম যে কাজটি আমরা করতে পারি তা হল সমিতির সদস্যপদ থেকে এরূপ আধিকারিকদের অপসারণ করা।

আশা রাখি, আপনাদের অনেকের কাছ থেকে শীঘ্রই কিছু জানতে পারব।

বিভূতিনারায়ণ রাই, আই পি এস (উই পি.আর. আর. ৩ ১৯৭৫)

("উজানে" ম্যাগাজিনে "কম্যুনালিজম কমব্যাট" মার্চ-এপ্রিল ২০০২ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত)

দুর্বৃত্ত পুলিশের সাজা হোক

কম্যুনালিজম কমব্যাট

সর্বভারতীয় সরকারি চাকরির (শৃঙ্খলা ও আবেদন) নিয়মাবলী, ১৯৬৯, পর্ব– ৩ 'শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিধানকারী কর্তৃপক্ষ' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে, সেই সব আই.এ.এস এবং আই.পি.এস আধিকারিকদের বরখাস্ত করা সম্ভব যারা অনুশাসন ৬-এ উল্লিখিত বাধ্যতামূলক দণ্ডবিধি যথাযথ প্রয়োগ না করে এড়িয়ে গেছেন।

১৯৯৫ সাল থেকে 'কমিউনালিজম কমব্যাট' পত্রিকটি সামান্য আরক্ষী থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় আরক্ষাবাহিনীর সমস্ত স্তরে যুক্ত কর্মীদের একপেশে মনোভাব নিয়ে জাতীয় বিতর্কের সূচনা করে। অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করে উক্ত প্রবণতাটি চেনা সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সরকারের তৈরি বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটিগুলি পক্ষপাতিত্বের জন্য পুলিশকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে। ভারতীয় সংবিধানে নির্দেশিত আইন পালনে অক্ষম পুলিশ অধিকর্তাদের নিষ্ক্রিয়তা স্বাধীনোত্তর ভারতে বেশ কয়েকটি ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে (বিশেষ উল্লেখনীয়,

দিল্লী ১৯৮৪, ভাগলপুর ১৯৮৭, মিরাট– মালিয়ানা ১৯৮৯, অযোধ্যা ১৯৯২, সুরাট ১৯৯২, মুম্বাই ১৯৯২-১৯৯৩)।

সাংবিধানিক সাম্যনীতির ধ্বজাধারী, পক্ষপাতহীন, পরিচ্ছন্ন পেশাদারী আই.এ.এস. এবং আই.পি.এস. অধিকারিকদের উদ্দেশ্যে সি.সি-র বিভিন্ন পাতায় অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন আই.পি.এস অফিসার কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংকেত দিয়েছেন।

* জেলাশাসক বা শহরের প্রধান রাজস্ব আদায়কারী সর্বোচ্চ শাসক যদি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারেন তাহলে তাকে সরাসরি অভিযুক্ত করা হবে। বড় রকমের বিপর্যয় হলে সর্বোচ্চ শাসক নারী বা পুরুষ যিনিই থাকুন না কেন তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হবেন।

* উর্দি পরা পুলিশ কর্মীরা বিশেষত উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা যদি দায়িত্ব কর্তব্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন তাহলে তাদের উদ্দেশ্যে আইন সম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং অবিলম্বে শাস্তি প্রদান করা হবে।

* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরেও যারা বেঁচে থাকবেন তাদের সরকার যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেবেন। কেন না এই সব অসহায় মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি, সম্মান রক্ষায় তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। সম্পত্তিহানির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে দুর্গত ব্যক্তি পুরোপুরি নিরুদবেগ হন।

১৯৯৫ সালে সি.সি কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিভূতিনারায়ণ রাই, তৎকালীন সীমান্ত সুরক্ষাবাহিনীর ডি.আই.জি. উচ্চ পদস্থ পুলিশ অধিকর্তা বলেন, 'সরকারের সায় না থাকলে কোনো দাঙ্গাই চব্বিশ ঘন্টার বেশি স্থায়ী হতে পারে না।' তখন থেকেই রাইয়ের বলিষ্ঠ উচ্চারণ জাতীয় বিতর্কে উত্থাপিত হয়ে আসছে বারবার।

গুজরাট পুলিশের শিহরণ জাগানো ভয়ঙ্কর আচরণের বিরুদ্ধে একাধিক পরিস্থিতিতে আইন মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা বারবার অনুভূত হয়েছে। এ শুধু ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারিতেই নয়, ১৯৯৮ সালে যখন বি.জে.পি গুজরাটে ক্ষমতায় আসে তখন থেকেই।

বর্তমানে কর্মরত একজন আই.এ.এস আধিকারিক– সর্বভারতীয় সরকারি চাকরির (শৃঙ্খলা ও আবেদন) নিয়মাবলী, ১৯৬৯, পর্ব-৩- 'শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধানকারী কর্তৃপক্ষ' শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে, সেই সব আই.এ.সে এবং আই.পি.এস আধিকারিকদের বরখাস্ত করা সম্ভব যারা অনুশাসন ৬-এ উল্লিখিত বাধ্যতামূলক দণ্ডবিধি যথাযথ প্রয়োগ না করে এড়িয়ে গেছেন– এই বিষয়টির প্রতি সি.স-র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড (সি.আর.পি.সি.)-র ১০৭ থেকে ১১০ অধ্যায় এবং ১৪৩ থেকে ১৫২ অধ্যায় স্মরণ করিয়েছে, শান্তি ভঙ্গকারীদের বাধা দেওয়ার জন্য ও

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করার কাজে যারা বাধা দেবে তাদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা জেলা শাসক ও উচ্চপদস্থ পুলিশ অধিকর্তাদের দেওয়া হয়েছে যা একই সঙ্গে তাদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হচ্ছে।

* যে সকল ব্যক্তি দ্বারা শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভবনা তাদের কাছ থেকে নিরাপত্তা সহযোগে অথবা ব্যতিরেকে লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করা (অধ্যায় ১০৭)।

* যে সমস্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও উত্তেজনা ছড়ায় বা ছড়াতে সাহায্য করে তাদের কাছ থেকে সুস্থ আচরণ লাভের উদ্দেশ্যে অর্থের বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি পত্র আদায় করা (অধ্যায় ১০৮);

* সন্দিগ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে সৎ ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি হিসাবে অর্থ জামিন রাখা (অধ্যায় ১০৯);

* দুষ্কর্ম করা যাদের স্বভাব তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি হিসাবে অর্থ জামিন রাখা (অধ্যায় ১১০);

* সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বে-আইনি কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি অথবা ক্রমাগত সেগুলির হয়ে যাওয়াকে রোধ করা (অধ্যায় ১৪৩);

* সমাজে বিপদের সম্ভাবনা আছে এমন ক্ষেত্রে অথবা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপের স্থলে বিশেষ নির্দেশ জারি করা (অধ্যায় ১৪৪);

* ওয়ারেন্ট ছাড়াই গ্রেফতার করা (অধ্যায় ১৪৫-১৪৮);

* বিচারালয়ের দৃষ্টিতে আইন লঙ্ঘণকারী সমস্ত কাজকর্মকে অবিলম্বে বন্ধ করা (অধ্যায় ১৪৯);

* কী উপায়ে আইন বিরোধী কার্যকলাপকে দমন করা হবে সেই পরিকল্পনা বিষয়ে অব্যবহিত উপরওয়ালাকে জানানো (অধ্যায় ১৫০);

* আইন বিরোধী কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনে গ্রেফতার করা (অধ্যায় ১৫১);

* সর্বসাধারণের ভোগ্য সম্পত্তিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা (অধ্যায় ১৫২)।

যদি উপরোক্ত সি.আর.পি.সি-র বিভিন্ন ধারাতে আইনি সুরক্ষার জন্য জেলাশাসক ও পুলিশকর্তাদের প্রদেয় ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাহলে সর্বভারতীয় চাকরির নিয়মাবলী ১৯৬৯ এ দোষী আই.এ.এস. এব আই.পি.এস. আধিকারিকদের শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে।

সর্বভারতীয় চাকরির (শৃঙ্খলা ও আবেদন) নিয়মাবলী, ১৯৬৯, পর্ব-৩ 'শাস্তি ও শাস্তি বিধানকারী কর্তৃপক্ষ ৬. শাস্তি :

(১) জোরালো এবং যথেষ্ট কারণ থাকলে নিম্নলিখিত শাস্তিগুলি চাকরিরত যে কোনো আরক্ষাবাহিনীর সদস্যের ওপরে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন :

(vii) বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ : যদি কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনা নিশ্চিতরূপে কোনো সদস্যকে অভিযুক্ত করে তাহলে শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সর্বভারতীয় চাকরির নিয়মবিধি ১৯৫৮ ক ও খ অনুসারে প্রদেয় অবসর গ্রহণকালীন সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে হ্রাস করার নির্দেশ দিতে পারেন যাতে অভিযুক্ত সদস্য ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা কোন ভাবে দুই তৃতীয়াংশের কম না পান।

(viii) চাকরি থেকে অপসারণ : চাকরি থেকে অপসৃত ব্যক্তি যদি পরবর্তীকলে পুনরায় কোনো সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন তাহলে এই অপসারণ নতুন কর্মগ্রহণ কালে অযোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে না।

(ix) চাকির থেকে বিতাড়ন : চাকরি থেকে বিতাড়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় সরকারি চাকরি গ্রহণের ক্ষেত্রটি বাধাগ্রস্ত হবে।

৭. আইনানুগবিধান প্রবর্তনকারী এবং শাস্তিবিধানকারী কর্তৃপক্ষ :

নিয়মাবলী ৭(১)ক এবং ৭(১)খ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে অভিযুক্ত সদস্যটির চাকরিস্থল অনুযায়ী রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষ নিয়মাবলী ৬ নম্বর ধারা মতে পুরুষ অথবা মহিলা পুলিশকর্মীর প্রতি আইন মান্য না করার জন্য শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

৭(২) চাকরি থেকে বিতাড়ণ, অপসারণ অথবা বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ ধরনের শাস্তি কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত বিশেষ আদেশনামা ব্যতিত জারি করা যাবে না।

৭(৩) শাস্তি যোগ্য ব্যক্তিকে ৬ নম্বর ধারা মতে শাস্তি বলবৎ করার পূর্বে তিনি যে সরকারের কর্মী তার সঙ্গে আলোচনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দোষী ব্যক্তি যদি 'জয়েন্ট ক্যাডার'ভুক্ত হন তাহলে শাস্তি প্রদানকারী সরকার 'জয়েন্ট ক্যাডার' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করবেন।

যদি শাস্তিদানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার ও কোনো রাজ্য সরকার অথবা দুটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার কোনো কমিশনের সঙ্গে আলোচনার পর প্রকাশ করবেন।

গুজরাটের ক্ষেত্রে দেখা গেছে রাজ্য এব কেন্দ্রে থাকা বি.জে.পি সরকার, উপরোক্ত শাস্তিসমূহ দানে যে সব আই.এ.এস.এবং আই.পি.এস. আধিকারিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছেন বা এমন কোনো কর্মে লিপ্ত হয়েছেন যার জন্য ৬ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা যায়, তাদের প্রতি যথাযথ শাস্তি প্রদানে উদাসীন থেকেছেন।

অবশ্য জাতিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরে জীবিত / ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তির অথবা মানবিক চেতনা সম্পন্ন কোনো নাগরিকের সংবিধান অনুযায়ী আদালতের কাছে সুবিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

পরিসংখ্যান :

সি.সি.-র তৈরি ফেব্রুয়ারি ২৮ ও মার্চ ১, ২০০২ তারিখে পুলিশের গুলিতে নিহত ব্যক্তিদের তালিকা–

১. আকবর খান মাকরানি
২. জাহিরুদ্দিন নাসিরুদ্দিন আনসারি
৩. মহম্মদ ইদ্রিস মহঃ ইসমাইল
৪. তহ্কির আহমেদ মুনির আহ্মেদ
৫. জামিল মিঞা ও কিফাইয়াতু মিঞা মিস্ত্রী
৬. কাদ্রি কানালুদ্দিন আহ্মেদ আলি
৭. নূরবান্ মহঃ হাকিম আনসারি
৮. আব্দুল রেহ্মান আব্দুল রাজ্জাক শেখ
৯. হাদি ভাই, পিতা-গুলাম রসুল আব্দুল ভাই
১০. আন্সারি মহিউদ্দিন জমাদার
১১. সুলাতনভাই আজিজভাই মালেক
১২. আন্সারি ইলিয়াস্ভাই জুমেরাতি
১৩. সাবির হুসেন্ ফতেহ্সাদ
১৪. হানিফ ভাই আলি বক্স রেলওয়েওয়ালা
১৫. মহঃ হুসেন্ আল্লারাখা শেখ
১৬. আব্দুল করিম মেহবুব্ মিঞা পাঠান
১৭. জাকির হুসেন্ মেহমুদ হুসেন্ আরিয়ান
১৮. ইলিয়াস্ আহ্মেদ জুমরতি
১৯. মহঃ ঈশাক্ আব্দুল আজিজ্
২০. মহঃ মুবিন আলি
২১. শামির আহ্মেদ ইক্বাল আহ্মেদ আরিয়ান
২২. জুমাদিন ম জাকিরা
২৩. মাহ্মুদ হানিফ মাহ্মুদ শেখ

২৪. গুলাম রসুল গুলাম নবি (বয়স-২২, ৪০৮ নুরনগর রাখিয়াল মাথায় গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু)

২৫. ফ্রোহাদ আলি হায়াদর আলি

২৬. গব্বরভাই (ওয়াহিদ), (বয়ন-২৫, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী)

২৭. ইন্তিয়াক খান্ নিজামুদ্দিন খান্ (বয়স-২৪, মুরারজি চক, বাপুনগর, মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু)

২৮. পারভেজ ভাই গুলাম দস্তগির (বয়স-২৬, জেনারেল হাসপাতাল রোডের বাসিন্দা, বাপুনগর, নাকে গুলি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু)

২৯. শামির ইক্‌বাল ভাই মনসুরি

৩০. কৌসরভাই সোব্রাতি আলি

৩১. নাসির খান্ কায়াম খান্

৩২. জাকির ভাই (মহা গুজরাট বেকারি)

৩৩. শামির ভাই (মহা গুজরাট বেকারি)

৩৪. আজহারউদ্দিন সিরাজউদ্দিন

৩৫. ইসমাইল ভাই ফ্রাইওয়েল

৩৬. আনোয়ার হুসেন

৩৭. নাসির ভাই রাজপুত

৩৮. অখতার ভাই

৩৯. মহঃ নঈম নাসরুল্লা

৪০. মহাঃ আজিম

৪১. নিসার আহমেদ এ হামিদ

৪২. আসলাম্ ভাই

৪৩. ইমতিয়াজ খান্ নিজামউদ্দিন পাঠান (বয়স-২১, বাসিন্দা- মুরারজি চক মাথায় গুলি লেগে মৃত্যু) মা আম্বিবেনের উক্তি- 'আমি আমার নিজের সন্তানকে চিনতে পারিনি, কারণ তার খুলির কিছুটা অশ উড়ে গেছিল'। (সূত্র ঃ আল্ আমিন্ গরীব নিবাস হাসপাতাল)।

এটি একটি অতিরিক্ত মৃত ব্যক্তির তালিকা যারা পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন :

৫,৩,২০০২ গুল্লুভাই করিম ভাই শেখ (৪২), জামালপুর

২৬.৩.২০০২ সার্ফরোজ তাকুব্ ভাই বান্নিওয়ালা (২৩), জামালপুর

১৫.৩.২০০২ মহম্মদ ইরফান্ আব্দুল জব্বর আন্‌সারি (দুধেশ্বর মসজিদ, বুকে দুটি বুলেট লাগে)

১৫.৩.২০০২ সিকন্দর খান পাঠান (২২), ভাতওয়া (সিদ্দিকভাই শেখ- শান্তি বাহিনী)

১৫.৩.২০০২ সইয়দ ফরজানা বুখারি (৩০), ভাতওয়া

৩.৪.২০০২ অ্যাডভোকেট নিজাম (গুলিবিদ্ধ)

(সি.সি.র দ্বারা তথ্য সংগ্রহ)

২৭ ফেব্রুয়ারিতে আমেদাবাদে ঘটে যাওয়া গোধরা বিপত্তির পর সতর্কতামূলক গ্রেফতার

পুলিশ থানা	গ্রেফতার
নারুদা	০
গোমতীপুর	০
শাহেরকোঠদা	০
ভেজ্জালপুর	০
কারুপুর	০
গায়েকোয়াড়া হবেলি	০
ইল্লিস ব্রিজ	০
নবরঙ্গপুরা	০
নারাণপুরা	০
ঘাটলোদিয়া	০
আস্তদিয়া	২

(সি.সি.র দ্বারা সংগৃহীত সরকারী পরিসংখ্যান)

আলআমিন গরীব নওয়াজ হাসপাতাল (পুলিসি গুলিবর্ষণ)

কে এই শিশুদের গুলি করেছে?

১. মহম্মদ হুসেন- আহত (শিশু)

২. ইরসাদ মির্জা- আহত (শিশু)

৩. আইয়ুব খান্ ইয়াকুব্ খান্- আহত (শিশু)

৪. ইকবাল মির্জা মহম্মদ খান্- আহত (শিশু)

৫. হানিক মির্জা রসিদ্ মির্জা- আহত (শিশু)

৬. আকবর খান্ আফসর্ খান্- আহত (শিশু)

৭. সৈয়দ জাভেদ- আহত (শিশু)

৮. মুনির আহ্মদ- আহত (শিশু)

৯. নিজামউদ্দিন- আহত (শিশু)

১০. ফিরোজ ফরিক – আহত (শিশু)

পরিসংখ্যান সংগ্রাহক ঃ কমিউনালিজম কমব্যাট

'Punish the partisan police'

ভাষান্তর : অগ্নিমিত্র ঘোষ

গুজরাটী সংবাদপত্র : বারুদে অগ্নিসংযোগ

কমিউনালিজম কমব্যাট

দেশের আভ্যন্তরীন সংকটময় পরিস্থিতিতে সংবাদমাধ্যমে ভূমিকা (সে শ্রুতিমাধ্যম দৃশ্যমাধ্যম, কিংবা মুদ্রণমাধ্যম যাই হোক না কেন) সবসময়ই সমালোচিত হয়েছে। কখনও উত্তেজনাপূর্ণ শিরোনামের ব্যবহারে ঘৃণার আগুনকে উস্কে দেওয়া কিংবা কখনো গুজবে বিশ্বাস করে বাঁধাধরা পথে চলা– এ দুটি ভিন্ন ভূমিকায় সংবাদমাধ্যমকে, দোষী সাব্যস্ত করা যায়। আর এই ভূমিকা সে পালন করেছে শুধুমাত্র অন্তর্দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি হিসাবে, কখনোই ঘটনার পর্যবেক্ষক বা ব্যাখ্যাকারী একজন সহানুভূতিশীল মানব হিসাবে নয়।

গোধরাকাণ্ডের পর গুজরাটের মোদী সরকার পোড়া দেহগুলির (৫৬ বগির) দ্রুত ময়না-তদন্তের নির্দেশ দেয়। অতঃপর সেগুলি নিয়ে আসা হয় সোলা সিভিল হাসপাতালে। এখানে তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গ এবং ক্রুদ্ধ সংঘীরা মরণোত্তর সংবর্ধনা জানায়। শেষকৃত্যের আগে জনসমক্ষে শবদেহগুলির উন্মুক্ত প্রদর্শনীও করানো হয়। পোড়া কয়লার মত দেহাংশগুলি বিশেষত স্ত্রী ও শিশুদের ঐ অবস্থা উস্কে দিয়েছিল প্রতিশোধের ইচ্ছা।

সম্পূর্ণ ঘটনায় উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমকে। শবদেহ নিয়ে ট্রেন কখন আহমেদাবাদে পৌঁছবে তা জানানো হয় রেডিওতে, যাতে বহু সংখ্যক উত্তেজিত মানুষ ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারে। ফলস্বরূপ এক বিশাল সংখ্যায় জনসমাবেশ হয়েছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে বারংবার শোনা যাচ্ছিল "খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্গে" (রক্তের শোধ নেওয়া হবে রক্ত দিয়েই)। আর তখনই তৈরি হয় গোধরাকাণ্ডের পরবর্তী ধ্বংসলীলার পরিকল্পনা। যেখানে পরিকল্পনার যথাযথ প্রভাব বিস্তারে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকাও সমালোচনাপূর্ণ।

ঘটনার পরপরই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বপ্রথম আকাশবাণী রেডিওতে বললেন, "গোধরা গণহত্যার পিছনে নিশ্চয় আই,এস.আই. বা অন্য কোনো বিদেশী মদত কাজ করছে।" আকাশবাণী ভালো করে তদন্ত না করেই, কোনো প্রমাণ না দেখেই প্রচার করলো এ তথ্য। সংবাদমাধ্যমের বড় অংশ দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত শুধু লাভের খাতিরে একেই রূপ দিল সরকারি বা আধা-সরকারি মন্তব্যে। কোনো প্রশ্নই করা হল না।

অন্যদিকে ইংরাজি মাধ্যমের সংবাদপত্র, যারা বিগত ছয় সপ্তাহ ধরে হিংসার গতিপথ নির্ণয় করছে এবং তাদের কার্যকারণ অনুসন্ধানে রত আছে তারাও কিন্তু গোধরা-কাণ্ড ও আই.এস.আই সংযোগ প্রচারে সামান্য হলেও দোষী। মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে যে 'দ্য টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া পত্রিকা' পূর্বপরিকল্পিত তত্ত্ব' (Pre-Planned theory) নামক প্রতিবেদনে সত্যের খোঁজ করছে তারাও কিন্তু কোনও প্রশ্ন তোলেনি যখন মন্ত্রী বললেন "গোধরার আক্রমণ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়" (দ্য টাইমস অফ্ ইন্ডিয়া, মার্চ ৬, ২০০২)।

এদিকে নোংরামির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে সন্দেশ ও গুজরাট সমাচারের প্রতিবেদন। ফলস্বরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে গোধরার ঘাঞ্চি মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। কিছু লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তাদের অভিহিত করা হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলে। এবং সেই নামকরণ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মোদী ও রাজ্যের গৃহমন্ত্রী যাদাফিয়া। বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম কোনোরকম উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই এসব মন্তব্য প্রচার করেছে জনসাধরণের উদ্দেশ্যে, প্রায় তিন-চার সপ্তাহ পরে যখন সত্যানুসন্ধান করে সঠিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে লাগলো তখন যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে।

পুড়ে যাওয়া দেহাবশেষের প্রদর্শনী, শেষকৃত্যের সময় জনসাধারণের ক্ষোভ এবং ক্রোধ, আহমেদাবাদের বিভিন্ন স্থানে ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় রামধুন– এ সবই পূর্বপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত গণহত্যার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরিতে সহায়ক হয়েছে।

দুটি প্রধান গুজরাটী দৈনিক, সন্দেশ এবং গুজরাট সমাচার গত চারবছর ধরে এই উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢেলে যাচ্ছে। বিশেষত ১৯৯৮, ফেব্রুয়ারিতে বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে (সেকশন সি সি, ১৯৯৮ অক্টোবর, ওয়েলকাম টু হিন্দু রাষ্ট্র) সাম্প্রতিক গণহত্যাকাণ্ডেও 'সন্দেশ' সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। যার ফলে সশস্ত্র দেহরক্ষীবাহিনী হিংসা, খুন ও লুঠ করতে উদ্বুদ্ধ হয় (অন্যদিকে গুজরাট টুডে, সদ্ভাব বা গুজরাট মিত্র-র মত কম প্রচারিত কাগজগুলি অনেক বেশি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছে)।

২৮ ফেব্রুয়ারি, 'সন্দেশের' প্রথমপাতায় সবরমতী এক্সপ্রেসের পুড়ে যাওয়া কামরাগুলির ছবি ছাপানো হয়। শিরোনাম লেখা হয় মাস্টহেডের উপরে "পঞ্চাশ জন হিন্দুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল"। গোধরা কাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ শবদেহগুলির এমন ভয়ংকর

রঙিন ছবি চাপানোই তো সংবাদমাধ্যমের আদর্শ ও নীতির প্রতি প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। একইদিনে, প্রথমপাতায় প্রকাশিত এক সম্পূর্ণ বানানো মিথ্যাকাহিনীর শুরুটা ছিল এরকম "সবরমতি এক্সপ্রেস থেকে অপহরণ করা হয়েছিল যাদের, তাদের মধ্যে দু'জন হিন্দু মেয়ের দেহ কালোলের কাছে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেছে।' প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে কল্পিত ছিল। পুলিশ তদন্ত শুরু করে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, এমনটিতে তল্লাশী চালানো হয় এবং পরিশেষে দেখা যায় যে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত ভিত্তিহীন। "ভদোদরা, বৃহস্পতিবার– সবরমতী এক্সপ্রেস থেকে অপহৃত দুটি মেয়ের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ কালোলের এক পুকুরের কাছে পাওয়া গেছে– গতকালের এখবর শুধু পাঁচমহলে নয় সারা রাজ্যেই উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। শয়তানও কেঁপে যাবে এমই অমানবিক বর্বরতায় উভয় মৃত দেহের স্তন দুটি কেটে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও দেহদুটি দেখে একথা বোঝা যাচ্ছে যে মেয়ে দুটিকে বারবার হয়ত বা বহুবার ধর্ষণ করা হয়েছে। এমনও সন্দেহ করা হচ্ছে যে ধর্ষণের সময়েই হয়ত তারা মারা যায়।

পুলিশ এমন স্পর্শকাতর ঘটনায় চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছে। এমনই উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অনুমাননির্ভর আলোচনা পরিস্থিতির আগুনে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। রাতের দিকে শোনা গেছে যে আরও একটি নারীদেহ, একই রকম অঙ্গহীন অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধর্ষণ ও অঙ্গহীন করার পর এক্ষেত্রে দেহটি পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। বর্বর লালসার কি কোনও সীমা নেই?

এরপর 'সন্দেশ' পত্রিকায় এমনই উত্তেজক আরও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, যেখানে মুসলমানদের অবিশ্বাসী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে অভিহীত করা হয়। ২ মার্চ, ২০০২ তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল ঃ

"মসজিদের ডাক ঃ "অবিশ্বাসীদের হত্যা কর– ইসলাম সমস্যায় পড়েছে..." একদল জনতা রামসেবকদের আক্রমণ করেছে এমন একটি খবর লেখা হল এভাবে "২৭ ফেব্রুয়ারি, সাড়ে এগারোটার সময় রেললাইনের নিকটস্থ একটি মসজিদ থেকে আওয়াজ আসে "অবিশ্বাসীদরে হত্যা কর... ইসলাম ধর্ম বিপদে পড়েছে"। এ ঘোষণায় উত্তেজিত একদল জনতা রেললাইনের ধারে বসে থাকা সেই সমস্ত লোকদের আক্রমণ করে যারা অগ্নিগদ্ধ ট্রেন থেকে বেঁচে গিয়েছিল। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বি.বি.মোহগিল একথা সাংবাদিকদের জানিয়ে বলেন যে শুধু সময়মতো পুলিশ কমিশনার ডি.এস.এন পাণ্ডে এসে পুলিশবাহিনীকে গুলি চালানোর হুকুম দিয়েছিলেন বলে আরও একটি গণহত্যা ঘটনা এড়ানো গেল।

"গোধরা কাণ্ডের বর্ণনা দেওয়ার সময় মোহগিল আরও জানান যে মাত্র দেড়কিলোমিটার ব্যবধানে দু'বার চেন টেনে থামানো হয় সবরমতি এক্সপ্রেস। দ্বিতীয়বার ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে একটি কামরায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়

কামরায় অগ্নিসংযোগকরার সময় অপরাধীদের গুলি করে থামায় এলাকায় পর্যবেক্ষণরত আর.পি.এফ বাহিনী। এছাড়াও ডিউটিতে না থাকা অন্য আর.পি.এফ জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাত্রীদের কামরা থেকে নিরাপদে বাইরে নিয়ে আসে।

"গণহত্যার ঘটনায় যারা বেঁচে গিয়েছিলো তারা বসেছিলো রেললাইনের ধারে। বেলাসাড়ে এগারোটা নাগাদ তারা দেখতে পায় যে মসজিদের কাছাকাছি দোকানগুলো জ্বলছে। শোনা যায় মসজিদের ঘোষণা। প্রায় তিন-চার হাজার মানুষ আক্রমন করতে ছুটে আসে এদের দিকে। এমন সময়ে ডিভিশনার সিকিউরিটি কমিশনারের নির্দেশে আর.পি.এফ জওয়ানরা ১২ রাউন্ড গুলি ছুঁড়ে জনতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর এভাবেই আরও একটি গণহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জ্বলন্ত ট্রেন থেকে কম করে আটজনকে উদ্ধার করে আর.পি.এফ জওয়ানরা। ছুটিতে থাকা অপর এক জনওয়ান নবাব সিং ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে উদ্ধারকার্যে সহায়তা করেন। ঘটনায় যাঁরা বেঁচে গিয়েছেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের আনন্দ প্যাসেঞ্জার ও সবরমতী এক্সপ্রেসে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

এই দুটি সংবাদপত্র যখন ক্রমাগত মুসলমানদের সংহতি ও বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তার পুরো ফায়দা নিল সরকার। গুজরাটের গৃহমন্ত্রী গোর্ধন যাদাফিয়া গোধরা কাণ্ডের অপরাধীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অভিহিত করলেন 'বিজাতীয় পাকিস্তানী' বলে, উল্লেখ্য যাদাফিয়া একজন প্রবীণ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সদস্য। "গোধরা আক্রমণ কলকাতার আমেরিকা সেন্টার আক্রমণের মতই জঙ্গী ঘটনা"। সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে ইনি সরাসরি ভয় দেখান "যারা এসব করেছে তাদের আমরা উচিৎ শিক্ষা দেব, কেউ বাঁচতে পারবে না। এধরনের ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটানোর সাহস তারা পাবেনা।"

৭মার্চ, ২০০২ তারিখে অপর একটি প্রতিবেদন উক্ত দৈনিকে ভয়াবহ শিরোনাম সহকারে প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে হজ ফেরত মুসলিমরা বিশেষ ক্ষমতাবান সব জঙ্গী, হিন্দুদের ভয়ের কারণ হতে পারে। প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল "জঙ্গীদের সহায়তায় আক্রমণের সম্ভাবনা– হিন্দুদের ভয়ের কারণ। ভয়ংকর সব আক্রমণের পরিকল্পনা হজ ফেরত মুসলিমদের দ্বারা।"

প্রতিবেদনে লেখা হয় "গোধরা কাণ্ডের পর অন্য আরও জঙ্গী, আক্রমণের ছায়া দেখতে পাচেছ বিভিন্ন সরকারি সংস্থাগুলি। জঙ্গীরা বিদেশী সহায়তায় আর.ডি.এক্স কিনছে, বোমা আক্রমণ ও বিমান ছিনতাইয়ের পরিকল্পনাও তাদের আছে।"

"তদন্তকারী দলগুলি এ ব্যাপারে একমত যে গোধরা কাণ্ডের জন্য আই.এস.আই. দায়ী। সমাজবিরোধীরা এখন লুকিয়ে আছে এবং পরবর্তী আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করছে। সৌদি আরব থেকে হজ করে আন্তর্জাতিক যাত্রীরা ফেরার পরও আঘাত হানা হতে পারে। হজযাত্রীরা যাতে নিরাপদে ফিরতে পারে তাই আক্রমণ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর এস.পি. সঞ্জীব ভাটের কথায় ১৯৯৩ এর মুম্বাই

বোমাকাণ্ডের মতই ভয়ংকর আক্রমণ হতে পারে। এরই সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যবসায়িক সমিতিকে বলেছেন যে, গোধরাকাণ্ড কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। এটি সুপরিকল্পিত এবং এখনও পর্যন্ত এ সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে করে আমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে। তিনি এও বলেছেন যে, শুধুমাত্র পাকিস্তানই এ ঘটনায় লাভবান হয়েছে।"

"ভারতের অভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সুযোগে দুষ্কৃতিরা এখানকার নাগরিক জীবন দুঃসহ করে তুলেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, সরকার গোধরাকাণ্ডের উৎস অনুসন্ধান করে সাধারণ মানুষ্যের ক্ষতিসাধনকারী সকলকে ধ্বংস করে দেবে।

"একইভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছবিলদাস মেহতা বলেছেন যে সরকার ও সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে পাকিস্তানের গোপন কাজকর্মের প্রতি উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে তারা যখন যা ইচ্ছা কিংবা যেখানে যা ইচ্ছা করতে না পারে"।

রাজ্য সরকার কিছু স্থানীয় টি.ভি. চ্যানেল ও একটি জাতীয় টিভি চ্যানেলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও সন্দেশের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। সম্ভবতঃ টিভি চ্যানেলগুলি সরকারি কাজকর্মের প্রতি আলোকপাত করেছিলো বলেই এ শাস্তি।

অন্যদিকে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, বিচারক কে জয়চন্দ্র রেড্ডি এক বক্তব্যে (এপ্রিল ৩, ২০০০) সংবাদমাধ্যমকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫-'ক' ও তার সহযোগী অন্যান্য ধারা সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। ২৯৫-'ক' ধারার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও বিদ্বেষবশত কোনো জাতির ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের অপমান করে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে হিংস্র করে তোলার কথা বলা আছে।

এরই মাঝে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু যুবক (জোনাপুরের যেমন মোহম্মদ সমীর বি, যেমন আয়ুব আবুবকর, সরখেজ রোডের যেমন গুলাম মুস্তাফা জে. এবং মানসুরি মকবুল ভাই), ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৫৩ (ক), ১৫৫, ২৯৫, ২৯৫(ক) ধারা অনুযায়ী 'সন্দেশ' ও 'গুজরাট সমাচার'-এর বিরুদ্ধে এফ. আই. আর দাখিল করে।

এসব অভিযোগ ফ্যাকসের মাধ্যমে আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পি.সি. পাণ্ডের কাছে পৌঁছায় ১০ মার্চ, ২০০২।

অভিযোগ লিখিত ছিল নিম্নরূপে :

"২৭ ফেব্রুয়ারি ঘটনার পর এই দুটি প্রকাশনা যথাযথভাবে প্রতিবেদন প্রকাশ না করে শুধুমাত্র মুসলিমদের ভিত্তিহীন অভিযোগের শিকার করেছে। ভ্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে উত্তেজক পদ্ধতিতে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেশের স্বার্থের পক্ষে এ ধরনের প্রতিবেদন ক্ষতিকর কারণ এ ধরনের উত্তেজনা বড় কোনও ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

"২৮ ফেব্রুয়ারি এরা যে ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তা যথেষ্ট উত্তেজক। এ প্রতিবেদন শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের সততাকেই প্রশ্নচিহ্নে জর্জরিত করেনি তাদের উপর অকথ্য নির্যাতনের বোঝাও চাপিয়ে দিয়েছে।

"এ ধরনের উত্তেজক প্রতিবেদন প্রকাশ করে অভিযুক্তরা নিজেদের দক্ষিণপন্থী সংস্থাগুলির যথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ্ এবং বজরং দলের সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত করছে। এতে শুধু রাজ্যেরই মানহানি হচ্ছে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে যাচ্ছে।"

"ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অসঙ্গতির ভিত্তিতে নাগরিক সম্পর্কে এই যে চিড় ধরেছে তা আর পুনর্নির্মাণ করা যাবে না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মতে অধিক প্রচারসংখ্যার দৈনিকরাই এধরনের জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত এ কাজের জন্য এদের তো পোটো আইনের আওতাতেও আনা যায়।"

ভাষান্তর : তাপসীঘোষ ("উজানে" কলকাতা, ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন থেকে)

সংঘের মোদী প্রেম

গুজরাটে দক্ষতার সাথে নরমেধ যজ্ঞ সংগঠিত করার পর, নেপথ্যে লুকিয়ে থেকে কোনো ঘটনা 'ঘটাতে এবং নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ পারদর্শী এবং 'হিন্দুত্ববাদের সহস্রধারার প্রধানতম উৎস, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, গুজরাটের মোদী প্রশাসনকে অবাধ অনুমোদন দিয়েছে। গোধরার হিংসাত্মক ঘটনার অব্যবহিত পরে গুজরাটের নারকীয় নরহত্যাকাণ্ডকে 'হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' হিসাবে বর্ণনা করে, গত শুক্রবার আর.এস.এস. মোদি প্রশাসনকে দ্বিধাহীন সমর্থন জোগালেন এবং ঘোষণা করলেন "কোনো সরকারই এই ধরনের স্বাভবিক অভ্যুত্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না"। এই 'স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া' (হিংসা) সমর্থন যোগ্য নয়'- এই অভিমত প্রকাশিত হলে, আর.এস.এস-এর মুখপাত্র এম.জি. বৈদ্য ঘোষণা করেন- "জাত, পাত, রাজনৈতিক অভিমত ছুঁড়ে ফেলে, সমগ্র হিন্দু সমাজ গোধরার ঘটনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে মাত্র'। (দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, মার্চ-১৬, ০২)।

মোদী এবং দলবলকে সার্বিক সমর্থন ঘোষণার ২ দিন বাদে, অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার ৩ দিন ব্যাপী এক সম্মেলনে, সংঘ পরিবার একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই সম্মেলন চেন্নেনাহালীতে সম্প্রতি শেষ হয়েছে। গৃহীত প্রস্তাবটির বয়ানে ঘোষণা করা হয়, 'মুসলমানদের উপলব্ধি করা উচিৎ যে তাদের প্রকৃত সুরক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল'। যদিও কতিপয় মুসলমান নেতা 'জেহাদ' কে সন্ত্রসবাদ বিরোধী বলে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত উগ্রবাদী কাজকর্ম প্রভাবিত করতে পারেননি। "এই

সভা পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিতে চায়, যে মুসলমান সমাজকে উগ্রবাদী নেতৃত্বের ক্রীড়নকে পরিণত করার কাজ কোন ভাবেই মসলমানদের কৃতিত্বের পরিচয় বলে মনে করা যেতে পারেনা"।

গোধরার ঘটনাকে 'ভয়ানক' এবং 'বীভৎস' বলে বর্ণনা করে আর. এস. এস. প্রতিনিধিরা অভিমত ব্যক্ত করেন যে- বিষয়টি প্রকৃত প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করা জরুরী ভাবে সমীচীন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া 'স্বতঃস্ফূর্ত' ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সমগ্র সমাজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কিছু সংখ্যক মানুষ হিংসার বলি হয়েছে। "এদেশে মুসলমানদের সুরক্ষা তখনই নিশ্চিত হবে যখন তারা সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের শুভেচ্ছা লাভে সক্ষম হবে। তাদের এই দেশের আইন মেনে নিতে হবে- যা তারা বর্তমানে করছে না।" হিন্দুদের প্ররোচিতকরার মতো কোন কাজ থেকে তাদের অবশ্যই বিরত থাকা উচিৎ"। তিনি খেদের সাথে উল্লেখ করেন, ভারতে হিন্দুদের জীবনের কোনো মূল্য নেই।

গোধরার ঘটনার পর, ধারাবাহিক নরহত্যা ঘটনার বিষয়কে সমর্থন জানিয়ে আর.এস.এস এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অভিমত ব্যক্ত করেন যে গোধরার ঘটনা যথার্থ প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করা সমীচীন। "এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সমগ্র হিন্দু সমাজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু সংখ্যক মানুষ হিংসার বলি হয়েছে। (প্রকৃতিগতভাবে এই তথাকথিত 'প্রতিক্রিয়ার' সাথে 'ধর্ষণ', 'গর্ভদেশ ব্যবচ্ছেদ', 'থেতলে খুন', 'জীবন্ত পুড়িয়ে কয়লায় রূপান্তর', প্রভৃতি যুক্ত। অথচ 'হিন্দু সমাজের প্রতিক্রিয়' আখ্যা দিয়ে এই ভয়ানক বীভৎসতার উপর স্বাভাবিকতার প্রলেপ দিয়ে ব্যক্তকরা হচ্ছে)।

আর.এস.এস. এখানেই থেমে থাকেনি। বাঙ্গালোর প্রস্তাবে প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর পরেও আর.এস.এস. মুখপাত্র এম.জি. বৈদ্য 'মুসলমানদের প্রতি আর.এস.এস-এর পরামর্শ' শিরোনামে, পুনরায় বিশ্লেষণ করে বলেন 'মুসলমানের নিরাপত্তার জন্য সখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শুভেচ্ছা অবশ্যই তাদের অর্জন করতে হবে। হিন্দুদের ক্ষতিসাধন-কারীদের হাতে খেলার পুতুল না হয়ে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যাবতীয় হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করতে এবং কয়েকটি ঐস্লামিক শব্দের 'পুনর্ব্যাখ্যা' প্রচলন করতে আমরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছি।" এম. জি. বৈদ্যের তালিকাভুক্ত শব্দ তিনটি- 'কাফির (অবিশ্বাসী), 'কাফর' (অবিশ্বাসের দর্শন) এবং 'জেহাদ' (অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ)- এবং তিনি দাবী করেন যে মুসলমানদের এই শব্দগুলির "পুনব্যাখ্য এবং নতুন সংজ্ঞা" দিতে হবে। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় মুসলমানরা হিন্দুদের শুভেচ্ছা কেমন করে লাভ করতে পারের- বৈদ্য উত্তরে জানান যে "পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের 'জেহাদ'কে তাদের নিন্দা করতে হবে।" তিনি জানান যে আর.এস.এস. সব মুসলমান সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী মনে

করে না তবে অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদীই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং এরা 'জেহাদের' প্ররোচনা জোগাচ্ছে। 'নরহত্যার' জন্য কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ না করে– আর.এস.এস. এদের প্রকৃত মনের ভাবই প্রকাশ করেছে। মুসলমাদের প্রতি তাদের বার্তাটিও পরিষ্কার। তবে এটা উদারচেতা হিন্দুদের, যারা আর.এস.এস. মার্কা ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আপনধর্মের বিকৃতি দেখে এর বিরোধিতা করছেন, তাদের প্রতিও বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছে।

সংঘ পরিবার, বিজেপি সভাপতি জনা কৃষ্ণমূর্তির মাধ্যমে মোদীর প্রতিকী পদত্যাগপত্র, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর গ্রহণ করার পরিকল্পনা– নাটকের উপরে যবনিকা পাতে সহজেই সক্ষম হয়। এটি এবং অন্যান্য ঘটনা পরম্পরা পরিষ্কার করে দিচ্ছে অদ্যাবধি, সরকারের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কাদের হাতে রয়েছে।

গুজরাট এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনাবলী পরিষ্কার সংবিধানের অপরাধমূলক অবমাননার পর্যায়ে পড়ে। তাঁদের কর্মীদের এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার স্বপক্ষে কোনো প্রকৃত কারণ খুঁজে না পাওয়ার মানসিকতা, ভারতের সংবিধান সম্পর্কে, আর. এস.এস-এর প্রকৃত ধারণা পরিষ্কার ভবে প্রকাশ করে দিচ্ছে। ১৯৪৮ সালে, গান্ধী-হত্যার পর আর.এস.এসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার ব্যাপারে এরা সবরকম প্রচেষ্টা যথাসাধ্য চালিয়ে যায়। একই সাথে সর্দার প্যাটেল ও গোলওয়ালকরের সাথে এ সম্পর্কে পত্রালাপ করতে থাকেন। গান্ধী হত্যার অব্যবহিত পরেই আর.এস. এসকে নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে এরকম একটি পত্রে আর. এস.এস. প্রধানকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল লেখেন, "হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করার স্বার্থে বিষ ছড়িয়ে, তাদের আত্মরক্ষার জন্য সংগঠিত করার প্রয়োজন ছিল না। এই ছড়ানো বিষের প্রভাবে শেষ পর্যন্ত দেশকে, গান্ধীজীর মত এক ব্যক্তির মহামূল্যবান জীবন বলিদানের ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। আর. এস.এস. সদস্যরা এই ঘটনার পর, বিজয় উল্লাসে মিষ্টি বিতরণ করেছে।" (সংঘ পরিবারের প্রতি সহানভূতিশীলএকটি প্রকাশন সংস্থা সাহিত্য নিকেতন কর্তৃক 'সত্যের জয়' শিরোনামে, ১৯৯৭ সালে হায়দারাবাদ-৫৭ থেকে প্রকাশিত। এই পুস্তকটির সংবাদ অনুসারে, আলোচ্য পত্রটি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কর্তৃক লিখিত।) ২ বৎসর বাদে পাকাপাকিভাবে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে গুজরাটের রঙ্গমঞ্চে যে রক্ত প্লাবনের পালা মঞ্চস্থ হলো তার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অদৃশ্য সমর্থন এবং প্রেরণা বর্তমান। তাদের সদস্যদের দ্বারা গুজরাটে সংঘঠিত কার্যাবলী সংঘ অনুমোদন করেছে। বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। আর.এস.এস.-এর সরসংঘচালক এম.এস. গোলওয়ালকার ১৯৩৯ সালে যা লিখেছেন তা আমাদের ভুললে চলবে না। তিনি লিখেছেন, "হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সমস্ত বিদেশী জাতিগুলিকে (মুসলমান এবং খ্রীষ্টান) অবশ্যই হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাষা আয়ত্ব

করতে হবে, এবং সম্মানের সাথে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করার শিক্ষা নিতে হবে। হিন্দুজাতির সংস্কৃতির গৌরবের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন কোনো চিন্তাধারণাকে হিন্দুধর্ম অবশ্যই স্বাগত জানাবে না এদের, আপন জাতি স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে, হিন্দু জাতিসত্বার সাথে একাত্ম হতে হবে– অন্যতায় তাদের সম্পূর্ণ হিন্দু জাতির অধীনস্ত হয়ে, এ দেশে থাকতে হবে। এদের কোনো 'দাবী করার অধিকার, কম বেশি কোনো সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার, স্বতন্ত্র কোনো সুযোগ পাওয়ার অধিকার, এমনকি নাগরিকত্বের অধিকার পর্যন্ত থাকবে না। এমন কি এদের জন্য গ্রহণযোগ্য নূন্যতম অন্য কোনো ব্যবস্থার অস্তিত্ব এদেশ থাকা চলবে না।" বাঙ্গালোর প্রস্তাবের প্রতিটি শব্দে গোলওয়ালকরের ধ্যান-ধারণা যে ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা তাৎপর্যহীন নয়।

গুজরাটে সংগঠিত, পরিকল্পিত হিংসাত্মক ঘটনাবলীর মধ্যে ব্যাপক হারে নরহত্যা ঘটানোর সমস্ত উপাদান বিদ্যামান রয়েছে– আঘাতে পঙ্গু করে দেওয়া, থেত্‌লে থেত্‌লে খুন করা, ধর্ষণ করা এবং পাশবিক নিষ্ঠুরতায় ধ্বংস করে দেওয়া, অর্থনীতির বিলুপ্তি সাধন- এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন। আর.এস.এস.-এর বিশ্ববীক্ষার মৌল উপাদানগুলি– এমন এক ভারতের কামনা করে, শ্রেষ্ঠ এবং ইতর জাতি তত্ত্ব, যার ভিত্তি, যেখানে, হিংসা হুমকি, ঘৃণা প্রভৃতি তাদের লক্ষ্য সাধনের জন্য অনুমোদিত। অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ দিক থেকে 'হিন্দুত্বের' এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে এক অস্বস্তিকর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।

গোলওয়ালকারের লিখিত হিটলার-প্রশস্তির সামান্য অংশের উদ্ধৃতি ঃ "জার্মান জাতি ও তাদের জাত্যাভিমান বর্তমান সময়ের প্রধান আলোচ্য সূচী। জার্মানীর হিব্রু উৎস জাত ইহুদিদের বিতাড়ণ করে জাতিয় পবিত্রতা রক্ষা কর্মসূচী জগৎকে বিস্মিত করেছে। জার্মানীতেই জাত্যাভিমানের সর্বোচ্চ নিদর্শন বিকশিত হয়েছে। কোনো জাতি এবং সংস্কৃতি যার– অন্যান্যদের সাথে আমূল পার্থক্য বিদ্যমান, তাদের পক্ষে– একটি সমগ্র জাতি সত্ত্বায় অন্যদের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া কতই না অসম্ভব। জার্মানীই এর পথ প্রদর্শক। জার্মানীর এই প্রদর্শিত পথ হিন্দুস্থানে আমাদের কাছে একটি মূল্যবান শিক্ষা এবং এর দ্বারা আমরা লাভবান হতে পারি।" (আমরা এবং আমাদের জাতিসত্ত্বার সজ্ঞা)

সংঘ পরিবারের এই রাজনীতিই গুজরাটে বাস্তবায়িত হয়েছে। হিংসা ছড়াতে, পরিকল্পিত হত্যা সংগঠিত করতে, নরমেধ যজ্ঞ উদ্‌যাপনে এই-বিশ্ববীক্ষাই প্রধানতম সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছে।

ভাষান্তর : **নির্মল চট্টোপাধ্যায়** ("মূল" কম্যুনালিজম কমব্যাট ও ত্রৈমাসিক "উজানে" সেপ্টেম্বর, ২০০২)

বিষ পুস্তিকা

বিগত কয়েকটি বছরে গুজরাট ছারখার হয়ে গেছে ভয়াবহ ভূমিকম্পে, দীর্ণ বিদীর্ণ হয়েছে আছড়ে পড়া বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে, ধুঁকেই চলেছে দীর্ঘস্থায়ী তীব্র জলসংকটে। এমন একটি রাজ্যে যে কোনো মানুষই আশা করবে মানবিক আবেদনই হয়ে উঠবে সেখানকার প্রধান মানবিক অনুভূতি। কিন্তু দুঃখজনক হলো মানবিক অনুভূতির সমৃদ্ধ বিকাশের বিপ্রতীপে সেখানে ঘটে চলেছে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার এক অভূতপূর্ব বিস্তার।

শান্তি-অহিংসার প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় জন্মভূমিতে ১৯৯৮-তে বি জে পি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সংঘ পরিবারের কর্মীরা যখন হাতে-কলমে ঘৃণার চর্চা নাও করে, তখনও তারা নিরন্তর ঘৃণার সৃষ্টির প্রচারে পুরোপুরি লিপ্ত থাকে। যখন ওরা বাইবেল পোড়ায় না বা মাতৃগর্ভ চিরে গর্ভস্থ ভ্রূণ বার করে এনে আগুনে নিক্ষেপ করার মতো পাশবিক কাজে ব্যস্ত থাকে না তখনও ওরা মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তোলার জন্য লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা ছাপে আর বিলি করে।

সংঘ পরিবারের এই ষড়যন্ত্রমূলক গোপনচারী কার্যক্রমের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের অনুভূতিকে লাগাতার তাতিয়ে রাখার লক্ষ্যে সি.সি গত চার বছর ধরেই নানা উপলক্ষ্যে সংগৃহীত এই পুস্তিকাগুলি মূল গুজরাটী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করে এসেছে। আমাদের আশা ছিল এই ঘৃণ্য পুস্তিকাগুলির প্রতি ব্যাপকতম অংশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে তা পুলিশকে এবং গুজরাট সরকারকে লজ্জায় ফেলে দেবে। ওরা হয়তো বাধ্য হবে এই ভয়ানক বিষের বিরতিহীন বিষক্রিয়া বাধা দিতে এবং লেখকদের, প্রকাশকদের এবং মুদ্রকদের ১৫৩ (এ) এবং ১৫৩ (বি) ধারা অনুযায়ী শাস্তি দিতে। ঘৃণা সৃষ্টিকারী এই সব মারাত্মক লেখাই জন্ম দেয় বিষাক্ত, খুনে কার্যক্রমের।

বিগত কয়েকটি সপ্তাহে গুজরাটে এমন ঘৃণা সৃষ্টিকারী প্রচার পুস্তিকার বন্যা বয়ে গেছে যেখানে হিন্দুদের অন্য সব কিছু ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র হত্যা এব সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযান চালানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। গত পয়লা মার্চ থেকে সি.সি এমন অন্ততঃত পনেরোটি প্রচার পত্রের সন্ধান পেয়েছ। মুসলিমদের অর্থনৈতিক দিক থেকে বয়কট করার আহ্বান জানানোর বিষয়টিই তার মধ্যে সবচাইতে কম আপত্তিকর। বাকিগুলিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালাতে ভীষণ রকম উস্কানি দেওয়া হযেছে। কিছু কিছু নজিরবিহীন নোংরামিতে পূর্ণ। এই ঘৃণাভিত্তিক মতাদর্শের শিকড় কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে– তারই নিদর্শনস্বরূপ কয়েকিট নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম পাঠকদের অবগতির জন্য। এই গুলি এক সঙ্গে পাঠ্ করলেই (মূল গুজরাটী থেকে ইংরাজীতে অনূদিত) এদের যৌথ উৎসটি যথার্থভাবে প্রকাশিত হবে।

আমরা সমস্ত মুসলিমদের কাছে এবং প্রতিটি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী এখানে 'জেহাদ' নামক প্রচারপত্রটি প্রকাশ করার জন্য। গভীর যন্ত্রণা নিয়েই আমরা এ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি। যদিও আমরা এই প্রচার পত্রটিতে বিকারগ্রস্থ মানসিক গড়নসঞ্জাত যে নিম্নস্তরের অশ্লীল বিষোদগার প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পর্কে সচেতন। তাই একে জনসমক্ষে আনা উচিত বলেই আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি। একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে ছাপার হরফে প্রকাশিত এইসব অশ্লীল বিষোদগার আর নারোদা পাতিয়া ও ভবনগরের সংঘ পরিবারের সশস্ত্র সদস্যরা যে বর্বরতা সংগঠিত করেছে তার মধ্যে একটি পরিষ্কার যোগসূত্র রয়েছে।

এখনই হচ্ছে সময় যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতবর্ষের কবি প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে সব সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলেন তাদের স্বরূপ বোঝা যাবে।

সি.জি. রোড শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সি. জি. রোড আহ্‌মেদাবাদ- ৩৮০০০৯

এতদ্বারা সি.জি. রোড শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সকল ব্যবসায়ীকে জানানো হচ্ছে যে আজ অর্থাৎ ৪.৪.২০০২ তরিখে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল-এর দপ্তর নির্বাহী শ্রী চিনুভাই প্যাটেল ও হরিশভাই ভাট তাদের সদস্যদের নিয়ে আমাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারে গুজরাটের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়। যেহেতু এই সাক্ষাৎকার ছিল আকস্মিক সেহেতু আমরা তাদের বক্তব্য ধৈর্য সহকারে শুনি। ঐ আলোচনার পরে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে আমরা আপনাদের সঙ্গে একটি সভা করবার পরিকল্পনা করি। এই সভায় সি.জি. রোডের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ীরা এবং হিন্দুপরিষদ ও বজরং দলের দপ্তর নির্বাহীরা উপস্থিত থাকবেন।

আশা করা যায় আমরা সকলে সমবেত প্রচেষ্টায় সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হব।

স্থান ঃ হোটেল নালন্দা, মিঠাখালি ছা (সিক্স) রোডস্

সময় ঃ ০৪. ৩১. পি.এম. তালিক ঃ ৬.৪.২০০২ (শনিবার)

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা, সি.জি রোড শপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে।

নমুনাপুস্তিকা-১

(বিশ্বহিন্দু পরিষদের পুস্তিকার একটির ইংরেজি অনুবাদ নিম্নে প্রদর্শিত হল)

আপনার জীবন বিপন্ন– যে কোনো সময় আপনি খুন হতে পারেন!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ 'অস্ত্র ধারণ কর এবং অধার্মিকদের হত্যা করো' ভগবান আমাদেরও কিছু বলতে চান ...

প্রাণাধিক প্রিয় ভাইয়েরা,

নমস্কার! আমি আপনাদের সঙ্গে একান্ত ভাবে মিলিত হতে এসেছি। আমি আপনাদের সঙ্গে এক অতীব প্রয়োজনীয় এবং জরুরী কথা বলতে এসেছি। আশা করি আপনারা কোনোদিনও এই সাক্ষাৎকারের কথা ভুলবেন না। আপনারা এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল মানুষ, অমূল্য আপনাদের জীবন। আজ আপনাদের জীবন ও পরিবার ভীষণভাবেই বিপন্ন। আমি আপনাদের সতর্ক করতে এসেছি।

নিশ্চিন্ত নিরাপদ হিন্দু এলাকাতেও, বাড়ির দরজায় নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করেও আপনারা আপনাদের বাড়িতে কতটা নিরাপদ? আজ ট্রাকভর্তি বিশ্বাসঘাতক সন্ত্রাসবাদী মুসলমানরা এসে রক্ষীদের মেরে আপনাদের বাংলোয় ঢুকতে উদ্যত। ওর আপনাদের শোবার ঘরে, বসার ঘরে ঢুকবে এবং খুন করবে। এমন অবস্থায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভয়ে সিঁটিয়ে আছে আর মহল্লায় মহল্লায় তারা সারারাত দলবেঁধে জেগে থাকছে বিনিদ্র প্রহরায়। একসঙ্গে কত মানুষকে সেনাবাহিনীর আর পুলিশ রক্ষা করতে পারে?

আমি কোনো হাজার বছর আগের গল্প বলতে আসিনি– মাত্র ৫৩ বছর আগের কথা। ১৯৪৭ সালে প্রথম সিন্ধ প্রদেশে, তারপর ক্রমে পাঞ্জাব ও বাংলয় ওরা হিন্দু বাড়িগুলিকে আক্রমণ করে এবং প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দুকে নির্মম নির্দয়ভাবে হত্যা করে। এটা ঐতিহাসিক সত্য আর আবারও এর পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তাহলে আমরা নিজগৃহে কতটা নিরাপদ?

১৯৪৭-এ এই হিন্দুদেশে বসবাসকারী মুসলমানরাই বলেছিল যে হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্ন জাতীয়তার ভিন্ন মানুষ। তাদের ধর্ম আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, তাদের ধর্মীয় স্থান এব আচার-বিচার আলাদা, ঐতিহ্য, ভাষা, পোশাক উৎসব, খাদ্যাভ্যাস, বিশ্বাস ইত্যাদি সবই আলাদা, তাই আমরা আপনাদের সঙ্গে একই দেশে থাকতে পারবো না। অতএব দেশভাগ করা হোক এবং আমাদের মুসলিমদের একটি পৃথক ইসলামী রাষ্ট্র দেওয়া হোক্। আমরা ওদের একটি মুসলিম দেশ দিয়েছি তা হলো পাকিস্তান।

১৯১৫ সালে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। সারা দেশ তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কংগ্রেস নেতা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই চেষ্টার ফল কি হলো? হিন্দু ও মুসলিম কি এক হলো? মোটেই না। মুসলিমরা তাদের পৃথক রাষ্ট্রের দাবি থেকে সরলো না এবং দেশভাগ হলো। গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রচেষ্টার ফসল হলো এই পাকিস্তান নামক দানব।

গান্ধীজীর মতো বিশ্বখ্যাত নেতাই যদি হিন্দু-মুসলিমকে এক করতে না পারেন তবে এখানকার রাজনীতিকরা কি করতে পারবেন? যারা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা বলেন তারা নিজেদের ঠকাচ্ছেন আর কোটি কোটি হিন্দুকে বিপথচালিত করছেন। হিন্দু ও মুসলিমদের

মধ্যে কোনো মিলই নেই আর ওরা ভারতকে নিজেদের দেশ মনে করে না। যারা ভারতকে ডাইনি বলে আর বন্দেমাতরমের বিরোধিতা করে তাদের সঙ্গে ঐক্য সম্ভব নয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সৌভ্রাত্র হচ্ছে একধরনের ভণ্ডামি, বিভ্রম আর বিগত ১৪০০ বছরের মুসলিম ইতিহাস সেটাই প্রমাণ করে।

১৯৪৭ এ মুসলিমরা সম্পূর্ণ সিন্ধু প্রদেশ এবং বাংলার অর্ধেক কেড়ে নেয় সম্পূর্ণ মুসলিম দেশ পাকিস্তান তৈরির জন্য। ২০% মুসলিমদেশের ৩০% মাটি দখল করে এর দুকোটি হিন্দু যারা ৮০,০০০ কাটি টাকার সম্পত্তি ও ব্যবসার মালিক ছিল তাদের সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় বিতাড়ন করে।

দেশ বিভাজনের সময় লাহোর, ইসলামাবাদ, ঢাকা, পেশোয়ার, হায়দ্রাবাদ ও করাচি শহরে 'আল্লাহ্ আকবর' 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ ও অবিশ্বাসীদের হত্যা করো' বলে ধ্বনি দিতে দিতে শহর তোলপাড় করতে থাকে। লাঠি, তরবারি, ছোরা, টর্চলাইট নিয়ে এরা লক্ষ লক্ষ হিন্দু মা, বোন, মেয়েকে ধর্ষণ করে ও হত্যা করে। সতীত্ব রক্ষার জন্য বহু মহিলা কুয়োয় বা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। প্রায় ১৫ লক্ষ হিন্দুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে হিন্দুদের সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা হয়। হিন্দুরক্তে মাটি রাঙা হয়ে যায় আর রক্ত গঙ্গা বইতে থাকে। (সে সময় 'ইসলামাবাদ'শহরের জন্মই হয় নাই–সংকলক)।

কটা হিন্দু জানে যে আমাদের জমির একতৃতীয়াশ নিয়ে পাকিস্তান তৈরি হয়েছে? কত জন জানে যে আমাদের ১৫ লক্ষ পূর্ণপুরুষকে হত্যা করা হয়েছে? যে জাতি তার ইতিহাস ভুলে যায় তার মৃত্যু অনিবার্য। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

দেশবিভাগ ও পাকিস্তান তৈরির পরে মুসলমানদের সংখ্যা আবার ১৬ কোটিতে পৌছেছে। ওরা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাসী নয়। কংগ্রেস এবং সংবিধান ওদের চারটে করে বিয়ের অনুমতি দিয়েছে। ওদের জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটেছে আর সেটাই ওদের একমাত্র পরিকল্পনা। যেদিন ওদের সংখ্যা ২৫% থেকে ৩০%-এ পৌছবে সেদিনই হিন্দুদের অবস্থা হবে শোচনীয়। (তথ্যে জানা যায়, হিন্দু পুরুষরাই মুসলমান পুরুষদের চেয়ে একের অধিক স্ত্রী-উপপত্নী রাখে– সংকলক)।

পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের নয়– ওরা ওখানে চাকরের মতো থাকে আর ভারতীয় হিন্দুদের অবস্থাও তাই হতে চলেছে। ওরা ওদের সংখ্যা আর অস্ত্র ব্যবহার করবে একের পর এক পাকিস্তান তৈরির কাজে। ওরা ভারতকে মুসলিম জাতি বলে ঘোষণা করবে আর লালকেল্লায় সবুজরঙা ইসলামীয় পাতাকা উড়িয়ে থাকবে। লাদেন একাই আমেরিকার ৫০০০ নাগরিককে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদের কিঞ্চিত নমুনা দেখিয়েছে। সমস্ত আমেরিকানরা এমনকি বিরোধীরাও বুশকে এই বিষয়টিতে সমর্থন জানিয়েছিলেন অথচ ভারতীয় বিরোধী রাজনীতিবিদরা মুসলিম ভোটের আশায়

'পোটো'র বিরোধিতা করেছ। ৮০০০ মাইল দূর থেকে আমেরিকা আফগানিস্তান আক্রমণ করে ১০০০০ আফগান মুসলিমকে হত্যা করে আর সেখানে ভারত ১৩০০ বছর ধরে মুসলিম সন্ত্রাসবাদ আর উস্কানির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

আমেরিকা দেখল লাদেন একাই যথেষ্ট, সেখানে আমাদের অলিতে গলিতে হাজার হাজার লাদেন, দাযুদ, লতিফ, ইমাম বুখারি, সৈয়দ সাহাবুদ্দিন আর দু'লক্ষ মোল্লামৌলবি এক লক্ষ মাদ্রাসা আর মসজিদে দিবারাত্রি সন্ত্রাসবাদের বিষ ছড়াচ্ছে। সিমি, লস্কর-ই-তোয়েবা, আই এস আই এর মতো সংগঠনগুলো পাকিস্তানের মদতপুষ্ট হয়ে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে। ওরা লক্ষ লক্ষ সন্ত্রাসবাদীদের হাজার হাজার শিবিরে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ওরা ভারতের অবিবাহিত, বেকার মুসলিম যুবকদের মোটা বেতন দিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করছে।

এদেশের সন্ত্রাসবাদী ও বিশ্বাসঘাতক মুসলিমরা ৫০টির বেশি মুসলিম দেশের কাছ থেকে অস্ত্র পায় ওদের ধর্মযুদ্ধের জন্য। ওদের একে-৫৬, একে-৪৭ রাইফেল, স্বয়ংক্রিয় মেশিনগান, ছোটছোট কামান, রকেটলঞ্চার আর কিলোকিলো আর ডি এক্স দেওয়া হয়েছে। পুরো দেশটাই অস্ত্রশস্ত্রে স্তূপের ওপর বসে আছে আর গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান যখন ভারত আক্রমণ করবে তখনই এখানকার মুসলিমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ১৯৪৭-এ ওদের শুধুমাত্র লাঠি সোটা আর বল্লম ছিল কিন্তু এখন ওদের হাতে আধুনিকতম অস্ত্র আছে। ওরা কোটি কোটি হিন্দুকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে এদেশের আর অলিতে গলিতে বিশ্বাসঘাতক মুসলিমদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। যেখানে দেশের পার্লামেন্টে আর কাশ্মীর বিধানসভা ভবন আক্রান্ত হয়েছে সেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা কোথায়?

অযোধ্যা ফেরৎ করসেবকরা যে ট্রেনে ছিল তার দগ্ধ জানলার শিকগুলো দেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি বিচারক ভার্মা শিউরে উঠেছিলেন যে যেসব হতভাগ্যর ঐ ট্রেনে ছিল তাদের কি অবস্থা হয়েছিল। মহিলা ও শিশুরা পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেছিল জীবনরক্ষার জন্য– ওরা নিশ্চয়ই জ্বলন্ত কামরার মধ্যে করুণভাবে আর্তনাদ করেছিল। হিন্দুদের দেশে ৫৮ জন করসেবক জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা গেল।

যদি পাকিস্তানে মুসলিমরা মন্দির তৈরিতে বাধা দেয় তাহলে তার এটা অর্থ হতে পারে। কিন্তু স্বয়ং রামের নিজের দেশে রামের মন্দির তৈরিতে বাধা দেওয়া কতদিন সহ্য করা যায়?

ভারতেও কি মুসলিমদের দয়ার ওপর নির্ভর করে হিন্দুদের বাঁচতে হবে? হিন্দুরা কি এখনও মুসলিমদের দাস?

গোধরার ঘটনা হচ্ছে এদেশে ছড়িয়ে পড়া ক্যান্সার রোগের এটা লক্ষণ মাত্র। সন্ত্রাসবাদের এই ক্যান্সার সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। গোধরা হচ্ছে শুধু বিজ্ঞাপন– পুরো ছবিটা দেখা এখনও বাকি। অনেক অনেক গোধরা কাণ্ড ঘটাবার পরিকল্পনা আছে।

মুসলিমদের বুঝতে গেলে ইসলামকে বুঝতে হবে। একটা দুটো ঘটনায় কেউ এসব বুঝবে না– অনেক গভীরে একেবারে শিখড়ে পৌঁছতে হবে। ওদের বিগত ১৪০০ বছরের ইতিহাসকে জানতে হবে। ইসলামের জন্মের পর (থেকে ১৪০০ বছর ধরে) গোঁড়া আরবরা একহাতে কোরান আর আরেক হাতে তরবারির উত্তরাধিকার বহন করছে। ওদের একটাই শর্ত– হয় ইসলামধর্ম গ্রহণ করো নয় মরো। ২০ কোটি মানুষ যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি তাদের হত্যা করা হয়েছে আর সে দেশের দেশজ সংস্কৃতিকে উৎপাটিত করা হয়েছে। ঐসব দেশকে ইসলাম রাষ্ট্রে বলে ঘোষণা করা হয়েছে আর ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। (বিশ কোটি মানুষ হত্যার মন্তব্য ডাহা মিথ্যা। কোথায় বিশ কোটি মরল? – সংকলক)।

আমাদের দেশে ঔরঙ্গজেবে, বাবর, হুমায়ুন, আকবর, চেঙ্গিসখান, মহম্মদ গজনী, মহম্মদ ঘোরী, শাহজাহানের মতো উগ্র, হত্যাকারী একনায়ক মুসলিম আগ্রাসনকারী তথা সম্রাটরা আমাদের শাসন করেছে, ক্রীতদাস বানিয়েছে। ভারতে বিগত হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে দেখা যায় ১০,০০০-এর বেশি যুদ্ধে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দু'কোটি হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। দু'লক্ষ সাধুসন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছে। ওরা পাঁচ লক্ষ হিন্দুমন্দির ধ্বংস করেছে যার মধ্যে রয়েছে অযোধ্যার শ্রীরামজন্মভূমি, মথুরার শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি, বেনারসের কাশী বিশ্বনাথ, গুজরাটের শ্রী ভগবান সোমনাথ আর ঐসব স্থানে ওরা মসজিদ তৈরি করেছে। কোটি কোটি গাভীকে বধ করা হয়েছে আর লক্ষ লক্ষ হিন্দু মা, বোন, মেয়ের শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ হয়েছে। আমরা যদি এসব ভুলি তো ঈশ্বরও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। (সব মিথ্যা তথ্য এসব। আর্যরা অনার্য ও হিন্দুরা ভারতীয় বৌদ্ধদের নিশ্চিহ্ন করেছে– সংকলক)।

ইসলামধর্মের বই কোরানে লেখা আছে যে যারা মুসলিম নয় অর্থাৎ পার্সী, ইহুদী, খ্রীস্চান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত ধর্মের মানুষেরা হল কাফের (অবিশ্বাসী), যারা ইসলাম নেবে তাদের ক্ষতি করো না। যারা নেবে না তাদের বধ করো। এই সব লোককে মারলে গাজী উপাধি পাবে, আর যদি যুদ্ধে মরো তবে শহীদ হবে। সমস্ত গাজী ও শহীদদের আল্লা নিজের কাছে সপ্তম স্বর্গে টেনে নেবেন আরা তারা সুরা ও সাকীর স্ফূর্তি পাবে। এই হল ওদের স্বর্গের কল্পনা– মদ আর মেয়ে মানুষ।

কোরানে সমস্ত মুসলিমদের এই বলে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে যে যদি তারা কোনো অ-ইসলাম দেশে বসবাস করে তবে তারা যেন অবশ্যই ধর্মযুদ্ধ করে এবং সেই দেশকে ইসলামীয় দেশে পরিণত করে। "দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে লড়ো

কারণ ধর্মযুদ্ধ হলো মুসলমানের কর্তব্য আর তাদের স্বপ্ন হওয়া উচিত পৃথিবীব্যাপী ইসলামকে একমদ্বিতীয়ম্ ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠা করা আর দেশে দেশে ইসলামীর পতাকা ওড়ানো।" ('একমদ্বিতীয়তম' তো বেদ-উপনিষদের বাণী– সংকলক)

১৪০০ বছরের ইসলামের ইতিহাস থেকে পৃথিবীর সমস্ত লোক দেখেছে যে মুসলিমদের ভাষা, চিন্তা ও ব্যবহার থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে ওরা পেছিয়ে পড়া, উগ্র, ক্ষমাহীন, গোঁড়া, প্রতিহিংসাপরায়ণ, একগুঁয়ে, নিষ্ঠুর, বর্বর, আর ঘৃণায় পূর্ণ, এটাই হল ইসলামের নগ্ন বাস্তবতা। আর মুসলিমরা বছরের পর বছর পার্সী, ইহুদী, হিন্দু আর ইংরেজদের সঙ্গে লড়ে এসেছে। (ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই কি অপরাধ?– সংকলক)।

যতদিন পৃথিবীতে ইসলাম আছে ততদিন ধর্মযুদ্ধ থাকবে অর্থাৎ সংঘর্ষ, হত্যা, নিষ্ঠুরতা, গণহত্যা। ইসলাম কোনো ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কৃষ্টিগত বা আত্মীক আন্দোলন নয়। ইসলামে কোনো সততা, অহিংস, মানবতা করুণা বা ভালোবাসার স্থান নেই। এ শুধুই হিংসা আর নিষ্ঠুরতার জায়গা। এ হলো আরবীয় মুসলমানদের পরিকল্পনা যাতে তারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে মুসলিম হতে বাধ্য করতে পারে। ইসলামকে ধর্ম বলে ভাবা বা বলা হল সত্যের অপলাপ, মূর্খামি। যদি তুমি বাঁচতে চাও তবে ওদের ১৪০০ বছরের ইতিহাসের কার্যক্রমের বিশ্লেষণ করতে হবে।

হিন্দুরা এখন জেগেছে, তারা এখন কোটি কোটি হিন্দুর এক বৃহৎ পরিবার। মুসলিমদের নিষ্ঠুরতা দমন করার জন্য এখন কোটি কোটি হিন্দু হাত উত্তোলিত হয়েছে। হিন্দুরা আর কারো করুণার পাত্র নয় বা মার খাওয়ার জন্য নয়। একজন হিন্দু নির্যাতিত হলে কোটি কোটি হিন্দু গর্জে উঠবে। তারা সমানে সমানে লড়বে। আমরা যদি আক্রান্ত হই তো আমরাও অক্রমণ করবো। মহম্মদ গজনী সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে যে মসজিদ ও কবরখানা নির্মাণ করেছিলেন লৌহমানব সর্দার প্যাটেল তা অপসারিত করে এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন যা জাতির গর্ব।

কংগ্রেসী নেহেরুর আপত্তি সত্ত্বেও তখনকার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রবাবু ঐ সোমনাথমন্দির নির্মাণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন আর এতে তার পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। আজ যদি সর্দার প্যাটেল বেঁচে থাকতেন তবে তিনি দাসত্বের সমস্ত চিহ্ন গুঁড়িয়ে ফেলতেন আর অযোধ্যা, মথুরা ও কাশীতে সুন্দর মন্দির তৈরি করতেন, কোটি কোটি হিন্দুর স্বপ্ন পুরণের জন্য আমরা অবশ্যই এইসব সুন্দর মন্দির নির্মাণ করার প্রয়াস চালাবো।

এমনকী জন্তু জানোয়াররাও তাদের সন্ততিদের জন্য প্রাণধারণ করে। আমরা ভারতে জন্মেছি আর এই দেশ আর ধর্মকে রক্ষা করে মাতৃঋণ পরিশোধ করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শান্তিতে সসম্মানে বাঁচতে হলে ঐক্যবদ্ধ হও। সমস্ত মুসলিম তা সে যত দরিদ্রই হোক না কেন তার আয়ের ৫% তার ধর্মের জন্য মসজিদে দান করে। মুসলিমরা হিন্দু ব্যবসায়ী, শিল্পপতিদের অপহরণ করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা মুক্তিপণ দাবি করছে আর আমরা ভয়ে ভয়ে মুক্তিপণ দিয়ে দিচ্ছি। এই টাকায় হিন্দু নিধনের জন্য অস্ত্র কেনা

হয়। প্রতিবছর বহু হিন্দুমেয়েকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আর জোর করে মুসলিমদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়।

এই ইসলাম সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিটি হিন্দু পরিবারকে কিছুটা আত্মত্যাগ করতে হবে। তার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ হিন্দু দলগুলিকে দান করতে হবে– শুধুমাত্র তোমার ক্ষমতার মধ্যেই নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। ঐক্যবদ্ধ না হলে আমরা বাঁচবো না। শুধু আশীর্বাদ বা শুভেচ্ছাতে হবে না। যোগ দিতে হবে আর অর্থ সাহায্য করতে হবে। হিন্দু দলগুলিকে অর্থদান করা কোনো খয়রাৎ বা দাক্ষিণ্য নয়– এটা আমাদের সুরক্ষা আর নিরাপত্তার জন্য খাটানো হবে। শুধু দেশের কথা ভাবতে হবে, রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন বা ঐতিহ্য ভাবলে চলবে না। হিন্দুরা বরং তাদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করবে যে তারা কেন রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্য মুসলিমদের তোল্লাই দেয়। হিন্দুরা কখনোই জয়চাঁদ আর আমিচাঁদদের ছেড়ে কথা বলবে না।

পরিষদের সারাজীবনের চাঁদা ২০০০ টাকা। বিশ্ব হিন্দু সমাচারের সারাজীবনের চাঁদা ৬০০ টাকা। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের পরিবার পিছু ১৫,০০০ টাকা দান করতে হবে। বিশ্বাসঘাতক মুসলিমদের একটু দেশপ্রেমের স্বাদ পেতে দিন, তাদেরকে আর্থিক ও সামাজিক ভাবে বয়কট করুন।

হিন্দুরা প্রতিটি পল অনুপলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। হিন্দুরা সত্য-অহিংসা-প্রেম-শান্তির পূজারী। পরিপূর্ণ শান্তি ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, আত্মিক উন্নতি বিঘ্নিত হবে। মানুষ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে আর সমগ্র দেশ মৃত্যুর অভিমুখে যাত্রা করবে।

ভিক্ষা করে শান্তি লাভ করা যায় না। কোটি কোটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী হিন্দুই পারবে দেশে শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে।

বিনীত

শুভাকাঙ্ক্ষী
চিনুভাই. এন. প্যাটেল
রাজ্য নেতা, বিশ্বহিন্দু পরিষদ,
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দপ্তর
বণি স্মারক ভবন
১১ মহালক্ষ্মী সোসাইটি
মহালক্ষ্মী ক্রশরোডস্
পালদি, কর্ণাবতী
দূরভাষ : ৬৬০ ৪০১৫
৬৬৩ ১৩৬৫
বাড়ি : ৭৪৫ ৪৬৯৯

নমুনা পুস্তিকা ঃ ২

অর্থনৈতিক বয়কটই একমাত্র সমাধান

আমাদেরই সহযোগিতায় অর্জিত অর্থ জাতীয়তাবিরোধীরা ব্যবহার করছে আমাদেরই দুর্বল করার লক্ষ্যে। ওরা অস্ত্র কিনছে আর আমাদের বোন, মেয়েদের শ্লীলতহানি করছে। এই সব অনাচারীদের জন্য যোগ্য জবাব হলো অর্থনৈতিক অসহযোগ আন্দোলন।

হিন্দু ভাইসব জাগো!

এখন এমন একটা সময় যখন হিন্দুস্তানে হিন্দুধর্ম উজ্জীবনের বদলে দাসত্বে এসে ঠেকেছে। সমস্ত সরকারগুলো মুসলিমদের সমর্থন করছে। এই সব মুসলিমরা জানে না যে হিন্দু সমিতিগুলো জেগে উঠেছে আর সমস্ত মুসলিমদের পাকিস্তানে পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। হিন্দুবিরোধী সমস্ত মুসলিমই সন্ত্রাসবাদী। ওদের প্রধান পদাধিকারী হল দিল্লীর শাহী ইমাম বুখারি যে নিজেই একজন বড় সন্ত্রাসবাদী। যে সব মুসলিম ভি এইচ পি আর বজরং দলকে ব্যাঙের ছাতার মতো ভাবে তাদের জানা উচিত যে ওদের বুখারি বা দায়ুদ ইব্রাহিম বা পাকিস্তান আর ভারতের মুসলিমরা কখনই প্রবীণ টোগাড়িয়া বা বাল ঠাকরের যোগ্য নন। ওরা সব এই দু'জনের কাছে পিঁপড়ে বা পোকার মতো তুচ্ছ। গোধরা হত্যাকাণ্ডের পর যে হিংসা দানা পাকিয়ে উঠেছে তা থেকে মুসলিমদের সতর্ক হওয়া উচিত যে এখনও ওদের পাকিস্তানে ফিরে যওয়ার সময় আছে।

গুজরাটে একটাও মুসলিমকে বাঁচতে দেব না। গ্রামে শহরে মানুষ জেগে উঠেছে আর তারা সব চোখের বদলে চোখ নিতে ঢিলের বদলে পাটকেল ছুঁড়তে প্রস্তুত। হত্যার প্রতিহিংসা নিতে (রক্তের বদলে রক্ত) আমরা যেখানেই মুসলিম দেখবো হত্যা করবো। ভারতকে মুসলিমমুক্ত করবো। মুসলিমরা জানেনা যে ওরা ধর্মোৎসাহী মুসলিম নয়। যখন মুসলিমরা রাজা ছিল তখন ওরা হিন্দু রাজাদের ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করতো আর নিষ্ঠুর ব্যবহার করত।

যতদিন না মুসলিমরা নিশ্চিহ্ন হয় ততদিনই এ সব চলবে। তাই হিন্দুদের এবার অগ্রসর হওয়া উচিত। গোধরা হত্যাকাণ্ডের পরে মাত্র ১০% হিন্দু ফুঁসে উঠেছে। মুসলিমদের বোঝা উচিত যে হিন্দুদের মাত্র ১০% তাদের নিধনে এগিয়ে এসেছে। যদি বাকি ৯০% এগিয়ে আসে তবে গুজরাটে আর মুসলিম শব্দটাই শোনা যাবে না। সমস্ত মুসলিমকে ধ্বংস করার সময় এসেছে। অনেক গ্রামেই এই কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন গ্রামের হিন্দুদের শহরের হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এই মুসলিম নিধন যজ্ঞ সম্পূর্ণ করা দরকার। ভারতের নির্মাতা বাবা আম্বেদকরকে কবে মুসলিমরা অচ্ছ্যুৎ মন করে তারা নিজেরা ওনার পায়ের জুতোর যোগ্য নয়। (অচ্ছ্যুৎদের হাত করতে, উসকানি দিতে এ মন্তব্য– সংকলক)।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলে ভারতে একজনও মুসলিম থাকতে পারতো না। অতএব সমস্ত হিন্দুভাইদের জানা প্রয়োজন যে গুজরাট থেকে মুসলিম শব্দটা মুছে দেবার সময় এসেছে। সমস্ত হিন্দুভাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা যেন রাজনীতিবিদদের ভয়ে ভীত না হয়ে মুসলিমদের ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়। করসেবকদের ধরার জন্য মন্দিরগুলো তল্লাশী করা হয়েছে তবে মুসলিমদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্যই বা মাদ্রাসা বা মসজিদগুলোতে তল্লাসী চালানো হবে না কেন? গ্রাম ও শহরের হিন্দু মানুষেরা মুসলিমদের রক্তে আগামী হোলি উদ্‌যাপন করতে প্রস্তুত থাকুন।

সুপ্রীম কোর্ট তার যা খুশি বলতে থাকুক মন্দির ঐ জমিতে তৈরি হবেই। হিন্দুজাতি দীর্ঘজীবী হোক– হিন্দুসেবক। অর্থনৈতিক অবরোধই একমাত্র সমাধান। আমাদেরই সহযোগিতায় অর্জিত অর্থ জাতীয়তাবিরোধীরা আমাদের দুর্বল করতে কাজে লাগাচ্ছে। ওরা অস্ত্র কিনছে আর আমাদের বোন, মেয়েদের শ্লীলতাহানি করছে। এইসব অন্যায়কারীর উচিত শাস্তি–

অর্থনৈতিক অসহযোগ আন্দোলন

আসুন ঃ আমরা সিদ্ধান্ত নিই–

১। কোনো মুসলিম দোকানদারের থেকে কিছু কিনবো না।

২। কোনো বস্তু ওদের কাছে বিক্রি করবো না।

৩। ঐ বিশ্বাসঘাতকদের হোটেল বা গ্যারেজ ব্যবহার করবো না।

৪। আমাদের গাড়ি শুধু হিন্দু গ্যারেজে রাখবো। একটা সূঁচ থেকে সোনা কিছুই ওদের থেকে কিনবা না কিংবা ওদেরকে বেচবো না।

৫। মুসলিম হিরো-হিরোইনদের সিনেমা দেখবো না, বিশ্বাসঘাতক প্রযোজকদের সিনেমা দেখবো না।

৬। মুসলিমদের অফিসে কাজ করবো না, মুসলিমদের কাজ দেবো না।

এইরকম আঁটোসাঁটো আর্থিক বয়কট ওদের দমবন্ধ করে দেবে। মেরুদণ্ড ভেঙে দেবে। তখন ওদের পক্ষে দেশের যে কোনো যায়গায় গিয়েই বেঁচে থাকা কঠিন হবে। বন্ধুগণ, আজ থেকেই এই বয়কট চালু হোক যাতে কোনো মুসলিম আমাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহস না পায়। এই পুস্তিকাটি যদি পড়ে থাকেন তো দশ কপি ছাপিয়ে আমাদের ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে বিলি করুন। যারা এই পুস্তিকার বাণী মানবেন না বা অন্যদের বিলি করবেন না, হনুমান ও রামচন্দ্রের অভিশাপ তাদের ওপর পড়বে।

– জয় শ্রীরাম।

– একজন প্রকৃত হিন্দু দেশভক্ত

নমুনা পুস্তিকা ঃ ৩

ওঠো– জাগো– ঐক্যবদ্ধ হও টিলের বদলে পাটকেল নাও

আজ সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের ধ্বংস করতে চাইছে। মুসলমানদের লজ্জিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও তারা হিন্দুস্তানি হয়ে ওঠেনি। তবে সংখ্যাগুরুদের শক্তি সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই। গোধরা হত্যাকাণ্ড আর সিন্ধি বাজার ধ্বস হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলিমরা অনেক বেশি বিশ্বাসঘাতক। এখনও পর্যন্ত মুসলিমরা শুধু কাশ্মীরেই ওদের বিশ্বাসঘাতী কার্যকলাপের নমুনা দেখিয়েছে, তারপর তারা দিল্লী লোকসভা পর্যন্ত ওদের কার্যকলাপ বিস্তৃত করলো। কিন্তু গুজরাটকে লক্ষ্য করে ওরা চরম ভুল করেছে। এখন আর কোনো হিন্দু ওদের রক্ষা করবে না– পুলিশ নয়– মিরিটারি নয়– ভোট পাকড়ানো রাজনৈতিক দাদা যারা ওদের তোল্লাই দেয়– তারাও নয়।

ভারত যখন স্বাধীন হলো তখন ভারতের তিন কোটি মুসলিম ছিল। এখন এই ৫০ বছর পূর্তিতে দেখা যাচ্ছে ওরা ৩৫ কোটি। (মিথ্যা তথ্য এসব– সংকলক)। বুঝে দেখুন অবস্থাটা আর সাবধান হোন। পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যেও ওরা আমাদের সমান হয়ে যাবে। এখানে কেউ ক্রিকেট টিম তৈরি করতে বসেনি। পাকিস্তান তার সৈন্যবাহিনী সাজাচ্ছে।

পুলিশ ও সেনাবাহিনীকেও বলার আছে যে আপনারাও হিন্দু। অতএব সতর্ক হোন। আপনারাও আক্রান্ত হতে পারেন। আপনাদের উচিত হিন্দুদের সমর্থন করা। আমরা হিন্দুরাই পুলিশ আর সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

হিন্দুভাইসব ঐক্যবদ্ধ হোন, স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরি করুন যেমন হয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়। শত্রু নিধন করুন, দেশ যে পাপের বোঝা বয়ে চলেছে তা হালকা করুন।

ভাটোয়া থেকে নারোদা, বাপুনরগ থেকে কানুপুর ২৯শে মার্চ একটা আহ্বান আসবে। রাম নাম নিয়ে আক্রমণ করুন।

যেভাবে বাবরি ধ্বংস করেছি ঐভাবে মুসলিমদের মারবো। জামালপুর জ্বালাবো, দরিয়াপুর খালি করবো। বৃদ্ধ হলেও ছেড়ে দেব না।

আমরা হিন্দুস্থানিরা তোমাদের খুঁজে বের করে হত্যা করবো। ঐ হচ্ছে রঘুকুলের ঐতিহ্য আমরা শপথ নিয়ে বলছি। সোনিয়া ওর ফারুকশেখ আর হাজি বিলালের মতো কুত্তাদের নিয়ে যত খুশি ঘুরুক।

আমরা ওদের অবস্থা করবো আয়েসান জাফরির মতো। (এহসান জাফরীকে তার পরিবার ও তার বাসায় আশ্রয় নেওয়া মুসলমানদের সহ পুড়ে হত্যা করা হয়– সংকলক)।

মুসলিমরা দোকান জ্বালিয়ে আকাশ ধোঁয়ায় অন্ধকার করে দিয়েছে।

আমরা ওদের কেটে রক্তনদী বইয়ে দেব। স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী হবে হিন্দুত্বের ঐক্যের নিদর্শন। হাজারে হাজারে হিন্দু ভাই এতে যোগ দিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ। আপনাকে সেলাম, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের পর একজন হিরো জন্মেছে। গুজরাট গর্বিত ভারতের গরিমা আপনারই হাতের মুঠোয়।

হিন্দুদের অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশ বা সেনাবাহিনীকে ঢিল না ছুঁড়তে। ওরা আপনার ভাই।

– একজন ভারতীয়

(২৮ মার্চ ২০০২ তে সিসি-র হস্তগত হয়েছে।)

নমুনাপত্র–৪

কাজ সুরক্ষা সংস্কৃতি

শুধুমাত্র হিন্দুযুবাদে জন্য

বজরং দলকে ওদের তীরধনুক প্রস্তুত করতে দিন

যুদ্ধই একমাত্র মুক্তির পথ

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর দেখা যাচ্ছে যে হিন্দুরা দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। ধর্মান্তকরণ, অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসবাদ, বোমা বিস্ফোরণে দেশ ছেয়ে গেছে।

গণতন্ত্রের এই সমৃদ্ধির দিনেও সিনেমা, টিভিসিরিয়ালে হিন্দু দেবদেবী আর হিন্দু দর্শনকে ক্রমাগত অপমান করা হচ্ছে। শুধু কাশ্মীরেই নয় সমস্ত হিন্দুদের সঙ্গে বহিরাগতর মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানের হিন্দুস্তানে রয়েছে–

১। একলক্ষ ক্রীশ্চান মিশনারী, বিদেশ থেকে যারা কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে ধর্মান্তরকরণের জন্য।

২। ৯৫% ক্রিশ্চান আর ৯০% মুসলিমদের পূর্বপুরুষ ছিল হিন্দু। ধর্মান্তরকরণের জন্য হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে।

৩। ধর্মান্তরকরণের জন্য সীমান্তের হিন্দুরা সংখ্যালঘু।

৪। তিন হাজারের জায়গায় ভারতে ৩৫০০০ কশাইখানা আছে। সেখানে প্রতিদিন ৫০০০০-এ বেশি গোবধ হচ্ছে।

৫। বুদ্ধ ও মহাবীরের জন্মভূমি থেকে অহিংসার বদলে মাংস রপ্তানি হচ্ছে।

সারা দেশ অরাজকতা আর উদ্দেশ্যহীনতায় আক্রান্ত কেননা হিন্দু, হিন্দুসংস্কৃতি, হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্ম ক্রামগত ধ্বংস করা হচ্ছে।

ইসলামী জেহাদের প্রকোপে সমস্ত বিশ্ব আজ পর্যুদস্ত। ওরা ভারতেকেও ছাড়বে না।

৬। যখনই পাকিস্তান যুদ্ধে হারে তখনই ওরা ওদের গুপ্ত সংস্থা আই এস আই-এর মাধ্যমে যুদ্ধের মহড়া দেয়।

৭। হিন্দুস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে।

৮। জামাত-ই-ইসলাম, তবলিঘ আন্দোলন, ভারতীয় ইসলামীয় ছাত্র আন্দোলন (এস আই এম আই); আহল্-ই-হাদিসের মতো গোঁড়া সংগঠনগুলো আই.এস. আই এর তত্ত্বাবধানে হিন্দুবিরোধী, জাতীয়তা বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ প্রস্তুতি হিসাবে।

৯। মুসলিম ধর্মযুদ্ধের জন্য কাশ্মীরে একজনও হিন্দু বেঁচে থাকতে পারছেনা।

১০। আই.এস.আই-এর জন্য গত কয়েকবছরে ঘটেছে–

২৯১৫১ নাগরিক নিহত হয়েছে

৫১০১ নিরপত্তাকর্মী নিহত হয়েছে

৬১৯০০ স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র খুঁজে পাওয়া গেছে

৫১৮১০ কেজি বিস্ফোরক পাওয়া গেছে

১১। ওদের পরিকল্পনা আছে যে হিন্দুস্তানের হিন্দু যুবকদের বিভিন্ন নেশায় আচ্ছন্ন করে দেওয়া।

১২। ওপারে ১০০ আর ৫০০ টাকার নোট এপারে নিয়ে আসা হচ্ছে এ দেশের অর্থনীতিকে ভেঙে চুরমার করে দেবার জন্য।

১৩। ওদের পরিকল্পনায় আছে হিন্দুমেয়েদের ফাঁদে ফেলে হারেমে পুরে ফেলবার–

১৪। ৮০,০০০ মাদ্রাসায় গোঁড়া ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

১৫। স্টেশন, বাঁধ, সেতু, সরকারি জমি থেকে শুরু করে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কবরখানা আর দরগা তৈরি করা হচ্ছে।

১৬। স্বাধীনতার পরেও প্রায় তিনশো হিন্দুমন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছে।

১৭। সীমান্তের কাছাকাছি জেলাগুলো হিন্দুবিহীন। ইসলামীয় ধর্মযুদ্ধ মানে সমস্ত হিন্দুদের নিধন

সমস্ত হিন্দুমন্দির ধ্বংস

হিন্দুধর্মের অবলুপ্তি

হিন্দুস্থান টুকরো টুকরো হওয়া

হিন্দুসংস্কৃতির বিলোপ

প্রতিটি হিন্দু যুবকের বজরং দলে যোগ দেওয়া উচিত কারণ ...

হিন্দু হিন্দুস্তানের সর্বাধিক সংখ্যক হিন্দু যুবকের সংগঠন বজরং দলের লক্ষ লক্ষ সদস্য রয়েছে।

বজরং দলের লক্ষ্য হলো যতদিন না ভারতমাতা খুশি হন ততদিন লড়াই করে হিন্দুত্ব, হিন্দুধর্ম আর হিন্দুস্তানের সুরক্ষা আর জয়ধ্বজা ওড়ানো।

বজরং দলই এখন হিন্দুদের শক্তি, ১৯৮৪ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বজরং দল লড়ে আসছে।

বজরং দল প্রায় দেড় লক্ষ গাভীকে কশাইখানা থেকে মুক্তি দিয়ে গোরক্ষা বৎসর পালন করেছে।

বজরং দল মাত্র ৮ মাসে ১০০-র বেশি হিন্দু মেয়েকে ধর্মনাশ থেকে রক্ষা করেছে

গুজরাটের ৩৩২১ গ্রামে বজরং দল নিরাপত্তা, ঐক্য এবং সেবা দিয়েছে।

প্রতি গ্রামে ২০ জন যুবকের বাহিনী গঠন করেছে।

হিন্দুদের এবং নিজেকে রক্ষার জন্য যুবকদের শারীরিক কসরৎ-এর শিক্ষা দেওয়া।

শারীরশিক্ষা, জিমন্যাস্টিক ইত্যাদির বিদ্যালয় এবং খেলার মাঠ তৈরি করা।

সপ্তাহে একদিন মঙ্গল বা শনিবার দলবদ্ধ ভাবে হনুমানকে পূজা দেওয়া।

হনুমান জয়ন্তী/বাল্মিকী জয়ন্তী

২রা নভেম্বর শহীদদিবস

১৪ই আগআরা ভারত স্মৃতি দিবস

৬ই ডিসেম্বর জাতীয় মহিমা দিবস

হিন্দু যুবকেরা– ধর্মযুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে সেই ভাষাতেই যথোচিত জবাব দাও

– যে সব অস্ত্র ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তা অবদমিত করো।

– ওরা তোমাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে তোমরাও ওদের সাথে তেমন ব্যবহার করো, হিন্দুদের এক হতে হবে।

ধর্মযুদ্ধের বিপরীতে ধর্মযুদ্ধ। এর জন্য সমস্তগ্রামের যুবকদের বজরং দলে যোগদান অবশ্য কর্তব্য। প্রতি গ্রামে ত্রিশূল দান করার ব্যবস্থা করো। সেমিনার আর মিটিং-এর ব্যবস্থা করো– ধর্মযুদ্ধের ভয়াবহতা বোঝাও। বজরং দলই হিন্দু শক্তি।

সমস্ত যুবক অবিলম্বে বজরং দলে যোগ দিক। ত্রিশূল ধারণ করো।

নমুনা পুস্তিকা ঃ ৫

('জেহাদ' শীর্ষক পুস্তিকাটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য আমরা আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী সমগ্র মুসলিম সামজের প্রতি এবং আমাদের পাঠকদের প্রতি। গভীর যন্ত্রণার সঙ্গেই এই কাজ আমরা করতে বাধ্য হয়েছি। যদিও আমরা এই প্রচার পত্রটিতে বিকারগ্রস্ত মানসিকতা গড়ন সঞ্জাত অতীব নিম্নস্তরের যে অশ্লীল বিষোদগার প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পর্কে যথার্থই সচেতন। তাই একে জনসমক্ষে আনা উচিত বলেই আমরা দৃঢ় ভাবে মনে করি।)

উজানের কৈফিয়ত ঃ সি সি কে ধন্যবাদ তাদের অসমসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য। সিসি প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকাগুলি যা আমরা ভাষান্তরিত করেছি, আলোচ্যটির ক্ষেত্রেও আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু এগোনো যায় নি কারণ এই পুস্তিকাটি যে তীব্রনাকারে উদ্গীরণ ঘটিয়েছে ঘৃণার, আমাদের ভাষান্তর প্রচেষ্টা কখনোই সেই তীব্রতার মাত্রাকে স্পর্শ করতে পারছিল না। ক্ষমা করবেন, মানুষের প্রতি মানুষের এমন বর্বর ঘৃণা মিশ্রিত বিষোদ্গারের নমুনা স্পষ্টতই আমাদের সকল অনুভূতিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। অবরুদ্ধ আবেগে, আক্রাশে-ধিক্কারে প্রকৃতই আমরা হারিয়ে ফেলেছি ভাষা। তাই সি সি কৃত ইংরাজি অনুবাদটাই এখানে আমরা উপস্থিত করলাম।

Pamphlet Sample 5

(We sincerly apologise to all Muslims, and every one of our readers for reporducing the leaflet below titled 'Jehad'. We do so with pain. We are however concerned that the mindset that can produce filth such as this must be brought into public view-Editors)

"JEHAD"

The people of Baroda and Ahmedabad have gone berserk
Narendra Modi you have fucked the mother of miyas
The volcano which was inactive for years has erupted
It has burnt the arse of miyas and made them dance nude
We have untied the penises which were tied till now
Without castor oil in the arse we have made them cry
Those who cal religious war, violence, are all fuckers
We have widened the tight vaginas of the "bibis"

Now even the advasis have realised what Hinduism is

They have shot their arrow in the arse of mullahs

Wake up Hindus there are still miyas left alive around you

Learn from Panvad village where their mother was fucked

She was fucked stading while she kept shouting

She enjoyed the uncircumcised penis

With a Hindu government the Hindus have the power to annihilate miyas

Kick them in the arse to drive them out of not only villages and cities but also the country

Let the fuckers know that

The fucking of fuckers will not work.

নমুনাপত্র-৫

আর এস এস সদস্যদের কাছে স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ

১। দিনে দু'বার সকালে সন্ধ্যায় মন্দিরে যাও

২। নেতা যখন তোমার সাহায্য চাইবেন তখনই সাহায্য করতে প্রস্তু থাকো

৩। যখন সেনাবাহিনী যাবে তখন বোমা নিষ্ক্রিয় করো

৪। খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট ও টুপি পরো, হাতে একটা দড়ি বাঁধো

৫। সভায় ও সমাবেশে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য ঘোরাঘুরি করো।

৬। যদি ওরা স্পর্ধা দেখায় প্রস্তুত হও, চিৎকার করো

৭। প্রতি মিটিং-এর পর অন্ততঃ তিনবার জোরে জোরে শ্লোক উচ্চারণ করো।

৮। প্রতি সপ্তাহে একটা মিটিং করো

৯। মুসলিমদের সঙ্গে লড়ার সময় প্রতিবেশীদের বেশবাস পরিবর্তন করো যাতে তোমরা চিহ্নিত না হও।

১০। সামনে থেকে নয়– পিছন থেকে আক্রমণ করো

১১। বেশিরভাগ রাত্রের দিকে আক্রমণ করো

১২। মুসলিমদের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করো

১৩। অস্ত্রশস্ত্র সহ পুলিসের হাতে পড়ো না

১৪। যখন মুসলিমদের জন্য কাজ করবে তখন পারিশ্রমিক নিও না

১৫। যখন বেতনের সময় হবে তখন খোঁজার অছিলায় মানুষ সংগ্রহ করো

১৬। যদি কোনো মুসলিম দোকান থেকে কিছু কেন তবে শুধু ক্রয়মূল্য দাও– লাভ দিও না

১৭। পুলিশকে সত্য পরিচয় দিও না

১৮। তোমার মন্দিরকে রক্ষা করো

১৯। কোনো তথ্য পেলে তৎক্ষণাৎ তোমার নেতাকে লিখিত আকারে জানাও

২০। প্রতি সদস্য অন্ততঃ একাধারে ১০ জন লোকের সাথে লড়ার প্রশিক্ষণ নেবে

২১। লড়াই-এর সময় যে কানো অস্ত্র ব্যবহার করো

২২। মুসলিম বাড়িতে কাজ করলে মুসলিম মহিলাদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলো যাতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পায়।

২৩। মুসলিম নবজাতকদের অন্যরকম করে দাও। এ একসময় নায়কের দেশ ছিল। এখন এ ভীত লোকে ভর্তি। ওরা আমাদের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে আর গরীব নির্দোষ বলিপ্রদত্ত হচ্ছে। যদি হিন্দু যুবকেরা জাগে তবে ওদের মাথায় শুধু জুতো বৃষ্টি হবে। হিন্দু জাগো আর মুসলিমদের ধাওয়া করো।

ভাষান্তর : পাপড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (সূত্র : "কম্যুনালিজম কমব্যাট', মার্চ-এপ্রিল ২০০২ বর্ষ ৮, নং৭৭-৭৮; ত্রৈমাসিক "উজানে" কলকাতা, দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ২০০২)।

নিষিদ্ধ করণ, হবে কি হবে না?

মার্চ-এপ্রিল ২০০২

লিখিত অভিযোগ

বিগত প্রায় ৩ বৎসর ধরে 'ভাজপা' ও বজরং দল নানা বহুল প্রচারিত আকর্ষণীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের অনুগামীদের অস্ত্রপ্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং সম্ভাব্য আরো কয়েক রাজ্যে এই অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আপাদমস্তক প্ররোচনামূলক এই হিংস্র তৎপরতা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র সরকারকে বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাতে একান্তভাবে বাধ্য করেছে। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানীর সাথে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা বজরং দলটিকে অবিলম্বে বেআইনী ঘোষণার পক্ষে যে তীব্র ভাষায় সওয়াল করেছেন তাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

এই বৈঠকের আগে ২০০১ সালের ২৪ এপ্রিল, একটি পত্র মারফৎ মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বীজয় সিং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, "সাম্প্রদায়িক সমাবেশ সংগঠনের দিক থেকে 'SIMI' এবং বজরং দল সমানভাবে দায়ী। এই পত্রে শ্রী সিং, ১৯৬৭ সালে গৃহীত 'বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধক' আইনের কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ করেন যে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে SIMI ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য রাজ্য সরকারকে ইতিবাচক সহযোগিতা ও সমর্থন দিতে। জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছ থেকে একটি অস্পষ্ট উত্তর এসেছিলো। যদিও গত সেপ্টেম্বরে 'SIMI' নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো কিন্তু সমান অপরাধী বজরং দলকে আইনের আওতার বাইরে রেখে দেওয়া হলো। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিভেদমূলক সিদ্ধান্তটি, কোন বেআইনী কার্যকলাপগুলি শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হবে এবং কোনগুলির প্রতি চোখ বুজে থাকতে হবে- উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এই মতলবটি পরিষ্কার করে দিয়েছে।

গুজরাটে পরিকল্পিত নরহত্যা সংগঠিত হবার ঠিক পরেই 'বজরং দল' ও 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' দল দুটিকে নিষিদ্ধ করার জন্য সর্বত্র দাবী উঠতে লাগল। ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ দুটি দিনে ৫০০০ হাজারেরও অনেক বেশি সংগঠিত দাঙ্গাকারী প্রায় সামরিক দক্ষতায় দাহ্য গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোল, কেরোসিন তেলের টিন নিয়ে সজ্জিত হয়ে গুজরাটের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ সাধারণ মানুষদের উপর আক্রমণ চালিয়ে গেল (যদিও লুঠ ও হত্যার জন্য এরকম দাহ্য পদার্থ বহন করা অস্ত্র আইনের ধারায় অপরাধ),- মুসলমান নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে পাশবিকভাবে কচু কাটা করা হলো- আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো, তাদের ঘর-বাড়ি দোকান-পাট, কলকারখানা, লুঠ করা হলো, পুড়িয়ে দেওয়া হলো। ঠিক তার ২/১ দিন আগে, তীব্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী এক বিস্ফোরক প্রচার পত্র সারা গুজরাট রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। (অথচ ১৯৬৭ সালের 'বেআইনী কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ১৫৩এ এবং ১৫৩বি, ভারতীয় পেনাল কোডের দুটি ধারা অনুসারে বজরং দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার যথেষ্ট প্রমাণ ছিল)। উল্লিখিত আইন মোতাবেক, বজরং ও বিশ্বহিন্দু পরিষদকে বে-আইনী ঘোষণা করার কোনো মামলা আজ পর্যন্ত রুজু হয়েছে কি?

১৯৬৭ সালের 'বে-আইনী' কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের ১৭ ধারা অনুসারে কোনো সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

এই আইনানুসারের 'কোন ব্যক্তি বা সংগঠনকৃত কোনো কাজের দ্বারা, কথায় বা লেখায় বা ইঙ্গিতে বা দৃশ্যমান যেকনো প্রক্রিয়ায় আইন বহির্ভূত এমন সব কিছুকেই বোঝাবে' যা ভারত রাষ্ট্রের কোনো অংশ বিচ্ছিন্ন করার, সেই অংশের ক্ষমতা হস্তগত করার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টিকে এমন ভাবে প্ররোচিত করে যা ভারত রাষ্ট্রের ঐক্য বা সার্বভৌমিকতাকে বিঘ্নিত করে।

বে-আইনী সংগঠন বলতে বোঝায় 'যে কেনো সংগঠন যা বে-আইনী কার্যকলাপ সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে, যা বে-আইনী কার্যকলাপ সম্পন্নকারী ব্যক্তিবর্গকে উৎসাহিত করে অথবা সে সংগঠনে সদস্যবৃন্দ বে-আইনী কার্যকলাপ সংগঠিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে অথবা যে সংগঠনের কর্মসূচী ভারতীয় পেনাল কোডের ১৫৩এ বা ১৫৩বি ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হতে পারে অথবা যে সব সংগঠন এই ধরনের কর্মসূচীকে সহায়তা দিয়ে উৎসাহ যোগাবে।'

সিসি এই নিষিদ্ধকরণের স্বপক্ষে, মধ্যপ্রদেশ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ২০০১ সালের জুলাই থেকে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন– তা সম্যকভাবে পর্যালোচনা করেছে। (সিসি হল 'কম্যুনালিজম কমব্যাট' সংগঠন– সংকলক)।

বজরং দলকে নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী এই দলটির কার্যকলাপের যে তালিকাটি প্রশ্নাতীত যুক্তি হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন, তাতে রয়েছে :

"বজরং দল– রাজ্যের– হরদা, ইন্দোর, শিহোর, রায়সেন, জব্বলপুর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, থর, হোসাগাংবাদ, খাণ্ডোয়া, খারগোন, গুণা, রাজগাধ, নরসিংহপুর, সাগর, নিমাক, উজ্জয়িনী, এবং বিদীশার জেলাগুলিতে অত্যন্ত সক্রিয়। সারা দেশে– অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, ধর্মান্তরিতকরণ, গো-হত্যা বিরোধী– সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ এবং খৃষ্টান ধর্মালম্বীদের তীব্র বিরোধিতা– প্রভৃতি কার্যকলাপ সংঘবদ্ধভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।"

"এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে বজরং দলের কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্যই হলো, অন্যান্য সম্প্রদায় বিশেষতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের উত্তেজিত ও হেনস্থা করা। পরিণামে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণার এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে তীব্র আইন শৃঙ্খলার সমস্য দৃষ্টি করবে।"

"১৯৮৫ সালে, শহজাপুর জেলার তানাড়িয়া গ্রাম থেকে বজরং দলের যাত্রা শুরু। বর্তমানে, মধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটি জেলায় এর শাখা রয়েছে। বজরং দল, বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং তার মহিলা শাখা 'দুর্গাবাহিনী' সহযোগী।"

"১৯৮৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত বজরং দলের কর্মীরা ভূপালে অনুষ্ঠিত 'রামশীলা পূজা' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ইট বয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী পালন করে।

এই কর্মসূচী চলাকালীন ১৪৪ ধারা জারির মধ্যে পুরানো ভূপাল শহর এক থমথমে ভীত সন্ত্রস্থ পরিবেশে দিন কাটায়।"

"১৬, ০৬.৯০ তারিখে বজরং দলের কর্মীরা রাম মন্দির নির্মাণের দাবীতে বিশ্বহিন্দু পরিষদ আয়োজিত এক মিছিলে অংশগ্রহণ করে। 'রথযাত্রা' কর্মসূচী যখন বিহারে বন্ধ

করে দেওয়া হলো– প্রতিবাদে– ভূপাল বন্ধ ডাকার পিছনে বজরং দল কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।"

"১৯৯২ সালের মে মাসে ভূপালের বৈরাশিয়ায় বজরং দল এক সমাবেশের আয়োজন করে এবং সমাবেশে উত্তেজক শ্লোগান দেয়। পরিণামে কালারী মসজিদের কাছে– বজরং দলের কর্মীদের সাথে স্থানীয় মুসলমান দোকানদারদের মধ্যে উত্তেজিত বচসাও তলোয়ারের আক্রমনে রূপান্তরিত হয়। বজরং দলের নেতা রামেশ্বর শর্মা আপত্তিকর অপপ্রচার করে যে, মুসলমানরা কালারী মস্‌জিদের মধ্যে সংগঠিত হয়েছে এবং তারা, ছগনলাল নামে এক দোকানদারকে আহত করেছে। ক্ষিপ্ত বজরং কর্মীরা কালারী মস্‌জিদের চারপাশে জড়ো হয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা "শুরু করে দেয়।"

"২৯, ১১.৯২ থেকে ৫.১২.৯২ এর মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ "চ্যালেঞ্জ উইক" উদযাপন করে এবং বজরং দলের কর্মীরা এই অনুষ্ঠানের মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এর ফলে ভূপাল শহর জুড়ে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যার পরিণামে ভূপালের বিভিন্ন জায়গায় ৭-১২-৯২ তারিখে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়।"

"২৮.১.৯৫ তারিখে রাজনাত গাঁও এবং উজ্জয়িনীতে বন্‌ধ সংগঠিত হয়। একই ভাবে ৭-৩-৯৫ তারিখে ধরের ভোজশালায় তীব্র 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনির মধ্যে হনুমানের প্রতি সাধারণ প্রার্থনার জমায়েত সংগঠিত হয়।"

"২৭.১.৯৫ তারিখে বজরং কর্মীরা স্বাধ্বী ঋতাম্বরার সাথে সাক্ষাতের জন্য ভূপাল রেল স্টেশনে জড়ো হয় কিন্তু তিনি না আসতে পারায় এই কর্মীরা স্টেশনের ভিতরে ও বাইরে এমন ভাবে ভাঙচুর শুরু করে যে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারে বাধ্য হয়।"

"১১.২.৯৭ এবং ১৫.২.৯৭-এর মধ্যবর্তী সময়ে ভোজে 'ভোজশ্রুতি' উৎসব পালন করা হয়। বজরং দলের জাতীয় নেতা শ্রী জয়ভা সিং পাভেজ্জা এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। ঠিক তার আগে ২৯.১.৯৭ তারিখে তিনি গোয়ালিয়রে ঘোষণা করেন যে মথুরায় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক শীর্ষ বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ভোজশালা ও ধরকে জাতীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করেছে। একই সভায় আচার্য গিরীরাজ ঘোষণা করেন যে ভোজশালায় 'নামাজ' বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সরকারি প্রশাসন নামাজ বন্ধ করতে ব্যর্থ হলে আমাদেরই করতে হবে।"

"১১-৩-৯৭ তারিখে বজরং দলের জেলা আহ্বায়ক রাজ ভানু মাজানে মাননীয় রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধিত একটি স্মারণপত্র ধর জেলার অতিরিক্ত কালেক্টারের হাতে অর্পণ করে ৮-৪-৯৭ তারিখ থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ সংগঠিত করার হুমকি দেন।"

ভীত-সন্ত্রস্থ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিন্দুসম্প্রদায়ের এই ধরনের কার্যাবলীর বিরোধীতা করেন এবং তারাও 'প্রত্নতাত্ত্বিক আইন' মোতাবেক এই ধরনের কার্যাবলী নিষিদ্ধ করার

দাবী জানিয়ে এবং 'নামাজ' সংগঠিত করার অধিকার দাবীকরে ধরের অতিরিক্ত কালেকটরের কাছে অপর একটি স্মারণলিপি অর্পণ করে।"

৫-৪-৯৭ তারিখ, বজরং দলের জয়ভান সিং পাভেজ্জা নেতৃত্বে ভূপাল শহরে 'গো-রক্ষা' সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সমস্ত ভূপাল শহরে বজরং দলের ভূমিকা সম্বলিত বিরাট বিরাট প্রচার পত্র সেঁটে দেওয়া হয়। কোনো কোনো প্রচার পত্র জবাই করা গরুর ছবি আঁকা ছিল। সমাবেশে বহুসংখ্যক জীপগাড়ী অসংখ্য কাট্-আউট বহন করেছিল। একটি কাট্-আউটে খোলা তলোয়ার হাতে একজন মানুষ এবং একজন কশাই'– অপর একটিতে, একজন কশাই একটি গরু জবাই করতে উদ্যত এবং একজন মানুষ, গরু ও কশাইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গরুটিকে রক্ষা করছে। সমাবেশের স্লোগানগুলি ছিল উত্তেজনাপূর্ণ। "এটা কাটুয়া (মুসলমানদের গালাগাল দিয়ে বলা হয়) কাজির জাত নয়'– 'এটা বীর শিবাজীর জাতি', 'গরুর রক্ত যেখানে ঝরবে সেখানেই আমরা অস্ত্র ধরব', 'এখন সীমান্তে সংঘর্ষ' চলছে, এখনই মানচিত্র থেকে অবশিষ্ট পাকিস্তান মুছে ফেল', 'গো হত্যাকারীদের জুতোপেটা কর', 'আমরা কিছুতেই গো-হত্যা এবং দেশ ভাগ সহ্য করব না', 'কাটুয়াদের হত্যা কর ওদের রামের শরণে পাঠাও'।

সমাবেশ চলাকালীন ঘোষণা করা হয় যে এ দেশটা হিন্দুদের এবং বক্‌রী ঈদ উদ্‌যাপনে গো-হত্যা চলবে না। ৬ ডিসেম্বর যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা কখনো থাকবে না। ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় যা ঘটেছিল তা রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের (শেষ অধ্যায়) শেষ অধ্যায় নয় বরং এটা বাল্‌কাণ্ডের (রামায়ণের প্রথম অধ্যায়) সূচনা মাত্র। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীদের হাতে ছিল ত্রিশূল।"

"১৩.৫.৯৭ তারিখে, ধর জেলার ভোজশালায় সাধারণ মানুষের অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক নীতি তীব্রভাবে সমালোচনা করে বজরং দলের আঞ্চলিক আহ্বায়ক প্রকাশ রত্নপারখি এবং 'দুর্গাবাহিনীর' জাতীয় আহ্বায়ক সাধ্বী ঋতম্ভরার নেতৃত্বে বিক্ষোভ সংগঠিত হয় এবং এ ব্যাপারে জাতীয় স্তরে বিক্ষোভ সংগঠিত করার শাসানী দেওয়া হয়। বজরং দল এবং অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলি'– প্রতি মঙ্গলবার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে পূজার পাঠ সম্পন্ন করার জন্য ভোজশালায় প্রবেশের অবাধ অধিকার দাবী করে আসছিল। ধর জেলার বিভিন্ন স্থানে, 'জাগো, অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলো, এসো, আমরা সকলে প্রতি মঙ্গলবার, রাত ৯টায় ভোজশালায় সরস্বতী মন্দিরে অধিষ্ঠিত মা সারদার পবিত্র চরণে আত্মোৎস্বর্গ করি"– ইত্যাদি বাণী সম্বলিত প্রচার পত্র দেখা যেতে লাগল।"

"২৫.৯.৯৭ তারিখে, খাণ্ডোয়ার নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারদের কলোনীতে, বজরং দলের আঞ্চলিক আহ্বায়ক এবং কয়েকজন কর্মী, প্রায় ৭০টার মত গরুর একটি পালের সাথে ৪/৫ জন কশাইকে দেখতে পায়। তৎক্ষণাৎ বজরং কর্মীরা ফোন করে মোঘাট রোডে অবস্থিত পুলিশ চৌকিতে খবরটি জানিয়ে দেয়। ইত্যবসারে ঈমলি পুরার কশাই

সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষজন এ খবরটা পেয়ে যায় এবং দলবদ্ধভাবে ঘটনা স্থলে চলে আসে। পরিণামে বজরং কর্মীদের সাথে তাদের বাগবিতণ্ডা রক্তক্ষয়ী প্রত্যাঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।"

"১.৭.৯৭ তারিখে ইন্দোরে-জাতীয় চেয়ারম্যান জয়ভান সিং পাভেজা, আঞ্চলিক আহ্বায়ক প্রকাশ রত্নাপারখির উপস্থিতিতে ধরের বজরং কর্মীদের এক গোপন সভায়, ১৯৯৭ এর ১৫ আগস্ট ধরের ভোজশালায় বজরং কর্মীদের উপস্থিত থাকার পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৯৭র ১৫ আগস্ট ভোজশালায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।"

"২৪.৮.৯৭, বজরং দলের জাতীয় চেয়ারম্যান জয়ভন সিং পাভেজ্জা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে সেপ্টেম্বর মাসের যে কোনো দিন বজরং দল 'গো-হত্যা' বন্ধের উদ্দেশে 'অপরেশন গো-হত্যারে' নামে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু করবে। এই কর্মসূচীর অংগ হিসাবে কশাইখানাগামী সমস্ত যানবাহন প্রধান সড়কের উপর বন্ধ করে দেওয়া হবে। ২৬.৯.৯৭ জয়ভানসিং পাভেজ্জা এবং আচার্য্য গিরীরাজ কিশোর ভূপালে আসেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাভেজ্জা বলেন যে রামজন্মভূমিকে বাবরি মসজিদ হিসাবে গণ্য করা অত্যন্ত অনুচিত। ঐস্থানটিতে পূজা পাঠ করার অধিকার আদালত অনমোদন করেছে এবং স্থানটিতে প্রাত্যহিক পূজা পাঠ চলছে।"

"১৪.৯.৯৭, বজরং দলের জাতীয় চেয়ারম্যান পাভেজ্জার প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিতিতে উজ্জয়িনীতে বজরং দলের অঞ্চলিক সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনের ভাষণে পাভেজ্জা বজরং কর্মীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে 'ত্রিশূল বিতরণ অনুষ্ঠান' উদ্‌যাপনের প্ররোচনা দেন।"

"১৬.৯.৯৭, শাজাপুরে, সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা রত বজরং দল চেয়ারম্যান পাভেজ্জা মন্তব্য করেন যে, অযোধ্যায় রাম জন্মস্থলে যদি নামাজ সংগঠিত হয় তবে বিতর্কিত অন্যান্য মসজিদগুলিতেও পূজা পাঠ সংগঠিত করা হবে।"

"২৭.১২.৯৭, সাগর জেলার দেবরিতে, এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বজরং দলের জাতীয় চেয়ারম্যান জয়ভান সিং পাভেজা বলেন যে, মুসলমানরা 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি উচ্চারণে অক্ষম,– এরা চিরকাল হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগে আঘাত দিয়ে আসছে। তিনি বিধায়ক সুনীল জৈনকে সুনীল মহম্মদ খান বলে সম্বোধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, কোনো একজন একটি গরুর শিরচ্ছেদ করলে– একশত মুসলমানের শিরচ্ছেদ ঘটানো হবে। যদি অমরনাথ যাত্রার পথে কোন বাঁধার সৃষ্টি হয় তবে সারা দেশে কোনো 'তাজিয়া' বের করতে দেওয়া হবে না। বুদ্ধিমান মুসলমানদের এ কথা বোঝা উচিৎ। আক্রান্ত হলে, আমরা সারা দেশ জুড়ে আমাদের প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করব। একজন হিন্দু কাউকে প্ররোচিত করে না কিন্তু সে যদি প্ররোচিত হয় তবে সে কাউকে রেহাই দেয় না।"

"বজরংদল, তাদের প্রাথমিক শিক্ষা শিবিরগুলিতে প্রত্যেক জেলা থেকে 'সংযোগ রক্ষাকারী এবং সহ সংযোগ রক্ষাকারীদের সমাবেশ ঘটাতে আদেশ জারী করেছে। এদেরকে গো-হত্যা বন্ধের জন্য 'অপারেশন গো-হাতিয়ারে' সংগঠিত করার এবং হিন্দু বালকদের সফলভাবে হামলা পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ দিতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

১৪.২.৯৮, সারগাওয়ের বজরংদল, রামকৃষ্ণ কলোনীর কমিউনিটি হলে– 'রামযজ্ঞ' ও 'ত্রিশূল বিতরণ' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। অনুষ্ঠানে, প্রায় আশি থেকে নব্বইটি ত্রিশূল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে, বজরং দলের জাতীয় আহ্বায়ক তাঁর ভাষণে বলেন, 'প্রতি যুগে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কৃতিদের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম স্থাপনের জন্য নবরূপে ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু কলিযুগে, ঈশ্বর এই কর্তব্য সম্পাদনের ভার বজরং দলের উপর ন্যস্ত করেছেন। গো-রক্ষা, বজরংদলের প্রত্যেক কর্মীর আবশ্যিক কর্তব্য। তিনি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তারা যদি এই দেশে বসবাস করতে চায় তবে রাম ও কৃষ্ণকে তাদের পূর্বপুররুষ বলে মানতে হবে, গরু কে গোমাতা হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, হিন্দুদের ভাবাবেগের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে– বাবর বা ঔরংজেবের প্রতি নয়। যষ্মিন দেশে যদাচার। ভারতের জল, খাদ্য তোমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দেশের জয় গান কর। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি বন্ধ কর। গো জাতিকে 'আম্মি' সম্বোধন কর। রাম, কৃষ্ণকে পরম পিতা বলে ঘোষণা কর। তবেই তোমাদের পূর্বপুরুষদের কৃত অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হবে।"

১৬.২.৯৮, হারদার গুপ্তেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে হারদা শাখা বজরং দলের উদ্যোগে শ্রীরাম মহাযজ্ঞ এবং ত্রিশূল বিতরণ অনুষ্ঠানে 'হিন্দুত্ব' ও 'গো-প্রজাতি' রক্ষার জন্য একটি আবেদন প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে, প্রধান সড়কে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলের প্রধান ধ্বনি ছিল "গো-হত্যাকারীদের জুতা পেটা কর," "দেশের শক্তি-বজরংদল," "গো-হত্যা বন্ধ কর", "গো–শাবক হত্যা করলে রাস্তাঘাট রক্ত স্রোতে ভেসে যাবে", 'হাত জোড় ক'রে বল 'বন্দেমাতরম' এবং 'হিন্দুদের কল্যাণে যারা কাজ করবে তারাই দেশ শাসন করবে।'

২৫.৩.৯৮ ভূপালের গো-রক্ষা আন্দোলন সমিতির নেতৃত্বে, বজরং কর্মী, আর্য সমাজ এবং হিন্দু উৎসব সমিতি, ভবানীচকে, গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবীতে দু'দিনের এক মৌন ধর্ণার আয়োজন করে।

"১৯৯৮ সালের ১০ থেকে ১২ এপ্রিল, ভূপালের দীদ্দয়াল কম্প্লেক্সে বজরং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এক আঞ্চলিক সম্মেলনের আয়োজন করে-যার প্রধান উদ্দেশ্য 'ভোজশালা মুক্তি আন্দোলন' সংগঠিত করা। এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ৬.১২.৯৮ তারিখ মাননীয় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান, তাঁর বিরুদ্ধে মিছিল, সমাবেশ সংগঠিত করা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে একই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

"বজরং দলের আঞ্চলিক আহ্বায়ক আদেশ জারি করেন যে, ১৪ আগস্ট দিনটিকে 'অবিভক্ত ভারত' দিবস হিসাবে অবশ্যই পালন করা হবে এবং ১৫ আগস্ট তারিখ যদি 'জিন্নাহ্' ছবিটি প্রদর্শনের চেষ্টা হয় তবে অবশ্যই বাধা দেওয়া হবে। বিভিন্ন সিনেমা হলের ম্যানেজারদের এই মর্মে অনুরোধ জানানো হবে– তবে তারা অনুরোধ না শুনলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ গ্রহণ করা হবে।"

"১৭.২.৯৯. সারগুজা ও কোরিয়া জেলায় বজরং দল এবং আর.এস.এস-এর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় দুদিনের এক অনুশীলন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বিষয়ের সাথে, 'হিন্দুত্ব রক্ষা', 'ধর্মান্তরিতকরণ এবং 'গো-হত্যা ইত্যাদিও আলোচিত হয়।"

২৯.১.৯৯, বিদিশার সেন্ট মেরী স্কুলের অধ্যক্ষ ফাদার যোশেপ স্থানীয় থানায় এই মর্মে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, ২ জন যুবক প্রায় ২টা ৩০মিঃ নাগাদ সেন্ট মেরী স্কুলে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে তাকে 'ফাদার' বলা হয় কেন? যুবকদ্বয়ের একজন, বজরং দলের সভাপতি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে, এটা রামের দেশ।' এখানে 'পিতা'কেই 'ফাদার' বলা হয়। ঐ একই তারিখে ফাদার যোশেপ অপর একটি লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন যে, তিনজন যুবক তাঁর রক্ষীকে এই মর্মে হুমকি দেয় যে যোশেপকে হত্যা করা হবে। এই রক্ষীর বিবৃতির ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয় এবং ৩১.১.৯৯ তারিখ অভিযুক্ত তিন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৪.৯.৯৯. বজরং দলের জাতীয় সংগঠন শ্রী রাজেন্দ্র পকংজ, ভূপালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে, যে কোনো মন্দির জাতীয়করণ সম্পর্কিত যে কোনে প্রশাসনিক পদক্ষেপের বিরোধীতা করেন।

যদি উল্লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণ-বজরং দলকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণার পক্ষে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দাবীকে যথেষ্ট শক্ত ভীতের উপর দঁড় করিয়ে থাকে তবে গুজরাটে সাম্প্রতিক নরহত্যা বজরং দলকে নিষিদ্ধ করার দাবীকে একান্তভাবে আবশ্যিক করে তুলেছে।

কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা সংগঠনকে কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহ্‌বিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রদানের অধিকার ও ক্ষমতা ৭নং ধারায় বিশদভাবে উল্লেখ রয়েছে। ৭(১) নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে একবার কোনো সংগঠন 'বে-আইনি' ঘোষিত হলে, কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ বলে সেই সংগঠনের সম্পত্তি ও তহবিল বাজেয়াপ্ত করতে পারে, তার সমস্ত ব্যাংকের জমা টাকা ও সমস্ত আর্থিক লেনদেন বন্ধ করে দিতে পারে। এই ধারাটিতে অবাঞ্ছিত সংগঠনগুলিকে আর্থিক সহায়তা দানের মারাত্মক পরিণাম আলোচিত হয়েছে। এদের তত্ত্ব এবং বেতনভূক্ত কর্মীদলের মধ্যে এমন এক ভয়াবহ সম্পর্ক বর্তমান যা ভাড়াটে সৈনিকদের মত অস্ত্র বহন, লুঠ, ধর্ষণ এবং হত্যার তত্ত্ব ছড়িয়ে দিতে এদের উদ্বুদ্ধ করে।

এই আইনের আওতায় 'ক্রিমিন্যাল প্রোসেডিওর কোড' অনুসারে আর্থিক লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি সংক্রান্ত আদেশ জারি করতে হবে যা পক্ষকালের মধ্যে কোনো জিলা আদালতে আপিল করার সুযোগ পাবে।

অনুরূপভাবে, ৮নং ধারাটিতে বে-আইনী কোনো সংগঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো বাড়ি, ইমারৎ, তাবু বা জাহাজের উপর আদেশনামা জারি করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়েছে। এ রকম সংগঠনগুলি বে-আইনি সমাবেশ সংগঠিত করার জন্য যে সব জিনিসপত্র ব্যবহার করার আয়োজন করবে সে সব কিছুর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ক্ষমতা জেলা শাসকদের দেওয়া হয়েছে। বজরং দল ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের শাখাগুলি গোপন শিবির ও আশ্রয়স্থলগুলির উপর এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে পারলে কার্যকরী ফল ভাল করা যেতো।

গুজরাটে মহিলা, শিশুদের অস্ত্র শিক্ষা শিবির

গুজরাটের দাংস্ জেলার শতপুরাতে স্বতম্বরা বিশ্ব বিদ্যাপীঠ আয়োজিত ৪৯তম নিখিল ভারত গ্রীষ্মকালীন অনুশীলন শিবির ৩ মে থেকে ২২ মে, শিশু ও মহিলাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হবে। 'লাঠিখেলা', 'রাইফেল সুটিং, ধ্যান, 'যোগাসন' 'প্রার্থনা', 'আধ্যাত্মিক' ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের অনুশীলন ও এ সম্পর্কে আলোচনা– এই শিবিরের শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত। দশ থেকে বার বৎসর বয়সী শিশুরা ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারে।

(এশিয়ান এজ– ২৭ মার্চ ২০০২)

খুনীরা 'ত্রিশূল হাতে', সংঘ পরিবারের প্ররোচনা...

'যা দিয়ে খুন করা যায় এমন চল্লিশ লক্ষ ত্রিশূল ও রামপুরী ছোরা, সারাদেশ জুড়ে বজরং দল বিতরণ করেছে। এই অস্ত্রগুলো বেশ চালাকির সাথে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে বহন করা চলতে পারে।

(অশোক গেহলট্, মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্থান)

* কৃপানের মত ত্রিশূলও ভারতীয় অস্ত্র আইনের আওতার বাইরে।

* এর ফলে, পুলিশ প্রশাসন বা সরকার, ধর্মের ফাঁকে সাধারণ মানুষের অস্ত্র সজ্জা প্রতিরোধে সম্যকভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

* ভারত রাষ্ট্র ও সাধারণ নাগরিকদের এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া কি?

(কমিউন্যালিস্‌ম কমব্যাট, নভেম্বর ২০০১)

দেশাই মোসাড বজরং দলের অযোধ্যা শিবিরের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে

"আমি বজরং দলের একজন সদস্য হিসাবে প্রভু 'হনুমানের নামে শপথ গ্রহণ করছি যে আমার দেশ, সংস্কৃতি এবং ধর্ম রক্ষার্থে আমি সর্বদা প্রস্তুত থাকব।"–

১৫ থেকে ২১ বৎসর বয়সী ১৫০ যুবক, গত একসপ্তাহ ধরে এয়ারগানের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ অনুশীলন সমাপ্ত করার পর অযোধ্যার করসেবক পুরমে, বজরং দলের জাতীয় সহ-সংগঠক প্রকাশ শর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে এই

শপথ আবৃত্তি করেন। উচ্চস্বরে 'জয় শ্রীরাম', 'জয় বজরংবলী' ধ্বনীর মধ্যে গত সন্ধ্যায় এই অনুশীলন শিবির সমাপ্ত হয়। "এই শিবিরে সে কি করেছিল' প্রশ্ন করা হলে- একজন বজরং দলের সক্রিয় কর্মী নিম্নস্বরে জানায়- "আমি বজরং দলের গোপনীয় কাজের ভারপ্রাপ্ত। ইস্রায়েলের মোসেড আমার প্রেরণা।' এর বেশি কিছু বলা যাবে না।"

বজরং দলের নেতৃবন্দ কণ্ঠকল্পিতভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, তাদের শিবিরে 'লক্ষ্যভেদ' অনুশীলন অপেক্ষা শারিরীক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অধিকভাবে প্রয়াস চালানো হয়ে থাকে। দলের নেতৃবর্গ দাবী করেন যে, তাদের কর্মীদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়। শর্মার ভাষায়, "আমরা আমাদের কর্মীদের ১৯৯৬ সাল থেকে আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছি। ১০ মে কনার্টকে এবং ৩০ জুলাই গুয়াহাটীতে আলোচিত এবং পরিকল্পিত ২৫টি শিবিরের মধ্যে অযোধ্যার শিবিরটি অন্যতম একটি মাত্র।"

দলের কর্মীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া, যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বজরং দলের, পদাধিকারীরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। শর্মার প্রতিক্রিয়া,- "তোমরা কি কখনো 'স্কাউট' বা 'ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পসের' সদসদের এ রকম প্রশ্ন কর? তারা যদি দেশের সুরক্ষার জন্য যুবকদের শিক্ষা দিতে পারে তাহলে আমরাও পারি। অস্ত্র প্রশিক্ষণ তাদের নৈতিকতার এবং আত্ম প্রত্যয়ের উন্নয়ন ঘটায়।"

(দি-ইন্ডিয়ান একপ্রেস, ৩০ জুন ২০০০)

হিন্দু সংগঠনগুলি অস্ত্র-শিক্ষা শিবির পরিচালনা করে

লখনউ, সদস্যদের দর্শনীয় ভূমিকা পালনের যোগ্য করে তোলার অভিপ্রায়ে হিন্দুত্ববাদী দক্ষিণপন্থী দলগুলি গত সপ্তাহে অযোধ্যায় ১০ দিনের এক শিক্ষণ শিবির পরিচালনা করে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার শাখা সংগঠন বজরং দলের কর্মীরা, এয়ারগানের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে। উত্তরপ্রদেশের বজরং দলের প্রধান বেদপ্রকাশে শচন এই শিবির সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "এটা প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়, পরবর্তী ধাপে, আমরা ছেলেদের প্রকৃত বন্দুক এবং রাইফেল ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ দেবো। এটা হিন্দুদের সুরক্ষার জন্য আমাদের অনুশীলন সূচী।"

শচন পরিচালিত করসেবক পুরমের অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরটি উত্তরপদেশে সংগঠিত প্রথম শিবির নয়। শচনের ভাষায়, "একই ধরনের শিবির বারানসী, মথুরা এবং মীরাটেও সংগঠিত হয়েছে। যে সব অংশগ্রহণকারী গুলি ছোঁড়ায় দক্ষতা প্রদর্শন করে, তাদের উন্নততর প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করা হয়।" অযোধ্যার কোনো কোনো অধিবাসী সন্দেহ করেন যে, এই দলগুলি অত্যন্ত গোপনে তাদের কর্মীদের উন্নততর আগ্নেয় অস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

(ইন্ডিয়া এ্যাবরড নিউজ সার্ভিস, জুলাই- ৭, ২০০০)

পশ্চিমবঙ্গেও বজরং দল অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে

কলকাতা, সম্প্রতি কলকাতায় অত্যন্ত গোপনে ২টি অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়েছিল। যে শিবির দুটিতে বজরং দল এবং দুর্গাবাহিনীর ১১৪ জন সক্রিয় কর্মী, বন্দুক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিয়েছে। নদীয়া জেলার চাকদহে কমলপুর হাইস্কুলে, ২৬ মে থেকে ৯ জুনের মধ্যে প্রথম শিবিরটি উদ্‌যাপিত হয়। ১৫ থেকে ২৫ বৎসর বয়সী ৫২ জন যুবককে এই শিবিরে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। যোগ, নিযুক্ত (ক্যারাটে) এবং লাঠিখেলা ছাড়াও দলের সক্রিয় কর্মীদের রাইফেল ছোড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পূর্ণ সামরিক কায়দায়, হামাগুড়ি দিয়ে চলা বা আগুনের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে পার হওয়ার প্রশিক্ষণ তাদের দেওয়া হয়। অধিকাশ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীই নতুন এবং দশজন প্রশিক্ষক সকলেই পশ্চিমবঙ্গের।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের মহিলা শাখা 'দুর্গাবাহিনীর' উদ্যোগে ৩০ মে থেকে ৭ জুনের মধ্যে, দুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজারে দ্বিতীয় শিবিরটি পরিচালিত হয়। এই শিবিরে সর্বমোট ৬২ জন মহিলা তাদের পুরুষ সতীর্থদের মত একই ধরণের সামরিক প্রশিক্ষণ লাভ করে।

এই শিবির পরিচালনার কথা স্বীকার করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাজ্য সম্পাদক অজয় কুমার নন্দী বলেন যে, এই ধরনের শিবির এ রাজ্যে বিগত দশ বৎসর যাবৎ প্রতিনিয়ত পরিচালিত হয়ে আসছে। "এ সম্পর্কে গোপনীয়তার কিছু নেই। প্রত্যেক বছর আমরা এ ধরনের শিবির সংগঠিত করি। এ সম্পর্কে পুলিশ সম্পূর্ণ অবগত। তারা এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত নাক গলায়নি।" অবশ্য নন্দী উল্লেখ করেননি যে কোন উৎসব থেকে তারা এই রাইফেলগলি সংগ্রহ করছে।

নন্দী আরো জানান যে, এ রাজ্যে বজরং দল এবং দুর্গাবাহিনীর ৩০০০ সদস্যের একটি সামরিক শিক্ষণ প্রাপ্ত বাহিনী গঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, "জাতীয় স্তরে ৩০ লক্ষ সদস্যের এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনের জাতীয় কর্মসূচীর অংশ হিসাবে, আগামী এক বৎসরের মধ্যে এ রাজ্যে ৩০ হাজার সদস্যের এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হবে।" নন্দী আরো জানান যে, এখন পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সদস্যের অধিকাংশই মালদা, হুগলী এবং উত্তর ২৪ পরগণা জেলা থেকে এসেছে।

এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদ নেতৃত্ব বলে থাকেন যে, এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে "সমাজ এবং রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দান।" দুর্গাবাহিনীকে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নারী হরণের ঘটনার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের বিশেষ নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। এই বাহিনীর একটি নির্বাচিত গোষ্ঠিকে পাকিস্তান পরিচালিত 'ইন্টার সার্ভিস' গুপ্তচর বৃত্তি প্রতিরোধের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

(দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, জুন– ২০০০)

বন্দুক এবং হিন্দুরাষ্ট্র

লখনউ, ফট্-ফট্-ফটাফট্। কানে তালা লাগানো গুলির শব্দে চারপাশের শান্ত পরিবেশ প্রায় প্রতিনিয়ত রহস্যজনকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। গজিয়ে ওঠা জোপ ঝাড়ের মধ্যে এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে জনৈক ব্যক্তি, ২২ থেকে ৩০ বৎসর বয়সী ১৫জন মানুষকে হাতে রাইফেল নিয়ে উপুড় হ'য়ে শুয়ে থাকতে হঠাৎ দেখতে পান। তারা বিভিন্ন স্থানে কাঁচের বোতল বসিয়ে 'লক্ষ্যভেদ' অনুশীলন চালাচ্ছে। বন্দুক সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বয়স্ক ব্যক্তি এদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রশিক্ষকের নির্দেশাবলী শুনেন এবং মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুশীলন পর্ব শুরু করে।

এদের নিয়ম-নীতি অত্যন্ত সরল– দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ। এদের মতে, বন্দুকের নলই হচ্ছে হিন্দুত্বের শক্তির উৎস। এরা শিবসেনার একটি নবগঠিত শাখা সংগঠন 'রাষ্ট্রীয় মুক্তি সেনানী' দলের সদস্য। রাজ্য-রাজধনী থেকে ৯০ কি.মি. দূরে, বিগত ১৫ দিন যাবৎ এরা একটি অস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করছে।

(দি টাইমস অব ইন্ডিয়া ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০১)

ভাষান্তর : নির্মল চট্টোপাধ্যায় (সূত্র ঃ "কম্যুনালিজম কমব্যাট", উজানে)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির গুজরাত পরিদর্শনের প্রতিবেদন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে গুজরাতে যে সমস্ত মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বলি হয়েছেন, সেইসব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করার জন্য এবং সেইসব নৃশংস ঘটনাবলি প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ভারতের কমিউস্টি পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দল এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা গুজরাতে পৌছান। মার্চ মাসের ১০-১৩ তারিখ পর্যন্ত তারা গুজরাতে অবস্থান করে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। এই প্রতিবেদন তারই ফলশ্রুতি। সমীক্ষক দলটি প্রায় এক হাজারের বেশি মানষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তার মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের পীড়িত মানুষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ, আমেদাবাদের প্রশাসনিক আধিকারিকেরা, ত্রাণ কমিটির সদস্যরা, নাগরিক কমিটির সদস্যরা, একাধিক এন জি ও এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। সমীক্ষক দলটি ১২ মে রাজ্যপাল শ্রী এস এস ভাণ্ডারীর সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি এবং তাদের মূল পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তাব জমা দেন। তারা মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অপসারণ দাবী করেন।

সমীক্ষক দলটি আমেদাবাদের শাহ আলম, বাপুনগর, আমান চক, সুন্দরম নগর, জুহাপুর, ৭,৮ নং কাণ্ডারিয়া মিউনিসিপ্যাল স্কুল দরিয়াখান ঘুমট ইত্যাদি শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন। সমীক্ষক দলটি গোধরার যে স্থানে বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল সেই স্থানটিও পরিদর্শন করেন। তারা গোধরার সিভিল হাসপাতাল এবং ইকবাল রিলিফ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। একজন সদস্য মেহেসোনা জেলার শিবিরগুলি পরিদর্শন করেন।

এই কেন্দ্রীয় সমীক্ষক দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী সুবোধ রায় (এম পি) এবং বৃন্দা কারাত, সুহাসিনী আলি, কিরণ মোঘে, মরিয়ম ধাওয়ানে এবং অরুণ মেহেতো (সম্পাদক, সি পি আই-এম), গুজরাত কমিটি এবং মহেশ চাঁদ, ইভা মেহেতা, নলিনী জাদেজা এবং যশোদা বেন।

সবরমতী এক্সপ্রেসে যাত্রারত করসেবকদের উপর অমানবিক আক্রমণে যে ৫৮ জনকে পুড়িয়ে মারা হয় তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল নারী ও শিশু। এইঘটনায় গোটা দেশ ধিক্কার, ক্রোধ ও আঘাতে ফেটে পড়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দিক থেকে দোষীদের শনাক্ত করা ও গ্রেপ্তার করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। রাজ্যপালকে প্রদত্ত স্মরকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিনিধিদলের গোধরা পরিদর্শন রাজ্য সরকারের এক বিস্ময়কর উদাসীনতা ও গাফিলতিকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে, যার ফলে পোড়া ট্রেনের কামরাটি, যা অবশ্যই এই ভয়াবহ আক্রমণের তদন্তে অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ, তার সুরক্ষা করা হয়নি। প্রতিনিধিদল দেখে যে দগ্ধ বগিটির ভিতর বস্তা বস্তা শষ্যদানা, স্টোভ, কেরোসিন বা রান্নার তেলের জন্য ব্যবহার করা হয় এমন ডিব্বা ছিল। এই ঘটনা এক সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে, যা হল, বগিটির ভিতরে দাহ্য পদার্থ ছিল। যাই হোক না কেন, ঘটনাটির তদন্ত ত্বরান্বিত করতে হবে। রাজ্যের ভিতরে এই তদন্তের ভারপ্রাপ্ত প্রধানের বিরুদ্ধে চাপা গুজব উঠেছে যেহেতু তার উগ্র হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ইতিমধ্যেই প্রচারিত এবং তিনি যখন হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন একটি রায় নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট তার সমালোচনা করে এই বলে যে, তিনি ঘটনার চেয়ে কল্পনার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (আসলে পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা যায়, বগির কামড়ার ভিতরের আগুনেই দুর্ঘটনাটা হয়– সংকলক)।

২৭ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী ঘটনাবলি স্পষ্টতই সরকারি পৃষ্ঠপোষণায় সংঘটিত মুসলমান সম্পদায়ের বিরুদ্ধে হিংসার জ্বলন্ত উদাহরণ। 'দাঙ্গা' এই শব্দটি এখানে ব্যবহার করা একেবারেই ভুল হবে। সবরমতী এক্সপ্রেস-এর রেল কামরা জ্বালিয়ে দেবার স্বতস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই ঘটনা ঘটেছে, মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই ব্যাখ্যা, এই প্রতিবেদনের পরিবেশিত বাস্তব সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যদি মুখ্যমন্ত্রীর যুক্তিই

সত্য হত তাহলে প্রথমেই আক্রান্ত হত গোধরা, যেখানে ঘটনাটি ঘটেছে। সমীক্ষক দল যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ঘটনাটি ঘটে যাবার এক ঘন্টার মধ্যে স্থানীয় প্রশাসন অন্যান্য ঘটনার তুলনায় এত দ্রুত এবং দৃঢ় হাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে ঘটনাটি শহরের মধ্যেই অত্যন্ত ভালোভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। অন্য জায়গায়, বিশেষভাবে আমেদাবাদে, প্রশাসন নয়, সঙ্ঘ পরিবারের জনপ্রতিনিধিরা প্রথম চব্বিশঘন্টা তাদের বিপুল সাংগঠনিক শক্তিকে ব্যবহার করে প্রচার করে। তাদের ডাকা ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ১লা মার্চের এই দু'দিনের বন্‌ধ শহর এলাকায় হিংসাকে ছড়িয়ে দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। স্বীকৃতভাবে সাম্প্রাদয়িকতায় আক্রান্ত এই রাজ্যের ইতিহাসেও এই প্রথমবার বাপুনগরের মতো শুধু মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাও ছারখার হয়েছে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে, এই কাজ সম্ভব হয়েছে এই কারণে যেসব জায়গায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বাধীন দঙ্গলের পাশে ছিল পুলিশ। প্রাথমিকভাবে শাসকদলের উচ্চপর্যয়ের নেতৃবৃন্দের, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের এবং মন্ত্রীদের দুষ্কর্মে জড়িত থাকার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, যার কিছু কিছু এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। আমেদাবাদে, তাদের জন্য কোন কার্ফু ছিল না।

সরকার তার কর্মদক্ষতার প্রমাণ হিসেবে দাবী করেন যে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি সামাল দিতে পেরেছেন। ৭২ ঘণ্টা লুঠতরাজ, খুন, রাহাজানি করার স্বাধীনতা একটি সম্প্রদয়কে ধ্বংকরার পক্ষে যথেষ্ট। অধিকন্তু, হিংসা এখনও শেষ হয়নি। এমনকী আমাদের সঙ্গে আলোচনার সময় রাজ্যপাল স্বীকার করেন যে, আক্রমণ ছিল আরো দীর্ঘ সময় জুড়ে; তবে তার মতে কোন 'হত্যার ঘটনা সেখানে ঘটেনি।' বর্তমানে রাজ্যে সেনাবাহিনী মোতায়েন আছে। উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকেরা এই মাসের শেষে হোলি এবং মহরম এই সময়ে উদ্‌যাপনের বিষয়ে আশান্বিত। সমীক্ষক দলটি দাবীকরে যে সেনাবাহিনী শুধু গুজরাতে এই মাসের শেষ অবধি থাকবে তাই নয়; আক্রান্ত গ্রামীণ এলাকায়ও তাদের উপস্থিতি আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আজও, কিছু জেলায় নতুন করে হিংসার খবর আসছে।

হিংসার ধরণ, বাম এবং বিত্তবান মুসলমানদের চিহ্নিত করা, তাদের সম্প্রদায়গত অবস্থানকে গোপন রাখা, হিংসার ধরণ, এবং মুসলিম মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর আক্রমণ (এমনকী সেই সব ক্ষেত্রে, যেখানে নাম থেকে মালিকের সম্প্রদায়গত পরিচিতি চিহ্নিত করা যায় না), এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রমাণ দেয়। আমাদের বলা হয়েছে যে সাম্প্রতিককালে জনগণনার আড়ালে বাড়ি বাড়ি ঘুরে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্রেন, বেলচা, ট্রাক ইত্যাদির ব্যবহার করে দেওয়াল ভাঙাকে কোনভাবেই 'স্বতস্ফূর্ত' বলা যায় না। রাজ্য সরকারের সহযোগিতার সবচেয়ে লজ্জাজনক ও মর্মান্তিক উদাহরণ হল

অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় সুফি কবি ওয়ালি গুজরাতির মাজারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ করে দেওয়া। সমীক্ষক দল বুঝতে পারেনি এই পরিপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। আমেদাবাদে ৪৪টি মসজিদ ট্রাক এবং বুলডোজারের সাহায্যে ধ্বংস করা হয়েছে। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করাই ছিল লক্ষ্য।

ইন্দিরা গান্ধী হত্যার অব্যবহিত পরে যে তৎকালীন শাসকদলের নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে তাদের সম্পত্তির ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছিল সেই ঘটনাবলির সঙ্গে গুজরাতের ঘটনাবলির তুলনা করেছেন সমালোচকেরা। কিন্তু প্রতিবেদন থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে, তুলনার ক্ষেত্রটি সীমিত। গুজরাতের ঘটনাবলী হল হিন্দু রাষ্ট্রের রাজনৈতিক জিগির তুলে সংখ্যালঘু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ পরিবারের দীর্ঘদিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন সাম্প্রদায়িকতার বিষের বিস্তারের রক্তাক্ত ফসল। প্রতিবেদনে 'বি' নামে একটি যুবতী-নারীর কথা আছে। রণধিকপুর নামে একটি গ্রামে যেখানে এই নৃশংসতার কাহিনীটি ঘটেছিল যেখানে ১৯৯৯-এর প্রথম দিকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দল পুরো গ্রামটাকে আক্রমণ করেছিল এই জন্যে যে, তারা সন্দেহ করেছিল গ্রামবাসীরা আন্তঃসম্প্রদায় দম্পতিদের আশ্রয় দিয়েছে (দুজন হিন্দু মেয়ে এবং দুজন মুসলমান পুরুষ) যারা বিবাহ করেছে। সেই সময়ে ৩৫০ জন মুসলমানকে গ্রামছাড়া হতে হয়েছিল, এবং তাদের সম্পত্তি তছনছ করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে এক হিংস্র প্রচার চলে। কয়েক মাস পরে, পরবর্তী লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টান সম্প্রদায়। তারা আক্রান্ত হয় ১৯৯৯-এর অগাস্ট মাসে। সে সময়ে সংবাদে জানা যায় যে ৫০০০ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা দশ ঘন্টা ধরে খ্রীষ্টানদের বাড়িগুলি আক্রমণ করেছিল, অথচ পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এবারের হিংসায় আমেদাবাদের বাইরে প্রধান যে জায়গাগুলি আক্রান্ত হয়েছে, সেগুলি বিগত কয়েক বছরে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে জন-উন্মত্ততার সাক্ষী ছিল।

প্রতিনিধি দলের হাতে বছরের পর বছর ধরে সঙ্ঘ পরিবার প্রচারিত প্ররোচনামূলক লিফলেটের কপি তুলে দেওয়া হয়। সেগুলির বয়ান এমনই, যে প্রকৃত কোন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে তার প্রকাশকে অবশ্যই ঐ জন্য কারাবাস করতে হত। অযোধ্যা প্রসঙ্গে এবারের যে জনসমাবেশ সৃজন, তাতে কর সেবকরা এই লিফলেটগুলিকে ব্যাপকভাব ব্যবহার করেছে। সবরমতী এক্সপ্রেসের দগ্ধ বগিতে প্রতিনিধিদল এমনই একটা লিফলেট পায় যাতে তারিখ দেওয়া ছিল ১৮ই আগস্ট, ২০০১। এই কারণেই, গুজরাতের হিংসা নিছক ৭২ ঘন্টার বিচ্যুতি নয়, যেমন দাবী করছে সরকার, বরং হিন্দুত্ববাদী শক্তিদের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস।

সমীক্ষক দল দোকান লুঠ করার দৃশ্য দেখেছেন এমন প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমেদাবাদের একজন প্রথিতযশা শিল্পী সমীক্ষক দলের কাছে বর্ণনা করেছেন কীভাবে তার এক প্রতিবেশী এক গাড়ি দোকান-লুঠ করা জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। এরকম আরেকটি কাহিনীর আখ্যান হল, কীভাবে অনাবাসী গুজরাতিদের দ্বারা নির্মিত ও অধ্যুষিত কতকগুলি ফ্ল্যাটে নিবাসী দম্পতিরা সগর্বে তাদের প্রতিবেশীদের কাছে ওই রকম লুঠ করা ধন দেখাচ্ছেন তার বর্ণনা। শহরের বিত্তবান এলাকায় লুঠপাটের সব খবর ইঙ্গিত করে যে দরিদ্ররা নয়, লুঠপাট করেছে ভদ্রবেশধারী মধ্যশ্রেণীর মানুষ, যাদের মধ্যে মহিলারাও পড়ে।

এই সব লুঠপাটকারী শ্রেণীর মানুষেরা যে সব কলোনীতে বসবাস করেন সেইসব কলোনীতে আমরা যেতে পারিনি, তাই কত সংখ্যক মধ্যবিত্ত এই লুঠপাটে যুক্ত ছিল আমাদের পক্ষে তার পূর্ণাঙ্গ ধারণা করা সম্ভব হয়নি। আমাদের শোনা একটি ঘটনা : একজন মহিলা জুতোর দোকানে গেলেন, আর তার স্বামী গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি যে জুতো-জোড়া নিয়ে আসছিলেন তা স্বামীর পায়ে ঠিক না হওয়ায় তিনি আরেকবার দোকানে গেলেন সেটি বদল করে আনার জন্য। এই কাহিনী সত্যি হোক আর না হোক, এক বিবেকহীন লোভ আমেদাবাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষদের অন্ততপক্ষে দু'দিন ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। হিন্দুত্বের রাজনৈতিক মঞ্চ সবসময়ই 'অন্যদের বিরুদ্ধে' এই লুঠতরাজকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ দান করে চলেছে। এবং মুসলমানদের কাছ থেকে লুঠ করা সম্পত্তিকে 'রাজনৈতিকভাবে সঠিক অবস্থানের চিহ্ন' হিসেবে প্রদর্শন করেছে। ভারতবর্ষে এর সমতুল্য আর কোন উদাহরণ নেই।

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় গুজরাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থাপন্ন মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। এই আক্রমণ সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে এবং বিভিন্ন শিল্পে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহায্য করেছে। আমেদাবাদের ভস্মরেখার যে চিহ্ন রয়েছে, তার মধ্যে একটি পরিসংখ্যানে পাওয়া যাচ্ছে মুসলমান চালিহার সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন ৭০০টি বড় এবং ছোট হোটেল। এই সব হোটেলের তালিকার মধ্যে বেশ কিছু হিন্দু নামের এবং যেগুলির মালিকানা ছিল ওই আগুন লাগানো দলের কারো কারো। তাই মুসলামন সম্পত্তিগুলি চিহ্নিত করা সহজ ছিল। অনেক গ্রাম্য এলাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ একটি গোষ্ঠী সুদের কারবারী অথবা রেশন দোকানের মালিক। তারা আদিবাসী ও গরীব মানুষদের টাকা ধার দিত। যারা প্রাণে বেঁচেছেন, তারা সমীক্ষক দলের কাছে জানিয়েছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ট্রাকে করে আদিবাসীদের এনেছিল লুঠ ও অগ্নিসংযোগ করার জন্য। এইসব ঘটনাবলী শুধুই সাম্প্রদায়িক অনুভূতি-জারিত নয়,

অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতও জড়িত ছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং তাদের 'বনবাসী' সংগঠনগুলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যা খৃষ্টান আদিবাসীদের প্রতি হিংসার সময় লক্ষ্য করা যায়। এই ভিত্তিটিকেই এখন নানা গ্রামীণ এলাকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কিছু আক্রান্তদের বিবরণ যা এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বর্বরতার একটি স্তবকে প্রতিবিম্বিত করে, যা সত্যিই স্তম্ভিত করে দেয়। আমেদাবাদ বহু সাম্প্রদায়িক ঘটনা ও দাঙ্গার সাক্ষী। প্রত্যেকেই বলেছেন শিশু ও মহিলাদের পুড়িয়ে মারার এত ঘটনার কথা তারা জানতেন না। সমীক্ষক দল বহু মহিলাদের সঙ্গে কথা বলেছে যারা তাদের সন্তান ও স্বামীকে রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছেন। সমীক্ষক দল যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তাদের প্রায় সকলেই শিশু ও নারীকে পুড়িয়ে মারার মুহূর্তের আতঙ্কের কথা বলেছেন। এই প্রতিবেদনে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, মৃত মানুষের সংখ্যা এবং যত সংখ্যক সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে– তার সংখ্যা রাজ্য সরকারের পরিবেশিত পরিসংখ্যানের চেয়ে অনেক বেশি। ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে তার কারণ গণহত্যা, লুঠ, গণ ধর্ষণ এসবের দশদি পরেও এফ আই আর করানোর সামান্যই উদ্যোগ লক্ষ্য করা গেছে। পরিস্থিতি এখনও খারাপ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভয়ংকর নিরাপত্তাহীনতা পুনর্বাসনের সমস্ত বিষয়টিকেই যেন ব্যঙ্গ করছে। গৃহহীন, আক্রান্ত মানুষগুলির কোথায় পুনর্বাসন হবে? আজকের ঘরছাড়া পরিবারগুলি বিশ্বাস করে যে তারা যে অঞ্চলে বা গ্রামে বসবাস করতেন সেখানে তারা আর ফিরতে পারবেন না। মৌলিকভাবে ভিন্নতর রাজনৈতিক অবস্থা এবং সরকারের পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, যারা মুসলমান সম্প্রদায়ের শান্তিতে ও নিরাপদে থাকার বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবেন।

সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে প্রায় এক লক্ষের মতো মানুষ আছেন ত্রাণ শিবিরে। এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে ত্রাণ শিবিরগুলির অবস্থা অবর্ণনীয়। মানসিক অবসাদ আর বেদনা শিবিরগুলিকে ঢেকে রেখেছে। তবুও দশম আর দ্বাদশশ্রেণীর ছাত্ররা ২৮শে মার্চ তাদের বোর্ডের পরীক্ষা দেবে বলে আশা করা যায়। গতবছর জানুয়ারি মাসে গুজরাতে যখন ভূমিকম্প হয়েছিল তখন সরকার সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছিল যে ভূমিকম্প-পীড়িত এলাকার ছাত্রদের দু'মাসের জন্য পরীক্ষা স্থগিত রাখা হবে। এতদসত্ত্বেও এই ধরনের সহানুভূতি আজ আর নেই। তার অর্থ এই যে, সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় বা শিবিরে যে সব ছাত্রছাত্রী আছে, হিন্দু বা মুসলমান যাই হোক না কেন, তাদেরকে একবছর নষ্ট করা অথবা ফেল করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তবুও গুজরাতের এই আতঙ্কের মধ্যেও মানবিকতা ও পবিত্রতার কণ্ঠস্বরও শোনা গেছে। সম্প্রদায়ের ত্রাণের কাজে যুক্ত কর্মীদের অভাবনীয় কর্মকাণ্ড দেখে সমীক্ষক দল অভিভূত হয়েছেন। সমীক্ষক দল বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন যাদের মধ্যে নবীন, প্রবীণ, পুরুষ ও মহিলা আছেন– যারা সাম্প্রদায়িক হিংসা

সৃষ্টিকারী দলের বিরুদ্ধে তাদের আতঙ্ক আর ক্রোধের কথা প্রকাশ করেছেন। তারা সবাই তাঁদের অসহয়তার কথা প্রকাশ করেছেন। তারা প্রশ্ন রেখেছেন : যখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশাল বাহিনী সামনে, তখন আমরা কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো? যা ঘটেছে আমরা তার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমরা কি করতে পেরেছি? মানুষের চেতনায় এইসব প্রশ্ন অবিরাম তাড়িত করে ফেরে। এমন ঘটনাও ঘটেছে যেখানে প্রতিবেশিরা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষা করেছেন। কিছু জায়গায় যেমন, জুহাপুরায় কিছু হিন্দু পরিবার ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের সম্পত্তির কোনো ক্ষতি হয়নি। শাহ্-এ-আলম শিবিরের পরিচালকেরা একটি মন্দিরে একটি শিবির চালিয়েছেন যেখানে একদল হিন্দু পরিবার এসে রয়েছে। এইসব উদাহরণ থেকে আশা জাগে।

সমীক্ষক দল তাদের বিস্তৃত প্রবিবেদন প্রস্তুত করেছেন যাতে বেশি সংখ্যক মানুষ সচেতন হয়ে পড়েন যে হিন্দু রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে জাতিকে মূল্য দিতে হচ্ছে।

সমীক্ষক দলের প্রতিবেদন :

গোধরা, পাঁচমহল জেলা, মার্চ ১১, ২০০২

সমীক্ষক দল ১১ মার্চ পাঁচমহল জেলার গোধরা শহরটি পরিদর্শন করে। তারা ডিস্টিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, রেলওয়ে আধিকারিক, রেলওয়ে পুলিশের আধিকারিক, ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে বিভিন্ন হাসপাতালে দেখা করেন। ইকবাল প্রাথমিক বিদ্যালয় যেখানে ১৮০০ মানুষের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, সমীক্ষক দল সেখানে শিবির পরিচালনা এবং পীড়িতদের সঙ্গে কথা বলেন। এই দিনই প্রথম সারা দিনের জন্য কার্ফু শিথিল করা হল এবং আবার ৬টার সময় কার্ফু শুরু হবে।

জেলা শাসক শ্রীমতী জয়ন্তী রাভী সমীক্ষক দলকে জানান যে তিনি ২৭ তারিখ ৮টা ৫ মিনিটে রেলওয়ে স্টেশন থেকে সংবাদ পান যে সবরমতী এক্সপ্রেসে ইট-পাটকেল মারা হয়েছে। ৮টা ২০মিঃ তিনি আবারও সংবাদ পান যে, কয়েকটি কামরা জ্বলছে। তাঁর কথা অনুসারে তার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল, যাতে পুলিশ, দমকল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধপত্রসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। পুলিশ এবং আর পি এফ জনগণকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালালে দুজন মুসলমান মারা যান। দমকল কর্মীরা পৌছেন ঠিক ৮টা ৩০ মিনিটে। তিনি আরো অতিরিক্ত পুলিশ পাঠাতে বলেন। তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্পর্কেই তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন। শুধু এটুকু জানান যে, রেললাইনের চারপাশে বসবাসকারী কয়েকশো লোকের ভিড় হয়েছিল এবং আহত সবাইকেই বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়, এবং পরে আমেদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি ১০টার সময় কার্ফু জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং দুপুরের মধ্যেই তা কার্যকর হয় যখন স্কুলের শিশুদের নির্বিঘ্নে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১২টা ৪০মি ট্রেনটি আমেদাবাদ যাত্রা করে।

জেলাশাসকের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সমীক্ষক দল সন্তোষ প্রকাশ করেন। এবং এই দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য 'সাম্প্রদায়িকভাবে-সংবেদনশীল' বলে বর্ণিত এই শহরে বড় মাপের কোন হিংসা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। পরে, সমীক্ষক দল যখন ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন তখনও আক্রান্ত মানুষরা ত্রাণ এবং চিকিৎসার সাহায্যের ব্যাপারে প্রশাসনের সদর্থক ভূমিকার কথা বলেন। গোধরায় ক্ষতির সঠিক পরিমাণ ও বিবরণ সংগ্রহ করা সমীক্ষক দলের পক্ষে সম্ভব ছিল না, যেহেতু এই অল্প সময়ে শহরের চারদিকে ঘুরে আসা সম্ভবপর ছিল না।

২৭ তারিখে যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সেইসব প্রবীণ রেলওয়ে এবং আর পি এফ-এর আধিকারিকদের সঙ্গে সমীক্ষক দল দেখা করেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, স্টেশন মাস্টার শ্রী দীপক দেশপাণ্ডের স্ত্রী শ্রীমতী পূজা দেশপাণ্ডে আমেদাবাদ যাবার জন্য সবরমতী এক্সপ্রেসে উঠেছিলেন। যারা পুড়ে মারা গেলেন তার মধ্যে তিনি অন্যতম। সমীক্ষক দল দেশপাণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করে, কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। আধিকারিকদের বিবৃতি অনুসারে ট্রেনটি ৪ ঘণ্টা দেরিতে চলছিল। করসেবকরা যে ট্রেনে যাচ্ছেন এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন খবর ছিল না। আর পি এফ আধিকারিক জানান, সাধারণত মিছিলকারীরা ট্রেনে ভ্রমণ করলে তাদের কাছে আগাম খবর থাকে। এইভাবে যখন মিছিলকারীরা অযোধ্যায় যাচ্ছেন আর পি এফ এই সংবাদ পাবার পরই সংশ্লিষ্ট সেই আধিকারিক তাদেরকে পরবর্তী বড় জংশন পর্যন্ত পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মতে এসবের প্রয়োজন আছে, কারণ চায়ের দাম না-দেওয়া ইত্যাদি নানা ব্যাপারে মিছিলকারীদের সঙ্গে স্টেশনের গোলমাল লেগে যায়। সেজন্য আর পি এফের সজাগ থাকা প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী সময়ে দুজন লাইসেন্সধারী 'টি স্টলের' দোকানদার জানিয়েছেন বেশ কিছু করসেবক চায়ের দাম দিতে চায়নি এবং তারা একজন মুসলমান চা-ওয়ালাকে স্টেশনের মধ্যেই নানাভাবে হয়রান করছিল। যাইহোক, তিনি সমীক্ষক দলকে তাদের নাম বা কোথায় তারা থাকেন এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি। সেইজন্য এই বিষয়টি চিহ্নিত করা যায়নি। যখন সংবাদপত্রের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, চা-ওয়ালার ওই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কিনা তখন এর উত্তরে তিনি বলেন এবিষয়ে তিনি কিছু জানেন না, তবে করসেবকদের সঙ্গে চা-ওয়ালার ঝগড়া হয়েছিল। তিনি জানান যে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন হকারের কাছ থেকে কোন রকম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেনি কেননা কার্ফু শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রেলওয়ের আধিকারিক জানিয়েছেন ৭টা ৪৫ মিনিটে ট্রেনটি এসে পৌঁছায় এবং ৭টা ৫০ মিনিটে ছেড়ে চলে যায়। তিনি মনে করেন যে কয়েজন যাত্রী প্ল্যাটফর্মে থেকে যাওয়ার জন্য ট্রেন ছাড়ার পরেই চেন টানা হয়। তিনি দেখেছেন যে চেন টানার পরেই

যাত্রীরা ট্রেনে ওঠার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিয়েছেন। চেন টানার ঘটনাটি দু'বার ঘটেছিল : প্রথমবার ৭টা ৫৫ মিনিটে এবং দ্বিতীয়বার ৭টা ৫৮ মিনিটে। যদি এটাই সত্যি হয় তাহলে জনতার মধ্যে কিছু লোক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ট্রেনটিকে থামানোর চেষ্টায় ওপরে উঠেছিল, সেটা সত্য নাও হতে পারে। তার ধারণা প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ লোক (রেললাইনের পাশে সংলগ্ন কলোনীতে বসবাসরকারী মুসলমান) জড়ো হয়েছিল। তারা চীৎকার করছিল এবং তাদের পাথর ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছিলো। যেহেতু অন্য দিকে কোন জনতা ছিল না তাই অন্য যাত্রীরা পালাতে পেরেছিল। ট্রেনটা যেহেতু প্ল্যাটফর্ম থেকে কয়েকশো মিটার দূরে ছিল, তাই তারা জানতে পারেনি কখন, কীভাবে ট্রেনে আগুন ধরেছিল। কিন্তু সমীক্ষক দল যে সসক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন, তারা সবাই বারবার বলেছেন, তাদের অভিজ্ঞতায় তারা যত ট্রেন দুর্ঘটনা বা আগুন লাগার ঘটনা দেখেছেন তার মধ্যে এইরকম একটিমাত্র বগিতে আগুন লাগা এবং এত দ্রুত ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া তারা দেখেননি। তাদের মতে এটা তখনই সম্ভব হবে যদি পুরো বগিটায় পেট্রল ঢেলে দেওয়া হয় অথবা বগির ভিতরে দাহ্য পদার্থ থাকে। তাদের মতে, একটা বগি মানে ৭২ জন যাত্রী এবং তার মধ্যে ৫০ জনের বেশি যাত্রীর আদৌ বাইরে আসা সম্ভবই নয়। আধিকারিকদের ধারণা সম্ভবত পাথর ছোঁড়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই জানালায় শাটারগুলি নামানো ছিল। তাহলে বগির ভেতরে এত পরিমাণ দাহ্য পদার্থ কোত্থেকে এল যে যাতে বগিটা এত ভয়ঙ্করভাবে পুড়লো? যখন অগ্নি-নির্বাপক কর্মীরা এসে পৌছলেন তখন ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাদের ধারণা বীভৎস নৃশংসতার মূল বলি হলেন মহিলা ও শিশুরা, কেননা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বড়রা সহজেই বাইরে বের হবার দরজায় প্রথমেই পৌছতে পেরেছেন। সমীক্ষক দল এইসব শুনে আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন।

পোড়া বগির ভেতরে সমীক্ষক দল দেখতে পেয়েছেন প্রচুর খাদ্যশস্যের বস্তা থরে থরে সাজানো রয়েছে জানালার পাশে। সেখানে অবশ্য স্টোভ এবং হ্যারিকেনও ছিল। স্পষ্টতই করসেবকেরা এইসব জিনিসপত্র তাদের রান্নার জন্যই নিয়ে যচ্ছিল। বগির ভিতরে দাহ্য পদার্থের সম্ভাবনা ছিল এইটুকুই। বাইরের লোকের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ ছিল না।

ইকবাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবিরে প্রশাসন তাদের রেশন দিচ্ছিল এবং এফ আই আর করানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করছিল। পাঁচমহল এবং দাহোদ জেলার গ্রাম্য এলাকা থেকে মানুষেরা সেখানে গিয়েছিল। তারা ৩০০ এফ আই আর থানাগুলিতে ফ্যাক্স করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তার মধ্যে কতগুলি নথিভুক্ত হয়েছে তা তারা জানেন না।

শহরে যখন তুলনামূলকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে, গ্রাম এলাকায় অবস্থা তখন ভয়ংকর, প্রায় ৬০০০ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন।

সমীক্ষক দল ইকবাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিবিরে এবং হাসপাতালে বেশ কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করেন যারা পাঁচমহল এবং দাহোদ জেলা থেকে এসেছেন।

গোধরার বাইরে গ্রামীণ এলাকায়

'B'-এর গল্প।

'Y'-এর স্ত্রী 'B' দাহোদ জেলার রণধিকপুর গ্রামে ২১ বছরের মেয়ে। সে পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিল। আমরা শিবিরে তার সঙ্গে দেখা করি। দুর্বল, নিশ্চল, বাকশক্তি রহিত অবস্থায় সে টেনে টেনে একঘেঁয়ে একটা গল্প বলে যাচ্ছিল, যেন সে অন্যকারোর কথা বলছিল। ১লা মার্চ তার গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের বাড়িগুলি উচ্চবর্ণের মানুষেরা আরো কিছু বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে আক্রমণ করে। সে এবং তার পরিবারের আরো কয়েকজন পালিয়ে যায়। সে তাদের নাম বলে : আমার শিশু কন্যা সালেহা, আমার আম্মা হানিমা, আমার বোনেরা : মমতাজ আর মুন্নি, আমার ভায়েরা। ইরফন আর আসলাম, আমার মামা মজিদ, আমার আব্বার বোন : সুগরা আর আমিনা, তাদের একজনের স্বামী ইউসুফ, আমিনার ছেলে এবং তিন মেয়ে : শমিম, মুমতাজ, মেডিনা এবং শামিমের ছেলে হুসেন। সে বলে শামীম ছিল পূর্ণ গর্ভাবস্থা। ফলে তাদের দুজনের পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব ছিল না।

প্রথমে তারা পালিয়ে ৫/৬ কিলোমিটার দূরের চুন্ডাগি গ্রামে স্থানীয় বিধায়ক বিজল দামোরের আশ্রয়ে থাকে। যেহেতু ওই আশ্রয় নিরাপদ ছিল না তাই তাদেরকে চলে যেতে বলা হয় এবং তারা পায়ে হেঁটে কুয়াঝর গ্রামে পৌছেন এবং একটি মসজিদে তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। এখানে একজন দাই-মা শামীমের একটি কন্যা সন্তান প্রসব করান, কিন্তু তাদেরকে অতি দ্রুত সেই স্থান ছেড়ে যাবার জন্য বলা হয়, যেহেতু ওই মসজিদটি উন্মত্ত জনতার লক্ষ্যবস্তু ছিল। শামীম হাঁটতে পারছিল না, তার সদ্যোজাত শিশুটি তার বোন কোনরকমে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল; ক্লান্ত, নিস্পন্দভাবে সে তার শিশুটিকে নিয়ে যেতে চাইছিল– যাইহোক কোনরকমে তারা কুদ্রা গ্রামে পৌছায়। এখানে কিছু আদিবাসী মহিলারা শামীমের অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে তাদের কুঁড়েতে থাকতে দেয়। 'বি' মনে করতে পারে, তারা আমাদের খুবই দয়া করেছিল। শামীমের জামাকাপড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। যদিও আদিবাসীরা গরীব ছিল, তবুও তারা শামীমকে পরার জন্য পরিষ্কার জামাকাপড় দিয়েছিল। তারা আমাদের বিশ্রাম করতে দিয়েছিল; কিন্তু তারপর আবার আমাদের অন্যত্র যেতে হয়। তবে, তারা আমাদের সঙ্গে পরের গ্রাম 'ছাপড়ভড়'-এ পৌছে দিয়েছিল। 'বি' থামে। তার পাশের একজন মহিলা তার কাঁধে হাত রাখে। সে বলে চলে। পানিভেলা গ্রামের দিকে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। এটা দূরপ্রান্তের এক

পাহাড়ী জায়গা। হঠাৎ আমরা গড়ির শব্দ পেলাম। আমাদের নিজেদের গ্রাম এবং আরও বাইরে থেকে লোকও এসেছিল ট্রাকে। তারা আমাদের সাহায্যের জন্য আসেনি। ট্রাক থামার পর তাদের উন্মত্ততা শুরু হল। তারা আমার হাত থেকে মেয়েকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমাকে এবং অন্য আর একজন মহিলাকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হল। আমাকে তিনজন ধর্ষণ করেছিল। আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করছিলাম। তারা আমাকে বেধড়ক পিটিয়ে, মরে গেছি এই ভেবে চলে যায়। যখন আমার জ্ঞান ফিরে আসে তখন আমি একা। আমার চারপাশে আমার পরিবারের মৃতদেহগুলি আমার মেয়ে, সদ্যোজাত শিশুটি। পাথর দিয়ে ঢাকা ছিল তাদের শরীর। আমি সেদিন সারারাত এবং পরের দিনেও বেশিরভাগ সময় সেখানে শুয়ে ছিলাম। আমি বুঝতেই পারছিলাম না কখন আমার জ্ঞান আছে, আর কখন নেই। পরে লিমখেদা পুলিশ স্টেশনের একটি দল আমাকে দেখতে পায় এবং তারপর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে এখানে আনা হয়। হাসপাতালের ডাক্তারেরা মেডিকেল রিপোর্টে তার ধর্ষণের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তিনি তার পরিবারকে যারা হত্যা করেছে এবং যারা তাকে ধর্ষণ করেছে তাদের নাম করেছেন : শৈলেশ ভাট, মিতেশ ভাট, বিজয় মৌর্য, প্রদীপ মৌর্য, লালা উকিল, লালা ডাক্তার, নরেশ মৌর্য, যশোবন্ত নাই, গোবিন্দ নাই (শেষের তিনজন তাকে গণধর্ষণ করেছিল)। তার স্বামী এবং বাবাকে দাহোদের শিবিরে পাওয়া যায়, আর তার ভাই সঈদ তার সঙ্গে গোধরায় রয়েছে। তার পাঁচ মাসের অজাতক শিশু এখন বেঁচে আছে।

মকসুদা বিবির গল্প :

মকসুদা, টানা টানা চোখ, শীর্ণকায়, মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে ছিল। দেয়ালের দিকে পেরানো ছিল তার মুখ। আশপাশের রোগিনীরা বলছিলেন যে সে বেশি কথা বলে না। যে পাঁচমহল জেলার 'অনজানওয়া' গ্রাম থেকে এসেছে। সে বলে ; আমি আমার দুই ছেলে ইফজল আর ইমরানকে নিয়ে বাড়িতে ছিলাম। তারা খুব ভয় পেয়েছিল এবং কান্নাকাটি করছিল। আমাদের গ্রাম আক্রমণ করা হয়েছিল ৫ই মার্চ (মুখ্যমন্ত্রীর দাবী অনুসারে ভয়ংকর ৭২ ঘণ্টার অনেক পরে) আমার ছেলেদের নিয়ে আমরা এবং আরও চারজন মহিলা দৌড়তে শুরু করলাম। আমরা সবাই ধরা পড়ে গেলাম এবং আমাদের সবাইকে গ্রামের সরপঞ্চ জয়সিং ডোনা ঘোরির একটা কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়। আমার জ্ঞান ছিল না। আমার বাচ্চাদের তখনও জ্ঞান ছিল। আমরাও সেখানে শুয়ে রইলাম। পরির দিন পুলিশ আমাদের উদ্ধার করে। আমার বাচ্চারা তখন মরে গেছে আর আমার সঙ্গে চারজন মহিলা আমার সঙ্গে আছেন। (আমার মনে হচ্ছিল আমি যদি মরে যেতাম।)

পাঁচমহল জেলার পাণ্ডারাভ গ্রামের কণ্ঠস্বর :

জঘন্য নৃশংসতার একটি রিপোর্ট পাওয়া যায় পাণ্ডারাভ গ্রাম থেকে, যেখানে, কারো কারো মতে ১০০ জন মানুষকে হত্যা করা হয়। সরকারি পরিসংখ্যান ২১। এই সংখ্যা ঠিক কত তা জানার কোন উপায় নেই। যারা বেঁচে ছিলেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই গুরুতরভাবে আহত। সমীক্ষক দল গোধরা সিভিল হাসপাতালে তাদের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, গ্রামের সরপঞ্চের নেতৃত্বে একদল আদিবাসী ট্রাকে করে উপস্থিত হয়। তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের বাড়িগুলি ঘিরে ধরে, জ্বালিয়ে দেয় এবং বাড়িগুলির অধিবাসীদের আক্রমণ করে। সেখানে সাকিনা বিবি সায়াদ যাকে দেখে প্রায় ৬৫ বছর বয়স্কা বলে মনে হয়, তিনি তার বিছানায় অবিন্যস্ত সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক অবস্থায় বসেছিলেন। তার স্তনে, ঘাড়ে এবং হাতে তলোয়ারের গভীর ক্ষতচিহ্ন। যখন তিনি তার সন্তানদের বাঁচাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন তার ওপর তলোয়ারের ঘা পড়ে। "তারা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, আমাদের ঘরদোর তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার পরিবার কোথায়?" তিনি তার পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ের খোঁজ জানেন না, অন্যরা আশঙ্কা করছে তারা মারা গেছে।

ওই একই গ্রামের ইউসুফভাই হাসপাতালের বিছানায় তার ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে শুয়ে ছিলেন; কথা বলতে পারছিলেন না। যে উন্মত্ত জনতা তার বাড়ি আক্রমণ করেছিল তারা একটি লোহার রড তার মুখে পুরে দিয়েছিল আর বেদম মার মেরেছিল। তার ক্ষতস্থানগুলি থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আর তিনি ভয়ংকর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন।

ফতিমা বিবি শেখ এবং ইরশাদের বৌ ফতিমা বিবি দুজনে ওই একই গ্রামের। তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তারাও তাদের স্বামীদের বাঁচাতে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় জনের স্বামীকে হত্যা করা হয়। জোহরার নিজের চোখের সামনে তার স্বামী আইয়ুব এবং শ্বাশুড়ি আমিনাকে হত্যা করা হয়। সরপঞ্চ যশোবন্ত প্যাটেলের আঘাতে তার ভেঙে যাওয়া হাতটিকে ধরে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠে বলে : আমি তাদের বাঁচাতে চেয়েছিলাম। একটি বাচ্চা ছেলে মৈন, পাঁচ বছর বয়স, মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়ে জখম হয়ে হাসাতালে শুয়ে আছে।

গ্রাম থেকে যে সব মানুষ তাদের আহত আত্মীয়স্বজনদের হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন তারা জানিয়েছেন, থ্যাকেরা সহ বহু গ্রামবাসীরা তাদের ঘরদোরে আক্রমণ চালিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পালিয়েছে এবং মাঠে রাত কাটিয়েছে। সকালে গ্রামে ফিরে তারা দেখেছেন একশোর বেশি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা আতঙ্কিত যে হয়ত প্রায় একশোর কাছাককাছি মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। তারা বলল, আইয়ুব, মুরাদ, ইয়াসিনকে হত্যা করা হয়েছে। রাবিয়া জানালো, তাঁর স্বামী, হাজিফের

বোন মুন্নি, তার বোনপো আসলাম, তার দু বছরের নাতি আর আরো একজনকে হত্যা করা হয়।

যারা জীবিত তাদের বিবরণী থেকে বহিরাগত মানুষের সঙ্গে মিলে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের বাড়ি আক্রমণ করেছিল। অনেক জায়গাতেই ট্রাকে করে এসেছিলেন আদিবাসীরা। যারা জীবিত তারা এই আদিবাসীদের অংশগ্রহণের কারণ বুঝতে পারছেন না। তারা বলছেন আমাদের সঙ্গে তাদের কোনদিন গোলমাল হয়নি।

ক্যাম্পে :

মোরা গ্রামের মহম্মদ ইশ্‌তিয়া আমাদের বলেছিল, তাদের গ্রামে ১২৫টি মুসলমান এবং ৫০০টি হিন্দু বাড়ি আছে। ১লা মার্চ নামাজের পরে প্রায় ১০০ জন লোকের একটা দল, তার মধ্যে ৫০ জন গ্রামেরই, তাদের আক্রমণ করেছিল : কিন্তু তারা আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছিল, মানে তারা পালিয়ে যায়। রাত্রি ৮টা নাগাদ অনেক বড় একটা দল আসে এবং তারা ২৩টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। একঘন্টা পরে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেডেন্ট গ্রামে আসেন। তারা সবাই তার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে, কিন্তু তিনি চলে যান এবং তিনি পুলিশও পাঠাননি। ফলে গ্রামে আরো দুটি আক্রমণ হয় রাত ২টায় এবং আবার পরের দিন। এই সময়েই প্রতিনিধি দল বিস্ফোরক ব্যবহারের কথা শোনে। "ওরা এমন এটা কিছু ব্যবহার করেছিল যা আমাদের বাড়িগুলো উড়িয়ে দিল"। ওরা বলেছিল, "তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে আমরা শুধু তোমাদের বাড়ি পোড়াচ্ছি।" মুসলিমদের সম্পত্তি এমন সব ট্রাক, দোকান এবং চাষের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করা হয়। ওদের শ'আড়াই আশ্রয় নেয় মসজিদে, আরো ১১৬ জন হাজী ইশাকের বাড়িতে। এদের দুই তৃতীয়াংশ ছিল মেয়ে ও শিশু। ওদের সকলকে শিবিরে নিয়ে আসে বি এস এফ। এই সাক্ষ্য আমাদের এমন এক ইঙ্গিত দিল যে আক্রমনের আরেকটা লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের সম্পত্তির সবরকম চিহ্ন মুছে ফেলা, যাতে তা আরো সহজে দখল করা যায়।

আমরা ওই একই গ্রামের গণি ভাই-এর সঙ্গে শিবিরে দেখা করেছিলাম। তিনি জানালেন ২৭ তারিখ সন্ধ্যায় তিনি লিমখেদায় ছিলেন, সেখানে কিছু আক্রমণ হয়েছিল। তার মোটর সাইকেলটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তিনি গ্রামে ফিরে যেতে পেরেছিলেন। দুপুর দুটোয় তার গ্রামে প্রায় ৭০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন, সকাল আটটায় বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়; চলে দশটা অবধি। সমস্ত অধিবাসীরা পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেউ কেউ বিজলভাই দামোরের আশ্রয় পেয়েছিল। সে বলেছিল, 'বি' এবং তার পরিবার সেখানেই ছিল। তালুকা পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ, লালুভাই পারমার আরও ৮০ জনকে আশ্রয় দিয়েছিল যাদেরকে পরে নিরাপদে শিবিরে আনা হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে যারা হয় লোক ক্ষেপিয়েছেন, অথবা চুপ মেরে আছেন, তাদের মধ্যে এই দু'জন নেতা পীড়িত মানুষদের রক্ষা করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

সরকারীভাবে ঘোষিত মৃত্যু :

প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুসারের ১১ই মার্চ তারিখে মৃতের সংখ্যা

তারিখ	তালুক	গ্রাম	মৃতের সংখ্যা
২৮.০২.০২	খানপুর দির্দা	পানডুন্ডা	১
	দিরদা		১
১.০৩.০২	ঘোগানবি	রিঞ্জিয়া	১
	কাডাল	দেভাডা	১
	খানপুর	পানধারওয়া	২১
	হালোল	হালোল	৫
২.০৩.০৩	কলোল	কলোল	১৬
	লিন্নওয়াড়া	লিন্নওয়াড়া	১
	খানপুর	লিমডিয়া	৮
	কলোল	আরাল	৭
	হালোল	রামেশ্রা	২
৩.৪.০২			
৫.০৩.০২	সান্ত্রামপুর	অঞ্জনভর	৮
৬-৭.০৩.০২			

গোধরার রাজনীতি :

মৌলভী হুসেন উমারজি, তিন জন উকিল, সর্বশ্রী খাটুদি, এ.এ. হাসান, চরখা এবং শিবিরের অন্যান্য সংগঠকরা আমাদের বলেন যে, গোধরার জনসংখ্যা মিশ্র– ৪০% মুসলিম এবং ৬০% হিন্দু। ১৯৮০ সালে শহরে দাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু তার পর থেকে আর কোনো ঘটনা ঘটেনি এমনকী ১৯৯২ সালেও না। ব্যক্তিগত গণ্ডগোল বা ঝগড়াঝাঁটিকে অনেক সময় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এই এতগুলো বছর জুড়ে কোন সাম্প্রদায়িক হানাহানি হয়নি। তারা জানান যে ২৭ ফেব্রুয়ারির আগে থেকেই রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিবেশকে দূষিত করে দিচ্ছিল। বিজেপি এই অঞ্চলে বড় শক্তি হিসেবে ছিল না, কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এম পি ভূপেন্দ্র সিং সোলাঙ্কি এখান থেকে নির্বাচিত হন। ১৯৮৯ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্ররোচনার জন্য 'আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা আইনে' তিনি গ্রেপ্তার হন। এই জেলায় ওই পার্টির কোন বিধায়ক নেই। শহর

এলাকায়, ভোটের পরে বিজেপির রাজু দরজি সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের এপ্রিলে, শ্রীমহম্মদ হাসান আরও ২৪ জন পৌরসভা সদস্যদের নিয়ে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তার মধ্যে আট জন হিন্দু। অনাস্থা প্রস্তাব পাস হয় এবং মে মাসে মহম্মদ হাসান শহরাঞ্চলের সভাপতি নির্বাচিত হন। সবরমতী এক্সপ্রেসের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর অপরাধমূলক কাজ করার কোন ইতিহাস নেই। শিবিরের পরিচালকেরা আমাদের জানান যে তাদের ধারণা, ২৭ ফেব্রুয়ারির ভয়ঙ্কর গোলমালের ঘটনার সূত্রপাত হয় চা-ওয়ালাদের সঙ্গে করসেবকদের হাতাহাতি দিয়ে। এই চা-ওয়ালাদের একজন ছিলেন মুসলমান। তারা বিশ্বাস করেন না যে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ করা হয়েছিল, বরঞ্চ তারা এটা বিশ্বাস করেন যে, বিজেপি নেতৃবৃন্দ ঘটনাটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করেন, তার কারণ হল শহরে রাজনৈতিক ঘটনাবলী। তারা বিশ্বাস করেন রাজনৈতিকভাবে বিজেপি কোনঠাসা হয়ে পড়ার জন্যে আগামী বছরের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আবার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য এই ধরনের হিংসাকে মদত দেওয়া হয়েছে।

তারা জানান, ২৭ তারিখে এই ট্রেনে এই নৃশংসতা ঘটবার পরেও গোধরা শহরে কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু পরে, ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত পরিকল্পিত আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ১১ মার্চ আমাদের যাওয়া পর্যন্ত আক্রমণ চলেছে, যদিও কম।

সম্পত্তির ধ্বংস, জীবনহানি, ক্ষতিপূরণ :

গুজরাত সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে এই ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগের ঘটনায় (গোধরার ট্রেনের কামরায় অগ্নি সংযোগের ঘটনা সহ) সাম্প্রদায়িকতার বলি, পুলিশ এবং ব্যক্তিগত গুলিচালনায় ৬০০ মানুষ মারা গেছেন। এই সংখ্যাটা ভীষণ রকম কমিয়ে হিসেব করার ফল। যেহেতু পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া লাশগুলি এখনও পাওয়া যাচ্ছে এবং যেহেতু হত্যালীলা এখনও বন্ধ হয়নি তাই এই সংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। ত্রাণ সংস্থার শিবির থেকে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করছেন এবং তাদের মতে সংখ্যাটি ২০০০-এর কাছাকাছি হয়ে যাবে। শুধু আমেদাবাদে সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকার বেশি। অনেক মসজিদ, দরগা, মাজার নষ্ট করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে। ১৩ মার্চের 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' জামি মসজিদের ইমাম মৌলানা সাব্বির আহমেদ সিদ্দিকীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে লিখেছে যে, তিনি ৪৪টি মসজিদ, দরগা, স্মৃতিস্তম্ভকে চিহ্নিত করেছেন যেগুলির লুঠপাঠ ও ক্ষতি করা হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় কবি ওয়ালি গুজরাতির মাজার (পুলিশ কমিশনারের অফিসের বিপরীতে) ২৮ ফেব্রুয়ারি শুধু ভাঙাই হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে গেরুয়া পতাকাও ওড়ানো হয়েছে। তারপরে পুলিশ সেটি সরিয়েছে। মাজারের স্মৃতিচিহ্নগুলি মুছে ফেলে সেখানে একটা কালো রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এই রাস্তা তৈরির বিষয়টি

সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। কিন্তু একথা স্পষ্ট যে কোন সরকারি সংস্থার তত্ত্বাবধান ছাড়া একাজ করা হয়নি। অন্তত দশটি মসজিদকে মন্দিরে রূপান্তরিত করা হয়েছে যেখানে নিয়মিত পূজা-অর্চনা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর এ এস আই সুরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ গুমতে মসজিদও দাঙ্গাবাজরা ভেঙে দিয়েছে। একাজ বুলডোজারের সাহায্য ছাড়া করা যায় না।

ভাসনায়, রাজকোট যাবার প্রধান জাতীয় সড়কের ওপর একটি লম্বা মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা শুনেছি যে, যে জমির ওপর মসজিদটি আছে সেই জমিটি নিয়ে মামলা মকদ্দমা চলছে এবং গুজরাত সরকারের মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে এই মসিজদটিকে গুঁড়িয়ে দেবার কাজটি হয়।

আমেদাবাদ শহরে মুসলমান মালিকানাধীন দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়ি-ঘর, হোটেল, রেস্তোরাঁ, ছোট কিয়স্ক পর্যন্ত অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে লুঠপাট ধ্বংস করা, জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু বড় বড় 'শপিং সেন্টারে' শুধু মুসলমানদের দোকানগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ঠিক লাগোয়া অন্য দোকানটি অক্ষত রয়ে গেছে। রেস্তোরাঁ, ছোট দোকান এবং অফিস-বাড়ি সম্পর্কেও একই ঘটনা ঘটেছে। একটি সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদের পরনির্ভরশীল, অধীনস্থ করে। রাখার জন্য একটি সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি হয়েছিল।

সারা রাজ্য জুড়ে ক্ষতির বিপুলতা শুধু অনুমান করা যায় মাত্র। আমাদের সমীক্ষক দলটি গোধরা থেকে আমেদাবাদ সড়কপথে পরিদর্শন করেছেন এবং ফিরে আসার পথে হাইওয়ের দু'পাশে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান সম্পত্তির গণনা করার চেষ্টা করেছেন। একটি খসড়া হিসেবে আমরা দেখতে পাই :

গোধরা এবং টিম্বা রোড স্টেশনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ১১টি দোকান, ৩টি বাড়ি, ২টি ট্রাক

টিম্বা রোড– একটি মসজিদ, মূল বাজার এলাকায় ২৩টি প্রতিষ্ঠান, একটি বিশাল বাড়ি, ৪টি রেলওয়ে কোয়ার্টার্স

শিবালয় এবং আম্বাভার মধ্যবর্তী অঞ্চলে– ২টি ট্রাক, কিছু কিয়স্ক

আম্বাভা– ২১টি দোকানঘর, ২টি বাড়ি

থাসরা– ২টি বাড়ি এবং ১টি কাঠের গুদাম

ডাকোর– ১৬টি দোকানঘর, ২টি বড় বাড়ি, বেশ কিছু গাড়ি

আলিমা– ১০টি বাড়ি

মির্জাপুর– ১টি বাড়ি

মেহমুদাবাদ– ৮টি দোকানঘর, ভাগ্যদয় হোটেল, ১টি মাজার, ১টি পেট্রোল পাম্প, ১টি হোটেল, ৪টি ঠেলাগাড়ি, ৪টি বাড়ি

রামোদ– পুলিশ স্টেশনের কাছে সর্বোত্তম হোটেল

রামোল– অসংখ্য দোকান, বাড়ি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, অসংখ্য বড় কারখানা, গ্যারেজ, পেট্রোল পাম্প, সস্তার রেস্টুরেন্ট, সর্বোদয় হোটেল এবং সুপ্রীম হোটেল।

প্রধান সড়ক থেকে যেগুলো দেখা যায়, এগুলো শুধু তাই। আরও অনেকগুলো হয়তো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। উল্লিখিত সমস্ত হোটেলই 'চেলিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমাদের মালিকানাধীন। 'চেলিয়া'রা হোটেল রেস্তোরাঁর ব্যবসাই করে। গত কয়েক বছরে ওরা আপাতভাবে 'হিন্দু' নাম দিয়ে হোটেল রেস্তোরাঁ গড়েছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বড়ো বড়ো সাইনবোর্ডে নিজেদেরকে 'নির্ভেজাল নিরামিষাশী, বলে ঘোষণা করেছে। একবছর আগে 'সন্দেশ' নামে একটি গুজরাতি পত্রিকা এই সব হোটেল রেস্তারাঁর নাম-তালিকা প্রকাশ করে বলতে চেয়েছিল, তোমরা যাই করো না কেন, এই সত্যকে তোমরা চাপা দিতে পারবে না যে তোমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যেরা বলে যে, অগ্নিসংযোগকারীরা এই তালিকাটি কাজে লাগিয়েছিল। এটাই হয়তো সত্যের কাছাকাছি, তা না হলে ওদের চিহ্নিতকরণ সম্ভব হতো না। যে সব প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম, তারা বলেছেন, টিন-টিন পেট্রোলসহ গাড়ি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে ট্রাকগুলি অবাধে প্রধান সড়কে যাতায়াত করেছিল। এইসব হোটেল-রেস্তোরাঁর বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হল যেন বুলডোজার চালিয়ে সব ধূলিসাৎ করা হয়েছে। স্পষ্টতই বোঝা গেল যে এই বাড়িগুলিকে গুঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে বেশ সময় লেগেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে পুলিশ ছিল কোথায়?

কিন্তু ক্ষতিপূরণের কি হবে? যে অবস্থায় শিবিরে এজাহার নেওয়া হচ্ছে না, যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত এবং শোকাহত মানুষেরা থানায় যেতে পারছেন না– কারণ হয় তারা আতঙ্কগ্রস্ত, না হয় বাস্তবে তা করা অসম্ভব– সেখানে ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটাই তো প্রহসনে পরিণত হয়েছে। যেহেতু বহু এলাকায় সম্পত্তির সব প্রমাণ লোপাট করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে আশঙ্কা এবং ভয় রয়েছে যে যেহেতু তাদের হত্যার ঘটনা এজাহারে লেখাই হচ্ছে না, তাই তাদের উত্তরাধিকারীরা শুধু যে ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবে তাই নয়, উপরন্তু তাদের হত্যাকারীদের, তারা দাঙ্গাবাজ বা পুলিশকর্মী যাইহোক তাদের কাঠগড়াতেই তোলা হবে না, বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কেঁদে যাবে। গ্রামাঞ্চলে আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বেঁচে যাওয়া নরনারীর কাছে শুনেছি যে মুসলমান চাষি ও দোকানিদের দলে দলে তাড়িয়ে দিয়ে, ওদের ঘরবাড়ি, দোকান, জমিজমা, গবাদি পশু, যন্ত্রপাতি– সব জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওদের আশঙ্কা, যে ওদের জমিজমা বেহাত হয়ে যাচ্ছে।

আমেদাবাদ, মার্চ ১০, ১২, ১৩

নতুন বৈশিষ্ট্য :

আমেদাবাদকে যুদ্ধবিধ্বস্ত শহর বলে মনে হচ্ছে। এই প্রথম মুসলমান প্রধান অঞ্চল পর্যন্ত পুলিশের মদতে আর সহযোগিতায় আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে পড়েছিল। এমনই একটা এলাকা হচ্ছে বাপুনগর ও তার চারপাশের অঞ্চল। আমেদাবাদ নগর থেকে শুরু করে ৮ নং সড়কের ডান দিক বরাবর– আনসারনগর, মোনে কি চালি, রহতনগর, মেদিনীনগর, আকরবরনগর, উরবাননগর ইত্যাদি এলাকা পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা। সামনের দিকে সব দোকান আর পিছনের দিকে সারি সারি বসতবাড়ি। কাছাকাছি রয়েছে উঁচু অট্টালিকায় ভরা গায়ত্রীনগরের মতো অঞ্চল, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বসবাস। এতকাল পর্যন্ত এখানে বসবাসকারীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ করে এসেছে। কিন্তু এবারে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে।

এখানে যারা বসবাস করেন, তারা মূলত উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন। কিন্তু, অন্তত তিন পুরুষ ধরে এঁরা আমেদাবাদ আছেন, এঁদের পূর্বপুরুষেরা আমেদাবাদে এসেছিলেন কাপড়ের কলে কাজ করার জন্য। তারপর মিল বন্ধ হয়ে যাবার পর এদের অনেকে ছোটখাটো কারখানায় দিনমজুরের কাজ করেন, কেউ কেউ ভেন্ডারি, কেউ ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আছেন। আকবরনগর ও উরবানগর ছাড়া, অন্যত্র বাড়িগুলি সব ইঁটের তৈরি, সারি দিয়ে গড়া একতলা বা দোতলা বাড়ি। একটা মাদ্রাসা আছে কামিনুল উলুম নামে, আর আছে একটা বড়ো মসজিদ, যার নাম মেদিনা মসজিদ।

সমীক্ষক দল হিসেবে আমরা এলাকার অনেকটা ঘুরে এসেছি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন সি পি আই (এম) ও সিটু নেতা কমঃ সাহাবুদ্দিন, যিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা এবং সক্রিয়ভাবে ত্রাণকার্যে জড়িত। ওই অঞ্চলের ফিরোজ, রাজভাই, ওয়ানি মহম্মদ সহ আরও অনেকে ছিলেন, আর ছিলেন বহু মহিলা। আমরা দেখতে পেলাম, যে সব পরিবারের বাড়িঘর খুব ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পুরো ধ্বংস হয়ে যায়নি, তাদের কেউ কেউ এখানে থাকছেন, রান্নাবান্না করে খাচ্ছেন, যদিও তাদের সম্পদের বেশিরভাগটাই তারা হারিয়েছেন। অন্য অনেকে আবার শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন কারণ তাদের বাড়িঘর সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আকবরনগর হল 'এইচ' ডিভিশনের সহকারী পুলিশ কমিশনারের দপ্তরের ঠিক পিছনের ছোট ছোট বাড়ির এক উপনিবেশ। এটা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে একেবারে বাড়ির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এর অস্তিত্বটাকেই লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। এখানকার শ'তিনেকের বেশি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে বাপুনগর আমনচক শিবিরে।

আমাদের সঙ্গে যে সব বন্ধুরা ছিলেন তারা জানালেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ শুরু হয় ২৮ তারিখে। লোকেরা দলে দলে আসে, এলাকা থেকে প্রতিরোধও হয়। কিছু বন্দুকবাজির আশ্রয় নেওয়া হয়। ১ তারিখে বেলা দুটো নাগাদ পুরো এলাকাটা পুলিশ ঘিরে ফেলে। এবং হাজার হাজার মানুষের মত্ত জনতা জড়ো হয় চারপাশে। সমীক্ষক দল

দেখতে পান সেই দেয়ালটা, যেটা ভেঙে ওই মত্ত জনতা এলাকায় ঢুকে পড়ে। দাঙ্গাবাজদের হাতে ছিল তলোয়ার, কাঠের আর লোহার ডাণ্ডা। ওরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার যথেষ্ট জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। ওরা এলো যেন ঢেউ-এর মতো, সংগঠিত প্রস্তুতি নিয়ে। যখন বাড়িঘরের বাধা ভাঙতে পারছিল না, তখন ট্রাক নিয়ে এসে তাদের অভীষ্ট পূরণ করছিল। বশির নামে ১২-১৩ বছরের ছেলেকে গুলি করে মারা হয়। সাগির আমেদকে পুলিশ গুলি করে মারে এবং তার লাশটা পরে জ্বালিয়ে দেয় মত্ত জনতা। আমরা শুনতে পেলাম যে প্রায় ৩৫ জনকে এ এলাকায় হত্যা করা হয়েছে, প্রায় ৫০০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষেরা গুজরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গোবর্ধন ঝাদাপিয়ার ভাই বাবু ঝাদাপিয়ার নাম করে বলেছে যে, তিনি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে খোলাখুলি মত্ত জনতাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ওরা আর এস এস সমর্থক এবং সিটি কেবলের মালিক বা পরিচালক (এটা একটু অনিশ্চিত) ভারত রানার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছে যে এরা অন্যাদের সঙ্গে মিলে আক্রমণ চলাকালীন মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছিল। ওঁরা এও বলেছেন যে, খুবই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানির লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং এই মানুষগুলির সুবিচার পাবার আশা কোথায়? এদের প্রশ্ন : যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের নির্বাচন কেন্দ্রের অধিবাসীদেরই সুরক্ষা দিতে পারেন না, তিনি সারাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ কী করে করতে পারেন? এঁরা এও বলেছেন যে যেদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাত পরিদর্শনে আসেন সেদিনও লুঠপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল।

যে মাদ্রাসায় প্রায় একশো শিশু বাস করতো, আর তারও বেশি পড়াশোনা করতো, সেটাও আক্রান্ত এবং কলুষিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বস্তা বস্তা পোড়া শষ্য এবং পুড়ে যাওয়া বহু বইপত্র, যার মধ্যে কোরানও ছিল বলে শোনা গেছে। প্রধান হলঘরের মেঝেতে পড়ে ছিল ফাঁকা মদের বোতলের স্তূপ, আর আগুনে ঝলসে যাওয়া দেওয়ালে আঁচড়ে লেখা হয়েছিল "অন্দর কী বাত হ্যায়, পুলিশ হামারে সাথ হ্যায়"; "শিবসেনা জিন্দাবাদ"; "নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ"। উন্মত্ত জনতা মসজিদের অভ্যন্তরেও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। এমনকী অধিবাসীরা এটাকে পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করলেও, এখানে প্রার্থনা শুরু করলেও, ভেতরকার ছাদ এখনও কালো। প্রচার-বেদীটা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, আলো-পাখা সব ভেঙ্গেচুরে দলা পাকানো। মেঝের মাদুর আর বইপত্রের অবশিষ্ট অংশ আধপোড়া অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল।

১ তারিখ সন্ধ্যে ছটয় সেনাবহিনী পৌঁছানোর পর এই ধ্বংসলীলা স্তব্ধ হয়।

ত্রাণ শিবির :

আমরা আমেদাবাদে পাঁচটা ত্রাণ শিবিরে যাই যেখানে দাঙ্গার শিকার মুসলমানদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। দাঙ্গার শিকার হিন্দুদের একটা শিবিরও আমরা দেখতে যাই আমেদাবাদে। প্রশাসনের মুখপাত্ররা চার-পাঁচটা হিন্দু শিবিরের কথা বললেও, তার কোন হদিশ দিতে পারেননি ওঁরা।

শিবির ছিল : শাহ্-এ-আলম দরগা (৯০০০ মানুষ), সুন্দরমনগর (৩৫০০ মানুষ), বাপুনগর আমন চক (৮০০০ মানুষ), জুহেপুরা সংকলিত নগর (৩০০০ মানুষ), দরিয়াখান ঘুমাং ও কাম্বারিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭ ও ৮ (৭০০ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ)।

ব্যতিক্রমী কাম্বারিয়া শিবির বাদ দিলে, শিবিরগুলি সবই পরিচালনা করছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। সাহায্য করছে এন জি ও এবং নাগরিক উদ্যোগসমূহ। এটা খুবই দুঃখজনক যে, নিদারুণভবে দাঙ্গাপীড়িত শ্রেণীকেই তাদের সম্প্রদায়কে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হচ্ছে। তারা খাবারদাবার দিয়ে সাহায্য করছে সেইসব দাঙ্গাগ্রস্ত মানুষদের যারা চল্লিশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধব্যাপী এলাকা থেকে দলে দলে আসছেন। শাহ্ আলম অঞ্চলের কাছাকাছি নাসিজি মন্দির এলাকার বত্রিশটা হিন্দু পরিবার যারা ২৮ তারিখ থেকে এই মন্দিরেই বসবাস করছে, কারণ তারা ভীতসন্ত্রস্ত, তাদের তিন চারটে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরও আহার দিয়ে আপ্যায়িত করছেন শাহ্-এ-আলম ত্রাণ শিবিরের সংগঠকেরা।

পাঁচই মার্চের আগে পর্যন্ত সরকার স্বীকারই করেনি যে, হাজার হাজার মানুষ শিবিরগুলিতে ভয়াবহ বিপন্নতার মধ্যে বাস করছেন। ওই দিনে একটা জি আর মঞ্জুর করা হয়, প্রতিনিধি দলের কাছে তার একটা প্রতিলিপি রয়েছে, যাতে আর্ত মানুষ পিছু ত্রাণসামগ্রী চাল-গম-তেলের দৈনন্দিন পরিমাণ এবং শাক-সবজি এবং মশলা বাবদ পাঁচটি করে টাকার উল্লেখ আছে। তবুও সমীক্ষক দল যখন এক সপ্তাহ পরে শিবির পরিদর্শনে যান, তারা দেখতে পান যে শাহ্ আলম শিবির ও বাপুনগর শিবিরগুলির প্রত্যেকটি সাকুল্যে মাত্র ৫০০ কেজি করে চাল, কিছু রান্নার তেলের টিন, আর গুঁড়োদুধের প্যাকেট পেয়েছে। কিন্তু কেউই কোন নগদ টাকা পায়নি। জিনিসপত্র যা পাওয়া গেছে তাতে একদিনের প্রয়োজন মিটবে। আমেদাবাদেও আমরা এফ সি আই-এর গুদামে থরে থরে শস্যদানা সাজানো রয়েছে দেখতে পাই, কিন্তু স্পষ্টতই সরকারী পরিকল্পনামাফিক ত্রাণশিবিরে দ্রব্যাদি পরিবেশিত হচ্ছে না। শিবিরগুলিতে অসংখ্য আহত মানুষ ছিলো কিন্তু আগের দিন পর্যন্ত ডাক্তার বলতে ছিল সম্প্রদায়ের কিছু স্বেচ্ছাসেবী। দুঘন্টার জন্য দুজন সরকারি চিকিৎসক শাহ্ আলম শিবির পরিদর্শন করেন, কিন্তু জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন এমন বহু নারী শিবিরে থাকলেও কোনও মহিলা চিকিৎসক পাওয়া যায়নি। শাহ্ আলম শিবিরে তিনটি এবং বাপুনগর ক্যাম্পে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলেও তারা কোন চিকিৎসকের সহায়তা পায়নি।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জলসরবরাহেও সমস্যা প্রকট। শাহ্ আলম শিবিরের ন'হাজার মানুষের জন্য মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন পাঁচজনের ব্যবহারের মতো একটা

ভ্রাম্যমান শৌচাগার, আর একটা অস্থায়ী শৌচাগার দিয়েছে। জলনিষ্কাষণ বা আবর্জনা দূরীকরণ ও সাফাই-এর কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। তুলনামূলকভাবে, স্বেচ্ছাসেবীরা শিবিরগলিকে বাসযোগ্য রাখার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন। কামদার স্বাস্থ্য সুরক্ষামণ্ডল নামে একটি এন জি ও দলের সঙ্গে সমীক্ষক দলের দেখা হয়। এরা বাপুনগর শিবিরের সঙ্গে আরও আটটা শিবির পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করছিল। শাহ আলম শিবিরে প্রতিদিন দুটো জলের ট্যাঙ্ক দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু ট্যাঙ্কের জল গড়িয়ে নেবার দায়িত্বে আছেন শিবির-সংগঠকেরা; তারা সময় মতো এসে না পৌঁছলে ট্যাঙ্কগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়।

দু একটা শিবিরে ক্ষতিপূরণের আবেদনপত্র পাওয়া যায় যা পূরণ করে জমা দিলে দাঙ্গাপীড়িতরা হলুদ কার্ড পেতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবীরা ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এটা কষ্টকর কাজ, কারণ অবেদনপত্রটা খুবই জটিল, নানা খুঁটিনাটিতেভরা এবং একগাদা তথ্যের প্রয়োজন হয়, যেগুলির যোগান দেওয়া ওই ঘরবাড়ি খুইয়ে আসা মানুষগুলির পক্ষে অসম্ভব। আবেদনপত্রের ঘাটতি এতেই বোঝা যাবে : বাপুনগর শিবিরের আট হাজার মানুষের জন্য মাত্র দুশোটি আবেদনপত্র দেওয়া হয়েছে। জীবন ও সম্পত্তি হারানোরজন্য এফ আই আর-এর কোন ব্যবস্থা নেই। বেশিরভাগ থানা শিবির এলাকা থেকে অনেকটা দূরে; ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পক্ষে যেখানে যাওয়া অসম্ভব। কেবল বাপুনগর শিবিরে ছিল ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া আকবরনগরের আদি বাসিন্দারা। এঁরা রাস্তা পেরিয়ে (যার পিছনেই ছিল এঁদের ঘরবাড়ি) থানায় এফ আই অর করতে পেরেছিলেন। যখন দিনে তিনশোর বেশি কেস ফাইল করবার কথা তখন প্রায় কুড়িটা কেস থানায় রেকর্ড করা হয়। কোন সরকারি আমলা শিবিরগুলি পরিদর্শনে আসেননি। অবশ্য সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদল যখন শাহ আলম শিবির পরিদর্শন করেন, তখন কিছু আমলা সঙ্গ দিয়েছিলেন।

কাঙ্কারিয়া শিবিরে ছিল ১৭৫টা দলিত পরিবার। এরা এসেছিলেন শাহ আলম টোল নাকা এলাক থেকে। কাঙ্কারিয়া মিউনিসিপাল ৭ এবং ৮ নং বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গোপাল ভাই শর্মা আমাদের বললেন যে, এই এলাকা থেকে ৭০০ লোক শিবিরে এসেছে ২৮ তারিখে, ওই দিন সকালে দাঙ্গা হবার পর। এই মানুষগুলির ওপর পাথর ও অ্যাসিড ছোঁড়া হয়েছিল। ছুঁড়েছিল নিকটবতী এলাকায় এগারোতলার বাড়িতে বসবাসকারী মুসলমানেরা। ভাগাজি নিহত হয়েছে, চল্লিশটা বাড়ি পোড়ানো হয়েছে। ওঁরা সম্প্রতি এসেছেন ওঁদের অক্ষত বাড়িগুলি দেখতে। এঁরা সবাই দিনমজুর ও দলিত। মহিলারা তাদের পাড়ার বিভিন্ন বাড়িতে কাজকর্ম করেন। এরা সবাই বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন; ফিরে গিয়ে আবার কাজ করতে চান। কিন্তু তাঁদের দাবী এই এলাকায় একটা পুলিশ চৌকি বসানো হোক।

আমরা ওঁদের কাছে জেনে খুশি হলাম যে ওঁরা মার্চ থেকে রেশন পাচ্ছেন এবং তাঁদের সব এফ আই আর পুলিশের কাছে পেশ করা হয়েছে। এই সাহায্যটুকু না পেলে এই গরিব পরিবারগুলি আরও বিপন্ন বোধ করতেন। অন্য শিবিরের মতো এখানে কোনও স্বেচ্ছাসেবী বা সাহায্য নজরে এলো না। শিবিরটা উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত অঞ্চলে অবস্থিত। মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ফকিরভাই বাঘেলা এবং বিরোধী নেতা অমর সিং চৌধুরী এ শিবিরটা পরিদর্শন করেছেন। বিভিন্ন আধিকারিকেরাও নিয়মিতভাবে এ শিবিরটা পরিদর্শন করে চলেছেন। আমাদের শুধু আকাঙ্ক্ষা হলো অন্য শিবিরগুলি যদি এই ধরনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারতো।

কিন্তু অন্যদিকে ১০ মার্চ পর্যন্ত একজন মন্ত্রী বা সরকারি আমলা একটা শিবিরও দেখতে আসেননি; সর্বদলীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়া কেউ আসেননি। কালেক্টর কে.শ্রীনিবাসের সঙ্গে দেখা করতে নির্দিষ্ট সময়ে আমরা পৌছতে না পারায়, অতিরিক্ত কালেক্টর উর্মিলা প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করি ত্রাণকার্যের ভারপ্রাপ্ত অন্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে। যখন আমরা ত্রা' শিবিরে সাহায্য দানে নির্লজ্জ দ্বিচারিতার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, তখন একমাত্র যে উত্তরটা পাওয়া গেল তা হল : মুসলমান শিবিরে কর্মীরা যেতে ভয় পায়। কিন্তু আধিকারিকেরা? প্রকৃতপক্ষে বহু অমুসলমান ত্রাণকর্মীদের শিবিরে দেখলাম– ঢুকছেন, বেরোচ্ছেন– নির্ঝঞ্ঝাটে। আসলে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এটা ছিল ইচ্ছাকৃত গুজব রটনা যে ত্রাণকর্মীরা আক্রান্ত হতে পারেন। আসলে হিন্দু আশ্রয় শিবির আর মুসলমান আশ্রয় শিবিরের মধ্যে যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল, তাকে সত্য প্রমাণ করার জন্যই এই মিথ্যা প্রচার। দুঃখের বিষয়, আধিকারিকেরা জানতেনই না যে, কোনরকম রেশন পাঠানো হচ্ছে না, বা কোনরকম এফ আই আর নেওয়া হচ্ছে না– এমন ঘটেছে। তারা বললেন, পুলিশ কমিশনার আশ্বস্ত করেছিলেন যে প্রতি শিবিরে এফ আই আর নেওয়ার জন্য একটা ডেস্ক থাকবে, কিন্তু তা যে হয়নি, তা জেনে ওঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

মনোবেদনার কণ্ঠস্বর :

শ্রীমতী যশোদা বেন কোষ্ঠির সঙ্গে দেখা হয় শাহ আলম শিবিরে। তিনি বলেন যে তিনি ভি এইচ পি-র বিতরণ করা লিফলেট পড়েছেন, যাতে প্রচার করা হয়েছে যে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কোনও সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। যদি তারা রাখে, তাহলে তারা আদৌ হিন্দুই নয়। তিনি বলেন, আমি হিন্দু, কিন্তু ওরা আমার নামে যা করছে, তার জন্যে আমি লজ্জিত। তাই তো আমি এখানে এই শিবিরে এসেছি, যেভাবে পারি কিছু সাহায্য করতে।

যে সব শিবির এলাকা ও হাসপাতালে আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে একই এলাকা, মহল্লা বা গ্রাম থেকে আসা কিছু মানুষ ছিল। তাদের বিবরণ থেকে, ফেব্রুয়ারি ২৭-এর রাত আর মার্চের ৫ তারিখের মধ্যে এই সব এলাকায় কী ঘটেছিল তার একটা ছবি তৈরি করে নেওয়া অসম্ভব নয়।

নারোড়া পাতিয়া :

মার্চ ১৩ তারিখের 'দ্য টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া' লিখেছে যে পুলিশের বিবৃতি অনুসারে, নারোড়া পাতিয়া ও তার সংলগ্ন এলাকায় ১০৭ জন মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। শাহ আলম ত্রাণ কমিটি, সর্বদলীয় প্রতিনিধিরা ৮ মার্চ ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে গেলে তাদের হাতে একটা স্মারকলিপি দেয়। এই স্মারকলিপিতে তারা বলেছেন যে, আমেদাবাদের উত্তরের শিল্পাঞ্চল এলাকা নারোড়া পাতিয়া ও নারোড়া গ্রামে আরেকটা ভয়ঙ্কর ট্রাজিডি ঘটে। নারোড়া পাতিয়ার অধিবাসী, মিস্টার তেওয়ারি নামে একজন হিন্দু ভদ্রলোক ৩০ জন লোককে তার বাড়িতে আশ্রয় দেন। তিনি শাহ আলম কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এলাকার পুলিশের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এই আটটাকে পড়া লোকগুলিকে স্থানান্তরিত করার কাজে সাহায্য করতে। পুলিশ এসে পৌঁছতে তিন ঘন্টা সময় নিয়ে নেয়, ততক্ষণে ২৭ জন মুসলিম নারী-পুরুষ শিশুকে খতম করে দেওয়া হয়ে গেছে। মাত্র ৩ জন মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা পেয়ে শাহ আলম শিবিরে রয়েছে।

আমেদবাদ শহরের এই অঞ্চলের দুর্গতদের সঙ্গে সমীক্ষক দলের প্রতিনিধিরা দেখা করেন শাহ আলম ও জুহাপুরা সকলিত নগর শিবিরে। আমিনা নামে একজন শিক্ষিতা মহিলা, যিনি প্রিন্টিং কর্মী এবং এই এলাকায় নুরানি মসজিদের কাছে তিনি বসবাস করতেন, তিনি বললেন যে, এ এলাকায় রাত থেকে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ২৮ তারিখ সকালে (যে দিন ভি এইচ পি বন্‌ধ ঘোষণা করেছিল) ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে তাঁর প্রতিবেশীরা এই বলে চীৎকার শুরু করে দেন, 'ওরা আসছে।' পুরো এলাকাটার চারপাশ উত্তেজিত জনতা ঘিরে ফেলে। তিনি বললেন যে, ওদের বাঁচানোর অজুহাতে দাঙ্গাবাজরা নারী ও শিশুদের পুরুষদের থেকে আলাদা করে দেয়। কিন্তু এটা ঘটে যাবার পর নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার নেমে আসে। তাঁর পোষাক প্রস্তুতকারী বোন সয়ীদা হট্টগোলের মধ্যে খুন হয়ে যায়। কৌসার নামে এক অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলাকে পেট চিরে হত্যা করা হয়। পার্শ্ববর্তী সড়কের ডিপোটি জ্বালানি সরবরাহের জন্য ব্যবহার করা হয়। এবং মানুষ-ভর্তি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। রশিদা বানো, যাঁর স্বামীর টিউবলাইট সরবরাহের ব্যবসা ছিল, এবং যিনি কৌসারের ননদ, তিনি বলেছেন যে, তাঁর টিউবলাইট ভর্তি বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাবিরা বিবি ও চাঁদ বিবি কৌসারের কাহিনীর সত্যতার সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় জন বলেছেন যে, তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। ফতিমা বলেছেন যে, তার বোন কুদরাত বিবিও তাঁর পরিবারের এগারোজন সদস্যকে হারিয়েছেন; কেবল তিনজন

সদস্য বেঁচে গেছেন। লাল বিবির ছেলে মুস্কান এবং কন্যা সকিয়া দুজনেই নিহত হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যখন তিনি রাষ্ট্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ কর্মীদের কাছে সাহায্য চেয়ে চীৎকার করে ওঠেন, তখন তারা বলে ওঠে : 'তোমরা ট্রেনে হিন্দুদের পুড়িয়েছ, এখন তোমাদের তার দাম দিতে হবে।'

আমরা দেখেছি একজন শীর্ণকায় যুবতী রেহমুন্নিসাকে দুদিন আগে যার এক শিশুসন্তান তার সামনে মাটিতে মরে পড়েছিল। রেহমুন্নিসা বললেন, "২৮ ফেব্রুয়ারি যখন আক্রমণ শুরু হয়েছে, তখন আমার প্রসব বেদনা শুরু হয়। এবং সন্তানের জন্ম হয়। আমি সম্পূর্ণ একা। ধাই শুদ্ধ বেশিরভাগ লোকই পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল যে, তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিছু গাড়ি পাঠানো হয়েছে। যখন এটা ঘটেনি, তখন ধাইটি ফিরে আসে এবং নাড়িকেটে বাচ্চাটাকে পৃথক করে। এর অব্যবহিত পরেই আমি দৌড়ে ওই অবস্থায় সাতবার আমার চালার মুখে যাই আবার ফিরে আসি– একই পোষাকে আমার নবজাতক শিশুকে আঁকড়ে ধরে। কেননা কে একজন বলেছিল যে গাড়ি এসে গেছে। অবশেষে গাড়ি থামে এবং আমাকে শিবিরে নিয়ে আসা হয়।'

নাসিম বানো প্রাণের ভয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারিতে জন্ম নেওয়া তার শিশুসন্তানকে নিয়ে পালায়, যখন ৯ মাসের আসন্ন প্রসবা রোশনও পালায়। তাদের সঙ্গে ছিল রুকসানাও, যাকে এই শিবিরে আসার পর প্রসবের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং ৫ মার্চে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এদের তিনজনই ওই এলাকার অন্যান্যদের সঙ্গে রাস্তা পেরিয়ে আবগারি চৌকিতে ছুটে গিয়ে কনস্টেবলদের পায়ে পড়ে তাদের প্রাণে বাঁচাতে প্রার্থনা জনায়। ওঁরা বললেন কিছু সময় পরে কনস্টেবলরা এদের দুরবস্থায় বিচলিত হয়ে পুলিশ ডাকে এব পুলিশেরা এদের শিবিরে নিয়ে আসে।

সাত বছরের বালক ইউসুফকে আবর্জনার স্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়। তাকে মৃত বলে এখানে ফেলে রাখা হয়েছিল এবং পরে এই শিবিরে নিয়ে আসা হয়। তার ডান চোখের ঠিক ওপরে তলোয়ারের পোঁচ পড়েছিল, সেখান থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল। তার আম্মা রিজিয়া বানোকে সাংঘাতিক পোড়া ক্ষত সহ হাসপাতালে ভর্তিকরা হয়েছিল। তার আব্বা মহম্মদ আয়ুব গনি খুন হয়েছে। কিন্তু ইউসুফকে বলা হয়েছে যে তার আব্বা হাসপাতালে তার আম্মার দেখভাল করছে।

বাবলু (আসল নাম ইরশাদ) বয়স ২১ বছর, সে থাকে ওই এলাকার টেলিফোন এক্সচেঞ্জের গমির চালিতে। তার মা-বাবা মেহেরুন্নিসা ও ট্যাঙ্কারকমী নূর মহম্মদ। বাবলু নিজে প্লাস্টারের কাজ করত। সে ২৮ তারিখে বেলা চারটের সময় পুলিশের গুলিতে আহত হয় এবং আল আমিন হাসপাতাল থেকে এনে তাকে তখন সরকারি হাসপাতাল রাখা হয় বলে শুনলাম।

মাহসপুর বেখিয়া :

প্রায় তিরিশ বছরের নাজমা আইয়ুব কুরেশি একেবারে খালি পায়ে শাহ্ আলম শিবিরে পৌছায়। তিনি আমাদের বলেন, "আমার উপর অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা হয়, আর একজন দাঙ্গাবাজ আমার মুখে প্রস্রাব করে দেয়। আমার কাপড়চোপড় গায়ে লেপ্টে গিয়েছিল এবং পোড়া গন্ধের অনুভূতি হয়ে উঠছিল অসহ্য। তাই আমি পোষাক-আসাক ছিঁড়ে ছাড়িয়ে ফেলি আর তার সঙ্গে আমায় ছালচামড়াও বেরিয়ে আসে। আমার দুটি ছেলেমেয়ে খুন হয়ে যায়।"

হলধার গ্রাম :

এটা বাপুনগর আমন চক শিবির থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীদের ৪৫০ জন এ-শিবিরে এসেছে। এদের বাড়িঘর আক্রান্ত হবার পর ফৌজির লোকেরা এদের এখানে নিয়ে আসে। এ গ্রাম থেকে আসা রোশন বানো আমাদের বলেছেন যে, গ্রামের নারীপুরুষরা তাদের শিশুদের নিয়ে মাঠের মধ্যে অনাহারে পড়েছিল দু'তিন দিন। তিনি বলেছেন যে, তাদের পশুপাখিদের পর্যন্ত জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। তার সঙ্গে ছিলো পঙ্গুপ্রায় শিশু হানিফা আর ইসমাইল ভাই, নানাভাই নামে এক অন্ধ বৃদ্ধ।

জুহাপুরা :

আমরা রোশনবাই শেখের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করি। তিনি এই এলাকায় বাস করেন এবং একটা সেলাই সংক্রান্ত নারী সমবায়িকা চালান। এখানে, ফারজানা, শাহনাজ বানো, মঞ্জুলাবেন প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করি। ফারহাত রোশনবাই আমাদের সঙ্গে কথা বলেন বেশ মর্যাদাপূর্ণভাবে, তিক্ততামুক্ত হয়ে, কিন্তু গভীর মনোবেদনা নিয়ে। তিনি বলেন যে, ২৮ তারিখটা দুশ্চিন্তায় টানটান হয়ে উঠেছিল। মানুষজন এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, মুখে তাদের নানা শ্লোগান, ওদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসীরা মুসলমান, কিন্তু ঝালা চত্বরে একসারি কুটির আছে হিন্দুদের। ১৫০টি হিন্দু পরিবারের সবাই এলাকাটা ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের বাড়িঘর সবই নিরাপদ, কেউ কিছু ছুঁয়েও দেখেনি। তাঁরা ভেজালপুরে আছেন বলে শোনা গেল। আমরা ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তবে ওদের বাড়িটা দেখেছি। মার্চের ১ তারিখে যখন পুরুষেরা জুম্মাবারের প্রার্থনা সারতে মসজিদে গিয়েছিলেন, আর বাড়িতে ছিলো নারী ও শিশুরা; তখন দাঙ্গাবাজেরা এলাকায় ঢুকে আক্রমণ শুরু করে। তারা অ্যাসিড ছোঁড়ে এবং আগুন লাগানোর কাজে লিপ্ত হয়। নব্বইটা বাড়ি পুড়ে যায়। এইসব বাড়ির অধিবাসীরা বেশিরভাগই আলবহমানি শিবিরে আছে, যে শিবির আমাদের দেখতে দেওয়া হয়নি। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীরা কেবল তখনই বহিরাগতদের সঙ্গে যোগ দেয়, যখন পুলিশ এসে

ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্ররোচিত করে তোলে। রং পাতলা করার স্পিরিট জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ অগ্নিকাণ্ডে অবাধে ব্যবহার করা হয়। ফারজানা আমাদের বলেছেন যে, তাঁর স্বামী হানিফের মন ভেঙ্গে গিয়েছিল– তাঁর বাড়ি ও আসবাবপত্র পুড়ে যাবার জন্য নয়, কিন্তু তার বইপত্রগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যাবার জন্য। এই বইগুলি সংগ্রহ করতে তাঁকে আশি হাজারের থেকেও বেশি অর্থব্যয় করতে হয়েছিল। তিনি তাঁর দুটি সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত এবং আমাদের প্রশ্ন করলেন– তারা বিদ্যালয়ে ফিরে গেলে তাদের হিন্দু শিক্ষকমশাইরা তাদের উপেক্ষা অবহেলা করবেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের সাজা দেবেন বলে আমরা মনে করি কিনা। মঞ্জুলাবেন আমাদের বলেন, তিনি ওই এলাকার মুসলমানদের মধ্যে থেকে কাজ করেন এবং তিনি আদৌ ভয়ভীতি অনুভব করেন না। তিনি বলেন, "এসবই করছে সরকার, বজরং দল, ভি এইচ পি, শিবসেনা এবং এ জাতীয় সব লোকের কাজকর্ম বেআইনি বলে ঘোষণা করতে হবে।" বারো বছরের বালক ফারহাত আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে কীভাবে এবং কখন যে তার ডন বস্কো স্কুলে ফিরে যেতে পারবে।

ড. গান্ধী কি চালি, বসনুরা (প্রয়াত এহ্সান জাফরির বাড়ির কাছে) :

আমরা শাহনাজ বানোর সঙ্গে দেখা করেছি, যিনি এ এলাকার জুহাপুরা শিবিরে থাকেন। তাঁর কাছে আমরা জানতে পারি যে ২৮ তারিখে সকাল ১০টা নাগাদ হাজার হাজার মানুষের মত্ত জনতা তাঁদের এলাকায় আসে। তিনি বলেন যে আক্রমণকারীরা অত্যন্ত অশ্লীল খিস্তি ও হুমকি (উৎকট যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ) করছিল, এবং যা কিছু পাচ্ছিল তাই আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল। তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে পালিয়ে পিছন দিক দিয়ে কালুপুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের বাড়ি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, তাঁর এলাকার অন্য লোকেরা গুলমার্গ সোসাইটিতে এহ্সান জাফরির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই জন্যে যে এখানে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। এই বিশ্বাসে। একজন ছিলেন তাঁর প্রতিবেশী জুবি, আটমাসের সন্তানসম্ভবা। তাকে হত্যা করা হয়েছে। আরেক প্রতিবেশী রিখিবেনের ছেলে এবং দুই দেওর খুন হয়েছেন সপরিবারে, এরসান জাফরিসহ। রিখিবেন হিন্দু বলে ভান করছিলেন এবং আক্রমণকারীদের বলেছিলেন যে, তিনি শুধু জাফরি পরিবারে কাজ করতেন। তাঁকে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে দিয়েছিল ওরা। আর তিনি আসছিলেন তার ছেলে আর দেওরদের মৃতদেহ মাড়িয়ে। তিনি আছেন শাহীবাগ শিবিরে।

আমেদাবাদে হিংসার লাগামছাড়া ব্যাপকতার দৃষ্টান্ত রয়েছে এই ঘটনায় যে সরকার আয়োজিত একটা জাতীয় হস্তশিল্প প্রদর্শনী পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছিল, কারণ অনেকগুলি স্টরের মালিক ছিলেন মুসলমান। ওঁদের অনেকে এসেছিলেন বিহারের ভাগলপুর থেকে।

এঁদের মধ্যে তিনজন আবদুল্লা, রহমৎউল্লা এবং সৈদুল্লা মারা গেছেন আর দুজন এখনও নিখোঁজ। এ ঘটনাগুলি আমাদের নজরে আনেন আমাদের যুক্ত সমীক্ষক দলের অন্যতম নেতা কমঃ সুবোধ রায়। তিনি ভাগলপুর লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ। পরে আমেদাদের পুলিশ কমিশনার এসব ঘটনার উম্মত্ততা স্বীকার করে নেন।

মেহ্সানা জেলা :

সমীক্ষক দলের এক সদস্য মেহ্সানা জেলার ভিজাপুর শিবির পরিদর্শন করেন। এখানে সরদারপুর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্তরা আছেন। তারা সদস্যকে বলেছেন যে, ১ মার্চের রাতে ৮৪টি মুসলমান পরিবারের বাড়ি আক্রান্ত হয় এবং সম্পর্ণ ভস্মীভূত হয়। নারী ও শিশুদের অনেকে আশ্রয় নিয়েছিল একমাত্র পাকাবাড়িটায়। এটার মধ্যে তারপর পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ২২ জন মানুষ মারা যায়। মৃতদের মোট সংখ্যা ৫৪। বেঁচে যাওয়া মানুষগুলিকে পুলিশ উদ্ধার করে, এই শিবিরে নিয়ে আসে। বিশনগর হোস্টেলের চারশো ছাত্রসহ এক হাজার মানুষ এখানে আছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষেরা বলেছেন যে, কিছু দলিত পরিবার যারা এঁদের রক্ষা করেছিলেন, তাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (এটা একটা জেলার একটি মাত্র ছোট উদাহরণ, যে জেলায় বহু ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে)।

উপসংহার :

এই প্রতিবেদনটি প্রেসে পাঠানোর সঙ্গে নতুন নতুন হিংসাত্মক ঘটনার আরও সংবাদ এসেছে মধ্য গুজরাতের বহু জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে। সবথেকে অস্বস্তিকর সংবাদ হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার সামরিক বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে এটা প্রমাণ করতে যে গুজরাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। এটা রাজ্যটির পক্ষে বড়ো মারাত্মক হবে। সামরিক বাহিনীকে থেকে যেতেই হবে ঠিক যেমন নরেন্দ্র মোদীকে সরে যেতেই হবে– প্রথমটা একটা অস্থায়ী পদক্ষেপ কিন্তু দ্বিতীয়টাকে হতে হবে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা।

গুজরাত ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ মুখমণ্ডল হয়ে উঠতে পারে না, হবেও না।

(সূত্র: "গর্ভঘাতী গুজরাত ঃ গুজরাতে নারী নিধনের দলিল সংকলন", পিপলস বুক সোসাইটি, কলকাতা)।

মেয়েদের অভিজ্ঞতা

২৭ ফেব্রুয়ারি–১০ মে ২০০২, বরোদা

সম্পাদকের ভূমিকা :

পিপলস্ ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস, বরোদা। বরোদার বহু গণ সংগঠন, এবং ইনকিলাবি কমিউনিস্ট সংগঠনের উদ্যোগে গুজরাতের গণহত্যা রোধে বরোদাতে গঠিত হয় শান্তি অভিযান। পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস ও শান্তি অভিযানের কর্মীরা

তাণ্ডবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি তদন্ত চালান, পুনর্বাসনের জন্য লড়াইও করেন। এই লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবে পি ইউ সি এল অনেকগুলি তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গঠন করে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন রচনা করে। মেয়েদের অভিজ্ঞতা ও মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন রচনার কাজে সাহায্য করেন সাহিয়ার (বরোদা), ফোরাম এগেনস্ট্ অপ্রেশন অফ উইমেন (মুম্বাই), আওয়াজ-এ-নিশওয়ান (মুম্বাই), সহেলী (দিল্লি) প্রভৃতি নারী সংগঠন। পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হবে ২০০২-এর জুন মাসের মধ্যভাগে। পি ইউ সি এল-এর সৌজন্যে অধ্যায়টি আমরা অগ্রিম পেয়েছি।

ভূমিকা :

বরোদার বিভিন্ন তাণ্ডব-পীড়িত বস্তিতে এবং জামাতগুলি যে সব ত্রাণ শিবির চালাচ্ছে সেগুলিতে পরিদর্শনে গিয়ে তথ্য সংগ্রহকারী দলগুলি মেয়েদের কাছ থেকে ব্যাপক সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং হিংসার বর্ণনা সংগ্রহ করেছে। পি ইউ সি এল-এর তথ্য সংগ্রহকারী দলগুলি প্রধানত মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা, তাদের সাক্ষাৎকার, এর ওপর জোর দিয়েছিল। কারণ হিংসার সিংহভাগ তাদের ওপরই পড়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতামতের মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। হিংসার কবলে পড়েছে এমন এক ব্যাপক ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলমেশা করা এবং তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া ছাড়াও, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গেও বহু আলোচনা করা হয়। নীচের বর্ণনা নির্মিত হয়েছে মেয়েদের সঙ্গে বিশদ সাক্ষাৎকার এবং বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ পরিদর্শনের ভিত্তিতে। জাত, শ্রেণী ও ধর্ম যাই হোক না কেন, ঘটমান হিংসা সব মেয়েদেরই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। তাদের সকলেরই প্রাত্যহিক জীবন হিংসার ফলে একেবারে ভেঙে পড়েছে।

হিন্দু মেয়েদের ওপর নানা ধরনের প্রভাব পড়েছে। একটি স্তরে, তারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রে যাওয়ার এক নতুন সুযোগ এবং সেখানে এক নতুন দৃশ্যমানতা পেয়েছে। এটা ১৫ মার্চের রামধুন কর্মসূচিতে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল। শহরের বহু মন্দিরে, ব্যাপক সংখ্যায় তারা সেদিন উদ্দীপনার সঙ্গে উৎসবে অংশগ্রহণ করেছিল। এরই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কথা, তা হল, ছোট হলেও, তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যায় মেয়েরা সক্রিয়ভাবে হিংসায় অংশ নিয়েছে। বাবনপুরা, বাজওয়া ও নকাইয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকার প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, আক্রমণকারী জনতার মধ্যে মেয়েরা সক্রিয় সদস্য ছিল। আক্রান্ত মানুষদের প্রামাণিক সাক্ষ্যেও কিছু সুপরিচিত মহিলা নেত্রীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। আলোধারাতে ১ মার্চ আক্রমণকারী জনতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন সরপঞ্চ কান্তাবেন সনাভাই ভাসাভা। ই এস আই হাসপাতাল এলাকার বিজেপি কাউন্সিলর কাঞ্চনবেন বারোটকে জনতার সঙ্গে হাতে তলোয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল। বাজওয়াতে আক্রমণকারী জনতার মধ্যে

ছিলেন জয়াবেন ঠাক্কার। বরোদাতে যেসব গ্রেপ্তারগুলি করা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে মেয়েরা লুঠপাটেও একটা ভূমিকা নিয়েছে। মার্চের মাঝামাঝি খবরের কাগজে এই গ্রেপ্তার-সমূহ ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ যে, তারা বিভিন্ন কাজে সমাবেশ ঘটানো এবং সংগঠন করার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। জাতীয় মানবধিকার রক্ষা কমিশন এবং জাতীয় নারী কমিশন সহ বিভিন্ন তদন্তকারী দল ও কমিশনদের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠানো এবং অভিযোগ করার ক্ষেত্রে বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্য সম্বলিত বেশ কিছু নারী গোষ্ঠী এগিয়ে আসে। আপাতভাবে, এই নতুন ভূমিকাতে তারা আসছে উত্তরোত্তর সহজ এবং সামাজিক সম্মতিক্রমে।

আরেকটি স্তরে, একথা অনস্বীকার্য যে ঘৃণার মতাদর্শ স্থায়িত্ব পাওয়ার অন্যতম আধার মেয়েরা। পি ইউ সি এল-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দলগুলি জানাচ্ছে যে হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ঘৃণার মাত্রা ছিল ভয়াবহ। যদিও তারা কথা বলতে শুরু করে আপাতভাবে সমবেদনা ব্যক্ত করার স্বরে (কুখ্যাত বেস্ট বেকারি ঘটনার ক্ষেত্রে 'বহুত বুঢ়া হুয়া'– খুব খারাপ হয়েছে– ইত্যাদি বলে), তবু অল্পক্ষণ বাদেই তারা হিংসাকে সমর্থন করে বলে, 'ওদের এটা হওয়ার ছিল'। গত ক'বছর ধরে যে ধারাবাহিক মুসলমানদের ঘৃণা করার প্রচার হয়ে চলেছে, মেয়েরা পুরোমাত্রায় তার অঙ্গ। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমদের কাছে বিপন্ন বোধ করে : 'ওদের ৪টে বৌ আর ২০টা বাচ্চা হয় ওরা আমাদের ছাপিয়ে যাবে, ওরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে না। ওরা আমাদের ব্যবসা নিয়ে নিচ্ছে, আমরা গরিব হয়ে পড়ছি।' পি ইউ সি এল-এর দলেরা দেখিয়েছে কীভাবে মুসলিমদের ঘৃণা করা থেকে তাদের হত্যাকে ক্ষমা করা ও তাকে মদত দেওয়া সীমারেখা পেরিয়ে যাওয়া হয়েছে। অন্তত আংশিকভাবে তা হয়েছে 'বিপজ্জনক অপর' (dangerous other)-এর ধারণাকে কেন্দ্র করে যে ভীতি, সেটার দরুন। অনেক দিক থেকেই, হিন্দু মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতার অনভূতি হল হিন্দুত্ব মতাদর্শের ফল। এই মতাদর্শ তাদের সৃজন করে সহজেই মুসলিম পুরুষ কর্তৃক যৌন আক্রমণের শিকার হিসেবে। এই সব ধারণা অযৌক্তিক এবং এদের কোনো দৃঢ় ভিত্তি নেই। তবু, তারা যে ভয় পেয়েছে, সেই অভিজ্ঞতাটা বাস্তব। নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কে চিন্তা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ঢেলে সাজিয়েছে, এবং তারই মধ্যে, তারা ওই রকম এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিত্তবান হিন্দু মেয়েরা নিয়মিতভাবে মধ্য/উচ্চবিত্ত হাউজিং সোসাইটিগুলিতে তাদের পুরুষদের সঙ্গে রাত জেগে বসেছিল, মুসলিম আক্রমণের ভয়ে। অবশ্য চিরাচরিত লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা মেনে তারা স্থানীয় 'শান্তিরক্ষক' পুরুষদের নিয়মিতভাবে চা ও খাবার সরবরাহ করে গেছে। অন্যরা, যারা এই আধিপত্যশালী দিশার স্রোতে ভাসেনি, তাদের হুমকি দেখানো

হয়েছে বা গালমন্দ করা হয়েছে, কারণ তারা মুসলিমদের সাহায্য করেছে, বা এমনকী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ পোষণ করেছে।

হিংসা চলাকালীন, দলিত মেয়েরা কমবেশি উঁচু জাতদের সঙ্গে মৈত্রী করেছিল। এটা দেখা গেছে বারাননুরা, নকাইয়ার্ড এবং ফতেপুরার মতো জায়গায়। এর ফলে দলিত মেয়েদের হিন্দুকরণ যতটা ব্যাপকভাবে ঘটেছে তা ইতিপূর্বে বরোদায় কখনো দেখা যায়নি। গোধরার পরবর্তী হিংসায় দলিত মেয়েরা, যারা অনেক সময়েই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত, তারা বিপন্ন হয়েছে। একদিকে ক্রমান্বয়ে কার্ফু, অন্যদিকে ভীতির পরিবেশ, এক তীব্র অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। বহু মেয়েরা, যারা দিনমজুর হিসেবে বা গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করত, তারা কাজের জায়গায় পৌঁছতে পারেনি এবং অনেকেই চাকরি হারিয়েছে। আয় হারানোর ফলে দারিদ্র ও ক্ষুধা বেড়ে চলেছে। পি ইউ সি এল-র দলগুলি লক্ষ্য করেছে যে উঁচু জাতের মেয়েদের তুলনায় দলিত মেয়েদের মধ্যে জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে দুশ্চিন্তা অনেক বেশি, অংশত এই কারণ যে, দলিত বস্তিগুলি প্রায় সব সময়েই মুসলিম বস্তিগুলির লাগোয়া। কাগদা চল-এ তরবারির পাইকারি বাজারে মাল তোলার কাজে নিযুক্ত হিন্দু মেয়ে, যে বাস করে মুসলিম পরিবারদের মধ্যে, সে বর্ণনা দেয় কীভাবে চিরুনী তল্লাশির সময় পুলিশ বাড়িতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল। যেহেতু সে মুসলিম যুবকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখে (এবং সম্ভবত তাদের আশ্রয় দিয়েছিল) তাই পুলিশ তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সম্বোধন করে। এছাড়া, দেখা যাচ্ছে, একইরকম আর্থ-সামাজিক সমস্যার ভিত্তিতে এবং দলিত ও প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে দলিত ও মুসিলম মেয়েরা যে দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রীবন্ধন করেছিল, তা যেন ভেঙে পড়ছে। এটা কিসানওয়াড়ির ঝাণ্ডা চকের মেয়েরা এবং বারানপুরার মেয়েরা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। ফতেপুরার অধিবাসী ভানুবেন পারমার নাগরিক ট্রিবিউন্যালের কাছে তাঁর সাক্ষ্যে বিবৃত করেন, কীভাবে, তিনি এখনো তাঁর মুসলিম প্রতিবেশী ও বন্ধুদের বিষয়ে চিন্তিত, কিন্তু তাদের থেকে সরে থাকতে বাধ্য হন। তাঁর বস্তির সমস্ত হিন্দু মেয়েরা মনে করে,তারা যদি তাদের মুসলিম বন্ধুদের সঙ্গে আগের মতো গভীর নৈকট্যের সম্পর্ক রাখে, তাহলে পুলিশ তাদের শাস্তি দেবে। তবু কিছু মেয়ে তাঁদের মুসলিম প্রতিবেশীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করতে গিয়ে বড় মাপের ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। কিসানওয়াড়ির হুসেনী চক-এর মারাঠী মেয়েরা বলে যে তারা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের সম্পত্তি উদ্ধার করে মজুত রাখছে, যতদিন না মুসলিম পরিবাররা বাড়ি ফিরতে পারে। দলিত বস্তিগুলি পুলিশ পরিচালিত চিরুনী তল্লাশীতে অনেক বেশী আক্রান্ত হচ্ছে, এবং বহু মেয়েদের পুলিশ ঠেঙিয়েছে ও আহত করেছে, যদিও মুসলিম মেয়েদের সঙ্গে অবশ্য এর মাত্রার কোনো তুলনা হয় না।

সংখ্যালঘু বাড়িদের অবস্থা অন্য কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনীয় নয়। তাদের জীবন ও সম্পত্তি ধারাবাহিক আক্রমণের শিকার। তাদের মোকাবিলা করতে হচ্ছে এক অসাড়, বস্তুত পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে। ফলে সংখ্যালঘু পরিবারের মেয়েরা এক

কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষুধা এক তীব্র সমস্যা, কারণ মেয়েরা বা পুরুষরা, কেউই কাজে বেরোতে পারছে না। শ'য়ে শ'য়ে পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে এবং পুনর্বাসনের সুযোগ খুবই দূরবর্তী। বিপন্ন সময়ে বাস করার যে সামাজিক উত্তেজনা, তা বেড়ে গেছে মেয়েদের অনুভূত এক গভীর বিশ্বাস হারানোর অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষত যখন তারা আক্রান্ত হয়েছে প্রতিবেশীদের এবং 'আমাদের চোখের সামনে বড় হয়ে ওঠা' প্রতিবেশীর সন্তানদের হাতে।

প্রধান যে প্রসঙ্গগুলি উঠে আসছে

মেয়েদের সাক্ষ্য ও ব্যক্তিগত বিবরণ থেকে কতকগুলি প্রসঙ্গ বারে বারের ফিরে আসছে। হিংসার ছক ও চরিত্র যেহেতু তিনটি পর্যায়ে পাল্টেছিল, তাই মেয়েদের অভিজ্ঞতা এবং তারা তাদের প্রসঙ্গ বলে কোনগুলির কথা বলছিল, তিনটি পর্যায় ধরে সেগুলিও পাল্টেছিল। হিংসার প্রথম পর্যায়ে, অর্থৎ ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত দিনগুলির প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মেয়েরা স্মরণ করে বাড়ি ছাড়া, বাড়ি লুঠ ও দগ্ধ হতে দেখা এবং তাতে তাদের যন্ত্রণা ও ত্রাসের অনুভূতি। বহু মেয়েদের তাদের স্বামীদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং তাদের স্বামীরা কোথায়, এ নিয়ে যে উদ্বেগ, সে বিষয়ে অনেক কথা বলে। ১৫ মার্চের পরে যে দ্বিতীয় পর্ব, তখন সামনে আসে পুলিশের হাতে তাদের লাঞ্ছনা। বস্তুত, অধিকাংশ জবানবন্দীতে প্রথম পর্বের পরবর্তী কথাবার্তার কেন্দ্র হল চিরুনী তল্লাশির সময়ে পুলিশি অত্যাচারের কথা।

পুলিশি অত্যাচার :

মেয়েরা সবক্ষেত্রেই অভিযোগ করেছে যে 'চিরুনী তল্লাশির' সময়ে পুলিশি নৃশংসতা ঘটেছে। আমরা এমন সব ঘটনার তথ্য নথিভুক্ত করেছি যা দেখায়, 'চিরুনী তল্লাশি' হয়েছে "বৈষম্যমূলকভাবে, যেখানে পুলিশ বাছাই করে কেবলমাত্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এলাকা ও বস্তিতে। এই খেয়ালখুশি মতো চিরুনী তল্লাশি হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই আক্রান্ত, এই বাস্তব পরিস্থিতি সত্ত্বেও। কিছু কিছু বাড়াবাড়ির ঘটনা নীচে দেওয়া হল।

* মেয়েদের বাড়ি থেকে টেনে বার করা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চুল ধরে টেনে বার করা।

* গালমন্দ করা, যেখানে ধর্মগত-যৌন অনুষঙ্গ মেশানো খেউড় ব্যবহার করা হয়েছে।

* বৃদ্ধা ও বিধবা সহ মেয়েদের ঠ্যাঙানো– অনেক সময় এত প্রবলভাবে যে তাদের ডাক্তারি তত্ত্বাবধান দরকার হয়ে পড়েছিল।

* গর্ভবতী মেয়েদের পেটে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মারা।

বহু মেয়ে পুলিশ কমিশনারকে প্রদত্ত মৌখিক ও লিখিত অভিযোগে এইসব অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত পুলিশ কর্মীকে শনাক্ত করলেও কোনো এফ আই আর রেজিস্টার করা হয়নি বা কোনো পদক্ষেপ নিতে শুরু করা হয়নি। (দ্র. বারানপুরা সম্পর্কে নিমা কুওয়াওয়ালার সাক্ষ্য, ওয়াদি তাইওয়াড়া থেকে রায়েঁ বাসেররার সাক্ষ্য ও বিবরণ, ইত্যাদি)।

নীচে যে সারণীটি দেওয়া হল, তাতে বরোদার বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশের অত্যাচারের ঘটনা দেখানো হল।

তারিখ	এলাকা	ঘটনার খুঁটিনাটি	অভিযুক্তের নাম	মন্তব্য
১ মার্চ	কারেলি বাগ	সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ। চিরুনী তল্লাসীর সময়ে পুলিশ মেয়েদের লাঞ্ছনা করে, মেয়েদের মারধোর করে। এক বৃদ্ধাকে মাথায় মারা হয়। মেয়েরা পুলিশ অফিসারদের কাছে অভিযোগ করতে ভয় পায়।		
১ মার্চ	মাধার মোহাল্লা	পুলিশ গুলি ও কাঁদান গ্যাস চালানোতে মেয়েরা আহত। (হাজরা বিবির ঘাড়ে ও হাতে কাঁদনে গ্যাসের খোলের টুকরো লেগে আঘাত। দিওয়ান সামিনার কানের লতিতে গুলি লাগে। ১৩ দিন তাকে হাসপাতালে রাখতে হয়। ৩ সপ্তাহের বেশি চিকিৎসা করতে হয়। বহু সপ্তাহের জন্য মানসিক বিষাদগ্রস্ত)		

২৮ ফেব্রুয়ারি ২২ মার্চ	বারানপুরা	২৮ ফেব্রুয়ারী এই এলাকায় আক্রমণ শুরু হয়। লোকের ঘরবাড়ি ও দোকান লুঠ হয়। মসজিদ, মসজিদের সম্পত্তি, এবং বক্তিগত বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। যখন লোকেরা পাঁচনামা করতে এবং নিজেদের সম্পত্তির তদারকি করতে যায়, তখন তাদের উপর আবারও আক্রমণ করা হয়।	সাজিদা বানো নিম্নলিখিতদের তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে বলে শনাক্ত করেন : ঈশ্ব মাচ্ছি, সোনি ভুরিয়া, ড. ঠাকুর প্যাটেল এবং বিমল ঠাকুর। তাঁর ভাইকে আক্রমণ করে বিজয়, আখতার ও দীপক সোনি।	
১৫ মার্চ	বেন বাগেরা	পুলিশরা কুৎসিকত গালি-গালাজ করতে থাকে। তাতে প্রকাশ্য যৌন ও ধর্মগত অর্থ ছিল। পুলিশ আক্রমণে গর্ভবতী মেয়েরা সহ বহু মেয়ে আহত হয়। (সাবিরাবেন আহমেদভাই শেখ, বয়স ৪৫–এমনভাবে মারা হয় তাঁর বাঁ হাতের ওপর দিক ফুলে যায় ও কালশিটে পড়ে। ফরিদাবানু বাব্দুভাই শেখ, বয়স ৩০, হাজিরাবিবি গুলাম হুসেন ধেবি, ৩২ এবং হামিদাবিবি আহমেদখান পাঠান, এই তিনজনকে পয়ে লাথি মারা হয়। হাজিরাবিবিকে বুকেও লাথি মারা হয় এবং ফরিদাবানুকে যৌনাঙ্গের কাছে লাথি মারা হয়। মেহেরুন্নিসা, বয়স ১৮– তাকে তলোয়ার দিয়ে হুমকি দেওয়া হয়। (আপাতভবে তা নাকি বাজেয়াপ্ত করা তলোয়ার)। তলোয়ারের ডগা তার পেট ছুঁয়ে গিয়েছিল।		

১৭ মার্চ	বাহার কলোনী	মেয়েদের উপর লাঠিচার্জ। প্রবীণারা সহ বহু মেয়েদের গুরুতর আঘাত লাগে।		কমিশনরের কাছে অভিযোগ করা হয় ১৮ মার্চ, ২০০২।
১৭ মার্চ	বোরসালি অ্যাপার্টমেন্টস, আলিশান কম্প্লেক্স	মেয়েদের উপর লাঠিচার্জ ও মৌখিক আক্রমণ। একজন গর্ভবতী নারী সহ সাতজন নারী গুরুতরভাবে আহত।		ঐ। ১৮ মর্চ সহকারী পুলিশ কমিশনার পীযূষ প্যাটেলের সঙ্গে আলোচনা। ১২ এপ্রিল জাতয়ি মহিলা কমিশনের কাছে সাক্ষ্য। কোনো কাজ হয়েছে কি?
১৮ মার্চ রাত ৮-৩০	রোশন নগর, তুলসী ওয়াড়ি	তুলসীওয়াড়ি ও সঞ্জয়নগরের বাড়ি ও দোকানের উপর আক্রমণ। চিরুনী তল্লাশীর সময় পুলিশি লাঞ্ছনা। পুলিশের হাতে আহত আমিনাবেন (৬০), বিসমিলাবেন (৩৫), রেহানা ইউনুস (১৫), রুকসানা পাঠান (গর্ভবতী), ৩ বছর ৬ মাস বয়সের খুশবু ও অন্য অনেকে। জন ২০ অল্প বয়স্ক ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।	প্রাক্তন মেয়র উমাকান্তভাই, কানুভাই পানওয়ালা, পাবর্তীর ছেলে নরেন্দ্র পাণ্ডা, রাজুভাই কুবেরভাই, তুলসীওয়াড়ির সুরেশ শর্মা (এস টি ডি-র মালিক), এরা সব সঞ্জয়নগরের দোকান এলাকায় বাড়ি পোড়ায়। ৫নং ওয়াদির প্রাক্তন পৌরপ্রতিনিধি হিল্লায়াব।	জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। মেয়েরা পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ করতে রাজি না, কারণ "তাঁর লোকেরা নাকি আমাদের দেখাশোনা করার কথা, তারাই এমন করেছে।"

২ মার্চ	ওয়াদি তাইওয়াদা	জর্জ ফার্নান্ডেজ এই এলাকার মধ্য দিয়ে গেলে একদল পুরুষ ও নারী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়েদের পুলিশ মারধোর করে। তাদের পা ও উরুতে মারা হয়। পুলিশ খেউড় ব্যবহার করে।		৩ মার্চ পুলিশ কমিশনারের কাছে সাহিয়ার একটি অভিযোগ পত্র পাঠায়। কোনো কাজ হয়েছে কি?
১৫ মার্চ, রাত ১০টা	ওয়াদি তাইওয়দা	সৈয়দ ফোটো স্টুডিও আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। চিরুনী তল্লাশীতে ১৩ জন মেয়ে আহত (হামিদার হাত তিন জায়গায় ভেঙেছে; ৬ মাসের শিশুকে পুলিশ মাড়িয়ে দিয়েছে; জারিনা, যার মাত্র এক মাস আগে সন্তান জন্মেছে, তাকে পুলিশ মারধোর করে) মেয়েদের মুখেও গালিগালাজ করা হয়।	সৈয়দ মাসুদের পরিবারের সদস্যারা আর এস এস-এর সন্দীপ ভোঁসে, মুকেশ ডি শিরসাগর, হিতেশ আর ধোমাস, এব ভারতেশ দেশাই এর নামবলেন। চিরুনী তল্লাশীর ক্ষেত্রে পুলিশ ইন্সপেক্টর কলোনি ও তার রোকজন সম্পর্কে অভিযোগ ওঠে।	২২ এপ্রিল পি ইউ সি এল শান্ত অভিযান, সদস্যরা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লেখেন। কোন কাজ হয়েছে কি?

২৬-২৯ এপ্রিল	ওয়াদি তাইওয়াদা	পুলিশ বারে বারে এসেছে, মেয়েদের কদর্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে, যৌন হিংসার ভয় দেখিয়েছে, শারীরিকভাবে অক্ষম ও তরুণ মেয়েদের দৈহিক আক্রমণ করেছে।		২৮ এপ্রিল পি ইউ সি এল শান্তি অভিযান পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লেখে। কোন কাজ হয়েছে কি?
৩০ এপ্রিল রাত দেড়টা	ওয়াদি তাইওয়াদা	পুলিশের গুলিতে ২ জন যুবকের মৃত্যু হয়। তাদের স্ত্রীরা অত্যন্ত দরিদ্র, এবং তাদের সামাজিক সমর্থন খুব সীমিত।		
২৫ মার্চ	বাওয়ামানপুর, কাগমা চল এব ইমরন চেম্বারস	ভোইওয়াড়া এবং ভাউচাওয়াড় থেকে আক্রমণ। তাদের বাড়িতে গিয়ে মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণ। মেয়েরা অভিযোগ করে যে পুলিশরা মত্ত ছিল। বয়স্কা মেয়েদের এত খারাপভাবে মারধোর করা হয় যে তাদের পুরোনো অস্ত্রোপচারের জায়গায় বেদনা দেখা দেয়। গর্ভবতী মেয়েদের মারধোর করা হয়েছে।	অনেকে কানানির নানম করেছ। ইমরান চেম্বারসে দায়িত্বরত পুলিশ ইন্সপেকটর ছিলেন কাটারা। ভাউচার ওয়াডের জয়ন্তী ও সত্য ইমরান চেম্বারসে একটি মেয়েকে আক্রমণ করেছে বলে শনাক্ত করা হয়েছে।	২৮ এপ্রিল, ২০০২ পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লেখা হয়।

২৭ এপ্রিল	রাজারানী তালাও	মোহাল্লার উপর দুদিক থেকে আক্রমণ; মেয়েদের কাছ থেকে পৌনঃপুনিক আবেদন এবং পি ইউ সি এল-এর কাছ থেকে আগে খবর পাওয়া সত্ত্বেও পুলিশ আসতেদেরি করে। পুলিশের আক্রমণে মেয়েরা আহত। অন্তত দু'জন গর্ভবতী মেয়ে পুলিশি অত্যাচারে আহত।		
২৮ এপ্রিল	বদ্রী মোহাল্লা	বদ্রী মোহাল্লার ভাডি এব হুসেনী চাকলা পুলিশের সক্রিয় সহযোগিতায় আক্রান্ত হয়। আক্রমণকারীদের ধরার বদলে পুলিশ বলপূর্বক আক্রান্তদের বাড়িতে ঢোকে, মেয়েদের আক্রমণ করে এবং পুরুষদের এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করে। একই এলাকায় আগের রাতের এক আক্রমণে সাকিনা বদরুদ্দীন গুরুতর ভাবে আহত হয় ও তার ডাক্তারী সাহায্যের প্রয়োজন হয়।		২৮ এপ্রিল পুলিশ কমিনারকে চিঠি লেখা হয়েছে।
৩০ এপ্রিল	সুলেমনী চল	পুলিশ জোর করে বাড়ি বাড়ি ঢোকে। পুলিশ শিশুদের ও মেয়েদের আক্রমণ করে এবং কুৎসিক ভাষায় গালমন্দ করে। পুলিশরা সকলেই মাতাল ছিল। (ওয়াহিদাকে লাঠি দিয়ে হাতে মারা হয়, পরে শামিমকে মারা হয়।) পুলিশ "তোমাদের পুরুষদের" খোঁজ করছিল। মেয়েরা তাদের খবর জানে না একথা বলার পর পুলিশ হুমকি দেয়, তারা মেয়েদের ধর্ষণ ও যৌন আক্রমণ করবে। তারা ৪ বছর বয়স্ক আফতারকে লাথি মারে ও তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। এই সময়ে চারজন মেয়ে বাচ্চাটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। ওরা মেয়েদের নির্দয়ভাবে লাঠি ও বন্দুকে কুঁদো দিয়ে মারে। পেটানোর ফলে ২৫ বছর বয়স্কা শাহনাজবানো সময়ের আগেই প্রসব করে।	যে পুলিশরা মারধোর করেছিল, তাদের মধ্যে ছিল পানিগেট থানার একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, এবং হরিশ নামে একজন, যে উর্দী পরে ছিল না।	

২৭ এপ্রিল	গেভা কালিয়া হাতিখানা	সাদা পোশাকে জন ২৫ পুলিশ এসে দুপুর ১টা নাগাদ বাড়িগুলোকে আক্রমণ করে। বেশ কিছু মেয়েকে মারধোর করা হয়। দুজন মেয়েকে গুলি করা হয় ও তাদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। একজন গর্ভবতী মেয়েকে পেটে লাথি মাররা হয়।	রাজু 'কালিয়া' পাটিল ও 'ডি' স্তরের স্টাফ সদস্যরা।	
২ মে	স্যারবাইনা পার্ক	কিসানওয়াড়ি থেকে ঢিল ছোঁড়ার ঘটনা– কিসানওয়াড়ির দুষ্কৃতিদের থামানোর বদলে পুলিশ স্যাবাইনা পার্কের বৃদ্ধ নাগরিকদের এবং মেয়েদের লাঠিচার্জ করে। একজন গর্ভবতী মিয়েকে পেটে ও পিঠে অঘাতকরা হয়। পুলিশরা মত্ত ছিল।	পানিগেটের পি এস আই পারমার।	৩মে, ২০০২ পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ করা হয়। পুলিশ কমিশনার কর্তৃক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রযন্ত্র, বিশেষত পুলিশের ভূমিকায় ক্রোধ :

হিংসাত্মক ঘটনার সময়ে পুলিশের একপেশে ভূমিকায় মেয়েরা খুবই ক্ষিপ্ত। অনেক মেয়েই চোখে দেখেছে, পুলিশ তাদের বাঁচাতে অক্ষম ছিল, কখনো কখনো অরাজি ছিল। "চিরুনী তল্লাশীর" সময়ে পুলিশের নৃশংস কাজ বহু মেয়েকে আঘাত দিয়েছে। বাওয়ামানপুরার কৌসল বানো মানসুরির "চিরুনী তল্লাশী" সংক্রান্ত সাক্ষ্য এখানে উল্লেখযোগ্য। : "২৩ মার্চ রাত ৯টায় আমি আমার বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম, আমার বাড়িতে একগাদা পুলিশ। ওরা বাড়িতে আমাদের পুরুষদের পায়নি। তখন ওরা আমাদের গালি দিতে শুরু করল। আমার উপর দুটো ডান্ডা চড়াল– একটা হাতে, একটা পেটে। তারপর ওরা দেখল আমি অন্তঃসত্ত্বা (৯ মাস) এব উরুতে মারল। ওরা সবাই বলছিল কানানি, কানানি (এলাকার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার)। ওরা সব তার কর্মী। (আমি এতটা আহত ছিলাম যে) সবে আজ থেকে হাঁটাচলা শুরু করতে পেরেছি। আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। আমি দরগায় গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। আমি ওদের বলেছিলাম, আমার পেটে আছে। ওরা তবু বলল, "ওকে আমাদের মারতেই হবে।" আমার শাশুড়িও বললেন যে আমার বাচ্চা হবে। ওরা বলল, "তা হওয়ার আগেই এটাকে মারতে হবে।"

মেয়েরা সবার আগে চাইছে নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার। রাফাই মোহাল্লার সমাজকর্মী নাসিম বানো পি ইউ সি এল সদস্যদের বলেন যে তিনি পুলিশ কমিশনারকে বলেছেন : "আপনাকে আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। আমরা যদি কানুন আমাদের হাতে তুলে নিই, তবে আমরা অপরাধী হয়ে যাব। যদি তা না করি, তবে আমরা মরব (কোনো নিরাপত্তা নেই বলে)।" আমি তাঁকে বলি, "আপনি এক তরফা হতে পারেন না। আপনার উচিত ওদেরও ধরা, এবং আমাদেরও ধরা (অর্থাৎ গ্রেপ্তার করার সময়ে সম্প্রদায় দেখে কাজ না করা)।"

আক্রমণকারী জনতা ও পুলিশের প্রকাশ্য ধর্মগত ও যৌন উক্তি ব্যবহার, সামগ্রিক অপমান ও আঘাতপ্রাপ্তির বোধ

মেয়েদের উপর মৌখিক আক্রমণের ফল ছিল প্রকট। তথ্য অনুসন্ধানকারী দলগুলির সদস্যরা মনেকরেন, এই ক্ষেত্রে মেয়েদের উপর হিংসার প্রভাব খাটো করে দেখা হয়েছে। মৌখিক গালিগালাজের ফলে অবমাননা বোধ দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে কষ্ট দেয় এবং তার ভর প্রায় শারীরিক আক্রমণের মতই। প্রায় প্রতিটি সাক্ষ্যই মেয়েরা গালিগালাজ এবং স্লোগান চেঁচানোর ঘটনাকে স্পষ্ট মনে রেখেছে। দাভোই রোডের বেস্ট বেকারীর জারিনা শেখের বিবরণ এটা স্পষ্ট করে তুলে ধরে : "আমরা গোটা রাত ছাদে ছিলাম। জনতা আমাদের দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে, গালমন্দ করতে থাকে এবং আমাদের নীচে নামাতে চেষ্টা করে। ওরা বাড়ির পিছন থেকে একটা মই লাগিয়ে আমাদের কাছে পৌছতে চেষ্টা করে, কিন্তু দেওয়ালগুলো বড্ড গরম ছিল (কারণ বাড়িটা পুড়ছিল)। গোটা রাত জনতা বাড়িটা ঘিরে ধরে আমাদের মা-বোনদের নাম করে গালি দিতে থাকে।" রায়েঁ বাসেরার মেয়েরা পুলিশ যে কদর্য ভাষা ব্যবহার করেছিল তা পুনরুচ্চারন করতেও পারেননি। একথা বলাই যথেষ্ট যে তাঁরা সবচেয়ে অপমানিত হয়েছেন আল্লার সঙ্গে তাঁদের যৌন সম্পর্কের বিষয়ে গালিগলাজ শুনে। এ কথাও তাৎপর্যপূর্ণ যে মাচ্ছিপিট এলাকার মেয়েরা (রায়েঁ বাসেরা থেকে একটা রাস্তা দিয়ে বিভক্ত) রায়েঁ বাসেরার মেয়েদের অভিজ্ঞতায় সমান অপমানিত বোধ করেন, যদিও তাঁরা ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের মানুষ।

কসামালা কবরিস্তানের মেহরুন্নিসা বলে যে পুলিশ এত খারাপ গালি দিয়েছিল "যো হামারে মর্দো নে ভি কভি হমে না দি হোঁ (যেমনটা আমাদের পুরুষরাও কখনো আমাদের দেয় না)।" শুধু মৌখিক কথা মেয়েদের ক্ষুব্ধ করে তোলেনি। সম্প্রতি বিধবা হওয়া মহিলা, কাগদা চল-এর রেহানা পাঠান, সভয়ে স্মরণ করেন যে তিনি যখন ইদ্দতকালে ছিলেন, তখন পুলিশরা তাঁর পর্দা (অবরোধ) লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ে। তারা তাঁর লোককেও পরোয়া করেনি, করেনি তার ধর্মীয় প্রথাকেও, যা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পরবর্তী তিন মাস কোনো পুরুষের মুখ না দেখার কথা।

কাগদা চল এবং ইমরান চেম্বারসের মেয়েরা বর্ণনা করে, মহরমের সন্ধ্যায় পুলিশের চিরুনী তল্লাশীর ফলে কীভাবে তাদের ভোজ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব বিশ্রীভাবে ওলটপালট হয়ে যায়, ও তাতে তারা কতটা শোকার্ত। "আমি আমার ছেলের জন্য যে খাবার করেছিলাম তা খেতে পর্যন্ত পারেনি।"

কোরান অবমাননা এবং বিভিন্ন মসজিদ/দরগা ধ্বংস/ক্ষতিগ্রস্তহওয়ায় ক্ষোভ :

বহু মেয়ে স্মরণ করে, তাদের এলাকায় মসজিদ/দরগায় কেমন করে ক্ষতি করা হয়েছিল। অন্যান্য মসজিদ/দরগায় যে সব ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তারা সে কথাও জানে এবং তা নিয়েও সমান শোক ও ক্ষোভ ব্যক্ত করে। বারানপুরার সাজিদা বানো বলে : "আমরা সম্প্রতি আমাদের মসজিদের উপর বেশ কিছু টাকা খরচ করি– এখন সেটা একেবারের ধ্বংস করা হয়েছে। ওরা মসজিদে বোমা খুঁজে পেয়েছে– সেগুলো ফাটেনি।"

বদ্রী মোহাল্লার এক মহিলা প্রায় কেঁদে ফেলে বলে, কীভাবে পুলিশ চিরুনী তল্লাশীর সময়ে কোরাণ ছিড়ে তা জলে ফেলে দিয়েছিল। "তোমাদের কেমন লাগত, যদি ওরা একটা তোমাদের গীতা নিয়ে করত?" সে প্রশ্ন করে। কিসানওয়াড়ির মেয়েরা পি ইউ সি এল-এর তথ্য অনুসন্ধানকারী দলকে দেখায়, একটা বোমাবিধ্বস্ত মসজিদের চারদিকে কোরানের আধপোড়া পাতা পড়ে রয়েছে।

জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা ও ভবিষ্যত নিয়ে ভয় :

মেয়েদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে সব কিছু ছাপিয়ে যাওয়া এক ভয়, প্রতিটি মেয়ে, যার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, নিজের পরিবারের এবং নিজের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীতির পরিচয় দিয়েছে। ভীতি ও নিরাপত্তার অভাব গোটা সমাজেই প্রবেশ করেছে, কিন্তু মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের, বিশেষত শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে ভীতির সঙ্গে যৌন আক্রমণেরও বাড়তি ভয় রয়েছে। ত্রাণ শিবিরে, এবং যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা নিজেরা হিংসার শিকার হয়েছে বা হিংসা প্রত্যক্ষ করেছে, সে সব জায়গায় অনিশ্চয়তা অনেক বেশি।

সব মেয়েরাই বলে, তারা এমন এক ভবিষ্যতের কথা ভেবে সন্ত্রস্ত, যেখানে জীবন ও সম্পত্তির ন্যূনতম নিশ্চয়তাও ধরে নেওয়া যেতে পারে না। এমনকী যে সব মেয়েরা ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, তারাও মনে করছে, তারা হিংসার চক্রে জড়িয়ে পড়েছে, কেবল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য বলেই। কুরেশি জামাত খানা ত্রাণ শিবির থেকে পি ইউ সি এল-এর দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : "মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তারা শিবিরের পর আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না। 'আমরা কতদিন এখানে থাকব?' 'ওরা আমাদের কতদিন খেতে দেবে?' ওরা বার বার জিজ্ঞাসা করছিল।"

ক্ষুধা, অর্থনৈতিক কষ্ট ও জীবিকা হারানো :

অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কার্ফুর ফলে দিন মজুরীর কাজ, খুচরো ব্যবসা এবং স্বনিযুক্ত কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাইওয়াড়ার হামিদার কব্জি পুলিশের লাঠির বাড়িতে তিন জায়গায় ভেঙে ছিল। সে বলে, তার ঘুড়ি বানানোর কাজ একেবারে থেমে গেছে। পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই কাজ করতে ও উপার্জন করতে পারছে না। যাতায়াত করতে না পারা এবং জীবন ও সম্পত্তির উপর আক্রমণের ভয়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে বাইরে বেরোনোটাকে একটা ঝুঁকির ব্যাপারে পরিণত করেছে। অনেকের টাকা থাকলেও দুধ বা খাদ্যশস্যের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘমেয়াদী দিশা একইরকম কঠোর– মুসলিমদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার উপর যে সুপরিকল্পিত আক্রমণ, তা বড় শিল্প/বাণিজ্য হোক বা দীনতম লারি (ছোট দোকান) হোক, তার ফলে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন একটা কঠিন কাজে পরিণত হয়েছে। এটা আরো বেড়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল মুসলিমদের অর্থনৈতিক বয়কটের যে ডাক দিয়েছে, তার ফলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মেয়েদের উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কাজ এক নতুন গুরুত্ব ধারণ করেছে। আমাদের কাছে খবর আছে যে মুসলিম মেয়েরা যারা বাড়িতে ও ছোট শিল্পে এতদিন নিযুক্ত ছিল, হিংসা পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আর কাজে নেওয়া হচ্ছে না। সাদ্দুবেন আশরফভাই মণ্ড্রুসারে বারোদা টাইলস ফ্যাক্টরিতে প্লাস্টার লাগানোর কাজ করত। ২৮ ফেব্রুয়ারি কোম্পানি আরো দশ জন মুসলিম শ্রমিকের সঙ্গে তাকে ছাঁটাই করে। মকারপুরার নূরজাহান ইসমাইলভাই ঘাঞ্চি বলে "২৮ ফেব্রুয়ারি বন্ধ ঘোষণা করা হল। আমাকে বলা হল যেন সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ১৫-২০ দিন বাদে আমি ফিরে আসি। কার্ফু খুললে আমি গিয়ে সই করলাম। আমাকে সুপারভাইজার সন্তোষভাই বললেন পরে ফিরতে। আমি এক মাস তাণ্ডালজার আলিয়ানা শিবিরে ছিলাম। ২৪ এপ্রিল আমি যখন ফিরে গেলাম, সন্তোষভাই বললেন, আমরা তোমার কার্ড খারিজ করে দিয়েছি।" এই সব মেয়েদের ভূতপূর্ব মালিকরা অনেকেই উগ্র দক্ষিণপন্থীদের ডাকা মুসলিমদের উপর সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বয়কটের ডাকে বিপন্ন বোধ করছে। মেয়েদের চাকরীর বাজার যে ক্রমেই ছোট হচ্ছে, তা আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ২০০২-এর মার্চের তাণ্ডবে গোটা সম্প্রদায়ের জীবিকার সম্পদ ধারাবাহিকভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, আর অন্যদিকে বর্তমানে তারা এক মন্দার সম্মুখীন হচ্ছে।

ত্রাণ শিবিরের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা :

অনেকেই ভবিষ্যতে বাঁচার পথ নিয়ে চিন্তিত। প্রথমত, পুনর্বাসন আসছে এমন মনে হচ্ছে না এবং দ্বিতীয়ত, তাদের এই আত্মবিশ্বাস নেই যে, ফের গোড়া থেকে নির্মাণ করা ব্যবসা নিরাপদ থাকবে। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মেয়েরা বিশেষভাবে বিপন্ন। তাণ্ডালজা ত্রাণ শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত পানকাড়ের মেহেরুন্নিসা ফকিরভাই মহম্মদের ভাষায় : "আমরা শেষ পর্যন্ত তাণ্ডালজা শিবিরে হাজির হলাম। এখানে আমাদের দিনেরাতে দু'বেলা খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু সেটা কতদিন চলবে? আমরা এখন আর পুরোনো জায়গায় ফিরে যেতে চাই না।"

কুরেশি জামাত খানাতে যাওয়ার পর পি ইউ সি এল-এর দলের সদস্যরা অনুরূপ মনোভাবের উল্লেখ করেন। "ওরা চায়, আমরা ওদের সাহায্য করি, একটা স্বতন্ত্র মুসলিম এলাকায় একত্রে পুনর্বাসনে সাহায্য করি। 'এক জাঠে মে মার জাভে' (একবারে মরাই ভাল)। কিসানওয়াড়ি ফেরার চেয়ে এটা বেশি গ্রহণযোগ্য।"

ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে টাক পাওয়া গেছে তার অঙ্ক অনেক মেয়ের কাছে একটা বড় প্রশ্ন। তাদের ক্ষতির পরিমাণ যেখানে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত, সেখানে পেয়েছে বড় জোর কয়েক হাজার টাকা। ন্যায়সঙ্গত ভাবেই, তারা ক্ষুব্ধ। কুরেশি জামাত খানার কয়েকজন মেয়ে বলে যে তারা ১০,০০০ টাকার চেক নিতে অস্বীকার করেছে– তাদের

স্থাবর সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ ১২ লাখ টাকার মত ছিল। অন্য মেয়েরা বলে, তারা তাদের নগণ্য চেকও নিয়েছে, কারণ ভিখারীর অত বাছ-বিচারের সুযোগ নেই। কিন্তু তার পর তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সন্তানদের ভবিষ্যত ও শিক্ষা নিয়ে সংশয় :

মেয়েরা সকলেই এই হিংসা তাদের সন্তানদের জীবনের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। এক দিকে, তারা চিন্তিত যে অনিশ্চয়তা, চেনা জায়গা থেকে উচ্ছেদ হওয়া, এবং যে সব বাচ্চা হিংসা চোখে দেখেছে বা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কি হবে তাই নিয়ে। তুলসীওয়াড়ির রাঈসা শেখ বলে :"আমরা এত যত্ন করে আমাদের ছেলেদের মানুষ করেছি, ওদের শিখিয়েছি যেন করো কোনো ক্ষতি না করে, যেন শান্তিকেই ভালবাসে। এখন ওরা সেই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেল। (জেলে থাকার এই অভিজ্ঞতার ফলে) ওরা যদি আতঙ্কবাদী (সন্ত্রাসবাদী) হয়ে যায়, তবে তো আমাদের কিছুই থাকবে না।"

অন্যদিকে, তারা গভীরভাবে বেদনার্ত, কারণ তাদের সন্তানদের শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরুপ, তান্ডালজা ত্রাণ শিবিরের মেয়েরা বিশেষভাবে স্বেচ্ছাসেবী চায়, যারা শিবিরের ২৫০ মত বাচ্চাদের পড়াবে। কিন্তু, যে অবস্থা চলছে, তার প্রেক্ষিতে বহু মা-বাবা তাদের কন্যাসন্তানদের ১০ম বা ১২শ শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে দিতে রাজি নন। মেয়েরা মনে করে, মুসলিম সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে যে অনিশ্চয়তা বোধ করছে, তার দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব শুধু শিক্ষার উপর নয়, তাদের সন্তানদের, বিশেষত মেয়েদের, ব্যক্তি স্বাধীনতার উপরও পড়বে।

আত্মীয় ও বন্ধু, বিশেষত পরিবারের যে সদস্যরা আয় করেন তারা গ্রেপ্তার হওয়ায় এবং যাঁরা নিখোঁজ তাঁদের জন্য উদ্বেগ।

বিশেষ করে ত্রাণ শিবিরগুলিতে, যে সব বন্ধু ও আত্মীয়রা নিখোঁজ তাদের নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে। শিবিরগুলিতে যারা বাস করছে, তাদের অনেকেই সেখানে পৌছেছে প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে পালাতে। ফলে যাদের ফেলে আসা হয়েছে, তাদের নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা রয়েছে, বিশেষত এই কারণে যে আক্রান্ত এলাকাগুলো সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

পুলিশের বহু ক্ষেত্রেই একেবারে অযৌক্তিক "চিরুনী তল্লাশী"র ফলে গ্রেপ্তার হওয়া পুরুষ আত্মীয়-বন্ধুদের ব্যাপারেও মেয়েরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ব্যক্তিগত এবং সম্প্রদায়গতভাবে, শারীরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের যে বিপন্নতার বোধ, তার ফলে মেয়েরা তাদের পুরুষ আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য যে ভয় পাচ্ছে তা আরো বেড়ে গেছে। বিশেষত, তারা তো নিজেরাই পুলিশের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ চোখে দেখেছে। পি ইউ সি এল দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : "(তুলসীওয়াড়ি থেকে আসা) মেয়েরা অত্যন্ত ব্যথিত ছিল, এবং তারা বলে, পুলিশের দায়িত্ব ছিল তাদের হেফাজতের (সুরক্ষার) ব্যবস্থা করা কিন্তু তার বদলে পুলিশ তাদের বিশ্রীভাবে আক্রমণ করেছে এবং তাদের

মর্যাদাবোধকে ধ্বংস করেছে। সব মেয়েরা বলে, তাদের ছেলেরা ও পুরুষরা ছিল পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী। তারা না থাকায়, পরিবারগুলো ৪দিন ধরে না খেয়ে রয়েছে। মেয়েরা বার বার পীড়াপীড়ি করে : 'আমাদের ফিরিয়ে দাও। আমরা শুধু এটাই চাই। আমাদের ছেলেরা ও পুরুষরা ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত আমরা না খেয়ে থাকব।"

আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য উদ্বেগ সম্প্রদায়ের সীমারেখা অতিক্রম করে। নাভাদি থেকে আগত বিহারি মেয়েরা, যেমন রঞ্জুবেন ও অন্যান্যরা, হল জি আই ডি সি মাকারপুরার বহিরাগত শ্রমিকদের স্ত্রী। তার সালির ইন্দিরানগর এলাকায় একটি তথ্য অনুসন্ধানকারী দল গেলে এই মেয়েরা পি ইউ সি এল সদস্যদের ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের স্বামীদের খুঁজে পাওয়ার জন্য সাহায্য চায়। তাদের অনেকের সঙ্গে নন্দী প্রসাদ ও বীরেন্দ্র প্রসাদকে ১৭ মার্চ দুপুরে, রবিবারের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রা উপভোগ করার মাঝখানে গ্রেপ্তার করে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সপ্তাহ পরেও মেয়েরা জানে না, তারা কোথায়। তাদের স্বামীদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার মোকাবিলা করতে হচ্ছে, আবার একা একা তাদের ছোট বাচ্চাদের দেখাশোনাও করতে হচ্ছে।

বিশ্বাসঘাতকতা :

পৌনঃপুনিক বিশ্বাসঘাকতায় মুসলিম মেয়েরা প্রবল মানসিক আঘাত পেয়েছে। যে সব মেয়েরা হিংসা ও অগ্নিসংযোগে সরাসরি আক্রান্ত হয়েছে, তাদের মধ্যেই বিশ্বাসবোধ ক্ষয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে স্পষ্ট। এক স্তরে, মেয়েরা তীব্রভাবে অনুভব করেছে যে তাদের এলাকার মানুষ তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মেয়েদের কাছে বিশেষ মনোবেদনার বিষয় হল, যে হিংসাত্মক ঘটনার সময়ে, দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতার কোনো দাম ছিল না। বারানপুরার সাজিদা বানোর ভাষায় "আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক ছিল, আমরা একে অপরের উৎসবের সময়ে ও অন্য সময়ে বাড়ি বাড়ি যেতাম। আমরা ওদের নিমন্ত্রণ করতাম। "আমারা সি মুখ ফের ভি লিডু ছে (এখন ওরা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে)।"

যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তারা সারা জীবন কাটিয়েছে, তারাই যে তাদের সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণে ও লুঠপাটে অংশ নিয়েছে এমন কি কখনো কখনো নেতৃত্ব দিয়েছে, এ জিনিস দেখার পর সব মানুষই মানুষ, এই বিশ্বাসটাও তাদের যেতে বসেছে। কসামালা কবরিস্থানের মেহেরুন্নিসার ভাষায় : "কে বন্ধু, কেই বা শত্রু? মানুষের উপর থেকে বিশ্বাসই উঠে গেছে।" পাড়াভিত্তিক যে এলাকা, তার চরিত্র সাম্প্রদায়িক হয়ে যাওয়ায় মেয়েরা বিপন্ন। প্রতিনিয়ত ত্রস্ত থাকে, ওই বুঝি বাচ্চারা, বা মুরগী, ছাগল ইত্যাদি "সীমানা" পেরিয়ে গেল। অনেক সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা, জল ইত্যদি পৌর উপাদান "ওপারে" আছে বলে তারা সেগুলির ভাগ নিতে পারে না। এক বিরাট বিয়োগান্ত ঘটনা হল যে বহু দশকের সম্পর্কে চিড় ধরেছে, এবং মেয়েরা সম্প্রদায়ের বিভাজন ছাড়িয়ে যে সাধারণ স্বার্থের বন্ধন তৈরি করেছিল, তা আর নতুন করে গড়া যাবে কি না, তা খুবই সন্দেহের বিষয়।

আরেকটা স্তরে মেয়েরা খুবই ক্ষুব্ধ, কারণ তারা মনে করেছে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষত পুলিশ, তাদের পথে বসিয়েছে। "পুলিশি একতরফা" ব্যবহার তাদের মন ভারাক্রান্ত করেছে। পুলিশের হাতে অত্যাচার সহ্য করা ছাড়াও তারা অনেকে দেখেছে পুলিশের ঔদাসিন্য ও নিষ্ক্রিয়তা, অনেক সময়ে আক্রমণকারী জনতার সঙ্গে পুলিশের যোগসাজস, বা তাদের এলাকাগুলিই যেখানে আক্রান্ত, সেখানে তাদেরই উপর চিরুনী তল্লাশী চালু করার মত ঘটনা। তারা দেখেছে, এফ আই আর-এর নাম বলা সত্ত্বেও হিংসার স্রষ্টারা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ তাদের পরিবারের নিরীহ সদস্যরা, বৃদ্ধরা ও অপ্রাপ্তবয়স্করা গ্রেপ্তার হচ্ছে। মেয়েরা প্রায় সব সরকারি সংস্থার ন্যায্য ব্যবহারের উপর আস্থা হারিয়েছে। তাদের জীবনে আজ যে সংকট, তার জন্য তারা দায়ী করছে মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দলকে। এই মুহূর্তে মেয়েরা নিরাপদ বোধ করে কেবল নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে। আমাদের ভয় এর ফলে এই সম্প্রদায়কে আরো বেশি ঠেলে দেওয়া হবে কেবল সম্প্রদায়গতভাবে বসবাস করতে।

গুজরাত ও ভারতের প্রতি আনুগত্যের পুনরুচ্চারণ :

পি ইউ সি এল যে সব মেয়েদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তারা ভারতের প্রতি নিজেদের আনুগত্য দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছে। তারা গভীর যন্ত্রণার সঙ্গে সেই সব স্লোগানের কথা বলে, যেগুলিতে তাদের বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছিল এবং ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে বলা হয়েছিল। নাগরিক ট্রিবিউন্যালের সামনে তাঁর সাক্ষ্য দিতে এসে বদ্রী মোহাল্লার এক মহিলা বলেন, "আমরা এখানে জন্মেছি, আমরা এখানেই মরব। এই আমাদের দেশ। আমরা কোথায় যাব?"

নেতৃত্ব :

বহু মেয়ে নিজেদের এবং নিজের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছে। কোথায় লুকোতে হবে, কতক্ষণ লুকিয়ে থাকতে হবে, পালানো, তার কৌশল ও দিক নির্দেশ, এসব নিরাপত্তা সংক্রান্ত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি অনেক ক্ষেত্রেই নিয়েছে মেয়েরা। পরিস্থিতি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতেও বাধ্য করেছে। যেমন, ২ মার্চ মেয়েরা কার্ফুর নিষেধকে উপেক্ষা করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে খাদ্য, দুধ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের অভাবের কথা বলতে চেষ্টা করেছিল। তাদের নিজেদের উপর পুলিশি অত্যাচার ও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের গ্রেপ্তার করা, এ সবের প্রতিবাদেও আজওয়া রোডের বাহার কলোনীর মেয়েরা একত্রিত হয়েছে। তারা পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার এবং এফ আই আর করার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিয়েছে। আজওয়া রোডের আলিশান অ্যাপার্টমেন্টসের মেয়েরা ১৭ মার্চ পুলিশ কমিশনারকে পুলিশি অত্যাচারের বিষয়ে অভিযোগ ফ্যাক্স করে পাঠায় এবং কমিশনারকে অনুরোধ করে, যেন তাদের চিকিৎসক কর্তৃক পরীক্ষা করানো হয়, যদিও ১ এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

প্রচণ্ড চাপের মুখেও শহরের সংবেনশীল ও আক্রমণ হতে পারে এমন জায়গায় মেয়েরা তাদের প্রতিবেশীদের, পুরুষদের ও অন্য অনেককে আশ্রয় দিয়েছে। কসামালা কবরিস্তানে মুসলিম মেয়েরা তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের দেখাশোনা করেছে এবং কার্ফুর দিনগুলিতে তাদের খেতে দিয়েছে। যারা শিবিরে রয়েছে বা আত্মীয়দের কাছে আশ্রয় নিয়েছে, মেয়েরা তাদের জন্য ত্রাণ সংগঠন করে চলেছে। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের রক্ষা করার জন্য প্রবল প্রতিকূলতার মুখে বিরাট সাহসিকতার সঙ্গে যাঁরা সাড়া দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বলা যায় করানপুরার শেরবানু, জাহানারা রংরেজ, সাজিদা বানো, তুলসীওয়াড়ির নাজমা শেখ, রাঈসা শেখ, কিসানওয়াড়ির লক্ষ্মীবাঈ পিল্লাই এবং রায়েঁ বাসেরের সোনিয়া ভাইয়ের কথা।

কার্ফুর সময়ে মেয়েদের দুটো ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। যেহেতু অনেক সময়ে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য কার্ফু তোলা হত, তাই বহু মেয়ে বাড়ির কাজের উপর বাড়ির বাইরের বহু জরুরী কাজেরও দায়িত্ব নিয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সব উত্তেজনা তুচ্ছ করে, দুই সম্প্রদায়েরই কিছু মেয়ে বড় রকম ঝুঁকি নিয়ে অন্যের প্রাণ বাঁচিয়েছে। অনেক মেয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করেছে।

দাবীসমূহ :

হিংসার কবলে পড়া মেয়েদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের প্রসঙ্গটা রাষ্ট্র কোনোরকম ধারাবাহিক ভাবে দেখেনি। এটা উল্লেখযোগ্য যে ত্রাণ শিবিরগুলি চালাচ্ছে সম্প্রদায়িভিত্তিক সংগঠন এবং তাদের প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন একেবারে নগণ্য। সরকার যে অন্তবর্তী ত্রাণ ঘোষণা করেছে, তা পৌঁছেছে খুব কম সংখ্যক মানুষের কাছে। অনেকগুলি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যাতে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি, উভয়ক্ষেত্রেই বিদ্যমান পরিস্থিতি পাল্টানো যায়।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য জরুরি ভিত্তিক কাজ শুরু করতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেন অন্তবর্তীকালীন ত্রাণ আর অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা না হয়। স্বল্প মেয়াদের জন্য জরুরি অন্তবর্তীকালীন ত্রাণ। কিন্তু রাষ্ট্রকে মেয়েদের দীর্ঘমেয়াদি আয়ের সুযোগ সম্পর্কিত ভাবনাচিন্তা করতে হবে।

গুজরাত সরকার যে ক্ষতিপূরণ ও ত্রাণের ঘোষণা করেছে তা মেয়েদের সমস্যাকে কার্যত দেখছেই না। সরকার যে অর্থকরী ও বৈষয়িক ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ঘোষণা করছে, তা খুবই অপ্রতুল হলেও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা মেয়েদের প্রতিদিনকার জীবিকার সমস্যাকে দেখছে না এবং আস্থাভঙ্গ ও চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতাবোধকে কীভাবে পূরণ করা যাবে তা নিয়েও এতে কোনো ভাবনা চিন্তা নেই। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই সামাজিক পুনর্বাসনের প্রসঙ্গসমূহকে এখন অবধি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছ।

মেয়েদের দাবীগুলি নিম্নরূপ :

* মেয়েরা ন্যায়বিচার চায়। যে গুণ্ডারা তাদের নিরাপত্তাকে হুমকি দিয়েছে, তাদের শারীরিক, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রকে আক্রমণ করেছে এবং তারা যাদের চিহ্নিত করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করা ও শাস্তি দেওয়া হোক, এটাও তারা চায়। তারা চায় যেন মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে যে সব পুলিশ অফিসার ও সেপাইরা, তাদেরও বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

* মেয়েরা চায় নিরাপত্তা– বাসস্থানে নিরাপত্তা, হয়রানি থেকে মুক্ত জীবনের মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তা। তারা এটা চায় তাদের নিজেদের জন্য, তাদের পরিবারের পুরুষদের জন্য এবং তাদের বাচ্চাদের জন্য।

* মেয়েরা চায় ন্যায্য ক্ষতিপূরণ এবং এমন এক ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা যা বাস্তবধর্মী এবং তাদের যত ক্ষতি হয়েছে তা যেন যথাযোগ্য ভাবে পুষিয়ে দেয়।

এই প্রতিবেদনটি তৈরি করতে যাঁরা সাহায্য করেছেন : পি ইউ সি এল/শান্তি অভিযান উইমেন সেলের সঙ্গে যুক্ত : দীপ্থা আচার; রণজিৎ কন্ট্রাক্টর; বীণা শ্রীনিবাসন; ক্রন্তি শাহ্; রীতা চোক্সী; জাহানারা রংরেজ; হামিদা;. নাজমা শেখ; শেরবানো; মায়া ভালেচা; নন্দিনী মঞ্জরেকর; অমিতা ভার্মা; প্রীতি প্যাটেল; গীতা রাথোয়া; শোভা শাহ্, নিমিষা দেশাই; মমতা বক্সী; বেলা ওয়াখেলা; রেণু খান্না।

অন্যান্য : অপূর্বা কারোওয়ার; চয়নিকা শাহ্; দর্শনা ওয়ানী; হাসিনা খান; জয়া মেনন; জুঁই দত্ত; লক্ষ্মী মূর্তি; মীনা; প্রতিমা প্রজাপতি, রক্ষা প্রজাপতি; রঞ্জন প্যাটেল; রঞ্জনা পাধি; রীতিকা খেরা; সাদিকা সালেরী; শাহিন সাফরী; শালিনী; সিরাজ বালসারা; সিস্টার লুসি; সুনিতা পারমার; স্বাতী দেশাই; টি. লক্ষ্মীসরস্বতী।

ফ্যাসীবাদের পথে ভারত

শেখ নাসীর আহমদ (প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সাপ্তাহিক মিযান, কলকাতা)

"ক্ষমতা এখন আমলাতন্ত্র, বিচার-বিভাগ; ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক্ আর্থিক, বাণিজ্যিক, শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও বড় বড় ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ইংরেজী পড়া শাসকগোষ্ঠীর যারা ভারতীয় সমাজের ১০% শতাংশের কম তারা ভারতীয় ফ্যাসীবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। যথোপযুক্ত সময়ে ধর্মীয় আবরণে হিন্দু হিটলারকে সামনে আনা হবে।

ক্রমবর্ধমান ক্রিকেট-কালচার, সিনেমা রোগ, ফিল্ম-পত্রিকার বিস্তার, ভিডিও ক্লাব, স্থূলধরণের রঙ্গরসিকতায় আগ্রহ সেই সংগে ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনাসহ দলবদ্ধ স্বামী বাবাজীদের আবির্ভাব, ক্ষুদ্র বন্দুকধারী ধীরেন্দ্র ব্রহ্মচারীর নেতৃত্বে গুরুগিরি ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি

সবকিছুই ফ্যাসীবাদের পাগলা ঘোড়ার অগ্রগতিকেই সূচিত করছে। টিভি পরিচালিত শহরে প্রমোদ-ব্যবসা এই দশ শতাংশ শহরে বসবাসরত অবসরমুক্ত নাগরিকরা যারা সরকার পরিচালিত বিমান পরিবহনের সুযোগপ্রাপ্ত তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই। হুঁশিয়ার হও বাঘ মানুষখেকো হয়ে উঠছে। ছোট ছোট জাতীয়তাবাদমূলক অনুভূতিগুলি প্রকৃত পথে বিবর্তিত না হয়ে বিপজ্জনক ভাষাগত সংস্কারান্ধতার রূপ পরিগ্রহ করছে। বোম্বের শিবসেনা ও ব্যাঙ্গালোরের কানাড়ী সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসীবাদেরই আর এক রূপ। শাসকগোষ্ঠীর আয় এত প্রচুর ও অবসর এত বেশী যে তা নিয়ে তারা কি করবে ভেবে পাচ্ছেন না। এই দুটোর সমন্বয় অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্পদের প্রাচুর্য হলেই মানবতার পতন ঘটবে। সাবধান– মানুষ-খেকো বাঘটি এখন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে। বন্দুক নিয়ে তৈরি থাকুন।

এই যদি শাসকশ্রেণীর অবস্থা হয়, সম্পদ ও সুবিধার প্রতি ক্রমবর্ধমান হুমকীর মুখে ফ্যাসীবাদের প্রতি তার আগ্রহ ও মোহ বোঝা যায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও ফ্যাসীবাদের প্রবণতার দিকে ঝুঁকছে। ফ্যাসীবাদ প্রধানতঃ সারা দুনিয়াতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যাপার। আর এস এস হিন্দু নাৎসীদল প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত থেকেই জাতঃ চাকুরীজীবী, ছোট ব্যবসায়ী, শিক্ষক, সরকারী অফিসের কেরানী, ব্যাংক কর্মচারী কিংবা এই ধরণের লোক। আফসোসের ব্যাপার হলো এই যে সরকারী বেসরকারী উদ্যোগে নিয়োজিত সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায়ও ফ্যাসীবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী চিত্রাভিনেতা এম. জি. রামচন্দ্রন, অন্ধ্রপ্রদেশের এ.টি. রামারাও, কর্ণাটকের ফিল্মনায়ক রাজকুমার সকলেই ফ্যাসীবাদের তরক্কীতে লিপ্ত। মূর্খ সর্বহারার দলএদের বিশ্রী স্থূল চিত্রাভিনয়ে পাগলের মত ভিড় জমাচ্ছে আর তার মাধ্যমে ফ্যাসীবাদ অগ্রসর হচ্ছে।

আমার ধারণা হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর থেকে এই সংঘবদ্ধ শ্রমজীবী সম্প্রদায় চিন্তাশূন্য গণ্ডমূর্খ সর্বহারাদের সমন্বয়ে কম্যুনিষ্ট দল সমূহের কল্যাণে ভারতে ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের অগ্রবাহিনীর কাজ করবে। ভাল মাইনের দ্বীপপুঞ্জে বাস করেও এই শ্রেণীর লোকেরা সন্তুষ্ট নয়। কম্যুনিষ্ট দলগুলোও তাদের বামপন্থী শ্রমজীবী ইউনিয়নের দ্বারা এই সংঘবদ্ধ শ্রেণীর ফ্যাসীবাদী ক্ষুধাকে বাড়িয়ে তুলছে।

সুতরাং আমি স্পষ্টতঃই ফ্যাসীবাদের আলামত দেখতে পাচ্ছি। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদ, সমাজবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ অথবা গণতন্ত্রবাদ যাকে আমাদের সংবিধানের মৌল উপাদান মনে করা হয়, তাকে কখনই মেনে নেবেনা। ব্রাহ্মণ্যবাদ হচ্ছে ফ্যাসীবাদের অপর নাম। ফ্যাসীবাদের ক্রমউত্থানকে রোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যই নয় বরং এর উত্থানে সাহায্য করার জন্য আমি কম্যুনিষ্ট দলসমূহের উপর দোষারোপ করছি।

যাইহোক আমি ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি। বাতাসে হিংসার বাতাবরণ। শাসক শ্রেণী একের পর এক সমাজতান্ত্রিক বুলি আউড়িয়ে ততক্ষণ জনগণকে বোকা বানাতেই থাকবে, একটার পর একটা লজেন্স দিয়ে ক্ষুধার্ত জনগণকে মোহগ্রস্ত করে রাখবে যতক্ষণ না একটা স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র একটা হিন্দু হিটলারকে চাপিয়ে দিতে না পারে। বিপদ কাল্পনিক নয়, বাস্তব।"

১৯৮৪ সালে ভি.টি. রাজশেখর শেঠি 'who is the Mother of Hitler' পুস্তিকার ভূমিকায় উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন। যে কোন দৃষ্টিমান পাঠকই উপলব্ধি করবেন যে তার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। আজ সকলেই দিশে হারা। কেন কিভাবে এমনটা হলো কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ জগতে যা কিছু ঘটে তা হঠাৎ ঘটে না। একটা বীজ সহসা মহীরুহের আকার ধারণ করে না। দীর্ঘ দিন ধরে এই বীজ লালিত-পালিত হয় ও অনুকূল আলো-বাতাস পেয়ে বর্দ্ধিত হয়। তীক্ষ্ণ সমাজ-বিজ্ঞানীরা আগেভাগেই এসব বুঝতে পারেন। আবহাওয়াবিদের মতই তারা সাইক্লোনের পূর্বাভাস দেন। বুদ্ধিমান লোকেরা বাসধান হয়, নির্বোধ লোকেরা খেল-তামাসায় লিপ্ত থাকে, অবশেষে মারা পড়ে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝার ব্যাপারটাও অনুরূপ।

১৯৭১ সালে Leon Poliakov ফরাসী ভাষায় একটি বই লেখেন। বইটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন 'Edmund Howard'। বইটির নামকরণ Aryan Myth ক'রে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানবজাতি যেসব জুলুম অত্যাচারের শিকার তার মূল নিহিত রয়েছে আর্য জীবনদর্শনের মধ্যে। এই আর্য জীবনদর্শনই জার্মান নাৎসীবাদ ও দু'-দুটো বিশ্বযুদ্ধের কারণ। রাজশেখর বলছেন এই আর্য দর্শন যদি উৎখাত করা না হয় তাহলে দুনিয়া আরও বেশি বিপর্যয়কর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের শিকার হবে।

জাপানী পণ্ডিত Mrs. Yumi Tswji যিনি ফ্রেঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয় ও ভরতের মাদুরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন তারও অভিমত হচ্ছে জাপানে যে বর্ণবাদ চালু রয়েছে তার মূল উৎসও আর্যদর্শনে নিহিত। পাশ্চাত্যের বর্ণবাদও আর্য সভ্যতার অবদান। আর্যরা জন্মের ভিত্তিতে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। তাই কৃষ্ণাঙ্গদের তারা মানুষ বলেই মনে করে না। আমেরিকায় নিগ্রোদের উপর জুলুম কিম্বা দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর জুলুম একই উৎস জাত। জার্মানরা যে ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে কিম্বা ৫ হাজর বছর ধরে ভারতে দলিতদের উপর যে নিপীড়ন চলছে তার মূলেও রয়েছে আর্যদর্শন।

জার্মান ও ইতালী থেকে ফ্যাসীবাদ বিদায় নিয়েছে কিন্তু ভারতে ফাসীবাদ শক্তিশালী হচ্ছে। এটা ভারতীয়দের চোখে না পড়লেও সচেতন পাশ্চাত্যবাদীদের চোখে পড়েছে।

ডেনমার্কের Aarhas থেকে প্রকাশত Update (Vol. 7. No.2, June '82) পত্রিকায় এসবের বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে।

আশির দশকে শেঠী যা বলেছেন, সত্তরের দশকে পলিয়াকভ তাই বলেছেন। এরা কেউ ব্রাহ্মণ নন। এঁদের বক্তব্যে বিদ্বেষ, অতিশয়োক্তি থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এদের অনেক পূর্বে তিরিশের দশকে এম. এন. রায় একই কথা বলে গেছেন। তাছাড়া তিনি স্বয়ং উচ্চবর্ণজাতও বটে। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে হলে এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেদের ও দেশবাসীকে বাঁচাতে হলে আমাদের অবশ্যই দেশী-বিদেশী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে ফায়দা নিতে হবে।

(লেখকের "ধ্বংসের পথে ভারত" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)।

ফ্যাসীবাদের উৎস সন্ধানে

শেখ নাসীর আহমদ

'The Philosoply of Fascism' প্রবন্ধে মিঃ রায় বলেছেন, "ফ্যাসীবাদ তুলনামূলকভাবে নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪৪ সালে ইটালীতে এর প্রথম আবির্ভাব। তারপর থেকে এটা ইউরোপের সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকটি দেশে সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করে। এর হঠাৎ আবির্ভাব ও চোখ ধাঁধানো অগ্রগতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই এটা সমকালের উল্লেখযোগ্য আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ফ্যাসীবাদ যে নিষ্ঠুরতা বর্বরতার পরিচয় দেয় তা দুনিয়ার সমস্ত প্রগতিশীল ও স্বাধীনতাপ্রেমী মানুষকে বেদনাহত করে তোলে। ... ঐতিহাসিকভাবে দেখলে এটা যুদ্ধোত্তর ঘটনা নয়। এই ধরণের ঝড়ো সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন সহসাই ঘটতে পারেনা।"

তিনি মনে করেন ফ্যাসীবাদের সুনির্দিষ্ট দর্শন রয়েছে। দার্শনিক ঘাত-প্রতিঘাতের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলেই এটা জন্মলাভ করেছে।

হেগেলোত্তর আদর্শবাদ থেকেই ফ্যাসীবাদ জাত হয়েছে। এই আদর্শবাদ হিন্দু মিষ্টিসিজম বা দার্শনিক হেয়ালীপনার সমর্থক। এম.এন. রায়ের ভাষায়- "A caricature of Hegelian dilectics this neo-scholasticism is remarkably similar to Hindu Mysticism" অর্থাৎ হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের ব্যঙ্গচিত্র এই নতুন যুক্তিবাদ হিন্দু হেঁয়ালিপনার সাথে আশ্চর্যজনকভাবে এক। এখন এই Mysticism-টা কি? মিঃ রায় বলছেন- "What is mysticism, after all, but mental confusion which takes refuge in obseurantism to reject experimentally demonstrated scientific truths and rationally established philosophical concepts? fascist

philosoply as expounded by gentile is a classical specimen of mysticism."

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রায়ের মতে মিষ্টিসিজম বা হেঁয়ালীপনা হচ্ছে মানসিক বিশৃংখলা বা কুসংস্কারের মধ্যে আত্মগোপন করে পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে। মিঃ রায় এর দুটো বিপরীতমুখী চিত্র অংকন করেছেন। একদিকে অর্থহীনভাবে ইশ্বরের ধ্যান, তপজপ। এটা নেতিবাচক ব্যাপার। এর মধ্যে ইতিবাচক কিছু নেই। এটা সক্রিয় চিন্তার বিপরীত অবস্থা। কারণ সক্রিয় চিন্তায় জ্ঞানবৃদ্ধি হয় কিন্তু নিষ্ক্রিয় ধ্যানে কিছুই হয়না। একটা যুক্তিবিরোধী আর অন্যটা যুক্তিসিদ্ধ। ঈশ্বরের ধ্যান, তপজপকে তাই যুক্তির উর্ধে রাখা হয়। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর' বলে এই নিষ্ক্রিয় চিন্তাকে সমর্থন করা হয়। ঈশ্বর সম্পর্কে এই বল্গাহীন নিষ্ক্রিয় চিন্তাই শের্কের জন্ম দেয়। এজন্য স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা না করে সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়। একঘণ্টা সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা সারা রাতের এবাদতের থেকে একারণেই বেশি মূল্যবান বলে হাদীসে কথিত হয়েছে। অন্যথায় চিন্তা বিশৃংখলা দেখা দেবে। রায় একে চিন্তার বিশৃংখলা বলেছেন। এই চিন্তা বিশৃংখলা থেকেই সাপ-ব্যাঙ সবই খোদা হয়ে যায়।

আর্যদের বল্গাহীনভাবে ঈশ্বরচিন্তা শুরু হয় যখন তারা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রকে স্রষ্টা ভাবতে শুরু করে। আর্যরা প্রথমে সূর্য পূজা শুরু করে। যারা সূর্য পূজক তারাই আর্য (মৎপ্রাণীত 'আর্যরহস্য দ্রষ্টব্য)। সূর্যকে আর্যরা তাদের আদি দেবতা বা আদি পুরুষ জ্ঞান করে। তাদের জাতীয় হীরো রাম সূর্য বংশের লোক। তাদের আদর্শ রাজ্য রামরাজ্য। রামায়ণ সূর্য পূজকদের কহিনী কাব্য আর মহাভারত চন্দ্রপূজকদের কাহিনী কাব্য। পরে তারা ভূমিপূজনও শুরু করে। ভূমিও তাদের কাছে দেবতার মর্যাদা লাভ করে। তারা স্রষ্টা সম্পর্কে অবান্তর চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে নিজেদেরকেই খোদা ভাবতে শুরু করে। তারা খোদার বংশ, অবতার ইত্যাদি হয়ে যায়। নরই শুধু নারায়ণ থাকেনি, পরে বল্গাহীন চিন্তার ফলে সাপ, ব্যাঙ, গাছপালা, ইঁট, পাথর সবই খোদার মর্যাদা লাভ করে। আসল খোদাকে হারানোর পর আর তারা, প্রকৃত খোদাকে খুঁজে পায়নি।*

* ইসলাম খোদা সম্পর্কে এই উদ্ভট চিন্তার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে এই বলে যে খোদা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর নেই কোন অংশীদার, স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র পৌত্রাদি। তাঁর কোন আকার আকৃতি ও রূপও নেই। তিনি সৃষ্টির সবকিছু থেকে পৃথক। কল্পনা তাঁকে ধারণ করতে পারে না, সৃষ্টিতে তাঁর কোন উপমা নেই। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে অনুপম। কোরান ও হজরত মোহাম্মদের (সাঃ) ইসলামে তাই কোন হেঁয়ালীপনা, অস্পষ্টতা বা ঝাপসা ভাব নেই।

একদিকে দুনিয়া তাদের কাছে কিছুই নয়। এই দুনিয়ার কোন বাস্তবতা নেই। এটা নাকি নিছক ভ্রম- মায়া মাত্র। অথচ তাদের মত দুনিয়াপূজক জাত দুনিয়ায় দুটি নেই

এমনকি তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদ নামক ধর্মটা দুনিয়াপূজার এক ভয়ংকর রূপ। রণজিৎ কুমার শিকদার ব্রাহ্মণ্যবাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- "ধর্মীয় কলাকৌশলে সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণের একটি অভিনব পরিকল্পনা।"*

এটা চিত্রের একটা দিক। এর অন্য একটা দিকও আছে। সেটা হচ্ছে জাগতিক দিক। এই জাগতিক দিকটা কেমন? মিঃ রায় বলেছেন- "They are purely materialisic in the most vulgar sense." অর্থাৎ 'অত্যন্ত কুশ্রীভাবে এটা জাগতিক' মুশরেকদের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতিতে এই বিশ্রী

* ইসলাম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শত্রু। দুনিয়া তাই তার কাছে মায়া নয়, বরং দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের খেত অর্থাৎ পরকালীন জীবনের ফসলের উৎপাদন ক্ষেত্র। ইহজীবন তাই তার কাছে মূলবান। এটা উপেক্ষার বা অবজ্ঞার বস্তু নয়। ইসলামে রয়েছে মানুষের ইহজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা। এখানে রয়েছে পরিকল্পিত জীবনের জন্য স্রষ্টা প্রদত্ত আইন-কানুন বা শরীয়ত। স্রষ্টাকে হারিয়ে সৃষ্টিপূজক হওয়ার দরুণ আর্যরা কোন ঐশী আইন প্রদান করতে পারেনি। চন্দ্র সূর্য্যের নামে, কল্পিত দেবতার নামে নিজেদের মনগড়া বিধান রচনা করেছে। এইসব মনগড়া শাস্ত্র-সমূহ তাই মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে ও হচ্ছে। মিঃ রায় পরে এরও আলোচনা করেছেন। (অনেক গবেষকের মতে আর্যরা প্রথমে একেশ্বরবাদী ছিল, পরবর্তীতে তারা বহুঈশ্বরে বিশ্বাস করতে থাকে- সংকলক)।

ইহ-সর্বস্বতা সুস্পষ্ট। তাদের অর্থনীতিতে ধনতন্ত্রের সব খারাবী বিদ্যমান। শিল্প-সাহিত্যে অশ্লীলতা এত লাগামহীন যে ধর্মীয়-সাহিত্য ও মন্দিরও এ থেকে মুক্ত নয়।

মুশরেকদের লাগামহীন ঈশ্বরচিন্তা ও বাস্তব নগ্ন আচরণের মধ্যে যে ফাঁক-যে বৈপরীতা, যে কপটতা তার চমৎকার চিত্র বর্ণনা করেছেন মিঃ রায়। The cult of superman প্রবন্ধে রামকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত করেছেন তিনি। রামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "ঈশ্বরে মনসংযোগ করে যে-কেউ শুকর মাংস খেতে পারে, পক্ষান্তরে হবিষ্য খেয়েও কামিনী-কাঞ্চনে লিপ্ত থাকা যায়।" এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মিঃ রায় লিখেছেন- "আধ্যাত্মবাদীর ভান করে যে-কেউ নগ্ন ভোগবাদের জীবন-যাপন করতে পারে। বিংশ শতাব্দীর অবতারের এই শিক্ষা নীৎসের নিন্দাবাদ থেকে ভিন্ন নয়। বাস্তবিক রামকৃষ্ণের সমস্ত শিক্ষা বিবেকানন্দ যাকে যৌক্তিকতামণ্ডিত করেছেন তা এই সুরেই বাঁধা। এটা হিন্দুত্বের আদর্শকে পূর্ণভাবেই প্রতিফলিত করে। কলিযুগে শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। এখন লোকের সংসার জীবনযাপন করা উচিত। এটাকে সমর্থন করা হয়েছে যতক্ষণ তারা নিরাসক্ত থাকবে তবে মনে পুজো ভক্তির ভাব থাকা চাই। বাস্তবে আধ্যাত্ম আদর্শ বর্জন। এটা কখনই বাস্তব ছিল না। অবশেষে যুগোত্তীর্ণ মাত্রকে বাতিল করা হলো বিপ্লবীর সাহস নিয়ে নয় বরং কপটতাপূর্ণ অনুমোদন দিয়ে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত নগ্ন ভোগবাদ। কিন্তু জড়বাদী দর্শন এখনও অগ্রহণযোগ্য। ধর্মীয় জীবনদৃষ্টি এই অসততা ও মিথ্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারেনা যখন তার সামাজিক উপযোগিতা ফুরিয়ে গিয়ে থাকে।" (Fascism, Page-36)।

মানুষের চিন্তার বিকৃতি থেকে কর্মেও বিকৃতি আসে। আকিদা খারাপ হলে আমলও খারাপ হয়। চিন্তার বিশৃংখলা থেকে জাত এই ফ্যাসীবাদ এল কোথা থেকে? মিঃ রায় বলেছেন ঃ

"Incidentally, it may be mentioned that the roots of the philosophy of the Facism can be traced in the divine philosophy of the Gita-its Indian ancestry can be traced through Schopenhawer whose disciple Nietzsche, was the father of the philosophy of Fscism."

"ঘটনা প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে ফ্যাসীবাদী দর্শণের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে গীতার ঐশ্বরিক দর্শনের মধ্যে– এর ভারতীয় পিতৃত্বের সন্ধান পাওয়া যায় শোপেনহাওয়ারের মাধ্যমে যার শিষ্য নীৎসে ফ্যাসীবাদী দর্শনের জনক।"

নীৎসের দর্শনকে তিনি গীতা থেকে জাত বলেছেন ঃ

"Nietzche's philosophy justifying cross class of domination bears striking resemblance with the Hindu doctrine of Karma and indeed, is an echo of the voice of God himself : "The four Castes are Created by me, according to quality and merit (Gita). The caste system places different groups of people in different social stations. If that system providentially ordained, those belonging to lower stations must be reconciled for ever to their positions. Social inequality is thus perpetuatcd on the authority of divine will. The slave must be slave forever! The ruling class enjoys its power and privileges as gifts of God which only the sinful can ever dare to take away from it. (Fascism-P. 39)।

শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্বের যৌক্তিকতা প্রদর্শনকারী নীৎসের দর্শনের সাথে হিন্দুর কর্মফলের দর্শনের আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য রয়েছে, (শুধু তাই নয়) "গুণ ও যোগ্যতানুযায়ী চতুর্বর্ণ আমার সৃষ্টি।" বর্ণাশ্রম প্রথা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মর্যাদা দেয়। যদি এই ব্যবস্থা ঐশ্বরিকভাবে নির্ধারিত হয় তাহলে যারা নিম্নবর্গের লোক তাদেরকে তাদের নিম্ন মর্যাদাকে চিরকালের জন্য বিধিলিপি বলে মেনে নিতে হবে। সামাজিক বৈষম্যকে এভাবে ঐশ্বরিক

ইচ্ছার দোহাই দিয়ে চিরন্তনতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। গোলামকে চিরদিন গোলাম থাকতে হবে। শাসক সম্প্রদায় শক্তি ও সম্পদ ব্রহ্মার কাছ থেকে দান হিসাবে পেয়েছে, কেবলমাত্র পাপী বান্দারাই তা কেড়ে নেবার দুঃসাহস পোষণ করতে পারে।"

এই সামাজিক দাসত্বের দর্শনের ব্যাখ্যা মিঃ রায় এভাবে দিয়েছেন, "যখন তাদের দৃষ্টিকে সামাজিক বৈষম্যের প্রতি আকর্ষণ করা হয় এবং যে বৈষম্যের শিকার তারা নিজেরাই তখন ভারতীয় কৃষ্টি তাদের একই হাতের পাঁচ আঙ্গুলের ফারাকের প্রতি নির্দেশ করতে শেখায়। তাদের এই পজিশানকে মেনে নেবার শিক্ষা দান করা হয়েছে যেহেতু এটা তাদের প্রাপ্য। তাদের শুধু তাদের পোড়া কপালকে মেনে নেবার শিক্ষাই দেওয়া হয়নি বরং প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা হিসাবে মেনে নেবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নীৎসেও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, "যেহেতু অনেক কঠিন শ্রমসাধ্য কাজের প্রয়োজন রয়েছে সেহেতু কিছু লোককে নীচুকরে রাখতেই হবে যাতে তারা একাজের যোগ্য হয়।" গোটা বর্ণাশ্রম প্রথা– যা ভারতীয় প্রতিভার বিশেষ সৃষ্টি তা এই নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ফ্যাসীবাদের দার্শনিক আর্য জাতিভেদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যখন তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, "এশিয়া আফরিকার বর্বর জনতাকে আমদানী করা যেতে পারে যাতে অসভ্য জগৎ সব সময় সভ্য জগতের সেবায় নিয়োজিত থাকে। কেন নয়?

আর্য ব্রাহ্মণরা কি তাদের প্রিয় মিত্রদের সাহায্যে ভারতের বেশীরভাগ আদি অধিবাসীদের শূদ্ররূপে চিরদাসত্বের শৃংখলে বন্দী করে হীন করে রাখেনি? ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেবা, এটা গান্ধীবাদেরও এক অন্যতম মূল সূত্র এবং গান্ধীবাদ হচ্ছে গোঁড়া জাতীয়তাবাদের দর্শন। সেবাকে আধ্যাত্মিকতার বুজুরুকী দান করে দাসত্বকে মহিমান্বিত করা হয়েছে, এর ক্ষেত্র ও পরিধির উপরে কোন যুক্তিসংগত সীমারেখা টানা যেতে পারে না। যখনই আপনাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেবার সুযোগ দেওয়া হবে এবং সেই অনুগ্রহ তাঁর অধিকতর অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্বেতাংগদের মাধ্যমে আসবে তখনই আপনার দাস্য করা উচিত।" (Fascism. P.40)

উপরোক্ত কারণে তিনি হিন্দুধর্মকে 'The ideology of social slavery' আখ্যা দিয়েছেন। শুধু গীতা নয়, বেদান্ত ও উপনিষদকেও তিনি ফ্যাসীবাদের উৎস মনে করেন। বেদান্ত সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

"Its pantheism, to be consistent, must interpret the capitalist system as an integral part of the supreme being. Thus, anothr philosopher is found preaching pure vedanta- as the means for the preservation of the "materialist" western civilisation."

অর্থাৎ "এর সর্বেশ্বরবাদ সর্বার্থেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চরম সত্ত্বার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই ব্যাখ্যা করবে। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সংরক্ষণের পন্থা হিসাবে অন্য এক দার্শনিককে এভাবে নির্ভেজাল বেদান্ত প্রচার করতে দেখা গেল।'

ফ্যাসীবাদের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মিঃ রায় বলেন ঃ

"That is how an ideology for German Imperialism and subsequently for fascism was constructed out of the sublime philosophy of the Upanishads."

"অর্থাৎ এভাবেই জার্মান সাম্রাজ্যবাদ ও তৎপরবর্তীতে ফ্যাসীবাদকে উপনিষদের মহৎ দর্শন থেকে তৈরি করা হয়।"

ফ্যাসীবাদী দর্শনের অন্যতম উদ্গাতা শোপেনহাওয়ার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"Schopenhawer- found consolation in the philosophy of the Upanishads- a philosophy which for ages prevented the Indian people from facing the realities of life with the courage to change them.The essence of Schopehawar's philosophy is the debsement of human will which is declared to be thoroughly evil and mean". The implication of this philosophy is a negative attitude to all progress, since the objective forces of progress find their objectvie expression in the will of man. With this docrine, Schopenhawer stands exactly on the same ground as the Hindu philosophy, whic also declares desire to be the impediment to self realisation- the fountain-head of true knowledge-

"শোপেনহাওয়ার উপনিষদের দর্শনে সান্ত্বনা খুঁজে পান- যে দর্শন যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনতাকে জীবনের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তাকে সাহসের সাথে পরিবর্তিত করার হিম্মত থেকে বঞ্চিত করেছে। শোপেনহাওয়ারের দর্শনের মর্মকথা হলো মানুষের ইচ্ছাশক্তির অবমূল্যায়ন যাকে বলা হয়েছে "সম্পূর্ণভাবে মন্দ ও হীন"। এই দর্শনের মোদ্দাকথা হলো সর্বপ্রকার প্রগতির প্রতি এক নেতিবাচক মনোভাব, কারণ প্রগতির বস্তুনিষ্ঠ শক্তির প্রকাশ ঘটে মানুষের মন্ময় চিত্তে। এই তত্ত্ব দিয়ে শোপেনহাওয়ার ঠিক সেই ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন যে ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিন্দুদর্শন যে দর্শন

আত্মার সত্যিকার জ্ঞানের ধর্মাধারার পথের প্রতিবন্ধক ঘোষণা করে মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে।"

ফ্যাসীবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মিঃ রায় পুনরায় বলেন ঃ

"It is a philosophy which bears a striking resemblance to the Indian spiritualism of the Vedanta school as well as of the dualist system which visualises the world as the Leela of the Almighty.

অর্থাৎ এটা একটা দর্শন যার সাথে বেদান্তদর্শনের যেমন আশ্চর্য মিল রয়েছে তেমনি মিল রয়েছে দ্বৈতব্যবস্থার যা বিশ্বকে চরম সত্তার লীলা হিসাবে কল্পনা করে।'

উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিকরা পাশ্চাত্য জড়বাদে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রাচ্যের বাস্তববিমুখ হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের অসাম্যমূলক আর্যদর্শন তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় অহংমূলক জাতীয়তাবাদের জন্যও মূল্যবান বিবেচিত হয়। তাদের চিন্তার আনাড়ীপনা হিন্দু চিন্তার আনাড়ীপনায় আরও বেশী তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তাদের রুচি ও আচরণ দুই-ই বিগড়ে যায়। তারা সুস্থ জীবনদর্শনের অভাবের ফলে সারা দুনিয়ায় বিভীষিকা সৃষ্টি করে। তারা হিন্দুদের ন্যায় একদিকে মানবতার উচ্চ আদর্শের কথা বলে আবার অন্যদিকে সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। বর্ণ-হিন্দুরা একদিকে নরকে নারায়ণ জ্ঞান করে আবার অন্যদিকে সেই নরকে অচ্ছুৎ জ্ঞান করে। তাদের বাড়ীতে কুকুরের প্রবেশাধিকার থাকলেও মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। কিছু মানুষকে তারা এত ঘৃণা করে যে তাদের স্পর্শও এড়িয়ে চলে। পাশ্চাত্যবাসীরাও এই ঘোড়ারোগে আক্রান্ত। একদিকে বর্ণবাদীরা নারীকে দেবী জ্ঞান করে আবার অন্যদিকে তাকে পণের জন্য অমানুষিকভাবে পুড়িয়েও মারে। পাশ্চাত্যের বর্ণবাদীরা এর থেকে ভিন্নতর নয়। তারা নারী স্বাধীনতা, নারীর মর্যাদার নামে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার আবার তারাই নারীর ইজ্জত-আবরু জানোয়ারের মত লুটে বেড়ায়। নারীকে একই সঙ্গে দেবী ও দেবদাসী বানোনোর দৃষ্টান্ত তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই দৃষ্ট হয়। একদিকে জীবন ও জগৎ কিছুই নয় বলে আস্ফালন আর অন্য দিকে সেই জগতকেই কামধেনুর মত দোহন ও শোষণ এই বৈপরীত্য তাদের উভয়েরই বৈশিষ্ট্য। একদিকে দুনিয়াকে অস্বীকার অন্যদিকে নগ্ন দুনিয়াপূজার লীলাখেলা উভয়ের মধ্যেই প্রকটভাবে বিদ্যমান। ফারাক শুধু এই যে একজন গুরু ও অন্যজন চেলা। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য গুরুমারা বিদ্যায় অনেক বেশি এগিয়ে যায়। তারা প্রাচ্য গুরুর আশীর্বাদ নিয়েই অগ্রসর হয়।

তাদের উভয়ের মধ্যেকার সৌসাদৃশ্যের কারণ মিঃ রায় যা দেখিয়েছেন আমার মতে তার মূলদেশে মিঃ রায় পৌছাতে পারেননি যদিও তিনি প্রায় মূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌছেছেন। আমার মতে তাদের চিন্তা ও কর্মের এই সৌসাদৃশ্যের কারণ শের্ক যার

স্বরূপ মিঃ এম.এন. রায়ের অজানা ছিল। বর্তমান বেদ-বেদান্ত, বাইবেল, গীতা, উপনিষদ প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের বাণী ছিলনা বরং এসব ছিল ঈশ্বরের বেনামীতে মানুষের দর্শন ও বাণী। এতে ঈশ্বরের বাণীর মিশ্রণ থাকতে পারে, প্রলেপ থাকতে পারে সেটা অন্য কথা। তাই তারা অহীর বা আল্লার বাণীর সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে মিষ্টিসিজমের অস্পষ্টতার গোলকধাঁধায় নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ও জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞতার শিকার হয়েছেন এবং আধ্যাত্মিকতার ছদ্মবেশে চরম বস্তুবাদের পূজা করে চরিত্রহারা হয়ে সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়েছেন। মিথ্যা আধ্যাত্মিকতা আর অজ্ঞতাসৃষ্ট দেবদেবী, কপটতা ভণ্ডামী আর ভ্রষ্টাচার থেকে বাঁচার জন্য মিঃ রায় মার্কসবাদী জড় দর্শনকেই আঁকড়ে ধরেছেন ও শেষ পর্যন্ত তাতেও আস্থা হারিয়েছেন। সত্যের সন্ধান করতে করতেই তাঁর জীবন চলে গেল যেমন অনেকের জীবন চলে গেছে ও যাচ্ছে। এর যথার্থ জবাব রয়েছে ইসলামে যার প্রশংসা Historic role of Islam গ্রন্থে M.N. Roy করেছেন। কিন্তু এ ইসলাম তিনি মুসলিম সমাজে খুঁজে পাননি। একে আবিষ্কার করার জন্য তিনি ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আসলে শের্ক হচ্ছে যুলুমে-আযীম অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের যুলুম! শের্কের উপর ভিত্তিশীল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাবাদ গুপ্তযুগে ফ্যাসীবাদের রূপ ধারণ করে চরম যুলুমমূলক উপায়ে বৌদ্ধর্মকে ভারত থেকে উৎখাত করে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এটাই জার্মান ও ইতালীতে নবরূপ ধারণ করে। বিশ শতাব্দীর শেষপাদে তা ভারতে আবার তার সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। মিঃ রায় পূর্বাহ্নেই এ সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আদর্শবাদের দিক থেকে ভারত ফ্যাসীবাদের নিকটতর। তাঁর ভাষায়,

"Ideologically, India is nearer to Fascism than realised by a few. The dogmatic spiritualism preached by many intellectual leader of modern India is the philosophy of Fascism".

"একথা খুব স্বল্প লোকের অনুভবে এসেছে যে, ভারত আদর্শের দিক থেকে ফ্যাসীবাদের নিকটতর। অহংকারমূলক আধ্যাত্মিকতাবাদ যা বর্তমান ভারতের অনেক বুদ্ধিজীবী প্রচার করে থাকেন তা ফ্যাসীবাদী দর্শন মাত্র।"

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের ন্যায় সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবীই এই ফ্যাসীবাদের কমবেশী সমর্থক ছিলেন ব'লে মিঃ রায় বলে গেছেন। রায়ের ভাষায়,

'Neither Mahatma Gandhi nor Rabindranath Tagore can find any fault with this philosophy of Facsism.'

অর্থাৎ 'না মহাত্মা গান্ধী না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেউই ফ্যাসীবাদের এই দর্শনের মধ্যে কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে শোপেনহাওয়ারের দ্বারা প্রভাবিত আর গান্ধীবাদ নীৎসের দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বলেছেন ঃ

"If Gandhism is to be regarded as a body of religioethical doctrines- the quintessence of ancient Indian culure, then the world has already experienced its modern political expression. Gandhism as a philosophical tradition has led to Hitlerism. Let the Indian nationalists take note of this fact. The logic of history cannot be any less binding in India than in Germany."

"যদি গান্ধীবাদকে প্রাচীন ভারতীয়-সংস্কৃতির মর্মনির্যাসের দৈহিক রূপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দুনিয়া ইতিমধ্যেই এর রাজনৈতিক প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করেছে। গান্ধীবাদ দার্শনিক ঐতিহ্য হিসাবে হিটলারবাদের জন্ম দিয়েছে। এই বস্তব ঘটনাকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের উচিত লিখে রাখা। ইতিহাসের যুক্তিধারা ভারতের ক্ষেত্রে জার্মানীর থেকে কম বাধ্যতামূলক হতে পারেনা।" এজন্যই মিঃ রায় গান্ধীবাদকে ভারতের অজ্ঞতা, ভীরুতা, কালিমা অর্থাৎ যা কিছু অপকৃষ্ট ও নিন্দনীয় তার সমাহার মনে করতেন। আজ মিঃ রায়ের ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গান্ধীজীর রামরাজ্য, রামজন্মভূমির মাধ্যমে দানবীয় রূপ ধারণ করেছে।

তাছাড়া আমরা এটাও জানি গান্ধীজী গীতার ভক্ত ছিলেন। মিঃ রায় বলেছেন,

"In Gita, the God also announced that all earthly powers are manifestations of his power. Not only are the priestly privileges of the Brahman exercised on divine authoriy, not only did kings and emperors in the past rule as incarnations of God; but even to-day parasitic land-lords claim to be 'the natural leaders" of the present masses whom they exploit; and naive prince wield autocratic power with the convenience orthodox nationalist who claims representative Government in the British province."

অর্থাৎ "গীতায় ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, সব জাগতিক শক্তিই তার প্রকাশ। শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের বলে ব্রাহ্মণদের শুধু পৌরহিত্যবাদের ধর্মীয় সুবিধাই নয় কিংবা

রাজাবাদশাদের ঈশ্বরের অবতাররূপে অতীত শাসনই নয় এমন কি আজো পরজীবী জমিদাররা নিজেদের বর্তমান জনগণের "স্বাভাবিক নেতা" হিসাবে দাবী করে তাদের তারাই শোষণ করে এবং দেশীয় রাজারাও গোঁড়া জাতীয়তাবাদের সাথে যোগসাজসে স্বৈরাচারী ক্ষমতার মদমত্ততায় বৃটিশ প্রদেশসমূহে প্রতিনিধিমূলক সরকারের দাবীতে সোচ্চার।"

("ধ্বংসের পথে ভারত" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

'মেরা ভারত মহান'

শেখ নাসীর আহমদ

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বহুখ্যাত উক্তি 'মেরা ভারত মহান।' সেই মহান ভারতের আজ ভগ্নদশা। ভারতের আজকের অবস্থা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগলরাও যা-তা গোগল ছিলনা, ছিল, "Great Mogol." বাবর থেকে আওরঙ্গজের পর্যন্ত সকলেই ছিলেন 'গ্রেট মোগল'। এই গ্রেট মোগল সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছিলেন ঃ There cannot be a lasting empire without a great people." অর্থাৎ 'মহান জাতি ছাড়া স্থায়ী সাম্রাজ্য থাকে না। ভারতে "গ্রেট পিপল' ছিলনা। ঐশীজ্ঞান ও প্রেরণা ছাড়া পিপল গ্রেট হতে পারেনা আর গ্রেট পিপল বা মহান জাতি না থাকলে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাও থাকে না। যদুনাথ সরকার তাই বলতে বাধ্য হয়েছেন,- "History when rightly read, is the manifestatin of the will of God." অর্থাৎ যথার্থভাবে পাঠ করলে ইতিহাস আল্লার ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র।"

ভারত ইতিহাসে আল্লার এই ইচ্ছা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা দেখা দরকার। গৌতমবুদ্ধ ভারতকে এক মহান জাতিতে পরিণত করেছিলেন যে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেই মহান জাতি কম-বেশী হাজার বছর ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছে কিন্তু পরে শংকরাচার্যের নেতৃত্বে ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক ধর্মের উত্থান হয় ও বৌদ্ধদের উপর সাংস্কৃতিক ও দৈহিক আক্রমণ শুরু হয়। ফলে ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব নষ্ট হয়ে যায় ও এক বিরাট শুন্যতা সৃষ্টি হয়। এটা পূরণ করার সাধ্য কারোরই ছিলনা। এই শূন্যতা পূরণের জন্য ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলাম মুসলমানদের গ্রেট পিপলে পরিণত করেছিল। ইসলামের আগমনের ফলে এদেশের আপামর জনসাধরণ বর্ণবাদের অত্যাচার থেকে বেঁচে যায়। লাখো লাখো মানুষ ইসলামের ছত্রছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলমান আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইসলামের প্রভাবে দেশজুড়ে অব্রাহ্মণ আন্দোলনসমূহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নানক, কবির, চৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাব হয়।

সংস্কৃতের পরিবর্তে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের জন্ম হয়। কালপ্রবাহে মুসলমানরা ইসলামের পরিবর্তে ভারতীয় লোকাচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের ন্যায় মুসলমানদেরও পতন ঘটে। তারা মোগল সাম্রাজ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। আবার শূন্যতার সৃষ্টি হয়। 'গ্রেট পিপল' ইংরেজ সেই শূন্যতা পূরণ করে। ইংরেজ রাজত্বকে আল্লার আযাব হিসাবে মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দুরা ইরেজ রাজত্বকে বিধাতার আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে ও তারা সেই বৈদিক সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে প্রয়াসী হন গৌতমবুদ্ধ যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তারা ইংরেজকে তাড়িয়ে দিয়ে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদ কায়েম করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালে ডাঃ আম্বেদকর 'মূকনায়ক' পত্রিকায় লিখেছেন, 'দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই যদি স্বরাজ আসে তা হবে উক্ত ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীর স্বরাজ।' পার্কিস পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ডঃ টি.এম. নায়ার বলেছিলেন, "Brahmins are demanding freedom to India to enslave the masses." (The Justice Movement-1917) অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণরা জনতাকে গোলাম করার জন্য ভারতের স্বাধীনতা দাবী করছে।'

এই কারণে মিঃ গান্ধী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ-এশিয়ার সক্রেটিস পেরিয়ার ই.ভি. রামস্বামী নাইকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করলে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এটা ভারতীয় জনতার স্বাধীনতার আন্দোলন নয় বরং ভারতীয়দের উপর জুলুম অত্যাচার চিরস্থায়ী করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমত ছিনিয়ে নেবার আন্দোলন। দেশের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্থা কংগ্রেস ও তার স্বৈরাচারী নায়ক গান্ধীজী ইংরেজদের হাত থেকে ক্ষমতালাভের পূর্বে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা কিংবা হিন্দু অচ্ছুত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিলেন না। হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি বাংলার জনসংখ্যার অনুপাতে সরকারী সুযোগ-সুবিধা সমানুপাতিক হারে বন্টনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ও নেতৃত্বে যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ১৯১৬ সালে লখনৌ চুক্তি সম্পাদিত হয় তেমনি ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই আপোষফর্মূলা বানচাল করে দেয়। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ১৯২৬ সালের প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্টকে বাতিল ঘোষণা করা হয় অথচ ঐ সম্মেলনেই নজরুল ইসলামের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গান গাওয়া হয়। 'জাতি' নয় 'জাতের' জয় সেদিন হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের আলোচনা টেবিলে ডাক্তার বিধান রায় বলেন, "তাহলে মুসলমানদের কথা এই ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে যাবনা, কিন্তু চাকরীতে অংশ দাও। স্যার আবদুর রহিম এর পাল্টা জবাব দেন, 'তাহলে হিন্দুদের কথা এই ঃ চাকরীতে অংশ দিব না, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে আস।'

–(দ্রষ্টব্য কলম নভেম্বর, '৮৯)

গান্ধীজীর এই চালাকীটা পেরিয়ার রামস্বামী নাইকার খুব ভালভাবে বুঝেছিলেন এবং বুঝেছিলেন বলেই ১৯৪০ সালের ৮ই জুন বোম্বায়ে মুসলমান সমাজের নেতা মিঃ জিন্না ও অচ্ছুত সম্প্রদায়ের নেতা ডঃ আম্বেদকারকে এক আলোচনা বৈঠকে সমবেত করে যৌথ স্ট্রাটেজী বানাতে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে এ উদ্যোগ সফল হয়নি। ভি.টি. রাজশেখর লিখেছেন, "On the other hand, we suspect a secret conspiracy blessed by Gandhi and other Hindu revivalist leaders to keep them apart.

তাদের এই ষড়যন্ত্রের কারণ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম তাদের লক্ষ্য ছিলনা বরং লক্ষ্য ছিল ভারতে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য যুগ ফিরিয়ে আনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল এই লক্ষ্য অর্জনের সোপান। মিঃ শচীন সেন তাঁর 'The Birth of Pakistan' গ্রন্থের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'The Indo-Moslem culture was not appreciated on the political platform of Hindus. The exploits of Sikhs and Marathas were revived, there was a call for return to the India of pre-Muslim times." অর্থাৎ 'ইন্দো-মুসলিম কালচার হিন্দুদের রাজনৈতিক মঞ্চে সমাদৃত হয়নি। শিখ ও মারাঠাদের বিপর্যয়কে নতুনভাবে উজ্জীবিত করা হয়, মুসলিম-পূর্ব যুগের ভারতে ফিরে যাবার আহ্বান জানান হয়।'

ভারতে ব্রাহ্মণ্যরাজ কায়েম করবার জন্যই মৌলানা মোহাম্মদ আলীর ফরমূলা (দ্রষ্টব্য Inlam in recent History) পরিহার করে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ১৯২৮ সালে ভাবী ভারত শাসনের খসড়া প্রকাশ করেন। এটা এতই একপেশে ছিল যে সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। মুসলিম লীগের দুটো গ্রুপের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাও মিটে যায় এবং ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রকাশিত হয়। এতে অচ্ছুতদের রাজনৈতিক সত্তা স্বীকৃত হয়। মুসলমান ও শিখদের মত তারাও সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার সুযোগ লাভ করে। এতে বর্ণ হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। গান্ধীজী পুণা চুক্তির মাধ্যমে অচ্ছুতদের স্বাধিকার আন্দোলনকে বিপথগামী করেন। তপশিলীদের কাছে টেনে মুসলমানদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করা হয়। মুসলিম লীগকে কোন স্বীকৃতি দিতেই রাজী হয়নি ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস। ১৯৩৮ সালে কায়েদে আযম জিন্নাহ এক অবরুদ্ধ সমাজের নেতা হিসাবে আর্তনাদ করে ওঠেন, "আমি বলতে চাই, মুসলমান ও মুসলিম লীগের কেবলমাত্র একটা মিত্রই আছে এবং সেই মিত্র হচ্ছে মুসলিম জাতি এবং একজন, কেবলমাত্র একজনের পানেই তারা তাকাতে পারে আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ"। এজন্য কবি নজরুল ইসলামের মতো মানুষ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে মুসলিম ভারতের নেতা হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাগত জানান নিম্নভাষায়– "হঠাৎ লীগ নেতা কায়েদে আযম যেদিন পাকিস্তানের কথা তুলে

হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'আমরা বৃটিশ ও হিন্দু দুই ফ্রন্টে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব'– সেদিন আমি উল্লাসে চীৎকার করে বলেছিলাম– হাঁ, এতদিনে একজন 'সিপাহসালার'– সেনাপতি এলেন। আমার তেজের তলোয়ার তখন ঝলমল করে উঠল।" (দ্রষ্টব্য দৈনিক সংগ্রাম, ২৯শে মে ৯০)।

গান্ধীজী জাতিভেদ প্রথা বিলোপের পক্ষাপাতী ছিলেন না বরং তিনি রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন যে রামরাজ্যকে অচ্ছুতরা মৃত্যুঘণ্টার সামিল বলেই মনে করে।

এ পথের প্রতিবন্ধক ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব। তিনি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতবাসীর নামে বর্ণ হিন্দুদের হাতে ক্ষমতা প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। অহিংসা ও অসহযোগ ছিল তার হাতিয়ার। তাই তিনি কাউকে স্বীকৃতি দিতে, কারো অধিকার স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না তবে কিছু অনুগ্রহ প্রদান করতে রাজী ছিলেন। গান্ধীজী ঘোষণা করেন, "আমি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন দেবনা কিন্তু পৃথক নির্বাচন ছাড়া যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অনিচ্ছাসহকারে আমি প্রত্যেক প্রকৃত সংখ্যালঘুদের তাদের সংখ্যানুপাতে সংরক্ষণ প্রথা দিতে রাজী আছি।" (দ্রষ্টব্য Birth of Pakistan P.20–শচীন সেন।)

এটাও তিনি দয়া করে রাজী হয়েছিলেন মিঃ নেহেরুর পরামর্শে কারণ তাঁর কংগ্রেস তখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারেনি ব'লে, অন্যথায় তিনি এটুকু দিতেও রাজী ছিলেন না। তিনি গণতন্ত্র, পার্লামেন্টারী পলিটিকস ইত্যাদির পক্ষপাতীও ছিলেন না। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে সাময়িকভাবে কালহরণের জন্য তিনি গণপরিষদ গঠনে রাজী হন। তিনি কংগ্রেসকে এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, "প্রত্যেক সংগ্রামের চিন্তার পূর্বে গণপরিষদে পৌছানোর সমস্ত উপায়-উপকরণ নিঃশেষ করে ফেলতে হবে। গণপরিষদে পৌছানোর ভূমিকা হিসাবে একটা পর্যায় এমনও আসতে পারে যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জরুরী হয়ে পড়বে। এখনও সেই পর্যায় আসেনি।"

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এতে তিনি ব্যর্থ হন। তিনি গৃহ যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন, 'He suggested that there should be a united India or a Partitioned India or a proper civil war" অর্থাৎ 'তিনি প্রস্তাব করেছিলেন অখণ্ড ভারত, খণ্ডিত ভারত অথবা যথাযথ গৃহযুদ্ধের।'

কিন্তু এ সব হম্বিতম্বি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আলোচনার টেবিলেই বসতে হয় ও ভারতের জন্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা লীগ-কংগ্রেস উভয়ই গ্রহণ করে। এটা ছিল এক পবিত্র চুক্তি। কিন্তু একাধিপত্যকামী ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেসী নেতৃত্ব মনেপ্রাণে এই চুক্তি গ্রহণ করতে পারেনি। তারা মুসলমানদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে ভোগ করার থেকে মুসলমানদের পৃথক করে ছেঁটে ফেলতেই আগ্রহী ছিল। ভারতের

সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানদের অবস্থান ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চিন্তিত করে তোলে। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের খপ্পরে পড়ে ডঃ আম্বেদকর ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেসকে চল্লিশের দশকেই পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশ ভাগ করে মুসলমানদের পাকিস্তান দিয়ে সেনাবাহিনীকে মুসলিম-প্রাধান্য মুক্ত করতে। তিনি বলেছিলেন, 'That is the only way of getting rid of the Muslim preponderance in the Indian army.' (Pakistan or partition of India, page-85) অর্থাৎ 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে মুসলিম প্রাধান্যমুক্ত করার এটাই একমাত্র পথ।' রাজাগোপালচারী এটাই লুফে নেন।

কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মিঃ নেহেরু তাই স্বয়ং ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাকে বানচাল করবার জন্য প্ররোচনামূলক বিবৃতি দেন। ১৯৪৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বায়ে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, There is a good deal of talk of Cabinet Mission's long-term plan and short-term plan. So far as I can see, it is not a question of our accepting any plan, long or short, it is only a quesion of our agreeing to go into the constituent Asembly. That is all and nothing more than that.We wll remain in that Assembly so long as we think it is god to India and will come but when we think it is injuring our cause and then offer battle. We are not bound a single thing except that we have decided for the moment to go to the constituent Assembly." অর্থাৎ ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। গণপরিষদে যাবার জন্য আমরা এই প্রশ্নে রাজী হয়েছি। এটাই সব, এর বাইরে কিছুই নেই। আমরা ততক্ষণই পরিষদে থাকবো যতক্ষণ থাকাকে আমরা ভারতের (অর্থাৎ নিজেদের) স্বার্থের জন্য কল্যাণকর মনে করবো এবং তখনই বেরিয়ে আসবো যখন আমরা মনে করবো যে আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অতঃপর যুদ্ধের প্রস্তাব দেব। আমরা এই মুহূর্তে গণপরিষদে যাওয়া ছাড়া আর কোন একটা কিছুর জন্যও বাধ্য নই।"

পূর্বেই বলেছি গান্ধীকথিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতির পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদ নিয়ে কালহরণ করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। গণরিষদে লীগকে কোণঠাসা করা সহজ ছিল কারণ সেখানে কংগ্রেসের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। তাদের ছিল ২৯২, আর মুসলিম লীগের ছিল মাত্র ৭২ জন সদস্য। কিন্তু ক্যাবিন্টে মিশন পরিকল্পনা ছিল কংগ্রেসের একাধিপত্য চাপিয়ে দেবার পথে বিরাট বাধা। তাই এ বাধা মানতে কংগ্রেস রাজী নয়। লীগ যদি কগ্রেসের কথা না শুনে তাহলে তারা 'then offer battle' অর্থাৎ যুদ্ধের প্রস্তাব দেবেন।

পণ্ডিত নেহেরুর আজন্ম সাথী মৌলানা আজাদ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লেখেন, "Looking back after 10 years, I concede that there was force in what Mr. Jinnah said.The Congress and the League were both parties to agreement, and it was on the basis of distribution among the centre, the provinces and the groups that the League had accepted the plan. Congress was neither wise, nor right in raising doubts. It should have accepted the plan unequivocally if it stood for the unity of India." অর্থাৎ দশ বছর পরে পিছনের পানে তাকিয়ে আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে মিঃ জিন্নার কথার মধ্যে যুক্তি ছিল। কংগ্রেস এবং লীগ উভয় দলই চুক্তির অংশীদার ছিল। কেন্দ্র, প্রদেশ ও গ্রুপের বন্টণের ভিত্তিতেই লীগ পরিকল্পনা (ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা) গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের তরফ থেকে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ উত্থাপন করা না বুদ্ধিমত্তা, না সততার পরিচয় ছিল। যদি ভারতের অখণ্ডতাই তার লক্ষ্য হতো তাহলে তার (কংগ্রেসের) উচিত ছিল বিনা বাক্যব্যয়ে এটাকে মেনে নেওয়া।"

কংগ্রেসের এই প্রতিশ্রুতিভংগই ভারত বিভাগের কারণ। মিঃ নেহেরুর এই বিবৃতির সময় মিঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীর সংগে ছিলেন। মিঃ নারায়ণ মিনু মাসানীকে বলেন, "Gandhiji was in tears at the manner in which Jawaharlal had sabotaged the effect to keep India united."

হায়, গান্ধীজী কি জানতেন যে, ভারতের সর্বনাশের প্রধান হোতাই তিনি। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান কিংবা দলিত হিন্দু সমস্যার সমাধান তিনিই হতে দেননি এদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের স্বীকৃতি না দিয়ে। তিনি এক নয়া ভারতের নতুন কৃষ্ণ হতে গিয়ে যদুবংশ উদ্ধার করতে এসে যদুবংশই ধ্বংস করে গেলেন। বড় দুঃখেই রাম মনোহর লোহিত লিখেছেন, 'I have almost proved Gandhiji to be a curse rather than a blessing to the country. India without Gandhiji would have been more happily placed at least in the short run." শুধু রামমোহন লোহিয়াই নন, আরও অনেকে এই কথই বলেছেন, উদাহরণ স্বরূপ ১৯৯০ সালের ৭ই মে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় বিমলেনদু এস. দত্তরায় যা বলেছেন, তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "I also do not regard Mahatma Gandhiji as secular, in mind and in day to day practice, as Mohammed Ali Jinnah was, not withstanding Jinnah's call for Pakistan on religious grounds during the final stages of the Indian freedom struggle. The damage done by the Mahatma to the

process of developing secular outlook in India ... could never be repaired after independence. To-days spread of communal Virus is, to a great extent Gandhiji's legacy ... Mahtma Gandhi's sustained drive against cow slaughter speaks volumes of his attitude to life, his attempt for communal harmony and Hind-Muslim unity Even a man in the street knows what a conservative man the Mahatma was, not to speak of the urban elite... In my view, if the Shankaracharya nullified the good work done by Lord Budha in cleansing the Hindu religion of its inherient blind faith in outdated customs and ceremonies and bigotry, Mahatma Gandh nultified the social progress initiated by Raja Ram Mohan."

এরপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্যবাদের অশুভ প্রভাবই তাঁকে এই বিপত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দেশ বিভাগের জন্য মিঃ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের দোষ দেওয়া হয় কিন্তু এখন সবাই স্বীকার করছেন প্রকৃত ইতিহাস ভিন্নতর। মৌলানা আজাদ ছাড়া কংগ্রেসের সব বড় নেতাই ভারত বিভাগের পাপে জড়িয়ে পড়েন। ঐতিহাসিক লিখেছেন, "That this happened is corroborated by evidence other than from Moulana Azad's writing, and that the proposal for the partition of India based on the Mountbatten plan was accepted first by Sardar Patel and then by Pt. Nehru quite against his will ... Azad betrays his ignorance as to what actually transpired in the meeting between Patel, Gandhiji and Pt. Nehru and Lord Mountabatten... Azad was never convinced of the national wisdom in partition."

"এটা যে ঘটেছিল মওলানা আজাদের লেখা ছাড়া অন্য সূত্র থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে ভারত ভাগের প্রস্তাব সর্বপ্রথম সর্দার প্যাটেল এবং পরে নেহেরু কর্তৃক অনিচ্ছাসহকারে গৃহীত হয়েছিল। ... প্যাটেল-গান্ধী-নেহেরু ও মাউন্টব্যাটেনের মধ্যে বাস্তবে যা কিছু ঘটেছিল আজাদ সে সম্পর্কে আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। ... দেশ বিভাগকে তিনি জাতীয় প্রজ্ঞার দাবী বলে কখনই মেনে নিতে পারেননি।' প্যাটেল কংগ্রেসে এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন কিভাবে? আসলে কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন তিনি। আর তার পিছনে ছিল দেশীয় শিল্পপতিদের নেতা মিঃ বিড়লা। ইংরেজকে তাড়িয়ে একচেটিয়া বাণিজ্যের সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন

তারা। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জি,ডি, বিড়লা এক বই লিখে কংগ্রেস নেতাদের নিকট পাঠিয়ে দেন (দ্রষ্টব্য Basic facts Relating to Hindustan and Pakistan) তাতে তিনি দেখান ভারত ভাগ হলে ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হবেনা, অধিকন্তু তিনি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার পরামর্শ দেন। ১৯৪৭ সালের ৫ই জুন বি.এম. বিড়লা প্যাটেলকে লেখেন ঃ ভাইসরয়ের ঘোষণার ফলে অবস্থার যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে আপনারই ইচ্ছার প্রতিফলন হয়েছে। তার ফলে হিন্দুদের ভালোই হবে... ভারতের বিভক্ত অঞ্চলে মুসলিম রাষ্ট্র হবে। আমরাও কি হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করে হিন্দুস্থানে একটা হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করার কথা বিবেচনা করতে পারিনা?"

ব্রাহ্মণ-বেনিয়া ষড়যন্ত্রের ফলেই দেশ বিভক্ত হয়। পাপ লুকায় না, সাগরও শুকায় না। পাপের ফল ভোগ করতেই হয়। প্রতিশ্রুতি ভাগের ফল ভাল হয়না। ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলে মিঃ নেহেরু এতবড় প্রতিশ্রুতি ভংগ করতে পারতেন না। এর পরও তিনি প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছেন বারবার। ডঃ আম্বেদকর ও মাষ্টার তারা সিং কিংবা শেখ আবদুল্লাহ কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস রক্ষা করেনি। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব-লংগোয়াল চুক্তি ভংগ করেছেন। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনগোষ্ঠী মুসলমান, শিখ ও অচ্ছুত সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র গঠনের জন্য যে বিরাট মন, বিরাট সাধনার প্রয়োজন তা ভারতে ছিলনা এবং আজো নেই। তাই ধ্বংসের হাত থেকে, বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে ভারতকে বাঁচান যাবেনা যদি না ভারত পুনরায় প্রকৃত অর্থে ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয় কিন্তু বর্তমানে ভারত ঐশীপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে শয়তানী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্থান তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রামজন্মভূমি মন্দিরের শিলান্যাস করার নামে যে ফ্যাসীবাদী হিন্দুত্ব আত্মপ্রকাশ করছে তার পরিণাম কখনও কল্যাণকর হবেনা। কেন হবেনা সে প্রশ্নে পরে আসছি কিন্তু প্রশ্ন হলো ভারতে সেকুলার গণতন্ত্র ব্যর্থ হলো কেন? এটা ব্যর্থ হলো এই কারণে যে, ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য ভারতে যে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন তা এখানে নেই। সামাজিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সামাজিক গণতন্ত্রের বিশ্বাসী হতে পারেনা। যদি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী সে হয় তাহলে তার জাতিভেদ প্রথা ও অহংকারমূলক আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যবাদকে কবর দিতে হয় কিন্তু এর অর্থ হলো ভারত থেকে বর্ণাশ্রমধর্মী ব্রাহ্মণ্যবাদের উচ্ছেদ। বৌদ্ধধর্মের সাম্যের আদর্শ অতীতে ব্রাহ্মণ্যবাদ যেমন মেনে নিতে পারেনি বরং বৌদ্ধধর্মকেই ভারত থেকে বিদায় করছে ও পরিণামে পাঠান-মোগলদের গোলামী বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অনুরূপভাবে গুপ্তযুগে ফিরে যাবার জন্যে তাদের সেকুলার গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করতে হবে। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে তারা তা করবে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি তার পরিণাম কখনও কল্যাণকর হবে না যেমন অতীতে হয়নি। জংগী

জার্মানীর ন্যায় জংগী হিন্দুত্বেরও পতন ঘটবে। মিঃ নেহেরু পূর্বাহ্নেই আমাদের সতর্ক করে গেছেন নিম্ন ভাষায়, "যখন একটা দেশ বিদেশের অধীনে পরাধীন থাকে তখন জাতীয়তাবাদ শক্তিও সংহতির হাতিয়ার কিন্তু একটা পর্যায় আসে যখন এর প্রভাব সঙ্কীর্ণতাদোষে দুষ্ট হয়। কখনও কখনও এটা উগ্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যেমনটা ইউরোপে হয়েছে এবং অন্য দেশ ও জাতির উপর নিজেকে চড়াও করতে চায়। প্রত্যেক জাতিই এই পাগলামিতে ভুগে যে অন্য সবার থেকে তারা সেরা ও নির্বাচিত জাতি। যখন তারা শক্ত সামর্থ ও প্রতাপশালী হয়ে ওঠে তখন তারা নিজেদের মতপথকে অপরের উপর চাপিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়। এটা করতে গিয়ে তাদের এই প্রচেষ্টায় তারা কখনও কখনও বা কোন এক সময়ে সীমা ছাড়িয়ে যায়, ধাক্কা খায় ও পতন ঘটে। জাপান ও জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদের এই পরিণতি হয়েছে।"

আমার মনে হয় গান্ধী-নেহেরুর নেতৃত্বে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত জাতীয়তাবাদ এই ভুল করেছে যার জন্য দেশ ভাগ হলো। মিঃ জিন্না মৌলবাদীও ছিলেন না এমনকি আজাদের ন্যায় মৌলানাও ছিলেন না বরং পাকা সেকুলার গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনেও প্রাজ্ঞ। প্রায় গোটা মুসলিম-ভারতও ছিল তাঁর পিছনে। কংগ্রেস মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারলে, অপরের উপর নিজেদের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে না চাইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কবেই হয়ে যেত এবং দেশ ভাগও হতো না কিন্তু যেহেতু তারা সীমা লংঘন করেছিলেন তাই ফলাফল ভাল হয়নি। ঐশী বিধানের কাছে নত না হওয়ার কারণেই এই সীমা লংঘনের ব্যাপারটা ঘটলো। এই সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ির জন্য দেশবিভাগের আযাবের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করেছিলেন কিন্তু আমরা শিক্ষাগ্রহণ করলাম না বরং জাতীয় স্বার্থের নামে, জাতীয় সংহতির নামে আমরা ক্রমশঃ সংকীর্ণ মনোভাবকে প্রশ্রয় দিতে লাগলাম। মিঃ নেহেরু এ ব্যাপারে সচেতন থেকেও এই মনোভাবকে রুখতে বিশেষ কিছু করতে পারেননি ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার মৌলিক দুর্ব্বলতার কারণে। এই মৌলিক দুর্ব্বলতা হলো সামাজিক সমস্যা সমাধানে এর ব্যর্থতা। পাঁচ হাজার বছর পরেও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থা দলিত সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেনি। ফলে দলিতদের মধ্য থেকে বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ, কম্যুনিষ্ট, র‍্যাশানালিষ্ট প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় বেরিয়ে এসেছে ও ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে। অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অহংকার ও বৃথা গর্ব ইত্যাদির কারণে তারা অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেনি। তারা সহাবস্থানের কোন বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তবপন্থাও উদ্ভাবন করতে পারেনি বরং নেতিবাচক মনোভাবের দ্বারা তারা সমস্যাকে জটিল করেছে। তাই তারা বর্ণহিন্দু ছাড়া কারো মনেই নিরাপত্তাবোধ দিতে পারেনি; সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধান তো অনেক দূরের কথা। তাই

তারা ভারতবর্ষের মত বহুজাতিক দেশে জনগণের সকল অংশকে সমানুপাতিক হারে অংশ দিয়ে সকলের সম্মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রগঠন করতে তারা পারেনি। আর সংগীতা রাও দিল্লী থেকে লিখেছেন, "ডঃ আম্বেদকর মনেপ্রাণে সমাজতন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ সালেই, "States and Minorities" এই শিরোনামায় তিনি ভারতের ভাবী সংবিধানের খসড়া তৈরি করে ফেলেন। মৌলিক অধিকার প্রবর্তনের ভার যাদের উপর ছিল সেই প্যাটেল ও. জে. বি. কৃপালনীর সাথে আলাপ-আলোচনা করে তিনি হতাশ হন, কারণ তাঁরা সমাজতন্ত্রকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে সামিল করতে রাজী হয়নি। তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নেহেরুর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করেও ব্যর্থ হন। তাঁদের না বোঝাতে পেরে তিনি আরও বেশি হতাশ হয়ে যান।"

মনে রাখতে হবে যে ডঃ আম্বেদকর কেতাবী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন না বরং তিনি সমাজতন্ত্র বলতে বুঝতেন বঞ্চিতদের প্রাপ্তি। ব্রাহ্মণ-বানিয়ার তল্পীবাহক কায়েমী স্বার্থের অতন্ত্র প্রহরী কংগ্রেস বঞ্চিতদের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামও করেনি যদিও মিঃ নেহেরু ত্রিশের দশকে থেকে সমাজতন্ত্রের ডঙ্কা বাজাচ্ছিলেন সাধারণ জনতাকে ধোঁকা দিয়ে দলে টানতে যাতে ব্রাহ্মণদের গদীলাভের আন্দোলন সহজ হয়। তাই অন্তবর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের সমাজতান্ত্রিক বাজেট কংগ্রেসের সমর্থন পায়নি। কংগ্রেসের বলার কথা ও করার কথা এক ছিলনা আজো এক নেই। তাই আম্বেদকরও প্রতারিত হলেন। সেকুলারিজমের ডঙ্কও কম বাজান হয়নি কিন্তু নতুন সংবিধানে কোথাও সেকুলারিজমের কথা বলা হয়নি যাতে সংবিধানে সেকুলার শব্দ প্রবিষ্ট করার আগেই প্রশাসনযন্ত্রের সর্বত্র বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য কায়েম হয়ে যায়। এসব কিছু করার পর সংবিধানের মুখবন্ধে জরুরী অবস্থার পর এসব শব্দ সংবিধানের অলংকরণের জন্য প্রবিষ্ট করান হয়। ১৯৮১ সালেও ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের পজিশান ছিল লোকসভায় ৪৮% রাজ্যসভায় ৩৬% গভর্ণর, লেঃ গভর্ণর ৫০%, তাদের সচিব ৫৪%, ইউনিয়ন ক্যাবিনেট সচিব ৫৩%, মন্ত্রীদের চিফ সেক্রেটারী ৫৪%, মন্ত্রীদের প্রাইভেট সচিব ৭০%, জুনিয়ার এ্যাডিশনার সেক্রেটারী ৬২%, ভাইস-চ্যান্সেলার ৫১%, সুপ্রীম কোর্টের জজ ৫৬%, হাইকোর্টের জজ ৫০%, এ্যামব্যাসাডর ৪১%, সরকারী প্রকল্পের ম্যানেজার কেন্দ্রীয় ৫৭%, রাজ্যে ৭২%। এই পরিসংখ্যান দিয়ে আর সগীতা রায় লিখেছেন, "উপরোক্ত ছক প্রমাণ করে যে ৫০% ব্রাহ্মণ কেন্দ্রে ৬০% ও অন্যান্য তিনি বর্ণের লোকেরা বাদবাকীটা লোপাট করেছে। ১০% সামন্ত প্রভু এবং রাজ্যের বাকী দুই উচ্চবর্ণ ৮০% রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে তা কংগ্রেস বা অকংগ্রেস যার দ্বারাই শাসিত হোক" (দ্রষ্টব্য Voice of the weak, Oct. 1989)।

পুলিশ, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এই একচেটিয়া প্রাধান্য থাকায় উগ্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান সহজ হয়। মিঃ নেহেরু এর উত্থান-সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীদের যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন, "But a more insidious form of nationalism is the narrowness of mind that it developes within a country, when a majority thinks iteelf as the entire nation and in its attempt to absorve the minority actually seperates them even more. We, in India, have to be particularly careful of this because of our tradition of caste and separatism.We have a tendency to fall into separate groups and to forget the larger unity... in the name of unity, they seperate and destroy. In social terms they represent reaction of the worst type."

অর্থাৎ "অধিক ছলনাপূর্ণ জাতীয়তাবাদ হচ্ছে মানসিক সঙ্কীর্ণতা যা একটা দেশের মধ্যে তখন জন্মলাভ করে যখন তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় নিজেকেই গোটা জাতি হিসাবে ভাবতে শুরু করে দেয় এবং সংখ্যালঘুদের মিলিয়ে-মিশিয়ে নিতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে তাদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভারতে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের জাতপাত ও বিচ্ছিন্নতার ঐতিহ্যের কারণে। আমাদের বৃহত্তর ঐক্যের কথা ভুলে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে যাওয়ার প্রবণতা আছে। ঐক্যের নামে তারা বিচ্ছিন্ন করে ও ধ্বংস করে। সামাজিক দিক দিয়ে দেখলে তারা জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারক।"

এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একটা অংশ আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বিজেপি, হিন্দুদের জাতি ভাবতে শুরু করেছে ও সংখ্যালঘুদের সাংগীকৃত করবার জন্য 'পজিটিভ সেকুলারিজমের' শ্লোগান তুলেছে। এতে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আপন না করে দূর করে ফেলেছে। এ সম্পর্কে সতর্ক থাকবার জন্য মিঃ নেহেরু বলে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর কন্যা ও নাতি তারই মত এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই করেন নি বা করতে পারেননি শুধু মৌখিক বিবৃতি দেওয়া ছাড়া। তাঁরা এটা করতে পারেননি এই কারণে যে, যে হিন্দুত্বের প্রচার সংকীর্ণচেতনা সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা করছে তার মোকাবেলা করার মত সামাজিক ভিত্তি ও সংগঠন তথাকথিত সেকুলার হিন্দুদের ছিলনা, আজো নেই। তাই প্রতিরোধ নয় বরং আত্মসমর্পণ করে বসলেন রাজীব সরকার। সংখ্যালঘুদের রক্ষার সব প্রতিশ্রুতিই নেহেরু পরিবারের সরকার ভঙ্গ করেছেন। তাই ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন।

ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষমতায় এল ইংরেজকে বিতাড়িত করার পর। ইংরেজকে পালাতে হলো কেন এটা একটা বড় প্রশ্ন। ইংরেজকে পালাতে হলো এই কারণে যে ভারতে এসে ইংরেজরা ভারতীয় আর্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। এটা আমার কথা নয়। ফরাসী চিন্তানায়ক Poliakov কি লিখেছেন শুনুন, "About 1780, the Brahamins of Bengal were given orders to translate in to English the ancient laws and sacred writings of India." অর্থাৎ "১৭৮০ সালে বাংলার ব্রাহ্মণদের ভারতের প্রাচীন আইনকানুন ও শাস্ত্র গ্রন্থ অনুবাদের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা জয় করলো আর ১৭৮০ সালে আর্যদর্শনের অনুবাদের আদেশ দিয়ে বসলো। এ কাজের জন্য তারা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্সকে কোলকাতা হাইকোর্টের জজ করে পাঠালো। তিনি সংস্কৃত শিখে আর্যগ্রন্থসমূহ রপ্ত করে দেখলেন ভারতীয় আর্য শিক্ষার সাথে ইউরোপীয় আর্য গ্রীকদের ধ্যান-ধরণার প্রভূত মিল। তিনি একজন ব্রাহ্মণকে ঘুস দিয়ে ব্রাহ্মণদের ধর্মশাস্ত্রসমূহ অনুবাদ করিয়ে নিলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিলেন জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমূলার। শোপেনহাওয়ার, হেগেল সবাই একেএকে আর্যদর্শনে প্রভাবিত হতে লাগলেন এই কারণে যে তারা যে সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ভারতের উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণরা সেই সাদা চামড়ারই লোক এবং তারাও তাদের বর্ণশ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ্যবাদ শুধু জন্মকৌলিন্যে বিশ্বাসী নয়-অর্থকৌলিন্যেও বিশ্বাসী। ফলে বৈষম্যমূলক অর্থনীতির মতবাদ ধনতন্ত্রবাদেরও তা বিরোধী নয়। একবারে সোনায় সোহাগা। চাণক্যের কূটনীতির মিথ্যাদর্শনও তারা পেয়ে গেল। 'Divide and rule' নীতি তারা ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই শিখেছিল। Poliakov লিখেছেন, Max Muller, who inflenced the British rulers to admit the genetic superiority of the Indian Brahamins who secured top jobs in the British Government." "অর্থাৎ ম্যাক্সমূলার বৃটিশ শাসকদের ভারতীয় ব্রাহ্মণত্বের বংশগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বুঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণরা বৃটিশ সরকারের বড় বড় পদে নিযুক্ত ছিলেন।"

ফলে ইংরেজ ও তার প্রশাসনের অধঃপতন ঘটেছিল। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল ভারতে এসেই। রাজা-বাদশা-নবাব জমিদার সবের পৃষ্ঠপোষক ছিল ইংরেজ। জমিদাররা ছিল অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও উগ্র ধনতন্ত্রবাদী। শাসনশোষণে দেশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজ তার মানবিকতা হারিয়েছিল ভারতে।

স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে যে মানবিকতার সে পৃষ্ঠপোষক ছিল বিদেশে সে ছিল সেই সেই মানবিকতার দুশমন। ইংরেজ চরিত্রের মহত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর ইংরেজ সম্পর্কে যে আকর্ষণ ছিল শীঘ্রই তা বিকর্ষণে পরিণত হয়েছিল। সে আর 'গ্রেট পিপল রইলো না। তাই তাকে যেতে হলো।

কিন্তু তারপরেও একটা প্রশ্ন রয়ে যায় ব্রাহ্মণরা কি তাহলে 'গ্রেট পিপলে' পরিণত হয়েছিল যে কারণে তারা শাসনক্ষমতা পেল? হ্যাঁ, তারা কিছুটা 'গ্রেট পিপলে' পরিণত হয়েছিল রাজা রামমোহন রায়, গোবিন্দ রানাডে ও স্বামী দয়ানন্দ প্রমুখের পৌত্তলিকতা বিরোধী আন্দোলনের ফলে। তারা প্রচলিত কুসংস্করাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার করেছিলেন। পাশ্চাত্য লিবারিলিজিমের প্রভাব তাদের উপর পড়েছিল। তারা ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ মানবতাবাদের উপর জোর দিয়েছিলেন। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল কিন্তু রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর বিপরীতমুখী চিন্তার কারণে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ঘুণ লাগলো আর তা ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশকে তমসাচ্ছন্ন করে তুলেছিল। সেটা কিভাবে বর্তমান অবস্থায় বিবর্তিত হয়ে এসেছে তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সহনশীল হিন্দুর জন্ম হয়েছিল তার একাংশ বিংশ শতাব্দীতে অসহিষ্ণু হতে হতে চরম অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সেকুলার ও সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর এই দ্বন্দ্বে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু যদি জয়ী হয় আর তা যদি মুসলিম দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু দলনে ব্যস্ত থাকে তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতার পতনের পর যে ফ্যাসীবাদী হিন্দুর অভ্যুত্থান ঘটবে তাতে এমন 'গ্রেট পিপল' থাকবেনা যারা ভারতকে সামলাতে পারবে। আজ ভারত প্রকৃতপক্ষে ধর্মের দেশ নয়, অপধর্মের দেশ। এই অপধর্ম রাজনীতির উপর সওয়ার হয়েছে। এটা শুধু ব্রাহ্মণ্যকালচারকে উত্তরাধিকারসূত্রে লালনই করছেনা বরং ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃত্বকে পরম সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেছে।

তাই আগামীতে তারা ভারতের বিপর্যয় থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবেনা। নকশালরা, দলিতরা কিংবা অন্যান্য গোষ্ঠীরা যদি আন্তরিকভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদবিরোধী মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনমূলক, গঠনমূল ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে সাময়িক বিপর্যয় এড়াতে পারলেও শেষরক্ষা করতে পারবে না কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিকল্প কোন শক্তিশালী জীবনদর্শন তাদের কাছে নেই। যাদের কাছে ঐশীচেতনা আছে তারা তাদের নিজেদের জালে নিজেরা বন্দী হয়ে রয়েছে। তাদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও উপযুক্ত রণকৌশল নেই। এই কারণে তারাও 'গ্রেট পিপল' তৈরি করতে পারবে না। ভারতে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তাই প্রবল। আল্লাহ তো জনপদের উপর জুলুম

করেন না কিন্তু জনপদের অধিবাসীরা যদি নিজেদের উপর জুলুম করে তাহলে তাদের বিপর্যয়ের জন্য তারা দায়ী হবেনা তো হবে কে? আল্লাহ বৌদ্ধ, মুসলমান, ইংরেজ কাউকে ক্ষমা করেননি অবশ্য ঢিল তিনি প্রত্যেককেই দিয়েছেন সংশোধনের জন্য কিন্তু বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যদি এর সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের সংশোধিত না করে অধিকতর ঢিলের কারণে আরও বেশী বেপরোয়া হয়ে যায় তাহলে পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠীর ন্যায় তারাও আল্লার রোষানলে পতিত হবে বলে মনে হয়। আফসোস এই বিরাট বিপদ থেকে এদেশকে বাঁচাবার জন্য কাউকেও সামনে দেখা যাচ্ছে না। আজ প্রয়োজন এক প্রহ্লাদের, এক ইবরাহীমের যিনি হিন্দুস্থানের বুতখানায় আজরের ঘরেই জন্মলাভ করবেন।

("ধ্বংসের পথে ভারত" গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)

ভারতের উদারমনা ও দি গড অব স্মল থিংস-খ্যাত ঔপন্যাসিক অরুন্ধতী রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদে আউটলুক পত্রিকার ০৬ মে ২০০২ সংখ্যায় একটি মূল্যায়নধর্মী লেখা লিখেছেন।

ঘাতকের পদধ্বনি

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ ঃ শিবব্রত বর্মন

গত রাতে আমার এক বন্ধু বরদা থেকে ফোন করেছিল। কান্নাকাটি করছিল সে। ব্যাপারটি যে কি, সেটা বলতে সে ১৫ মিনিট সময় লাগিয়ে ফেলল। ঘটনাটি খুব সরল; বেশি কিছু না, তার এক বান্ধবী সাঈদার ওপর একদল উচ্ছৃঙ্খল লোক হামলা চালিয়েছে। তেমন কিছু না, তার পেট কেড়ে নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছে ওরা। তার মৃত্যু ঘটার পর কেউ তার কপালে 'ওঁ' কথাটা লিখে দিয়েছে।

কোনো হিন্দুশাস্ত্রে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী (বাজপেয়ী) এ জাতীয় হামলা জায়েজ করতে গিয়ে বলেছেন, গোধরায় সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেন জ্বালিয়ে দিয়ে মুসলমান 'সন্ত্রাসবাদীরা' ৫৮ জন হিন্দু যাত্রীকে হত্যা করার প্রতিশোধ হিসেবে বিক্ষুব্ধ হিন্দুরা এসব কর্ম করেছে। এসব বীভৎস হত্যাকাণ্ডের যারা শিকার হয়েছে তারা প্রত্যেকে কারো না কারো ভাই, কারো না কারো মা, কারো সন্তান। হ্যাঁ, তা তো বটেই। কোরআনের কোন আয়াতে লেখা আছে মানুষকে এভাবে পুড়িয়ে মারতে হবে?

যতই দু'পক্ষ একে অপরকে হত্যা করার মাধ্যমে তাদের ধর্মের পার্থক্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে, ততই তাদের মধ্যে তফাৎ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। তারা

একই বেদিমূলে অর্ঘ্য দেয়। একই জিঘাংসার দেবতার পূজারী তারা। পরিস্থিতি এমন চরম-জঘন্য রূপ নিয়েছে, এমনকি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত এ চক্রের উৎপত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত পরনিন্দুক এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করেন।

এ মুহূর্তে আমরা এক বিষের পেয়ালা পান করছি। চুষে নিচ্ছি ধর্মীয় ফ্যাসিবাদে মাখানো এক ক্রটিপূর্ণ গণতন্ত্র। খাঁটি আর্সেনিক।

আমাদের কী করা উচিত? কী করা সম্ভব আমাদের পক্ষে?

আমাদের ক্ষমতাসীন দল (বিজেপি) নিজেই একটি রোগের মতো। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি পোটো নামে এক আইন পাস, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খঞ্জর উত্তোলন (সেই সঙ্গে পারমাণবিক হুমকি), সীমান্তে প্রায় ১০ লাখ সতর্ক সৈন্য মোতায়েন এবং সবচেয়ে যা ভয়াবহ স্কুলপাঠ্য ইতিহাস বইয়ের সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাস বিকৃতি- এত কিছু করার পরও একের পর এক নির্বাচনে অপমানিত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি এ দল। এমনকি তাদের দলের পুরনো কৌশল-অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের ইস্যু উসকে দেওয়া- সেটাও কাজ করেনি। এ রকম অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে তারা গুজরাত রাজ্যে ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছে।

ভারতের একমাত্র বিজেপি সরকার শাসিত রাজ্য গুজরাতে বহুদিন ধরে এক গভীর রাজনৈতিক এক্সপেরিমেন্টে তা দেওয়া হচ্ছিল। গত মাসে এ এক্সপেরিমেন্টের প্রাথমিক ফলাফল সবার সামনে প্রদর্শন করা হলো মাত্র। গোধরার ঘটনায় ঘণ্টা কয়েকের মাথায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে শুরু করে দিল। সরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৮০০। নিরপেক্ষ সূত্র বলছে, ২ হাজারের বেশি লোক মারা গেছে। ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত দেড় লাখ লোক এখন উদ্বাস্তু শিবিরে বসবাস করছে। মেয়েদের উলঙ্গ করে গণধর্ষন করা হয়েছে। সন্তানের সামনে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে পিতাকে। ২৪০টি দরগা ও ১৮০টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে- আহমেদাবাদে আধুনিক উর্দু কবিতার জনক ওয়ালি গুজরাতির মাজার ভেঙে ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। জ্বলন্ত টায়ার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেখানে। দুষ্কৃতকারীরা দোকানপাট, বাড়িঘর, হোটেল, টেক্সটাইল মিল, বাস ও প্রাইভেটকারে লুটপাট চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার লোক চাকরি হারিয়েছে।

কংগ্রেসের সাবেক এমপি ইকবাল এহসান জাফরির বাড়ি ঘেরাও করেছিল উন্মত্ত লোকজন। পুলিশের মহাপরিচালক, পুলিশ কমিশনার, মুখ্য স্বরাষ্ট্র সচিব ও অতিরিক্ত সচিবকে ফোন করেও কোনো সাড়া পাননি তিনি। তার বাড়ির আশপাশে টহলরত ভ্রাম্যমাণ পুলিশ ভ্যান হস্তক্ষেপ করেনি। দুষ্কৃতকারীরা দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। তারা

তার মেয়েদের নগ্ন করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। তারা এহসান জাফরির শিরচ্ছেদ করে তার দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। গত ফেব্রুয়ারিতে রাজকোট এলাকার বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে প্রচারাভিযানকালে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন জাফরি। যোগসূত্রটি লক্ষণীয়।

গুজরাত জুড়ে হাজার হাজার লোক উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাদের হাতে পেট্রলবোমা, বন্দুক, চাকু, তলোয়ার এবং ত্রিশূল। ভিএইচপি ও বজরং দলের লুণ্ঠনবাদীরা ছাড়াও দলিত ও আদিবাসীরাও এতে অংশ নেয়। মধ্যবিত্তরা যোগ দেয় লুটপাটে। (অভূতপূর্ব এক দৃশ্য– এক পরিবার লুটপাট চালিয়ে একটি মিথসুবিশি ল্যান্সার নিয়ে বাসায় ফিরেছে।)

দাঙ্গাবাজ নেতাদের কাছে মুসলমানদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, এমনকি পার্টনারশিপের কম্পিউটারে রক্ষিত তালিকা ছিল। হামলা সমন্বয়ের জন্য তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে ট্রাকে ট্রাকে গ্যাস সিলিণ্ডার জমানো হয়েছে। এগুলো তারা ব্যবহার করেছে মুসলমানের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার কাজে। তারা শুধু পুলিশের মদদই পায়নি, পুলিশ তাদের রক্ষা করতে গুলিও চালিয়েছে।

গুজরাত যখন জলছিল তখন এমটিভিতে প্রচার হচ্ছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কবিতা। জানা যায়, তার গানের ক্যাসেট লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। গুজরাতের দিকে নজর দিতে এক মাসেরও বেশি সময় এবং পাহাড়ি এলাকায় দু'দফা অবকাশ যাপন করতে হয়েছে তাকে। যখন নজর দিলেন, তখন তার দৃষ্টি ঢাকা পড়ে গেল কম্পিত মোদির ছায়ায়। শাহ্ আলম উদ্বাস্তু শিবিরে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার মুখ নড়ল। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করতে চাইলেন। কিন্তু কোনো কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হলো না। কেবল পড়ে অঙ্গার হয়ে যাওয়া, রক্তাক্ত, চূর্ণ-বিচূর্ণ চরাচরের ওপর দিয়ে ঠাট্টার মতো শিস দিয়ে বয়ে গেল বাতাসের ঝাপটা। পরের দৃশ্যে তাকে সিঙ্গাপুরে একটি গলফ মাঠে ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পাদনে ব্যস্ত দেখা গেল। গুজরাতের পথে পথে এখন ঘাতকের পদধ্বনি। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ধারণ করে দিচ্ছে দাঙ্গাবাজরা। তারাই বাতলে দিচ্ছে, কে কোথায় থাকবে পারবে না পারবে, কে কি করতে পারবে, কে কার সঙ্গে কখন কোথায় দেখা করতে পারবে। তাদের ম্যান্ডেট দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপার ছাড়িয়ে এখন তারা নিদান দিচ্ছে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের, পারিবারিক কলহের। পানিসম্পদের পরিকল্পনা ও বরাদ্দও তারাই নির্ধারণ করে দিচ্ছে ... (এ কারণেই নর্দমা বাঁচাও আন্দোলনের নেত্রী মেদা পাটেকরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে)। মুসলমানদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হোটেলে মুসলমানদের বসতে দেওয়া হচ্ছে না। স্কুলে মুসলমানদের

শিক্ষার্থীরা ভয়ে পরীক্ষায় বসতে পারছে না। মুসলমান পিতামাতাদের আশঙ্কা, যা শিখেছে সেটুকুও ভুলে যাবে তাদের ছেলেমেয়েরা। প্রকাশ্যে তাদের আব্বি, আম্মি সম্বোধন করতে নিষেধ করছে তারা। এভাবে সম্বোধন করা মানেই মৃত্যু ডেকে আনা।

বলা হচ্ছে, এ তো সবেমাত্র শুরু। যে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা প্রচার করা হচ্ছে, এটাই কি সেই রাষ্ট্রের রূপ? মুসলমানদের একবার তাদের 'রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার' ফলে কি এ দেশে দুধ আর কোকাকোলার নহর বয়ে যাবে? রামমন্দির নির্মাণ হয়ে গেলেই কি সবার গায়ে জামা আর উদরে রুটি জুটবে? প্রত্যেক চোখ থেকে কি উবে যাবে অশ্রু? আগামী বছর কি আমরা এ সাফল্যের একটা বার্ষিকী পালন করতে পারব? নাকি তখন ঘৃণা করার নতুন কোনো পাত্র বেরিয়ে আসবে? আদিবাসী, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, দলিত, পারসিক, শিখ- ঘৃণার তালিকায় তখন এরা কি আর বাদ পড়বে? কিংবা তারও পরে যারা জিন্স পরে, যারা ইংরেজি বলে, কিংবা যাদের পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো চুল? খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না আমাদের। এ প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি কি অব্যাহত থাকবে? শিরশ্ছেদ করা, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা, মুখে মূত্রত্যাগ-এগুলো কি চালু হবে? মায়ের জরায়ু ছিঁড়ে ভ্রূণ বের করে কি তাকে হত্যা করা হবে?

তাদের পরিচয় যাই হোক বা যেভাবেই তারা নিহত হোক না কেন, গুজরাতে গত কয়েক সপ্তাহে নিহত প্রত্যেকটি মানুষের জন্য শোক করা উচিত।

সম্প্রতি জার্নাল ও পত্র-পত্রিকায় শত শত ক্ষুব্ধ পাঠকের চিঠি আসছে। যাতে 'ছদ্ম সেক্যুলারিস্ট'দের প্রতি প্রশ্নবান ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, গুজরাতের বাকি হত্যাকাণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে তারা যতখানি ক্ষুব্ধ নিন্দা জানান, অতোখানি ক্ষোভ কেন সবরমতি এক্সপ্রেসের হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ে না? যারা এ প্রশ্ন করছেন, তারা মনে হয় বুঝতেই পারছেন গোধরার না সবরমতি এক্সপ্রেস জ্বালিয়ে দেওয়া এবং গুজরাতে এখন যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে- এ দুটোর মধ্যে একটি মৌলিক তফাৎ রয়েছে। গোধবার ঘটনার পেছনে কে দায়ী আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না। কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সরকার ঘোষণা করেছে, এটা আইএসআইয়ের ষড়যন্ত্র। নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রেনটিতে অগ্নিসংযোগ করে। যেভাবেই আগুন লাগানো হোক না কেন, এটা অপরাধমূলক কর্ম। (পরবর্তীতে সরকারী অনুসন্ধানে জানা যায় এটা ছিল দুর্ঘটনা। ভিতরে ছিল গ্যাস সিলিণ্ডারসহ দাহ্য পদার্থ- বর্তমান লেখক)। ওদিকে প্রত্যেকটি নিরপেক্ষ সূত্র জানিয়েছে, গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যা যা ঘটেছে- সরকারের ভাষায়

যেগুলো ছিল তাৎক্ষণিক 'প্রতিহিংসামূলক' ঘটনা– তার সবই ঘটেছে প্রদেশ সরকারের প্রশ্রয়মূলক দৃষ্টির সামনে এবং সবচেয়ে যা জঘন্য ব্যাপার, সরকারের সক্রিয় মদদে। উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্র দণ্ডনীয় অপরাধ করেছে। রাষ্ট্রতো জনগণের হয়ে কাজ করে। কাজেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, গুজরাত ষড়যন্ত্রে আমিও কোনো না কোনোভাবে সহযোগী হয়ে পড়েছি। আমার ক্ষোভের কারণ এখানেই। এ কারণে দুই ধরনের হত্যাকান্ডের প্রকৃতি দুই রকম।

গুজরাতের গণহত্যার পর ব্যাঙ্গালোর তাদের সম্মেলনে বিজেপি'র নৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদিভূমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শুভেচ্ছা অর্জন করার আহ্বান জানালো মুসলমানদের প্রতি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মোদি আরএসএসের সদস্য। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভায় নরেন্দ্র মোদিকে বীরের মর্যাদায় স্বাগত জানানো হলো। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তার পদত্যাগের কৃত্রিম ইচ্ছা সর্বসম্মতিক্রমে খারিজ করে দেওয়া হলো। প্রকাশ্য জনসভায় তিনি গুজরাতের গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনাবলীকে গান্ধীর 'ডাণ্ডি মার্চ'-এর সঙ্গে তুলনা করলেন। বললেন, 'তার মতে দুটোই স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত'।

সমসাময়িক ভারতকে বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব জার্মানির সঙ্গে তুলনা করতে খারাপ লাগে। কিন্তু এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। (আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতারা তাদের লেখালেখিতে হিটলার ও তার পদ্ধতির প্রশংসা করতে কসুর করেননি)। দু'টি পরিস্থিতির মধ্যে তফাৎ শুধু এটুকুই যে, এখানে ভারতে আমরা একজন হিটলারকে এখনো পাইনি। তার বদলে আমরা পেয়েছি এক ভ্রাম্যমাণ আনন্দোৎসব, এক ঘুরে বেড়ানো বাদ্যদল। আমরা পেয়েছি হাইড্রার মতো বহু মাথাবিশিষ্ট এক সংঘ পরিবার-বিজেপি, আরএসএস, ভিএইচপি ও বজরং দল। তারা একেকজন বাজাচ্ছে একেক রকম বাদ্যি। এদের সবচেয়ে বড় প্রতিভা জনগণ যখন যা চায়, যে রকম চায়, সে রকম করে নিজেকে সর্বরোগহর হিসেবে উপস্থাপন করা।

প্রতিটি ক্ষেত্রে সংঘ পরিবারের রয়েছে একেবারে উপযুক্ত নেতৃত্ব। যে কোনো পরিস্থিতির উপযোগী বাগড়ম্বরতায় পারদর্শী এক বৃদ্ধ কবি (বাজপেয়ী) রয়েছেন তাদের। জনতাকে উন্মত্ত করে তোলার সিদ্ধহস্ত এক কট্টরপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় দেখার জন্য ইংরেজির তুবড়ি ছোটানো এক আইনজীবী। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তারা জোগাড় করেছে ঠাণ্ডা মাথার এক খুনিকে। গণহত্যা চালানোর মতো শারীরিক খাটাখাটুনির কাজ

সামাল দেওয়ার জন্য রয়েছে বজরং দল ও ভিএইচপির তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা। এই দশাননের আবার রয়েছে একটি টিকটিকির লেজ। বিপদ দেখলেই এই লেজ খসে পড়ে। পরে আবার গজায়। ইনি আর কেউ নন, যে কোনো রূপ ধারণে পারঙ্গম এক সমাজবাদী নেতা, যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর উর্দি পরে আছেন। ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে বলার মিশনে পাঠানো হয় তাকে। তার ডাক পড়ে যুদ্ধবিগ্রহ, ঘূর্ণিঝড় কিংবা গণহত্যার ঘটনা ঘটলেই। সঠিক বোতামে চাপ দিয়ে সঠিক সুরটি বাজানোর দক্ষতার জন্য তার খুব সুনাম পরিবারে। ত্রিশূলের ঝঙ্কারের মতো বিচিত্র ভাষায় কথা বলতে পারে সংঘ পরিবার। একই সঙ্গে একাধিক স্ববিরোধী কথা শোনাতে পারে এই পরিবার। তাদের একটি মাথা (ভিএইচপি) যখন তার লাখ লাখ ক্যাডারকে 'চূড়ান্ত সমাধানের' জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে, তখন তাদের নামসর্বস্ব শিরোমণি (প্রধানমন্ত্রী) জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা হবে। 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে অবমাননা' করার দায়ে এরা একদিকে বই-পুস্তক-চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ করতে পারে, চিত্রকর্ম পারে পুড়িয়ে ফেলতে, তেমনি অন্যদিকে তারাই আবার সারা দেশের পল্লী উন্নয়ন বাজেটের ৬০ শতাংশের সমান অর্থ এনরনের কাছে বন্ধক রাখে। এ পরিবারের মধ্যে নানারকম রাজনৈতিক মত একই সঙ্গে ভরা রাখা হয়েছে। এ কারণে যেসব বিষয় দু'টি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হওয়ার কথা সেটি এখন নিতান্ত 'পারিবারিক কলহ'। তাদের কলহ যত আক্রমণাত্মকই হোক না কেন, তারা সবসময় প্রকাশ্যে এসব কলহ করে। শেষে আন্তরিকভাবে বিপদভঞ্জন হয়। দর্শকরা এই স্বান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যায় যে, পয়সা উসুল হয়েছে– হাসি, কান্না, অ্যাকশন, ড্রামা, ষড়যন্ত্র, প্রতিশোধ, অনুতাপ, কাব্য এবং রক্তারক্তিতে ভরপুর এক নাটক দেখার সুযোগ পাওয়া গেল। এটাই হলো সম্পূর্ণ বশীকরণের স্বদেশী কৌশল।

কিন্তু যখন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ মিইয়ে আসে, মাথাগুলোর ঠোকাঠুকি নীরব হয়ে আসে তখন কান পাতলে শোনা যায়– এ বিশৃঙ্খল নিনাদের ভেতর ধুকপুক করছে একটি মাত্র হৃদস্পন্দন। অহর্নিশি এক গেরুয়া চাহনিতে বিশ্ব দেখছে সকলে।

এর আগেও ভারতে বিভিন্ন অভিযান চালানো হয়েছে, সব রকমের অভিযান। সেসব অভিযানের লক্ষ্য ছিল সুনির্দিষ্ট বর্ণ, গোষ্ঠী, সুনির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর নয়াদিল্লিতে ৩ হাজার শিখ নিধনযজ্ঞের নেতৃত্ব দেয় কংগ্রেস। সে হত্যাযজ্ঞের প্রতিটি মুহূর্ত গুজরাতের মতোই বীভৎস ছিল। সে সময় দুর্মুখ রাজীব গান্ধী বলেছিলেন, 'বড় বৃক্ষের পতন ঘটলে মাটি কেঁপে উঠবেই।' ১৯৮৫ সালে নির্বাচনে একতরফা বিজয়

অর্জন করে কংগ্রেস। সে কি শুধুই সহানুভূতির জোয়ারের কারণে। তারপর ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। একটা লোকেরও শাস্তি হয়নি।

যে কোনো অস্থির রাজনৈতিক ইস্যুর কথা তুলুন– পারমাণবিক পরীক্ষা, বাবরি মসজিদ, তেহেলকা কেলেঙ্কারি, নির্বাচনে সুবিধা করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক উসকানি– দেখবেন আগে থেকেই নজির সৃষ্টি করে গেছে কংগ্রেস। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস বীজ বুনে রেখে গেছে, আর বিজেপি ফসল তুলেছে ঘরে। কাজেই যখন ভোট দিতে যেতে বলা হয় দ্বিধান্বিত অথচ অনিবার্য উত্তর হচ্ছে, 'হ্যাঁ, পার্থক্য আছে' কারণ ব্যাখ্যা করা যাক। এ কথা সত্য যে, দশকের পর দশক ধরে কংগ্রেস পাপ করছে। কিন্তু এ পাপকর্ম তারা করছে রাতের আঁধারে। বিজেপি ওই কাজই করছে দিনের আলোয়। কংগ্রেস এ কাজ করেছে গোপনে, প্রতারণামূলকভাবে লজ্জাবনত চোখে। বিজেপি তাই করেছে সগর্বে– এ তফাৎটুকু খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সংঘ পরিবার ম্যাণ্ডেটই পেয়েছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়ার। বছরের পর বছর ধরে এটাই তাদের লক্ষ্য ছিল। সুশীল সমাজের রক্তের মধ্যে এ ঘৃণা তারা স্লো-পয়জনিংয়ের মতো করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। দেশজুড়ে শত শত আরএসএসের শাখা এবং সরস্বতী শিবমন্দির হাজার হাজার শিশু ও তরুণকে তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে তাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় ঘৃণা আর মিথ্যে ইতিহাসের বীজ। গুজরাতের মতো রাজ্যে পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রতিটি স্তরে সুপরিকল্পিতভাবে এসব লোক ঢুকিযে দেওয়া হয়েছে। গোটা ব্যবস্থাটার মধ্যে একটি প্রবল ধর্মীয়, আদর্শিক রঙ মেখে দেওয়া হয়েছে। এ জাতীয় ক্ষমতা, এ জাতীয় প্রভাব একমাত্র রাষ্ট্রের মদদেই সম্ভব।

নিরন্তর চাপের মুখে যা হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হলো, মুসলমান সম্প্রদায় বস্তি এলাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের জীবন বেছে নেবে। সার্বক্ষণিক আতঙ্কের ভেতর বসবাস করবে তারা। নাগরিক অধিকার থাকবে না তাদের। ন্যায়বিচারের প্রতিও থাকবে না তাদের কোনো আস্থা। তাদের সেই জীবনযাপন কেমন দাঁড়াবে? যেকোনো ক্ষুদ্র ঘটনা- সিনেমার টিকেট কাটার লাইনে সামান্য কথা কাটাকাটি, কিংবা গাড়ির আলো গায়ে পড়া নিয়ে মৃদু বচসা হলেই জান খতম। কাজেই তারা একেবারে চুপ মেরে যাওয়া শিখে নেবে। এটাকেই মেনে নেবে নিয়তি বলে। সমাজের পরিধির দিকে সরে যাবে তারা। তাদের সন্ত্রস্ত ভাব অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে। অনেকেই, বিশেষত তরুণরা হয়তো জঙ্গিদের দিকে ঝুঁকে পড়বে। ভয়ানক কাজকর্ম করবে তারা। সেসবের নিন্দা জানানোর জন্য সুশীল সমাজের লোকজনকে ভাড়া করা হবে। তারপর

প্রেসিডেন্ট বুশ তার কামানের নল আমাদের দিকে তাক করে বলবে, 'হয় তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো, নইলে তোমরা সন্ত্রাসবাদী।'

বুশের এ বাণী সময়ের শরীরে গেঁথে গেছে তুষারিকার মতো। ভবিষ্যতের দিনগুলোয় কসাই আর গণহত্যাকারীরা এসব তুষারিকায় তাদের চোয়ালের সাইজ অনুযায়ী কামড় বসিয়ে কসাইগিরি জায়েজ করবে।

শিবসেনার বাল ঠাকুরে ইদানীং মোদির কীর্তিকলাপে উৎসাহীত বোঁধ করছেন। তিনি একটি স্থায়ী সমাধান দিয়েছেন। তিনি গৃহযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। নিখুঁত বুদ্ধি নয়? তাহলে তো পকিস্তানকে আর কষ্ট করে আমাদের ওপর বোমাবর্ষণ করতে হবে না। আমরাই বোমা মেরে আমাদের দফারফা করে ফেলব। আসুন পুরো ভারতটাকেই আমরা কাশ্মীর বানিয়ে ফেলি। কিংবা বসনিয়া। কিংবা ফিলিস্তিন। অথবা রুয়াণ্ডা। চলুন, সবাই মিলে আজীবন অশান্তিতে ডুব দিই। একে অপরকে হত্যা করার জন্য চলুন দামি বন্দুক ও বিস্ফোরক কিনি। আসুন, আমাদের ফিনকি দিয়ে ছোট রক্তের ধারায় ভারী করে তুলি আমেরিকান ও ব্রিটিশ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পকেট। যে কার্লাইল গ্রুপের শেয়ারহোল্ডার বুশ ও লাদেন পরিবার, সেই গ্রুপের কাছে আমরা বিশেষ মূল্য ছাড় দাবি করতে পারি। সবকিছু ভালোমতো চললে আমরা হয়তো একদিন আফগানিস্তানে পরিণত হবো। (তাছাড়া দেখুন না, কি রকম ঈর্ষণীয় পাবলিসিটি পেয়েছে তারা!) যখন আমাদের সবগুলো ক্ষেত-খামার মাইনে গিজগিজ করবে, আমাদের দরদালান যখন সব ধুলায় মিশে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে, যখন স্বতোৎপাদিত ঘৃণার স্রোতে আমরা আমাদের প্রায় মুছে ফেলার উপক্রম করব, তখন হয়তো আমরা আমেরিকার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাব। বলব, বিমানে করে আমাদের মাথার ওপর খাদ্য বর্ষণ করার মতো কেউ কি আছো?

আত্মবিনাশের কি এক খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। আরেক ধাপ পা বাড়ালেই অতলে সাঁই সাঁই পতন। সরকার পেছন থেকে সেদিকই ঠেলছে ক্রমাগত। গোয়ায় বিজেপির জাতীয় ।নর্বাহী কমিটির সভায় ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ি ইতিহাস তৈরি করেছেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক অবিবেকী অন্ধবিশ্বাস সবার সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি। বলেছেন, 'মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন, তাঁরা শান্তিতে থাকতে চায় না।'

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি সাদামাটা আশা পুষে রেখেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, গত কয়েক সপ্তাহের আতঙ্কের ভয়াবহতা বিক্ষুব্ধ সেক্যুলার দলগুলোকে একাট্টা করবে। বিজেপি এককভাবে ভারতের জনগণের ম্যাণ্ডেট পায়নি। হিন্দুত্ব প্রকল্পের

ম্যাণ্ডেট তাদের দেয়নি জনগণ। আমরা আশা করেছিলাম, কেন্দ্রে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশনের ২৭ শরিক তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করবে। বোকার মতো আমরা ভেবেছিলাম বিজেপি এবার টের পাবে নৈতিকতার কত বড় পরীক্ষার মুখে পড়েছে তারা।

সময়ের অশনি সঙ্কেত ধ্বনিত হয়েছে। বিজেপি'র একটি শরিক দলও পদত্যাগ করেনি। পদত্যাগ করলে কোন আসন থাকবে আর কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে– সেই'মানসাঙ্ক করার দূরবর্তী চাহনি দেখা গেল প্রতিটি চতুর চোখে। একমাত্র এইচডিএফসির দীপক পারেখ ছাড়া ভারতের করপোরেট সম্প্রদায়ের একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকেও দেখলাম না নিন্দা জানাতে। ভারতের একমাত্র বিশিষ্ট মুসলমান রাজনীতিবিদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ্ মোদিকে সমর্থন করে সরকারের সঙ্গেই পাত পেতেছেন। কেননা শিগরিই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার বাসনা মনের ভেতর পুষছেন তিনি। সবচেয়ে খারাপ ঘটনা হলো, নিম্নবর্ণের একমাত্র ভরসার স্থল মায়াবতী উত্তর প্রদেশে বিজেপি সরকারের সঙ্গে কোয়ালিশন গড়ার উপক্রম করেছেন।

কংগ্রেস ও বাম দলগুলো মোদির পদত্যাগের দাবিতে গণআন্দোলনের ডাক দিয়েছে। পদত্যাগ? আমরা কি পরিমিতিবোধ হারিয়ে ফেলেছি নাকি? পদত্যাগ তো অপরাধীদের শাস্তি নয়, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়ার কথা। বিচার করে তাদের সাজা হওয়ার কথা। গোধরায় যারা ট্রেনে আগুন দিয়েছে শাস্তি তাদেরও হওয়া উচিত। বিচার হওয়া উচিত গুজরাতে অভিযানে পরিকল্পনাকারী উচ্ছৃঙ্খল লোকজন এবং তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর। সুপ্রিম কোর্ট চাইলেই মোদি, বজরং দল ও ভিএইচপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। তাদের বিরুদ্ধে সুযোমোটা জারি করতে পারে আদালত। হাজার হাজার বয়ান পাওয়া যাবে। লাখো লাখো সাক্ষী সাক্ষ্য দেবে। গুজরাতে যা ঘটেছে তাতে অনেকের আতঙ্কের ঘোর এখনো না কাটলেও এদিকে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হাজার হাজার তরুণ আতঙ্কের আরো গভীরে তলদেশ কুঁড়ে বের করতে উদ্যত। চারদিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখতে পাবেন ক্ষুদ্র পার্ক, বৃহৎ ময়দান, গ্রাম্য পঞ্চয়েতে আরএসএস তার গেরুয়া ঝাণ্ডা উড়িয়ে পা পা করে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ চোখের পলকে তারা সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। তরুণরা এখন সোমত্ত পুরুষ। খাকি প্যান্ট পরে তারা মার্চ করছে তো করছেই। কোথায়? কেন? ইতিহাসের প্রতি অনীহার কারণে তারা জানতে পারছে না ফ্যাসিবাদের আস্ফালন খণ্ডকালের। এক সময ‍নিজের বোকামিতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনে ফ্যাসিবাদ।

পার্লামেন্টে নিন্দা জানিয়ে মানুষের মনে ঘৃণা আর ক্ষোভের জোয়ার নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। ভ্রাতৃত্ব আর প্রেমের মন্ত্র শ্রুতিমধুর হলেও এগুলোই যথেষ্ট নয়।

ইতিহাস বলে জাতিগত হতাশা, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা থেকে ফ্যাসিবাদের জন্ম। ভারতে ফ্যাসিজম এসেছে একের পর এক পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কার স্বপ্নগুলোকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার কারণে। ভারতের স্বাধীনতা এসেছেই রক্তের পথ বেয়ে। দেশভাগের সময় নিহত হাজার হাজার মানুষের রক্তের দাগ লেগে রয়েছে স্বাধীনতার গায়ে। অর্ধশতাব্দীকাল ধরে এই ঘৃণা আর পারস্পরিক অবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতিবিদরা এ ঘৃণা নিয়ে খেলতে চেয়েছেন। ক্ষত সারানোর কোনো চেষ্টা তারা করেননি। এ খেলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন মিসেস ইন্দিরা গান্ধী। প্রতিটি রাজনৈতিক দল আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের মজ্জা শুষে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। নির্বাচারে সুবিধা করার খাতিরে তারা এর শরীর খুঁড়েছে। উঁইপোকার মতো তারা এর ভেতরে সুড়ঙ্গ করেছে। মাটির তলায় করেছে রাস্তাঘাট। এভাবে 'ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে ফাঁপা খোলসে পরিণত করেছে। তাদের খোঁড়াখুঁড়ি সংবিধান, পার্লামেন্ট ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সুতোর বন্ধন কেটে দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চেক অ্যাণ্ড ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতে ১৩ কোটি মুসলমানের বাস। হিন্দু ফ্যাসিবাদীরা তাদেরকে বৈধ শিকার বলে গণ্য করে। মোদি ও বাল ঠাকুরে কি মনে করেন, গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে মুসলমান নিধন শুরু করলে সারা বিশ্ব তা চেয়ে চেয়ে দেখবে? পত্রিকার খবরে প্রকাশ, গুজরাতের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তারা এটিকে নাৎসি শাসনের সঙ্গে তুলনা করেছে। ভারত সরকারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া– ভারতের মিডিয়া ব্যবহার করে ভারতেরই 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' মন্তব্য করতে দেওয়া হবে না বিদেশীদের। এরপর কি? সেন্সরশিপ? ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া? আন্তর্জাতিক ফোন কল বন্ধ করে দেওয়া? ভুল 'সন্ত্রাসবাদীদের' হত্যা করার পর ডিএনএ নমুনা নিয়ে ছোটাছুটি? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের চেয়ে বড় কোনো সন্ত্রাস হয় নি। কিন্তু এদের থামাবে কে? একমাত্র বিরোধী দলের সোচ্চার প্রতিরোধই এদের ফ্যাসিবাদী জোশকে রুখতে পারে। এখন পর্যন্ত বিহারের লালু যাদবই নিজের আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি বলেছেন, কৌন মাই কা লাল কেহ্‌তা হ্যায় কে ইয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হ্যায়? উসকো ইয়াহা ভেজ দো, ছাত্তি ফাড় দুঙ্গা। (কোন মায়ের পুত বলে রে এটা হিন্দু রাষ্ট্র। পাঠিয়ে দে তাকে এখানে, বুকের ছাতি গুঁড়িয়ে দিই।)

দুর্ভাগ্য যে, সবকিছু ঠিক করে ফেলার সহজ কোনো পথ নেই। ফ্যাসিজম উৎখাত করা সম্ভব কেবল এর দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষগুলো যদি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি দ্বিগুণ জোরদার অঙ্গীকার প্রদর্শন করে।

আমরা কি আমাদের নিজ নিজ প্রাচীর ডিঙিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? আমরা কি লাখে লাখে, কাতারে কাতারে শুধু রাস্তায় নয়, কর্মস্থলে, স্কুলে, বাড়িতে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে মিছিলে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত? নাকি এখনো প্রস্তুত নই ...

যদি প্রস্তুত না হয়ে থাকি, সে ক্ষেত্রে আজ থেকে বহু বছর পরে, যখন বাকি বিশ্ব হিটলারের জার্মানির নাগরিকদের মতো আমাদেরও এড়িয়ে চলতে শুরু করবে, তখন আমরাও আমাদের মানবসন্তানের চোখে ঘৃণার ছায়া চিনে নিতে শিখব। আমরাও আমাদের সন্তান-সন্ততির চোখের দিকে তাকাতে পারব না লজ্জায়। যে কাজ আমরা করেছি এবং যা করতে পারি নি- তার লজ্জা। যা আমরা ঘটতে দিয়েছি, তার লজ্জা।

ভারতে এই হলো আমাদের পরিস্থিতি। এ রাত্রি অবসানে ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

খতম

মুহাম্মদ সিদ্দিক সাবেক কূটনীতিক, কলাম লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর রয়েছে নানা অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তিনি সস্ত্রীক হজ্বসহ দু'ডজনের মতো দেশ ভ্রমণ করেছেন। লেখালেখির ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণক্ষেত্র হল আন্তর্জাতিক বিষয়, দর্শন, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, সফর কাহিনী, রাজনীতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, একসময় তিনি দেশে-বিদেশে বাংলা ও ইংরেজিতে চল্লিশটির মতো পত্র-পত্রিকা-ম্যাগাজিনে লিখতেন। এখনও বহু বাংলা পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে তিনি লিখে চলেছেন। তাঁর প্রকাশিত অন্যতম বইগুলো হলো : ১. স্টিফেন হকিং, নাস্তিকতা ও ইসলাম, ২. নাস্তিকের যুক্তিখণ্ডন, ৩. বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, ৪. Basic Islamic Prayers, ৫. ষড়যন্ত্রের কবলে ফিলিস্তিন, ৬. ষড়যন্ত্রের কবলে উপমহাদেশে মুসলমান, ৭. ইসরাঈল ও মুসলিম জাহান, ৮. ভারতের নির্মম গণহত্যা, ৯. মার্কিন নথি, ১০. দেশের কথা, ১১. ষড়যন্ত্রের কবলে দেশে দেশে মুসলমান, ১২. ষড়যন্ত্রের কবলে আফগানিস্তান, ১৩. স্রষ্টার খোঁজে, ১৪. দেশ কোন পথে?, ১৫. সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা, ১৬. ভারতে মুসলিম নির্যাতন, ১৭. বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি, ১৮. বাংলাদেশের রাজনীতি।

উল্লেখ্য যে, জনাব মুহাম্মদ সিদ্দিকের বড় মেয়ে শামীমা সিদ্দিকা লিখেছেন নেপালী মুসলমানদের উপর বিশ্বের প্রথম বই 'Muslims of Nepal', যা নেপালের কাঠমণ্ডু থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালে।